ছেড়ে বাইরে থাকলে পিষে যেতে হবে, ভগবান আমাদের ডাকছেন—আয় কীলকের কাছে আয়, আমার কাছে এসে দাঁড়া, আমাকে ধর্, আর ভয় থাকবে না।

এই জন্যই শরণাগতি, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই। সকলের ভিতরে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, তিনিই সকলকে ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—(গীতা—১৮।৬১) মায়াযন্ত্রে ঘোরাচ্ছেন। তাঁরই শরণাগত হতে হবে, তবেই এই মায়া থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' গীতা—১৮।৬২) হে ভারত, তাঁরই শরণ লও, সর্বভাবে শরণ লও, নতুবা জীবের আর গতি নাই। ভগবান্ বললেন—আমিই ভিতরে লুকিয়ে আছি, অণুপরমাণুতেও আমিই আছি, দেখ, খোঁজ, চোখ বন্ধ কর, ভিতরে প্রবেশ কর—শরণাগত হও। যখন পূর্ণ শরণাগতি আসবে তখন তাঁর কৃপা লাভ করবে—পরম আনন্দ ও শান্তি পাবে। জন্ম-জন্মান্তরের কষ্ট আর ভুগতে হবে না—এমনি এক অবস্থা লাভ করবে। ভগবান অর্জুনকে বড় ভালবাসেন, তাই আরও বলছেন—অর্জুন, তুমি আমার বড় প্রিয়—বড় ভালবাসি তোমায়, তাই অযাচিতভাবে এই গুহ্যতম উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি তোমার মঙ্গলের জন্যে। যদি শান্তি চাও আমার এ গুহ্যতম বাণী ভক্তদের শোনাও, সকলকে ডেকে বল—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' (গীতা—১৮।৬১) ঈশ্বরই সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তারপরেই আবার বলছেন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমাকে ধর—আমিই তোমাকে ধুয়ে পুঁছে সাফ করব।

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' (গীতা—৯।৩৪) মন সমাহিত কর—আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, 'মদ্‌যাজী' আমার উপাসনা কর—'মাং নমস্কুরু'—আমাকে নমস্কার কর। তাতে তুমি আমাকেই লাভ করবে। কী অপূর্ব স্বীকারোক্তি! শরণাগত হও, আমাকেই তুমি পাবে।

মাছ জলের শরণাগত, তাই প্রবল স্রোতেও সে নির্ভয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—কিন্তু হাতী তো কত বৃহৎ, কত শক্তিশালী তবু তো স্রোতে চলতে পারছে না। কোথায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

ভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে ভক্তি কর, আমাকে নমস্কার কর, আমাতে মন দাও, আমার উপাসনা কর। এই চারটি জিনিস পালন করলেই তো তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন। মা ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাইলেও গলা আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়, তবেই আর নামার ভয় থাকে না। ভগবানের বাণীতে বিশ্বাস নিয়ে বিড়ালশাবকের মতো নির্ভরতা নিয়ে কত সাধক সারা জীবন সাধনা করে যাচ্ছেন। পূর্ণ শরণাগতি—তিনি যখন বলেছেন আমি দেবো তখন নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। আমার কেবল দেখতে হবে আমি কি করছি। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। আর একটা কথা ঠাকুরের—তুমি এক পা এগোও তো তিনি অমনি একশ পা এগিয়ে আসবেন।

মানুষ একবার এসে ফিরে গেলে রাগ করে কিন্তু ভগবান বার বার আমাদের কাছে আসেন আমরা ফিরিয়ে দিই তবুও তিনি রাগ করেন না, আবার আসেন।

লালাবাবুর কি হয়েছিল? ছোট কথা 'বেলা গেল' এইটুকু শুনেই চমকে উঠলেন—আমারও তো বেলা গেল! সব ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে, বনে বনে হরিনাম করে কাটালেন। আমার কেউ নেই প্রভু, আমি একলা, বড় অসহায়—এই ভাবে তাঁকে ডাকতে হবে। সত্যি অসহায় হতে হবে 'দুসরা না কোঈ'—আমি একলা, আমার আর দুসরা কেউ নেই—আছেন, 'মেরেতো গিরিধারী-গোপাল'—খালি গিরিধারীলাল আর কেউ নেই। 'ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব!' হে দেব, হে নাথ, কেবল তুমিই আমার সর্বস্ব আর কেউ নয়।

আরণ্যক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
(অধ্যক্ষ, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ, পশ্চিম বঙ্গীয় সরকার)

বৈদিক সাহিত্য মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত—সংহিতা বা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে অধীত হতো, তাই আরণ্যক; অরণ্যবাসী বা বাণপ্রস্থাবলম্বী যাঁরা নন, তাঁরা এই অংশ শুনতে পারতেন না। সায়নাচার্য তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যের প্রারম্ভে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্যতে।
অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষতে॥
এতদারণ্যকং সর্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি॥"

কেবল তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম চার অধ্যায় এ নিয়মের বহির্ভূত। ব্যাকরণের দিক থেকে মহাভাষ্যকার আরণ্যকের এই অর্থোপপত্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। পাণিনি বলেছেন—"অরণ্যং মনুষ্যে" (৪।২।২৯); মহাভাষ্যকার বললেন—মনুষ্য, এই কথা বললে অত্যল্পই বলা হলো—পন্থা, অধ্যায়, ন্যায়, বিহার, মনুষ্য ও হস্তী—এই সব অর্থেও অরণ্য শব্দের সঙ্গে বুঞ্, বা অক প্রত্যয় হলে আরণ্যক কথাটী পাওয়া যাবে—"অত্যল্পমিদমুচ্যতে, মনুষ্য ইতি। পন্থাধ্যায়-ন্যায়-বিহার-মনুষ্য-হস্তিষ্বিতি বক্তব্যম্"॥ যাহা হোক্—"আরণ্যক" কথাটীর অর্থ এই যে বেদের যে অধ্যায় অরণ্যবাসীর বা বাণপ্রস্থাবলম্বীর অবশ্য পাঠ্য তাই আরণ্যক।

অধুনাপ্রাপ্ত আরণ্যক গ্রন্থের সংখ্যা স্বল্প। ঋগ্বেদের আরণ্যক দুটী—ঐতরেয় ও কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন; যজুর্বেদের অন্তর্গত দুটী—বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয়। কারো কারো মতে সামবেদের অন্তর্গত আরণ্য-সংহিতা এবং আরণ্য গানও আরণ্যকের পর্যায়ভুক্ত। অথর্ববেদের কোনও আরণ্যক নাই।

ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের অন্তর্গত আরণ্যক-চতুষ্টয় উক্ত বেদের ব্রাহ্মণসমূহের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট এবং আরণ্যকসমূহের শেষাংশে আবার ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সন্নিবিষ্ট আছে। উপনিষৎসমূহ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান-মূলক; কিন্তু আরণ্যকগুলির উপনিষদ্‌বর্জিত অংশে জ্ঞান-বিষয়ক পর্যালোচনা থাকলেও উক্ত বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক মাত্র। ফলতঃ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই পর্যায়ক্রমে আরণ্যকের স্থান ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ গ্রন্থের মধ্যভাগে এবং বিশিষ্ট আরণ্যক-সমূহ তদবস্থাতেই পাওয়া যায়। আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে দেখা যায়—ব্রাহ্মণাংশে যে যে বৈদিক ক্রিয়ার আলোচনা স্বল্প দৃষ্ট হয় বা পরিবর্জিত হয়েছে, আরণ্যকে তারই আলোচনা। তজ্জন্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের পরিশিষ্টস্বরূপ। উপনিষদ্‌বিবর্জিত আরণ্যকসমূহ কর্মকাণ্ডমূলক। কিন্তু উপনিষৎ-সমম্বিত আরণ্যক কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ব সমাহার।

ভারতীয় মতে বৈদিক সাহিত্যের বিশিষ্ট অংশ-স্বরূপে আরণ্যকসমূহও অপৌরুষেয় বা revealed scriptures. পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে আরণ্যকের রচনাসময় ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ-সমূহের মধ্যবর্তীকাল।

এখন পর্যায়ক্রমে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি আরণ্যক এবং যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করছি।

ঐতরেয় আরণ্যক

ঐতরেয় আরণ্যকের উৎপত্তি-বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত উপাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। সায়নাচার্য ঐতরেয়

ব্রাহ্মণ-ভাষ্যের প্রারম্ভে এটা বর্ণনা করেছেন। কোনও মহর্ষির অনেক পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে "ইতরা" একজন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল মহীদাস। কোনও ক্রিয়োপলক্ষ্যে উক্ত মহর্ষি তাঁর অন্যান্য পত্নীজাত পুত্রগণকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক দেবার্চনা আরম্ভ করেন। এতে অত্যন্ত ক্লিষ্টা ইতরা তাঁর ইষ্টদেবতা ভূমির নিকট নিজের দুঃখ নিবেদন করায় ভূমিদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হন এবং মহীদাসকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে তাঁকে "ব্রাহ্মণ" প্রতিভাসনের বর প্রদান করেন (সা চ ভূমির্দেবতা দিব্যমূর্তিধরা সতী যজ্ঞসভায়াং সমাগত্য মহীদাসায় দিব্যং সিংহাসনং দত্ত্বা তত্রৈনমুপবেশ্য সর্বেষ্বপি কুমারেষু পাণ্ডিত্যাধিক্যমবগম্য এতদ্ ব্রাহ্মণপ্রতিভাসনরূপং বরং দদৌ)। সেই বরানুগৃহীত মহীদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-কারণ। "ব্রাহ্মণে"র উৎপত্তির পরে আরণ্যকব্রতরূপ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ঐতরেয় আরণ্যকের উৎপত্তি হলো। (তত উর্ধ্বমথ মহাব্রতমিত্যাদিকম্ আচার্যা আচার্যা ইত্যন্তম্ আরণ্যকব্রতরূপং চ ব্রাহ্মণমাবিরভূৎ ইতি)।

এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখযোগ্য যে ঐতরেয় আরণ্যকের পাঁচ আরণ্যকের মধ্যে শেষের দুই আরণ্যক পৌরুষেয় বা পরবর্তীকালে রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। খুব সম্ভবতঃ আশ্বলায়ন এর রচয়িতা।

আকারে ঐতরেয় আরণ্যক খুব প্রকাণ্ড নয়। শ্লোক সংখ্যার গণনা করিতে গেলে এই আরণ্যকের আকার নয় শত শ্লোক পরিমিত (অর্থাৎ ৩২ × ৯০০ অক্ষর সমন্বিত)। এই অংশ পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম আরণ্যকে পাঁচ, দ্বিতীয়ে সাত, তৃতীয়ে দুই, চতুর্থে এক এবং পঞ্চমে তিন—মোটের উপর আঠারটা অধ্যায়। এই আরণ্যকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় ঐতরেয় উপনিষদ্ রূপে সুবিদিত। প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চম কাণ্ডে "মহাব্রত" বিবৃত হয়েছে।

শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকি আরণ্যক

শাঙ্খায়ন আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই পনের অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দুই অধ্যায়ে মহাব্রতের বর্ণনা। ক্রিয়ামূলক আরণ্যক ফলতঃ এই দুই অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। অতঃপর উপনিষদ্ আরম্ভ, তৃতীয়—ষষ্ঠ পর্যন্ত কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদ্। সপ্তম ও অষ্টমে সংহিতোপনিষদ্। নবমে প্রাণ-বিষয়ক উপনিষৎ পর্যালোচনা। দশমে আন্তর অগ্নিহোত্র, একাদশে প্রাণসংবাদ, দ্বাদশে বিশ্বসূক্ত, ত্রয়োদশে 'আত্মা' বিষয়ক পর্যালোচনা, চতুর্দশে বেদার্থ জ্ঞান এবং পঞ্চদশে বংশবর্ণন।

ফলতঃ ঐতরেয় ও কৌষীতকি আরণ্যকের উপনিষদ্‌ব্যতিরিক্ত ক্রিয়াংশে "মহাব্রতে"র বর্ণনই মুখ্য বিষয়। এই মহাব্রত কি এবং কখন সম্পাদন করা হতো, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এক দিবসে সমাপ্য ক্রিয়া বা কোনও সত্রের অংশরূপে এই যজ্ঞ করার বিধি আছে। উত্তরায়ণের পরে খুব সম্ভবতঃ, এই ব্রত অনুষ্ঠিত হতো। ঋত্বিক্ দোলায় চড়ে সূর্যের গতিপথ যেন প্রবৃদ্ধ করতেন এবং নারীরা বিভিন্ন প্রকারে বাদ্য বাজাতেন।

সূর্যের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত গোলাকার চর্মখণ্ডের অধিকার বিষয় নিয়ে একজন আর্য এবং শূদ্রের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হতো। বন্ধ্যা গাভীর চর্ম উপরে ঝুলিয়ে রেখে যোদ্ধারা তীর দিয়ে তা বিদ্ধ করতেন। নারীরা বীণা বাদন করতেন এবং কুমারীরা স্তোত্রের সঙ্গে সঙ্গে জলকুম্ভ সহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করতেন। অগ্নিতে জলবর্ষণ পূর্বক তাঁরা প্রার্থনা করতেন—গাভীর অভ্যুন্নতি ও প্রচুর গোদুগ্ধ। এ মহাব্রতে পৃথিবীর নিকটস্থ সূর্যের নিকট বারংবার প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক

তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত। আকারে ও বিষয়ের গুরুত্বে এই গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। এই পুস্তকের অন্তর্গত দশটী প্রপাঠকের অর্থাৎ বৃহৎ

অধ্যায়ের মধ্যে শেষ চারটী অধ্যায় তৈত্তিরীয় উপনিষৎ এবং প্রথম ছয়টী অধ্যায়ই তৈত্তিরীয় শাখার ক্রিয়াকাণ্ডমূলক।

এ গ্রন্থে যাতে কোনও নূতন শব্দ সংযোজিত হতে পারে, তজ্জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রপাঠকের শেষে প্রত্যেক অনুবাকের এবং পরবর্তী দশকণ্ডিকার প্রারম্ভিক শব্দ প্রদত্ত হয়েছে—যাতে প্রত্যেক প্রপাঠকের শেষে এবং প্রত্যেক অনুবাকের আরম্ভ ও অন্ত ভাগ সহজেই বোধগম্য হয়। আবার প্রত্যেক অনুবাকের শেষেও অনুবাকস্থ প্রত্যেক পূর্ণচ্ছেদের বা বিভাগের অন্ত্য ২।১টী শব্দ পুনরুদ্ধৃত করা হয়—যাতে প্রত্যেক অনুবাকের শেষও সহজেই শ্রুত ও অনুমিত হয়।

ব্রাহ্মণাংশে যে সব ক্রিয়া বর্ণিত হয়নি বা অতিসামান্য ভাবে হয়েছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার পর্যালোচনা আরণ্যকে। আরুণকেতুক অগ্নিস্থাপনা বর্ণিত হয়েছে প্রথম প্রপাঠকে। বিভিন্ন অভিপ্রায়ে—ধন বা সন্তানাদি প্রবৃদ্ধি, শত্রুধ্বংস, যশোবৃদ্ধি প্রভৃতি—এই যাগ সম্পাদিত হতো। তজ্জন্য এই যজ্ঞ ছিল নৈমিত্তিক এবং ইচ্ছামূলক। যজ্ঞ আরম্ভের প্রস্তুতির জন্য এক বৎসর বা অন্ততঃ দু'মাস বিভিন্ন নিয়ম পালন করতে হতো। যজ্ঞ আরম্ভ হলে এক বৎসর পরিমিত কাল রোজ দুটী বেদীতে মাখন, সমিধ, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা আহুতি প্রদান করা হতো—একটী বেদীতে থাকতো জল, অন্যটীতে অগ্নি। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে অষ্ট আদিত্যের নামোল্লেখ আছে—যথা, অরোগ, ভ্রাজ, পটর, পতঙ্গ, স্বর্ণর, জ্যোতিষ্মান্, বিভাস ও কশ্যপ। কশ্যপ থাকেন নিরন্তর মেরুপ্রদেশে—আলোকে রাখেন মেরুদেশের দিগ্‌দিগন্ত ভাস্বর। এভাবে দ্বিতীয় প্রপাঠকে আছে স্বাধ্যায়-বর্ণন, যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বর্ণন। তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্হোত্র-চিতি। চতুর্থে ও পঞ্চমে প্রবর্গ্য ক্রিয়ার বিবৃতি এবং মন্ত্রোদ্দেশ্য বর্ণন। ষষ্ঠে পিতৃ-মেধ॥

আরণ্যক গ্রন্থের শেষাংশ উপনিষদ্। গার্হস্থ্য-জীবনের নৈমিত্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ক্রিয়ার বিবরণ সন্নিবদ্ধ আছে ব্রাহ্মণাংশে; আরণ্যকে অরণ্যবাসীর অবশ্য করণীয় ক্রিয়ার উল্লেখ ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্রহ্মণাংশে সূক্ষ্মতঃ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং উপনিষদে জ্ঞানমূলকপর্যালোচনা। উত্তরমীমাংসা-মূলক বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রের তাই প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। বহু প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার স্বভাবতঃই "অথ" শব্দের "ক্রিয়াকাণ্ডের পরে" এই ব্যাখ্যা করে ক্রিয়াকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনার আরম্ভ - ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের এই ব্যাখ্যা করেছেন।

কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে কোনও বিরুদ্ধ সম্পর্ক নাই। একটী থেকে অন্যটীর ক্রমপরিণতি। নিবিষ্ট চিত্তে বৈদিক সাহিত্য অনুধাবন করলে এই সত্য সহজেই বোধগম্য হয়। কর্ম ও জ্ঞানমার্গ নিয়ে উত্তরযুগের কোলাহল ও তৎপ্রসূত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় নিতান্ত ভেদবুদ্ধিপ্রসূত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী আরণ্যক সাহিত্য পাঠে এই সত্যের অভ্রান্ত আলোক হৃদয় বিপ্লাবিত করে। বর্তমান যুগে আরণ্যক পাঠের এখানেই চরম সার্থকতা।

"যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রসূত নির্বুদ্ধিতা থেকে আসে প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(দার্জিলিং হইতে মিস্ মেরী হেলকে লিখিত ২৮।৪।১৮৯৭ তারিখের পত্র)

শিক্ষক

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

মোরা শিক্ষক সমাজসেবক
ভাবী নাগরিক গঠন করি।
কচিদের নিয়ে বড়ো ক'রে তুলি,
মহাদেবও গড়ি, বাঁদরও গড়ি ॥

স্রষ্টার মত স্বপ্নই থাকে
হাতে খড়ি দিই প্রথম যবে—
'আজকার শিশু পরিণত হ'লে
বিদ্বান্ মহামানব হবে'॥

স্বপ্ন কভু বা স্বপ্নই থাকে,
দুঃখের বোঝা বাড়ায় মনে।
সফল যদি বা হয় কদাচিৎ
ধনী মনে করি পরম ধনে ॥

বিদ্যার পুঁজি যার যতটুকু
তাই নিয়ে করি অধ্যাপনা।
পণ্ডিতও আছে আমাদের মাঝে
মূর্খও আছে অনেকজনা ॥

ক-খই পড়াই কেহ আজীবন,
চিরদিনই কেহ অঙ্ক কষি।
ভূগোল, ইতিহাস, কেহ বিজ্ঞান
কেহ সাহিত্য-ক্ষেত্র চষি ॥

কারো বা কলেজে কারো ইস্কুলে,
পাঠশালে কারো জীবন কাটে।
গৃহশিক্ষক কেহ আজীবন,
জল খেয়ে ফেরে নানান ঘাটে ॥

শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব
ভিক্ষার ঝুলি মোদের কাঁধে,
চিরদিন অবহেলিত আমরা
অভাবে মোদের চক্ষু ধাঁধে ॥

সম্মান করে, কেহ অপমান,
ত্যাগেই মোদের দীক্ষা শুরু।
চিরদরিদ্র—তবু ধনী মোরা
জাতির যে মোরা শিক্ষাগুরু ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্র নূতন করিয়া পড়িতেছি। কিছুদিন আগে স্বামীজীর স্বামি-শিষ্য-সংবাদ পড়িয়াছিলাম। একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ দুজনের কণ্ঠেই শক্তির বন্দনাগান। একজন গৃহস্থ এবং অপরজন সন্ন্যাসী—কিন্তু দুজনেই একই ধাতুতে গড়া। বঙ্কিম শাক্ত, বিবেকানন্দও শাক্ত।

আনন্দমঠে বঙ্কিম মহেন্দ্রসিংহকে ধর্ম ত্যাগ করাইয়া নূতন করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমময় বিষ্ণুকে প্রাধান্য দিয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম কংস-রাবণ-শিশুপাল-জরাসন্ধাদির বিনাশহেতু শক্তিময় বিষ্ণুকে যাঁহার প্রকাশ 'গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়।' বিষ্ণু তো শুধু প্রেমে সৃষ্টি করেন না, শক্তিতে তিনি ধ্বংসও করেন। একদিকে তিনি যেমন করুণকোমল আর একদিকে তেমনি তিনি বজ্র-সুকঠিন। মোহনমুরলীধারী তাঁহার বাঁশী বজ্রেও বাজে। বজ্রসুকঠিন শক্তিময় বিষ্ণু পুরাতনকে

ভাঙেন। না ভাঙিলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্র সিংহকে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করাইয়া শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসনায় ব্রতী করিয়াছেন। সন্তানের বিষ্ণু শক্তিময়।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম লিখিয়াছেন :—

> "পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।"

স্বদেশরক্ষায় আমরা অগ্রসর হইব কেন? বঙ্কিম বলিতেছেন : 'সর্বভূতের হিতের জন্য।' বঙ্কিমের মতে 'ধর্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে।' ঈশ্বর যে সর্বভূতের অন্তরাত্মা। স্বদেশরক্ষার কার্যে ব্রতী না হইলে পৃথিবীর আশা কোথায়? বিজ্ঞানকে সহায় করিয়া ইউরোপীয় Patriotism স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিতে উদ্যত। ভারতবর্ষের কুটীরশিল্পের চিতা-ভস্মের উপরে ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার আদিম জাতিসকলকে বিলুপ্ত করিয়া বিজয়োদ্ধত ইউরোপের সর্বগ্রাসী অভিযান চলিয়াছে দিকে দিকে। এদৃশ্যে শিহরিয়া উঠিয়া বঙ্কিম লিখিলেন :

"ইউরোপীয় Patriotism-ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism-এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য ধর্ম না লিখেন।"

সেদিন যুগ-পুরুষের কণ্ঠ হইতে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত না হইলে আমরা হয়তো ইউরোপের অনুকরণ করিতে গিয়া ভারতবর্ষকে এতদিনে একটী বৃহত্তর জাপানে পর্যবসিত করিতাম! ভগবানকে ধন্যবাদ ভারতের ইতিহাসের একটী যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য।

ঋষি বঙ্কিমের শ্যেনদৃষ্টি দেখিয়াছিল, ইউরোপীয় বিজ্ঞান পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতিদের স্বার্থসিদ্ধির বাহনে পর্যবসিত হইয়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিতেছে। ইউরোপের মানুষ জড়বাদী ভোগসর্বস্ব বলিয়াই তাহার হাতে বিজ্ঞান বাঁদরের হাতের খোন্তা হইয়া পৃথিবীকে নরকের সামিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মানুষকে দেবতা করা যায় কেমন করিয়া? বঙ্কিম লিখিলেন :

> "যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।"

প্রথম প্রয়োজন মানুষের রূপান্তর। দেব-মানব চাই যাহার মগজে জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি এবং হৃদয়ে সর্বভূতে প্রেম। ভারতের আদর্শ-পুরুষ কৃষ্ণের কণ্ঠে নিষ্কাম ধর্মের বন্দনা-গান। ইউরোপের বিজ্ঞান যদি ভারতবর্ষীয় নিষ্কাম ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সর্বভূতের কল্যাণের বাহন না হইয়া উঠে —উহা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বারেবারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবেই। আণবিক বোমা এবং হিরোশিমার শ্মশান কি 'বঙ্কিমের' উক্তিরই অনুমোদন করে না? জীবন কল্যাণময় শুধু প্রেমের আর জ্ঞানের সমন্বয়ে।

বিজ্ঞানের নিষ্কাম প্রয়োগের ব্যাপারে ইউরোপ পথপ্রদর্শক হইবে—একথা বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই ধর্মতত্ত্বে খোলাখুলি তিনি লিখিলেন : 'ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র।' বঙ্কিম যে ঋষি ছিলেন

আজিকার আন্তর্জাতিক ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের এবং গান্ধীর মতোই বিশ্বাস করিতেন, নূতনতর পৃথিবী গড়িয়া উঠিতে পারে ভারতবর্ষীয় জাগতিক প্রীতির আদর্শকে অনুসরণ করিয়া। ধর্মতত্ত্বে আছে: "অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলে আছে; অচ্ছেদ্য, অভিন্ন জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই।" বঙ্কিম স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন, "এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা এবং নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথাই আমি বকিয়া মরিতেছি।"

কিন্তু যে ভারতবর্ষ রক্তাক্ত পৃথিবীকে কল্যাণের শুভ্র পথ দেখাইবে সে যদি 'পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত' থাকে তবে সর্বভূতের হিতের আশা কোথায়? পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি যাহাতে বিলুপ্ত না হয় তাহার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুজাল ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষকে প্রথমে স্বাধীনতার অমৃতপান করিতে হইবে। স্বদেশের কর্ণে জলদমন্দ্রে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করিলেন: "ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।"

কিন্তু আবেদন-নিবেদনের পথে তো পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির হাত হইতে মুক্তি মিলিবার নহে। শক্তির দ্বারাই শক্তিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব। বঙ্কিম নব্য ভারতবর্ষের হৃদয়ে তাই প্রতিষ্ঠিত করিলেন কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণকে। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ অর্জুনকে গাণ্ডীব ধরাইয়া দুষ্টের দমনকার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ শক্তিময়। আমরা জয়দেবের বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণকে লইয়া মাতিয়া ছিলাম। ওদিকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের করাল ছায়ায় আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ 'হাকিম সেখ আর রামাকৈবর্ত' জীবন্ত নর-কঙ্কালে পর্যবসিত হইতেছিল, আমাদের জাতীয় জীবন সকল দিক দিয়া পঙ্গুত্ব লাভ করিতেছিল, সেদিকে আমাদের কোন খেয়ালই ছিল না। পাপকে না ঠেকানো যে পাপ, যে ধর্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী—এই কথাটা আমরা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ভুলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই ত্রে আমরা বৃটিশের সঙ্গীনের ছায়ায় পরাধীনতার গ্লানির মধ্যে এমন নীরব এবং নম্র ছিলাম। এই 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'র রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি আসিতে পারে যদি জাতির চিত্তে নূতনতর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়—অন্যায়কে সহ্য না করার আদর্শ, দুষ্টের দমনের পথে ধরিত্রীর উদ্ধারের আদর্শ। যে-জাতির ভগবান ভক্তকে আরাম হইতে ছিন্ন করিয়া সংগ্রামের বিঘ্নসঙ্কুল পথে আহ্বান করিয়াছেন সে জাতি তাহার স্বাধীনতা হারাইল কেমন করিয়া? ভাবিলে সত্যই বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। কুরুক্ষেত্রের শক্তিময় কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া জয়দেবের বা যাত্রার কান্তকোমল কৃষ্ণকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলাম বলিয়াই কি? বঙ্কিম নির্বীর্য জাতিকে ক্ষাত্রতেজে দুর্জয় করিবার জন্য উাঁহাকে নূতন করিয়া কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। এইজন্যই 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা। বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছেন সপ্তম পরিচ্ছেদের উপসংহারে:

> "যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যেদিন আমরা কৃষ্ণ চরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।"

শাক্ত বিবেকানন্দের কণ্ঠে যেন শাক্ত বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রতিধ্বনি। স্বামি-শিষ্য-সংবাদের মধ্যে শুনিতে পাই স্বামীজীর সিংহগর্জন:

> "বৃন্দাবন লীলাফীলা এখন রেখে দে।

গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।"

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম লিখিয়াছেন:

"হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্মা।"

কর্মকীর্তিহীন স্বদেশবাসীদের জড়তা বঙ্কিমের চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল। তাই তিনি সর্বকর্মকৃৎ কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন যাহাতে আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি। কৃষ্ণের কণ্ঠে 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্।' কৃষ্ণ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন সংগ্রাম-গান। কৃষ্ণের অভিযান ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে। বঙ্কিম তাই জাতিগঠনের জন্য যাঁহার শরণ লইলেন তিনি মহাভারতের কৃষ্ণ।

কর্মবিমুখ স্বদেশের জড়পিণ্ডবৎ অধিবাসীদের জড়তা বিবেকানন্দের মনকেও বিচলিত করিয়াছিল। স্বামি-শিষ্য সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই:

'আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এদেশের মত এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে?'

এই দিগন্ত-জোড়া জড়তার নাগপাশ হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বঙ্কিমের মতো স্বামীজীও বাঁশী-বাজানো কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন:

'বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাবীর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।'

বঙ্কিমচন্দ্রও কি আনন্দমঠে সন্তানগণকে আত্মবলির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন নাই? আনন্দমঠের সন্তানেরা দেশোদ্ধারের জন্য সর্বত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। স্বামীজীর কণ্ঠ হইতে নিদারুণ ক্ষোভে উৎসারিত হইয়াছে:

'খোলকরতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখবি খোলকরতাল বাজছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না?'

দেশের অসংখ্য চাষী ইংরেজশাসনের ছায়ায় অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিতেছে, তৃষ্ণানিবারণের জন্যে অঞ্জলি ভরিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুনলঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইতেছে - এ দৃশ্য বঙ্কিমের বুকে শেলের মতোই বাজিয়াছিল। বঙ্গদেশের কৃষকপ্রবন্ধে এই বেদনার প্রকাশ। কৃষ্ণচরিত্র লেখা জীবন্মৃত জাতিকে বীর্যের মন্ত্র শোনাইয়া প্রাণ চঞ্চল করিয়া তুলিবার জন্য।

বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দও একই দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন।

"দুঃখ পেতে পেতে যারা কুকুর শেয়ালের মতো মরে তারা কি আর মানুষ?"

তিনিও কর্মবিমুখ অপদার্থ দেশবাসিগণকে কর্মচঞ্চল করিবার জন্য শোনাইলেন গীতারই বাণী। শোনাইলেন বেদান্তের অমোঘ মন্ত্র।

বঙ্কিম আর বিবেকানন্দ নব্য ভারতকে শুনাইয়াছেন শক্তির মন্ত্র আর দেশ যাহাতে ক্লৈব্য হইতে মুক্ত হইয়া মহাবীর্যের পথে নব-জীবন লাভ করিতে পারে তাহার জন্য দুইজনেই জয়দেবের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণের পরিবর্তে যে কৃষ্ণকে জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন সে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের 'গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ।'

কতদিন হইয়া গেল, কিন্তু আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই বিবেকানন্দের সেই অগ্নিগর্ভ বাণী:

"ডমরুশিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে

ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে।"

জীবন অন্তহীন সংগ্রাম—ভিতরে এবং বাহিরে। এই অন্তহীন জীবনসংগ্রামে দুর্বলের স্থান কোথায়? স্বামীজীর কণ্ঠে তাই বীর্যের মন্ত্র এবং সংগ্রামের আহ্বান। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।' সংগ্রামের দুঃখকে এড়াইয়া যে আরাম খুঁজিবে, পরাজয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া যে ধনুঃশর ত্যাগ করিবে সেই ক্লীবের স্থান সংসারের পদপ্রান্তে অসম্মানের ধূলিশয্যায়। স্বামীজী তাই আরাম হইতে ছিন্ন করিয়া জাতিকে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন রৌদ্রতপ্ত পথের বুকে যেখানে বাধা এবং বিঘ্ন পদে পদে।

"যেখানে struggle, যেখানে rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।"

সংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রয়োজন শক্তির, শারীরিক ও মানসিক শক্তির। তাই স্বামীজীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে :

> "Iron nerves with a well-intelligent brain—and the whole earth is at your feet."

অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্যই স্বামীজীর কণ্ঠে বেদান্তের সিংহনাদ। দেহাত্মবুদ্ধি সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। তাই আত্মার উপরে স্বামীজীর এত জোর দেওয়া। শক্তি, শক্তি, শক্তি। শক্তিই বিবেকানন্দের এবং বঙ্কিমের প্রথম কথা এবং শেষ কথা।

ভিক্ষুক

শান্তশীল দাশ

তুমি অনেক দিয়েছ, তবু তো আমার
চাওয়ার বিরাম নাই।
যত দাও তুমি মেটে না পিপাসা;
আরো দাও, আরো চাই।
যা দিয়েছ তুমি দিবসে, নিশীথে,
তরুলতা, ফলে, ফুলে, সংগীতে;
সে-সকল দানে ভরিনি হৃদয়,
করেছি অবহেলাই।

তোমার দানের এতটুকু নিয়ে
যদি মন রাঙাতাম,
তোমার গানের একটি সুরেতে
হৃদয় ভরে নিতাম;
ঘুচে যেত মোর এ-কাঙালপনা,
অবসান হতো সকল বাসনা;
পরিতৃপ্তির পরম প্রসাদে
ভরে যেতো সব ঠাঁই।

শ্রীশ্রীতিরুপতি বালাজী

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি বালাজীর অশেষ মাহাত্ম্যের কথা সুবিদিত। একদিন এই পুণ্যতীর্থ দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হল। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন থেকে আমাদের ছয়জনের দলটি রওনা হল বিকালের ট্রেনে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল বলে, কামরাটি প্রায় খালিই ছিল। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভজন গান আরম্ভ করলাম। ভগবানের নাম কীর্তন যেখানে ও যে ভাষাতেই হোক না কেন, উহা শুনলে হিন্দুমাত্রেরই মনে কমবেশী কিছু ভক্তির উদয় হয়। অপর যাত্রীরা ভজনে যোগ দিতে না পারলেও তারা অন্তরের সঙ্গে আমাদের কার্যাবলীর মৌন সমর্থন করছিল। দু'একজনের যে একটু আধটু কৌতূহল না হয়েছিল তাও নয়। ষ্টেশনে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরার সামনে বেশ ভিড় হতে লাগল। আমাদের গাড়ী বদল করতে হবে রেণিগুণ্টা জংসনে। রাত ১০টা নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি উল্টাদিকের প্লাটফরমে মিটার গেজ লাইনে তিরুপতির গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—আধ ঘণ্টা পরেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি আমরা উঠলাম সেই গাড়ীতে। খুব ভিড় ছিল—সকলেই প্রায় যাত্রী। মাদ্রাজ হতে রেণিগুণ্টা ৮৪ মাইল এবং সেখান হতে তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন মাত্র ৫ মাইল। রাত ১১ টায় আমরা তিরুপতিতে পৌঁছে ষ্টেশন হতে দু ফার্লং দূরে মন্দিরের ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম। বিরাট ধর্মশালা—একসঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক লোক থাকতে পারে। যদিও লোকে বলে তিরুপতি বালাজী, কিন্তু দেবতার মন্দির তিরুপতি শহর হতে হাঁটাপথে সাত মাইল এবং বাস রুটে ১২ মাইল দূরে তিরুমালাই বলে এক ছোট পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। পাহাড়টির অপর নাম বেঙ্কটাচল বা শেষাচল এবং দেবতার অপর নাম বেঙ্কটাচলপতি বা বেঙ্কটেশ্বর। শেষাচল ইষ্টার্ণঘাট পর্বতমালার একটি অংশ। দূর হতে দেখলে পাহাড়টিকে সাপের উদ্যত ফণার মত বোধ হয়। পাহাড়ের ওপর যেখানে শ্রীমন্দির অবস্থিত সেখানকার উচ্চতা ২৮০০ ফিট। মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে গ্রামটি গড়ে উঠেছে তার নামও তিরুমালাই এবং সেজন্য এই তীর্থস্থানকে তিরুপতি তিরুমালাই দেবস্থানম্ বলা হয়। তিরুপতি শহরটি ছোট নয়—বর্তমানে ইহা অন্ধ্র প্রদেশের চিতুর জেলার অন্তর্গত—লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। সম্প্রতি সেখানে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ইহার প্রাধান্য বেশ বেড়ে গেছে। মাদ্রাজ হতে তিরুপতি পর্যন্ত বাস সার্ভিসও আছে—দূরত্ব ৯০ মাইল। তিরুপতি শহরেও একটি বিরাট মন্দির আছে—দেবতার নাম শ্রীগোবিন্দরাজস্বামী। এ ছাড়া 'দেবস্থান'-পরিচালিত ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা আলাদা কলেজ, স্কুল, চতুষ্পাঠী, হাসপাতাল ইত্যাদিও তিরুপতি শহরে অবস্থিত।

ধর্মশালাতে আমরা প্রায় সব প্রদেশের লোকই দেখলাম। উত্তর ভারতের বহু যাত্রী এই দেবস্থান দর্শনে আসেন। মন্দিরের প্রধান কার্যালয় তিরুপতিতেই অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য অসংখ্য মন্দির। যতগুলি মন্দির দর্শন করেছি তন্মধ্যে এখানকার ব্যবস্থাই সব থেকে ভাল বলে মনে হল—প্রায় ত্রুটিবিচ্যুতি শূন্য। ধর্মশালাতে যাত্রীদের অভ্যর্থনা করবার জন্য একজন কর্মচারী আছেন—এছাড়া পোষ্ট অফিস, বুকিং অফিস, হোটেল এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধার অন্যান্য

সুবন্দোবস্তও আছে। পাহাড়ের ওপর মন্দিরে যাওয়ার বাস ধর্মশালা হ'তেই ছাড়ে এবং তাহা দেবস্থান-পরিচালিত। ভাড়া ৯/০ আনা। সমগ্র পাহাড়টিই দেবতার বিরাট শরীর বলে কেউ কেউ বলে থাকেন এবং যেহেতু উহা বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আসন সেজন্য ঐ মন্দিরের পাদদেশ হ'তে শীর্ষদেশ পর্যন্ত কোথাও জুতাপায়ে হাটা নিষিদ্ধ। তিরুপতিতে ধর্মশালার যাত্রীদের জন্য একটি আলাদা ঘর আছে, যেখানে জুতা ও অন্যান্য বেশী জিনিসপত্র নিভয়ে রাখা যায়। ধর্মশালায় তিনদিন পর্যন্ত থাকা যায় এবং কোনও পয়সা দিতে হয় না। তবে যাঁরা একটু বেশী আরামে থাকতে চান তাঁদের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, আসবাব, স্নানাগার ইত্যাদি সমন্বিত আলাদা ঘর আছে—ভাড়া ২৪ ঘণ্টার জন্য দুটাকা। এক ঘরে চার পাঁচ জন থাকতে পারেন। আমরা ধর্মশালায় পৌছে শুনলাম পরদিন ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়বে—কাজেই আমরা তখনই টিকিট কেটে রাখলাম। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ৺বেঙ্কটপতির জয় দিয়ে সকলেই বাসে উঠে বসলাম। বাসে একঘণ্টা লাগে। সকলের মন তখন আনন্দে ভরপুর—কিছুক্ষণের মধ্যেই অভীষ্ট দেবতার দর্শন হবে এই আশায়। বহুযাত্রী পদব্রজেই যান—শেষরাতে রওনা হয়ে তাঁরাও বেশ সকালেই মন্দিরে পৌছান। হেঁটে গেলে সাত মাইল যেতে তিন চার ঘণ্টা লাগে, কারণ চড়াই উৎরাই আছে। অবশ্য বরাবর বৈদ্যুতিক আলো আছে। ভগবানের নাম গুণ-গান করতে করতে তাঁরা অতি আনন্দে ও অক্লেশেই এই পথ অতিক্রম করেন। অনেকের ধারণা পদব্রজে তীর্থদর্শনে গেলে বেশী ফল হয়—অন্ততঃ স্মরণ মনন যে বেশী হয় এতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া তীর্থযাত্রায় একটু কঠোরতা না করলে তীর্থের মাহাত্ম্য যেন পুরাপুরি উপলব্ধি হয় না। কথিত আছে আচার্য রামানুজ এই মন্দিরের সংস্কার করেন এবং যেহেতু পাহাড়টি ভগবানের বিরাট শরীর, সেহেতু তিনি উহাতে পদক্ষেপণ না করে হামাগুড়ি দিয়ে ঐ সাত মাইল পথ অতিক্রম করেন।

আমরা আঁকাবাঁকা রাস্তায় বাসে করে এক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে এসে পৌছলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য পূর্ব হতেই মন্দিরের পেস্কারকে লেখা হয়েছিল। অভ্যর্থনা অফিসে যেতেই তাঁরা লোক দিয়ে আমাদের থাকবার নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। চমৎকার জায়গা—দুখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, সতরঞ্চি, রান্নার সরঞ্জাম, জলের কল ইত্যাদি সবই রয়েছে। একখানি টেবিলের ওপর আমরা আগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসিয়ে, সকলে স্নান সেরে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। প্রবেশ দ্বারেই বিরাট গোপুরম্—খুব বেশী পুরাতন বলে মনে হ'ল না। ভেতরে গিয়েই শুনলাম শীঘ্রই 'ধর্মদর্শন' হবে। ধর্মদর্শন অর্থ—সাধারণের জন্য বিনামূল্যে দর্শন। উহা সাধারণতঃ দিনে তিনবার হয়—সকাল ৭টায়, দুপুর ১২টায় এবং সন্ধ্যা ৮টায়। বিশেষ বিশেষ দিনে ধর্মদর্শনের জন্য আধ মাইল লম্বা লাইন (কিউ) হয়। এ ছাড়া পয়সা দিয়ে কোনও কোনও দর্শনের ব্যবস্থাও আছে। ভোরে মন্দির খোলার সময় এবং আরতির সময় জনপ্রতি এক টাকা দিলে দর্শনের ব্যবস্থা হয়। এক টাকা দিলে যাত্রীর পক্ষ থেকে দেবতাকে কর্পূর আরতি করা হয়। বিশেষ বিশেষ পূজা কোনও কোনও ভক্ত দিয়ে থাকেন এবং তাহার খরচ ৫০৲ টাকা হতে আরম্ভ করে ২০০০৲ টাকা পর্যন্ত আছে। সে সব অর্চনার বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যথা কল্যাণম্ (বিবাহ) ৫০০৲ টাকা, অভিষেকম্ ৪৫০৲ টাকা, সহস্রকলস অভিষেকম্ ১৫০০৲ টাকা ইত্যাদি।

মন্দিরের মধ্যে তিনটি প্রাকার আছে। গর্ভ মন্দির আন্দাজ ১০০ ফিট উঁচু হবে, উহার শীর্ষদেশ

সোনার পাত দিয়ে মোড়া। উহাকে যাত্রীরা আনন্দনিলয় বলে থাকেন। মন্দিরের মধ্যে ভগবান বেঙ্কটপতির অতি মনোরম দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্তি। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট—কালো পাথরের তৈয়ারী। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান যুগ যুগ ধরে সেখানে বিরাজ করছেন এবং ভক্তের সর্বপ্রকার বাধা ও বিপদ বিনাশ করে তাকে করছেন অভয়দান এবং দিচ্ছেন অনাবিল ঐশ্বরিক শান্তি। এরূপ মনোমোহনকারী মূর্তি যে, তাঁর দিকে চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না। কি প্রশান্ত, স্থির, ধীর, করুণাময় আনন্দোদ্দীপক বিগ্রহ! ভাষায় উহার বর্ণনা অসম্ভব। দর্শনে আসে এক অপূর্ব ভাবান্তর—মন চলে যায় ভাবরাজ্যের গণ্ডীর বাইরে। এ তো যাঁরা কেবল মূর্তি দর্শন করেন তাঁদের অবস্থা, আর যাঁরা মূর্তির মধ্যে সেই চিন্ময় দিব্য পুরুষের দর্শন পান তাঁদের কি অবস্থা কল্পনা করুন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এই দেবমূর্তি দর্শনে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন এবং বহুক্ষণ ভগবানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে দৈবী আনন্দে মগ্ন থাকেন। সত্যই অপূর্ব সে মূর্তি—আর অপূর্ব ঐ মন্দিরের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া। শ্রীভগবান সত্যই সেখানে বিরাজিত। নতুবা দেশ বিদেশ থেকে সহস্র সহস্র যাত্রী কোন্ টানে ছুটে আসে এখানে—এসে লুটিয়ে পড়ে ভগবানের রাতুল চরণে! ভগবানও তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অকৃপণভাবে বিলিয়ে যাচ্ছেন তাঁর করুণা-ধারা। করুণার সেই অমৃতধারায় আস্নাত হয়ে লাভ করছে সকলে নবজীবন।

অবাক্ বিস্ময়ে আমরা চেয়ে রইলাম সেই দেব-মূর্তির দিকে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে দৃশ্য উপভোগ করার সৌভাগ্য হল না—অন্য যাত্রীদের দর্শনের সুবিধার জন্য আমাদের চলে আসতে হ'ল এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছেন কোনও মন্দিরে গিয়ে দেবতা দর্শন করেই চলে আসতে নেই—মন্দিরের কোনও নির্জন স্থানে বসে মন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপ চিন্তা করতে হয়, তাহলে মনের ওপর দেবতার স্মৃতির বেশ একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে। তাঁর অমূল্য উপদেশ স্মরণ ক'রে আমরাও বসলাম এক কোণায় এবং কিছুক্ষণ ভগবান বেঙ্কটাচলপতির শ্রীমূর্তির ধ্যান ক'রে তিনবার গর্ভমন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। দেখলাম, একজন মহিলা গড়াগড়ি দিতে দিতে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করছেন। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম, অনেকে ব্যাধি ও বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এরূপ মানত করে থাকেন। পূর্বেই বলেছি মন্দিরের তিনটি প্রাকার বা পরিক্রমা আছে।

পদিকাবলী নামক গোপুরম্ দিয়ে মন্দিরে ঢুকেই প্রথম পরিক্রমা—ইহার নাম সম্পঙ্গী প্রদক্ষিণ। দরজার ডান দিকে বিজয়নগরের মহারাজা কৃষ্ণদেব রায় এবং তাঁহার দুই মহিষীর ব্রোঞ্জ মূর্তি—যুক্ত-করে তাঁরা দেবতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁরাই মন্দিরের উন্নতির জন্য এবং দেবতার সেবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাম পাশে আকবরের মন্ত্রী তোডরমলের মূর্তি—ইনিও ভগবানের সেবায় অকাতরে অর্থদান করে ধন্য হয়েছেন। এ ছাড়া বিজয়নগরে রাজবংশের আরও দুজন রাজার মূর্তি আছে। এই প্রদক্ষিণে দুটি কূয়া আছে—একটিতে নির্মাল্য ফুল ফেলা হয়। এ ছাড়া ভাণ্ডার, পুষ্পগৃহ, রামানুজ কূটম্ প্রভৃতি এই প্রাকারেই অবস্থিত। দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের সামনেই সোনার পাত দিয়ে মোড়া বলিপীঠম্ এবং সুউচ্চ ধ্বজস্তম্ভম্। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণের নাম বিমান প্রদক্ষিণ। ভোগঘর, যজ্ঞশালা, কল্যাণমণ্ডপ, বাহনঘর এবং বরদারাজ স্বামী, রামানুজ, গরুড় প্রভৃতির মন্দির এই প্রাকারে অবস্থিত। তৃতীয় প্রদক্ষিণের নাম বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ—ইহা পৌষ মাসে বৈকুণ্ঠ একাদশীতে মাত্র একদিনের জন্য খোলা হয়। ইহার পাশেই হুণ্ডীবাক্স—অর্থাৎ প্রণামী দেবার

এক অদ্ভুত ধরণের পাত্র। ইহার পাশে লেখা আছে Gate to heaven—অর্থাৎ ভগবানের সেবার জন্য যাঁরা এখানে প্রণামী দেবেন তাঁদের পক্ষে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত! যাত্রীরা ভক্তিভরে সেই পাত্রটি প্রদক্ষিণ করে তাহাতে টাকাপয়সা, সোনা, মণি-মুক্তা প্রভৃতি অকাতরে দান করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। এদেশে অনেকের বাড়ীতে প্রত্যহ একটি কৌটায় কিছু কিছু পয়সা রাখা হয় এবং বছরে একবার বা দুবার শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের দর্শনে তাঁরা যান এবং সেই সঞ্চিত পয়সা ঐ পাত্রে অর্পণ করেন। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় নগদ দুলক্ষ টাকা প্রণামী পড়ে। কেউ কেউ বলেন ইহা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ধনী মন্দির। সম্পত্তি ইত্যাদির তো কথাই নাই। শ্রীবেঙ্কটপতির শ্রীঅঙ্গে মহীশূরের মহারাজা প্রদত্ত সোনার শাল-গ্রামের বিরাট মালা, সম্প্রতি দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বহুমণিমাণিক্যশোভিত বিরাট কিরীট, রঘুজী ভোঁসলে প্রদত্ত বহুমূল্য এক মণি এবং অসংখ্য সোনার মালা ও মূল্যবান্ মণিমাণিক্যখচিত বিভিন্ন অলঙ্কার। দেবতার শ্রীঅঙ্গে যে অলঙ্কার আছে উহার মূল্য প্রায় ৫।৬ কোটি টাকা। উৎসব উপলক্ষে দেবতার উৎসব মূর্তিকে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়, তজ্জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি একটি রূপার রথ নির্মি: হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, মন্দির কর্তৃপক্ষ এই দেবোত্তর সম্পত্তির প্রক বিরাট অংশ নানারূপ জনহিত কাজে ব্যয় করেন।

দেবতার চোখে ও কপালে চন্দনের নামম্ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীক। চন্দনে চোখ প্রায় ঢাকা—কাজেই চোখ দেখা যায় না। প্রশ্ন করে জানলাম যে দেবতার চোখে এত জ্যোতি যে উহা কেহ সহ্য করতে অক্ষম, সেজন্যই চোখ ঢাকা থাকে। যাঁরা আসল মূর্তি দেখতে চান তাঁদের বৃহস্পতিবার রাতে দর্শন করতে হয়। ঐ সময় শ্রীঅঙ্গ হতে যাবতীয় অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য, এমনকি চন্দন পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হয়, কারণ প্রতি শুক্রবার পূর্বাহ্ণে ১০৮ কলস তীর্থবারি ও কয়েক কলস দুধে দেবতার অভিষেক (স্নান) হয়। নির্ধারিত প্রণামী দিলে উহাও দর্শন করতে পারা যায়। কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় আমাদের উহা দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। অভিষেক শেষ হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা হ'তে দুঘণ্টা লাগে। দুপুরে দেবতার বিরাট ভোগ হয় এবং উহা সমবেত ভক্তদের মধ্যে বিতরিত হয়। এ ছাড়া প্রসাদী লাড্ডু, পিষ্টক প্রভৃতি কিনতেও পাওয়া যায়। যাঁরা গর্ভমন্দিরের মধ্যে যেতে পারেন না তাঁরা তৃতীয় প্রাকারের মধ্যে প্রবেশদ্বারের সামনেই দেবতার উদ্দেশ্যে নারিকেল, কলা, পান, ধূপকাঠী ইত্যাদি নিবেদন করে কর্পূর আরতি করেন। কোনও রকম পাণ্ডার উৎপাত নেই। কোনও পাণ্ডার বা পুরোহিতের যাত্রীদের কাছ থেকে এক পয়সা লওয়াও নিষিদ্ধ। তবে হনুমানের উৎপাত বেশ আছে। যাত্রী একটু অসাবধান হ'লেই তারা ছুটে এসে যাত্রীদের হাত থেকে কলা নারিকেল ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই মন্দির যে কত পুরাতন তা বলা মুস্কিল। কেহ কেহ বলেন ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। তবে প্রাচীন তামিল সঙ্গমের কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে এবং বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু আলোয়ারগণ প্রায় সকলেই শ্রীবেঙ্কটাচলপতির নানারূপ গুণগান করেছেন। ৮৩০ খৃঃ অব্দে কাঞ্চীর পল্লব বংশের রাজারা এই মন্দিরের সংস্কারকল্পে বহু অর্থ দান করেন—এইরূপ শিলালিপি আছে। তাঁদের কিছু পরে মাদুরা চোলা ও পাণ্ড্য রাজারা, ধর্মসমুদ্রের বল্লাল রাজারা এবং বিজয়নগরের শাসকরাও এই মন্দিরের সেবায় বহু অর্থ দান করেন, কাজেই মন্দির যে বহু প্রাচীন তাহাতে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

মন্দিরের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 'বেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য' নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। কথিত আছে, বেঙ্কটাচল পাহাড়-শ্রেণী পূর্বে স্বর্গস্থিত মেরুপর্বতের অংশ ছিল। আদিশেষ ও বায়ু দেবতার মধ্যে যুদ্ধের ফলে পাহাড়ের কিছু শৃঙ্গ ভগ্ন হয়ে পৃথিবীতে পতিত হয়।

প্রলয়ান্তে ভগবান মহাবিষ্ণু শ্বেতবরাহমূর্তি ধারণ করে জগৎকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার বাহন গরুড়কে বৈকুণ্ঠ হতে ক্রুটাচল এনে উহা স্বামী পুষ্করিণীর পাশে স্থাপন করতে আদেশ করেন। এদেশে ভগবানকেও স্বামী বলা হয়, কাজেই স্বামী পুষ্করিণীর অর্থ ভগবানের পুষ্করিণী—ইহা ঠিক শ্রীমন্দিরের পাশেই অবস্থিত বিরাট পুকুর। এখানে floating festival (ভাসান উৎসব) বছরে একবার হয়। পুষ্করিণীর পশ্চিম কোণায় এক উইএর ঢিপির মধ্য থেকে শ্রীভগবান বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হন। এখনও সেখানে বরাহ স্বামীর মন্দির আছে। যেহেতু মর্ত্যে ওখানেই ভগবানের প্রথম আবির্ভাব সেজন্য মন্দিরে শ্রীবেঙ্কটাচলপতির পূজা হওয়ার পূর্বে প্রথমে বরাহ স্বামীর পূজা হয়ে থাকে। ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী পদ্মাবতীও আসেন তবে তিনি পাহাড়ের পাদদেশ তিরুপতি হতে আড়াই মাইল দূরে এক পদ্মসরোবরে আবির্ভূতা হন। ঐ স্থানের নামে ত্রিচানুর। ওখানে দেবী পদ্মাবতীর মন্দির বিরাজিত। শ্রীবালাজীর দর্শনান্তর যাত্রীরা নীচে নেমে এসে ত্রিচানুরে দেবীর দর্শন করেন।

পূর্বেই বলেছি শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীবেঙ্কটপতি-মন্দির দর্শনে আসেন। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পূজাদি হয় উহা শ্রীরামানুজই প্রচলন করেন। তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দরাজ স্বামীকেও শ্রীরামানুজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও মালা দিয়ে শ্রীবেঙ্কটপতিকে রোজ অতি সুন্দর রূপে সাজানো হয়। এই অঞ্চলের মেয়েরা সাধারণতঃ মাথায় ফুল পরেন না। এই পাহাড়ে যত ফুল হয় সবই শ্রীবেঙ্কটপতির সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। উহার ব্যবহারে অন্য কাহারও অধিকার নেই।

ভোর সাড়ে চারটায় মন্দির খোলা হয়। ঐ সময় পুরোহিতরা শ্রীভগবানের নিদ্রাভঙ্গের জন্য সমস্বরে এক অতি সুন্দর স্তব পাঠ করেন। তিরু-মালাই পাহাড়বাসী যাতে সকলে শুনতে পায় সেজন্য ঐ স্তব রোজ ব্রডকাষ্ট করা হয়। যাত্রীরা পূর্বে বন্দোবস্ত করে ঐ সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। উহাকে 'সুপ্রভাতম্' বলা হয়। দুপুরে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকা ভিন্ন সব সময়ই কোনও না কোন পূজা অর্চনা চলে। এ ছাড়া বছরে অনেক-গুলি উৎসব হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মোৎসব, রথসপ্তমী প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। ঐ সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের অবস্থানের জন্য সুব্যবস্থা আছে। মন্দিরের নিকটেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপম্ রয়েছে; সেখানে বিনামূল্যে যাত্রীরা তিন দিন পর্যন্ত থাকতে পারেন। এ ছাড়া 'দিয়ানম্' 'সিমেণ্ট ব্লক' ইত্যাদি অনেকগুলি ধর্মশালা আছে, সেগুলিতে দৈনিক ১৲ টাকা বা ২৲ টাকা দিলে একটি সুন্দর ফ্ল্যাট পাওয়া যায়—উহাতে দুখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, জলের কল ইত্যাদি আছে। প্রয়োজন হলে সব যাত্রীকেই রান্নার বাসন দেওয়া হয়। হোটেলও আছে এবং উহার চার্জ মন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই যাত্রীদের থাকার ও খাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। গরম খুবই কম। শীতের সময় গেলে কিছু গরম কাপড় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দেবস্থান পরিচালিত ধর্মশালা ছাড়াও আরও কয়েকটি ধর্মশালা আছে। তন্মধ্যে মহীশূরের মহারাজা নির্মিত ধর্মশালাই প্রধান। পূর্বে খবর দিলে এখানে ব্রাহ্মণ যাত্রীদের তিন দিন খেতে দেওয়া হয়। মন্দিরের কাছেই 'কল্যাণকট্টা' নামে এক মনোরম অট্টালিকা আছে—

উহাতে যাঁরা ওখানে চুল দেওয়ার মানত করেন তাঁদের কামানো হয়। প্রত্যহ শত শত লোকের ওখানে চুল ফেলা হয়—বিশেষ করে শিশুদের। বহু বয়স্ক স্ত্রীপুরুষও ওখানে মস্তক মুণ্ডিত করেন।

তিরুমালাই পাহাড়ে ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের মন্দির ছাড়াও কয়েকটি তীর্থস্থান ও পবিত্র ঝরণা ও কুণ্ড আছে—তন্মধ্যে গোগর্ভ তীর্থ, আকাশ-গঙ্গা ও পাপনাশম্ই প্রধান। মন্দির হতে ঐগুলির দূরত্ব দুই হতে তিন মাইলের মধ্যে। পদব্রজে যেতে হয়। কথিত আছে, হনুমানের মাতা অঞ্জনা আকাশগঙ্গায় বার বছর তপস্যা করেছিলেন। শ্রীবেঙ্কটাচলপতির পূজার জন্য রোজ এখান হতে তিন কলস জল নিয়ে যাওয়া হয়। পাপনাশনম্ ঝরণাটিরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এখানে স্নান করলে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। বহু যাত্রী রোজ স্নানের জন্য ঐ স্থানে গমন করেন।

তিরুমালাইতে দুদিন অবস্থান করায় মোটামুটি সব তীর্থ এবং শ্রীবালাজী বেঙ্কটেশ্বরের বিভিন্ন অর্চনা দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে মন্দিরে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে মনে ভরপুর আনন্দ নিয়ে আমরা ফিরে আসি।

পদাবলী-সাহিত্যে বসন্তোৎসব

সাহিত্যশ্রী শ্রীমতী উষা বসু এম্-এ, সাহিত্য-সরস্বতী

পদাবলী-সাহিত্য আনন্দলোকের গান। রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলার কাহিনী অবলম্বন করে এই সাহিত্য অমরত্ব লাভ করেছে। রাধা ও কৃষ্ণ ব্রহ্মেরই দু'টি মূর্তি—"শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ, আনন্দময় এবং শ্রীরাধিকা তাঁর প্রেম রসমূর্তি··তাঁর শক্তি।" পদাবলীবর্ণিত প্রেম—বেদনা ও দুঃসহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে যেন রূপ হতে রূপাতীতের পথে যাত্রা করেছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে পদা-বলীতে মিলনের সুর অপেক্ষা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মাথুরের সকরুণ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস। শ্রীরাধিকার এই প্রেম যেন এক মহাযোগিনীর তপস্যা। পদাবলী-সাহিত্য পার্থিব সৌন্দর্যের পথ ধরে চলতে চলতে হঠাৎ এমন এক রহস্যময় অসীম আনন্দময় স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংশয় স্তব্ধ ও মূক হয়ে গিয়েছে··· সম্মুখে শুধু এক দুশ্চর · দুরধিগম্য মহাসত্যের দুর্গ। তাই ইহারই জয়গান বেদনা ও ব্যর্থতায় ভরা ধরিত্রীকে অতিক্রম করে এক অপার্থিব আলোকের দেশের কন্দরে কন্দরে রণিত হয়ে উঠেছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক পদাবলীর অনেক ভাগ আছে। তাদের মধ্যে ঋতু-উৎসব অন্যতম। পদাবলীর মধ্যে, ঋতু হিসাবে অন্য কোন ঋতুর সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে বসন্ত ও শরতের বর্ণনা বেশ পাওয়া যায়। কোনও সময়ে হয়তো বসন্তকালে বর্ষারম্ভ হত। "বসন্তায় নম-স্তুভ্যম্ গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ" মন্ত্রে প্রথমেই বসন্তের উল্লেখ আছে। কাহারো কাহারো মতে মধু মাধব চৈত্র ও বৈশাখ, এই দুই মাসের মধ্যে চৈত্র বৎসরের প্রথম ছিল। বসন্ত উৎসব সম্বন্ধে আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা সংক্ষেপে বিভিন্ন কবির রচনা হ'তে কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

কবি বিদ্যাপতি বলছেন—বসন্তঋতু রাজারূপে এসেছেন, ধরিত্রীর দিকে দিকে সমারোহের সাড়া পড়ে গেল, প্রকৃতি নূতন সাজে সজ্জিত হ'ল—

আওল ঋতুপতি—রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥

মৌলি রসাল—মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ়, আশিস-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ-বেলী-তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ, অশোক-দলবাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি' শিশির ঋতু আগে দেল ভঙ্গ॥

*   *   *

নব বৃন্দাবন—রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

আবার কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি বসন্ত বর্ণনা করেছেন—

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত।
জহাঁ কুন্দ-কুসুম কেতকি হসন্ত॥
জহাঁ চন্দা নিরমল, ভরমকার।
রয়নি উজাগরি, দিন আন্ধার॥

গোবিন্দ দাস তাঁর রচিত পদে ঋতুরাজ বসন্তের যে বর্ণনা দান করেছেন তাহা চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে—

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুমসব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন-পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥

*   *   *

বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিনি—জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দ দাস অবধি নাহি পান॥

পদকর্তা বলরাম দাস ঋতুরাজের আগমনে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীতে বিকশিত হয় ও সেই মধুময় সময়ে রাধাশ্যামের মিলনের যে সুন্দর ছবি মূর্ত হয়—তারই মনোরম বর্ণনা করেছেন—

কুসুম ভরে নব-পল্লবদোল।
মধু পিবি মধুকরী-মধুকর-রোল॥

*   *   *

পুনমিক রাতি, মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধী বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম, শ্যাম ভেল গোরি॥

জ্ঞানদাস বলছেন—

আওতরে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত, অলিকুল ধাব।
মদন মহোৎসব পিককুলরাব।

তিনি আরও বলছেন—শ্যামের স্নেহ যেন রস-সাগরের মধ্যে বিকশিত পদ্মের ন্যায় রসের সমাপ্তি।

সরোবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে—রস নিরবাহা।

দোল পূর্ণিমা সমাগত, চারিদিকে আনন্দের সাড়া জেগেছে এমন দিনে—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগুদেই শ্যাম-অঙ্গে॥

*   *   *

ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবনে তরুলতা রাতুল বরণে॥

*   *   *

রাঙ্গাবায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ্‌ বিদিক না জানি।

পদকর্তা উদ্ধবদাসও বসন্তোৎসবের একটি মনোরম চিত্র অংকিত করেছেন—

আবিরে অরুণ   সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।

বঁধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায় ॥

* • * *

এ উদ্ধব ভণ চতুর দুজন—
রসবতী রসরাজ ॥

গোবর্ধন দাসের একখানি পদে ঋতুরাজের উৎসবের অপরূপ একখানি ছবি দেখতে পাই—

বিহরে শ্যাম নবীনকাম,
নবীন বৃন্দা-বিপিন-ধাম,
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ,
নব ঋতুপতি-রাতিয়া।

* * *

মধুর কেলি, মধুর মেলি,
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যামর গৌরী-কাঁতিয়া।

পদকর্তা যদুনন্দন দাসও বসন্তোৎসবের মধুময় চিত্র অংকিত করেছেন। পদের ধ্বনি-মাধুর্যে ইহা যেন মুখরছন্দে পৃথিবীর পুষ্পিত বুকে নৃত্য করে—

ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু।
ফুলময়-আভরণ, করে ফুলধনু ॥
ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ ॥
ফুলতনু হেরি' মুগধ ফুলবাণ।
ফুলশরে হানল ফুলময় কান ॥

* * *

অপরূপ ফুল-দোল ফুলবিন্যাস।
ফুল-করে রহ যদুনন্দন দাস ॥

কবি বিদ্যাপতি ঋতুরাজের মধুর বন্দনা-গীতি রচনা করেছেন। বিদ্যাপতি সুখের কবি; তিনি অপূর্বছন্দে রূপায়িত করেছেন বসন্তোৎসবের ছবি—

(১) মধুঋতু মধুকর-পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥

বসন্তের আগমনে আজ চারিদিকে উৎসবের সূচনা……চারিদিক মধুময়, সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা—

মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

ঋতুপতির আগমনে রসবতী শ্রীরাধিকা রাস-রসিক-কৃষ্ণের সহিত রসে অবগাহন করছেন। চারিদিকে মধুর বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কঙ্কণের কিঙ্কিণী রব বড়ই মধুর লাগছে।

এমন সুন্দর উৎসবে সমস্ত প্রকৃতি ও মানুষ যেন আনন্দে মত্ত হয়ে গিয়েছে।

(২) নব বৃন্দাবন, নব নব তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল,
মাতিল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেমবিভোর ॥

* * *

নব যুবরাজ, নবল নব নাগরী
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি ॥

বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদাবলীর সংগীত-ধারা চিরদিন সাধকের প্রাণে অশ্রু-নির্ঝর প্রবাহিত করে, কবি-হৃদয়ে ভাবের প্লাবন প্রবাহিত করে ও গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে অপূর্ব মূর্ছনা তুলে অনুর্বর মানব-মনকেও চিরসরস ও শ্যামময় করে তুলবে।

শিশুর সুমতি

শ্রীনীরদবরণ বসু

প্রার্থনা করি, যারা আমাদের আত্মজ হয়ে এসেছে, তারা সকলেই সুন্দর হোক, সার্থক হোক। শ্রীভগবান তাদের সহায় হোন্।

কুমতি যাকে ভর করেছে, তার জীবন যে লোকসানে ভরে যাচ্ছে। কত ভাল সে হ'তে পারতো কেন্দ্রের দিকে কতটা সে এগিয়ে যেতে পারতো! কিন্তু হ'ল না। সুমতি উদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ তার জীবনে এসে এসে ফিরে যাচ্ছে।

"ইহাদের কর আশীর্বাদ!"

সন্তান মনের মত হোক এ আমরা সবাই চাই। সন্তানকে মনের মত করে গড়বার জন্যে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি বৈকি। তবু তো তার চরিত্রে বাঞ্ছিত গুণের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি না। হাজার শাসন সত্ত্বেও সে বিগড়েই যাচ্ছে—তার সুমতির উদয় আর হচ্ছে না।

তবে কি সরষেতেই ভূত চেপেছে? সন্তানের কল্যাণকামী হিসাবে আমাদের সকলেরই বিষয়টি নিয়ে মাথাঘামানো দরকার।

"যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।" সন্তান যদি মূর্ত লোকসানই হ'তে বসে তাহ'লে প্রথমে ঐ ভাবটারই খোঁজ নেওয়া দরকার। নয় কি? মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদান অহর্নিশ চলছে। তার ফলে বাইরে উদ্দীপক কারণ ঘটছে আর আমাদের অন্তরে শিক্ষা চলছে। একথা স্বামীজী বলেছেন। "গঠন-ব্যাপারে চিন্তাসমূহই মুখ্য।" আজ আমি যা হয়েছি, তা আমার গত জীবনের প্রবল চিন্তাসমূহের ফল। আবার প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের চিন্তার সংক্রমণ চলছে। প্রভাব আমরা আহরণও করছি, সঞ্চারণও করছি। আর আমাদেরই এই ভাব-চিন্তা দিয়ে গড়া রেফ্রিজারেটরে আমাদের সন্তানেরা আবদ্ধ। কাজেই তাদের কুমতিপরায়ণ হ'য়ে ওঠার ব্যাপারে আমাদেরই 'হাত' বেশী।

প্রশ্ন উঠতে পারে—'যার যেমন ভাব' এটা তো ছেলেমেয়েদের উপরেও আমরা প্রয়োগ করতে পারি? কিন্তু সত্যিই তা পারি কি? কুমতি-পরায়ণ হয়ে ওঠার সমুদয় দোষ ঝুঁকিটা কি আমরা আমাদের আত্মজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি? এ বিষয়ে আপনাদের ভাবিয়ে তোলার জন্যই আমার আজকের এই লেখাটুকুর অবতারণা।

আসল ছেদ মূলচ্ছেদ। সেই মূলেরই অনুসন্ধান করতে হবে। তবেই গলদ ও তার প্রতিকার ঠিক ঠিক নির্ণয় করা যাবে। কাজেই শিশুপালনের মূলনীতি থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

শিশুর উদয় আঁতুড়ঘরে। পৃথিবীতে সে নতুন অতিথি। একমাত্র ভালমন্দ লাগার একটা অনুভূতি ছাড়া তখন তার মধ্যে আর কিছুই জাগ্রত থাকে না। কাউকেই সে চেনে না। এমনকি মাকেও না। এমনি অসহায় অবস্থা। মা-ই তাকে চেনা দেন। তার ঐ ভাললাগার সুযোগে স্বীয় পবিত্র বাৎসল্যভাব সঞ্চারণের মাধ্যমে নবাগতকে জানিয়ে দেন—'ওরে, আমি তোর মা।' বোধ করি, সেই পরম শুভ ক্ষণটি থেকেই শিশুর পার্থিব জীবন-নাটকের শুরু হয়। শিক্ষার উদ্বোধন হয় সেই চেনার দিনটিতে—সেই বাঞ্ছিত বিশেষ ক্ষণটিতে।

এইখানেই শিশু-পালনের মূলতত্ত্ব নিহিত। এই তত্ত্বকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি :—

(ক) ইচ্ছা করে শুদ্ধভাব সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে শিশুকে চেনা দেওয়া—তাকে তারই মন দিয়ে চিনতে চেষ্টা করা।

(খ) শ্রদ্ধা ও স্নেহকে শিক্ষার মাধ্যম করা।

(গ) শিশু যে সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মেছে, সেই গ্রহণ-ও ধারণ-ক্ষমতাকে কেন্দ্র ক'রে তার শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(ঘ) সেবাধর্মের নীতি অনুযায়ী পুণ্য ব্রত হিসাবে শিশু-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করা।

চেনা দেওয়া মানে খোলাখুলি মেশা। শিশু যেন আমাদের সহজেই মঙ্গলার্থী হিসাবে, মনের মানুষ হিসাবে—সুখদুঃখ অনুভবের নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসাবে পায়, এমনভাবে চলা। আমাদের জীবনে যদি গোপনতা বেশী থাকে, কথার সঙ্গে কাজের, চলাফেরার, খাওয়াদাওয়ার কোন সঙ্গতি না থাকে, তাহ'লে আমরা যে কোন্ ধাতুর, তা শিশুরা জানবে কী করে? শিশু কেমনটি হ'লে যে আমরা খুশী হব, এটা জানায় যেন তার কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। আমাদের কাকে এড়িয়ে চলতে হবে, কাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, অন্যথায় অনর্থের সৃষ্টি হবে—এ চিন্তা যাতে শিশুর মধ্যে না দানা বাঁধতে পারে, সেটি আমাদের দেখতে হবে।

শিশুকে চিনতে হবে। সে তার যথাস্থানেই এসেছে; কাজেই আমরা বংশানুবর্তন ভেবে নিতে পারি। পূর্ব পূর্ব পুরুষদের নানা দোষগুণের বীজ সে এনেছে। কিন্তু তার জন্য তাকে দোষী করা যায় না। কেননা মানুষ কর্মের জন্য দায়ী। আর তাছাড়া সৎ হওয়ার সুপ্ত সম্ভাবনা সকল শিশুর মধ্যেই আছে। পূর্ণ সৎও সে হ'তে পারে। ঐ সম্ভাবনা নিয়ে সে আমাদের এই ভাবরাজ্যে এসে বাসিন্দা হয়েছে। দরকার শুধু সোনার কাঠির স্পর্শ। আমাদের শুদ্ধ ভাব হ'ল সেই সোনার কাঠি। আগুনের ছোঁওয়ায় আগুন জ্বলে। মহৎ চরিত্রের সতেজ আত্মবিশ্বাস সেই আগুন। "ইহার অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস। * * আত্মপ্রীতির ব্যাপক অর্থ বিশ্বপ্রীতি, জীবপ্রীতি, সর্ব প্রাণীর প্রতি প্রীতি। * * আত্মবিশ্বাস হইতেই সকল প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চারিত হয়।" তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যেমন আত্মবিশ্বাস, সেইমত প্রেরণা ও শক্তি আমাদের শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। আর এই যে শক্তির সঞ্চারণ, এর জন্য আমরা ও শিশুরা এই দুপক্ষের মধ্যে একটা যোগসূত্র বা ভাববাহক আছে। শব্দ একপ্রকার শক্তি। 'ইথার' তার বাহন। আমাদের মনোজগতেও তো ইথার-সদৃশ কিছু আছে। কী সেটা? শুভ ইচ্ছা। মানুষে মানুষে যেখানে যতটা মিল গড়ে উঠেছে, তা এই শুভ ইচ্ছার মাধ্যমে সৎ ভাব, প্রেরণা ও শক্তির আহরণ-সঞ্চারণের ফলে। অতএব সন্তানকে চেনা দেওয়া ও চিনে নেওয়ার জন্য তার সঙ্গে আমাদের যোগসাধন প্রয়োজন।

শিশুর সঙ্গে আমাদের এই যোগসাধন—এই শুভ ইচ্ছার মিলন যেখানে ঘটলো না, সেইখানেই মনের মনকষাকষি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, অশান্তি ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা। অসামাজিক আচরণের অসঙ্কোচ, দুর্নিবার, অশ্লীল এলোমেলো প্রকাশ। স্বরূপই এই।

আমরা মানুষ। মনুষ্যত্বই আমাদের ধর্ম। এই ধর্মের বুকে আশ্রয় নিলেই আমরা সকল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে ও পাওয়াতে পারি। এই ধর্মানুরাগী মনেই শুভ ইচ্ছা থাকতে পারে। এই খানেই মানুষে মানুষে যোগস্থাপন সম্ভব ও সঙ্গত। শিশুপালনের নীতি এই ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যা কিছু করিনা কেন, যা-খুশি বলি না কেন, কিছুতেই কোন ক্ষতি করতে পারবে না যদি আমরা এই ধর্মকে আশ্রয় ক'রে থাকি। সেই রাজার অলক্ষ্মী-কেনার কথা স্মরণ করুন। ভাগ্য-লক্ষ্মী, রাজ্যলক্ষ্মী,—সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি স্থির। তারপর ধর্মদেব এসে বিদায় চাইলেন। তখন রাজা বললেন, "আপনাকে তো আমি ত্যাগ করিনি, আমি তো আমার কথা রক্ষা

করেছি—অবিক্রীত অলক্ষ্মীমূর্তি কিনেছি। বলুন আপনি কি যেতে পারেন আমায় ছেড়ে? ধর্মদেবের যাওয়া হ'ল না এবং সেইজন্য সবাইকেই সুড়সুড় করে ফিরতে হ'ল। এখন, আমরা কি ঐ রাজার মত জোরগলায় বলতে পারছি—'আমি তো মনুষ্যত্বের ধর্মকে অবমানিত করিনি, আমার সন্তান তাহলে লোকসানরূপী হবে কেন? আমা হ'তে তার যথাযথ শিক্ষা হচ্ছে না কেন?' পারছি না তো? গলদ জমে উঠেছে। কোথায় সেই গলদ?

প্রথম গলদ যোগসাধনে—শিশুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে। সন্তানের সঙ্গে আমাদের যে যোগের প্রয়াস তা হল অপূরিত ও 'আকাশ-কুসুম' কামনার যোগ, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির চরিতার্থতার যোগ, পাটোয়ারী বুদ্ধির যোগ, সংস্কারের যোগ—জৈবিক প্রয়োজনের যোগ। এই ভাবেই আমরা আদেশ, উপদেশ, দণ্ড, লাঞ্ছনা প্রভৃতি বাছা বাছা 'মানুষ' গড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজ নিজ সন্তানদের দুর্লভ জন্ম ও জীবন সার্থক করে দেবার কাজে গলদ্‌ঘর্ম-পরিশ্রম করছি! অতি সন্তর্পণে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছি। সবাই আমরা একজোট হ'য়ে আপন আত্মজদের 'আজকালকার ছেলে' ক'রে রেখেছি। তারা যেন অস্পৃশ্য, অসহনীয়, ক্লান্তিকর। পরের বাড়ীর ছেলেমেয়েকে তবু কিছুটা সইতে পারি, কিন্তু নিজের বাড়ীর ছেলেমেয়ে—তারা যেন নতুন লেখকের নবপ্রকাশিত এক একখানা উপন্যাস আর আমরা সমালোচক। অনুগ্রহ-গর্বিত হ'য়ে বিশেষ দয়াপরবশ হ'য়ে শুধু বইএর নামটা দেখেই দু-পাঁচটা কলমের খোঁচা অবদানস্বরূপ দিতে বসেছি। সবাই আমরা দূর থেকে দয়া করে ভিন্নাত্মা হ'য়ে সন্তানদের 'মানুষ' করতে উদ্যত!

ঘটা ক'রে, হাঁকডাক ক'রে পাড়ার মিনুর মা, ডলির পিসি, সানুবাবু প্রভৃতিকে নিজের ছেলে-মেয়ের দোষ-কীর্তন শোনানো আমাদের একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লিলির বৌদি এসে যখন তাঁর মেয়ে কেমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠেছে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো, তখন আমরা গলার জোরে তাঁর স্বরকে ছাপিয়ে আমার মেয়ের বেয়াড়া-পনার প্রামাণ্য ইতিহাস তারিখ, সময়, কার্যকারণ-সহযোগে উদাত্তকণ্ঠে শুনিয়ে যাই। "কাকে আর বলছো দিদি ··· তোমার মেয়ে তো লক্ষ্মী গো··· আমার মেয়ের গুণের কথা যদি শোনো"···বেশ গর্বভরেই বলে যাই—যেন কত তৃপ্তির, কত গৌরবের। তারপর সহসা থেমে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি ও একটু দম নিয়ে উপসংহার-স্বরূপ জানিয়ে দিই—'মেয়ের গুণের কথা কত আর শুনবে দিদি, বলতে গেলে কিছু আর থাকে না···হাড় মাস ভাজা ভাজা করে দিলে······।'

নিজেকে দিয়েই এটা আমরা বুঝি—দোষকীর্তন কানে কত মধুই না ঢালে! যে আমার দোষ-সম্পর্কে একটু হাঁ করে তার উপরেই আমরা হাঁ-হাঁ ক'রে হামলা করি। তাকেই বিষনজরে দেখি, এড়িয়ে চলতে চাই। পক্ষান্তরে যে আমার হ'য়ে দুকথা বলে—দোষ চাপা দিয়ে দুটো সহানুভূতির কথা শোনায়, সামান্য গুণ দেখেই খুশী হ'য়ে পাঁচ-জনের সামনে প্রশংসা করে, নিজের অজ্ঞাতসারেই আমরা তার বশ হয়ে যাই। তাকে খুব ভাল লাগে—তার উপর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। বস্তুতঃ পরিমিত প্রশংসা ও আন্তরিক সহানুভূতির কথা প্রাণে বল সঞ্চার করে, কাজ করার শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু নীতিবাক্য কি আমরা কম শিখেছি? সেই 'সদা সত্য কথা বলিবে' থেকে শুরু করে, 'অপ্রিয় সত্য বলিবে না', 'যে ব্যবহার তুমি নিজে পেতে চাও না তা কখনও অপরের প্রতি দেখাবে না', 'যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে', 'শ্রদ্ধা ভালবাসা নিতে জানতে হয়' পর্যন্ত ডজন ডজন নীতিবাক্য মহাজন-বাণী প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করেছি। জীবন্ত নীতি-মালা হয়েছি এবং সকলই পরার্থে।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের জন্য সে সব মনের যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। জাদুরা চাইলেই অর্থাৎ কোন দোষ করলেই ঘর খুলে সবগুলিই দখল করার অধিকার দয়া ক'রে দিয়ে দিই। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার বেলায় আমাদের হাত স্বভাবতঃ একটু বেশী দরাজ।

আমরা যা বলি তা উপদেশ; যা করি তা সদাচরণ। এমন এক স্তরে আমরা পৌঁছেছি, যেখানে সবই শোভনীয়, সবই সঙ্গত। কত কথা, কত রকমের কথা বলি। বেঁচে বাঁচিয়ে বলার জন্য অপরকে আদেশ দিই, উপদেশ দিই। নিজে ঠিকই করি—কেননা বলাটা তো শ্রোতার মঙ্গলের জন্য।

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস—এ আমরা সবাই জানি। জানাবার জন্যেই জানি। আমার নিজের সঙ্গ সৎ কিনা, তা একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না।

ছেলেমেয়ের জন্য মাষ্টার রাখি। মাষ্টারকে নির্দেশ দিই—দেখুন, একটু শাসন করে দেবেন— বড্ড বদমাইস—। কিন্তু মাষ্টারকে নিয়ে বদমাইসদের সুমতি উদয় কী ভাবে করা যায়, তার আলোচনা করি না। মাষ্টারের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। পরীক্ষায় পাশ না করলেই মাষ্টারকে মনে পড়ে—তবে তো ব্যাটা ফাঁকি দিয়েছে। তা ছাড়া মাষ্টারের প্রতি এমন আচরণ দেখাই, বাড়ীতে মাষ্টারকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করি, যাতে শিশুদের মন মাষ্টারের প্রতি অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে ওঠে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—এটা নিজের বেলায় মনে আসে না। অন্যের কাছে ভীতিস্থল হওয়াকেই আমরা পৌরুষের ব্যাপার মনে করি। নিজেরা সযত্নে পরিশ্রম সহকারে বাড়ীর ভীতিস্থল হই ও তাতে গর্ব অনুভব করি। বাড়ীর মাষ্টারকেও কখনও সোজাসুজি, কখনও বক্রকটাক্ষে শিশুর ভীতিস্থল হবার নির্দেশ দিই। মাষ্টার যেন আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অর্থাৎ যোগবিয়োগ কষার যন্ত্র। কেননা, ছেলেমেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাতে চাই—মানুষ করতে নয়। "বাড়ীতে শুনলুম আপনি নাকি কাল ছেলেদের সঙ্গে গল্প ক'রেই কাটিয়েছেন? —কী, হিতোপদেশের গল্প? কী হবে ও দিয়ে—পাস করবে? ও হিতোপদেশের যুগ এটা নয়—যাতে ক্লাশের কাজ ঠিকমত হয়, আপনি শুধু তাই-ই করবেন—ফিফটি সেভেন-এ ওকে পাস করাতেই হবে।....."

একপারে সন্তান আর অন্যপারে আমরা, মধ্যে দুস্তর ভুল বোঝাবুঝির পারাবার। যা কিছু আমার ভাল বলে বোধ হ'ল না, সেইটাই অপরাধ। বাড়ীতে যদি অভিভাবক-সংখ্যা দশজন হয় তো, দশদিক দিয়ে শিশুর অপরাধ ধরে ফেলা চলছে। কেবল 'করবি না,' 'বলবি তো হাড় একদিকে মাস একদিকে ক'রে দোবো,' 'দেখবি, যাবো এবার আমি,' 'এমন গাধা তুইরে,' 'ফের যদি ওখানে যাবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন,' 'মরণ-দশা আর কি, মুখপোড়া ঝাঁটা-খাকী' ইত্যাদি বাছা বাছা বোমার বিস্ফোরণ চলছে। সন্তানের মনোরাজ্যে দখল চাই। ছেলে ছেলের মত থাকবে না? মুখের উপরে জবাব করবে? চেনেনা আমায়, না!

সত্যিই চেনে না! চিনলে সকাতরে বলতো— বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।···

সন্তানকে আমরা কখন খুব শিশু ভাবি আর কখন আমাদের সমান ভাবি। পেতে চাই অনেক বেশী। বাড়ীর সবাই চাই। কাজেই চাওয়াটা নানারকম হয়ে যায়। শিশুর উপর কামনার চাপ পড়ে। নিজের সম্বন্ধে কিছু ভেবে ঠিক করার অবসরই সে পায় না। তার মনের প্রায় ষোল আনা শক্তি আমাদের মতির দুয়ারে মজুরগিরি করেই ফুরিয়ে যায়। তবুও মন পায় না!

আমাদের হাতে আছে জ্ঞানের টর্চ। অপরকে

তাই চট করে চিনে ফেলি, কিন্তু নিজে থাকি তিমিরে।

"এবার ফিরাও মোরে।" সন্তান মানুষ। দোষগুণের সমষ্টি নিয়েই মানুষ। আমরাও তাই। সন্তান ও আমরা সবাই একই ট্রেনের যাত্রী। সবাই এই ভ্রমময় সংসারের বাসিন্দা। ভ্রম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা আমরা সবাই করছি।

মদালসার উপাখ্যান আমরা পড়েছি। 'রামের সুমতি'তে রামের সুমতি উদয়ের জন্য নারায়ণীকে কী তিতিক্ষা, কী ক্ষমা, কী ধৈর্যই না অবলম্বন করতে হয়েছিল! অফুরন্ত স্নেহ ও সহানুভূতিই নারায়ণীকে সার্থক করেছিল—সাধনায় সিদ্ধি এনে দিয়েছিল। আমাদের এই সব কুমতি-পীড়িত সন্তানদেব 'মানুষ' করার জন্য আজ আমাদের সেই মদালসার সাধনা, নারায়ণীর যজ্ঞশালার দ্বার খুলতে হবে। শিশুরা দাঁড়াবে কোথা? তারা' যে একান্ত ক'রে আমাদেরই।

'যত দিন বাঁচি ততদিন শিখি।' 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' এ বাণীকে—এ মন্ত্রকে কায় মন ও বাক্য দিয়ে মানতে হবে। সবাই আমরা অসম্পূর্ণ। শিশুরা কয়েকটা ষ্টেসন পিছিয়ে আছে মাত্র। প্রভেদ তো এই! কেন আর তাদের উপর বিরূপ থাকি—কেন আর তাদের দূরে ঠেলি। সবাই তো শিক্ষার্থী। গোত্র একই। আসুন, শুদ্ধ ভাব সঞ্চারণের দ্বারা তাদের সৎ হওয়ার সুবিধা ক'রে দিই। শিশু-শিবের পূজো। বড় পবিত্র ব্রত।

নিয়ম মনের বড় অবলম্বন। শিশুপালনের ক্ষেত্রেও আমাদের নিয়মকে অবলম্বন ক'রে চলতে হবে। মূলনীতিকে ভিত্তি করেই নিয়ম নির্ধারিত হবে।

প্রথমতঃ প্রতিকার সম্পর্কে চিন্তনীয় এই যে সন্তানের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন প্রয়োজন। চিত্তের যোগ, বোধের যোগ, নৈতিক আদর্শের যোগ ও আত্মিক যোগ চাই। তবেই আমরা তার মন দিয়ে তার চাহিদা ও সমস্যা বুঝতে পারবো। তার মনের গতি-প্রকৃতি দেখে উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবো। এজন্য দরকার—

(১) প্রার্থনা। ছেলেমেয়ের মানুষ হওয়ার কামনা জানানোই হবে আমাদের প্রার্থনার বিষয়-বস্তু। সে তারই মত হবে—আমাদের নানা মুনির নানা মনের মত নয়।

প্রার্থনা ও সৎচিন্তার শক্তি অমোঘ। ছেলে-মেয়ের রোগ হ'লে আমরা কত ঠাকুরের কাছে 'মানত' করি, কত ব্রত-উপবাস করি—কত কৃচ্ছ্র-সাধন করি। কুমতি ভর করাও এক প্রকার অসুখ। এর জন্যও ঠাকুরের কাছে আবেদন জানানো দরকার বৈকি। ঠাকুর বা নিজ নিজ ইষ্টের কাছে এই প্রার্থনা জানাতে হবে। শিশুদের দিয়েও প্রার্থনা করাতে হবে।

(২) সন্তানের সম্ভাবনার খোঁজ নেওয়া। কি কি সে মূলধনস্বরূপ এনেছে? সে এনেছে, বংশগত কতকগুলি দোষগুণের বীজ, জন্ম-জন্মার্জিত সংস্কার, কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান এবিষয়ে যা বলে তা জানতে হবে। মনোবিদ্‌কে দিয়ে সন্তানের বুদ্ধির পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে তার মত তার শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া দরকার। চিন্তার ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। 'আমি মানুষ হব—গায়ক হব—শিল্পী হব—শিক্ষাব্রতী হব—সন্ন্যাসী হব...' এরূপ কোন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে সহায়তা করতে হবে। বাড়ীর সকল পরিজনের মধ্যে শিশুর শিক্ষা বিষয়ে মতের মিল থাকবে, চেষ্টায় সমর্থন ও সহ-যোগিতা থাকবে। একের কথায় অন্যের শ্রদ্ধা থাকবে।

(৩) সন্তানের জীবনে যাতে কোনরূপ গোপনতা না আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ জন্যই তাকে চেনা দেওয়ার প্রয়োজন বেশী।

অকপট, দরদী, বিশ্বস্ত ও ক্ষমাশীল লোকের কাছেই আমরা মন খুলে মনের কথা বলতে পারি। বলেও তৃপ্তি পাই। এ তৃপ্তি আত্মপ্রকাশের তৃপ্তি। সহজভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ শিশুদের পূর্ণ মাত্রায় দিতে হবে।

'সত্যের বল' গল্পটি স্মরণীয়। অপরাধপ্রবণ শিশুকে চোরের ও অভিভাবকগণকে মহসীনের ভূমিকায় মনে করলে শিশুর সংশোধনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। মহসীন চোরকে 'সত্য কথা বলো' ছাড়া আর কিছুই বলেন নি, একটুও তিরস্কার করেন নি। আমরাও শৈশব থেকে আপন আত্মজদের সত্য বলার সহায়ক হ'য়ে থাকবো। প্রেরণা পায় এমন ব্যবহার করবো।

(৪) উপাসনা, শিক্ষাচর্চা, শিল্পকাজ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বাড়ীর সক্ষম ব্যক্তিদের পালনীয় বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নিয়ম থাকা দরকার। উপাসনা সকলকেই করতে হবে। যে কোন এক বা একাধিক শিল্পকাজে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকেই রত থাকতে হবে। শুধু কে কখন কতক্ষণ রত থাকবে, সেটা অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ছেলে-মেয়েদের সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে সকাল সন্ধ্যায় উপাসনার রীতি প্রবর্তন করা নৈতিক চরিত্র গঠনে খুবই সহায়ক। বাড়ীতে সম্ভবমত সঙ্গীতচর্চা থাকা প্রয়োজন।

যে নিজে খেলেনি বা খেলার উপকারিতা বিষয়ে অজ্ঞ, সে কখনই সদাচঞ্চল শিশুর মন বুঝতে পারবে না। খেলোয়াড় বা খেলাপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গেই শিশুর যোগ বেশী। তেমনি যে নিজে শিক্ষাচর্চা করে, শিক্ষার্থীর মন বোঝা তারই পক্ষে সহজ ও নিরাপদ।

পারিবারিক উন্নতির মান রক্ষা—ঐক্যবোধ জাগানো ও পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সজীব মনের যোগস্থাপনই উক্ত প্রকার বাধ্যবাধকতার উদ্দেশ্য।

(৫) 'আমি মানুষ করছি' এই অহংবোধ সোজাসুজি শিশুর স্ফুটনোন্মুখ শুভ প্রকাশকে আঘাত করে, তার ব্যক্তিত্বকে লাঞ্ছিত করে। এ বিষয়ে সচেতন হ'য়ে চলা দরকার।

বাতাসে আজ কুমতির বীজই বোধ করি বেশী। দুর্নীতি-দুষ্ট সমাজ আজ মুক্তির জন্য ব্যাকুল।

শিশু যতদিন স্তন পান করে ততদিন মাকে আহার-বিহার বিষয়ে বহু নিয়ম মেনে সংযত হ'য়ে চলতে হয়। শিশুর শিক্ষা ব্যাপারেও বাড়ীর সকল পরিজনদের ঐ মায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ প্রয়োজন।

(৬) শিশুপালনে আদেশ কম ক'রে নির্দেশ (suggestion) ও অনুরোধ বেশী করা দরকার। 'করো না' না বলে কোন ভাল কাজ দেখিয়ে 'কর' বলা উপযোগী। 'গোলমাল করো না' এর স্থলে 'চুপ করে থাকো', 'কাগজগুলো ছড়িও না' না ব'লে 'ওগুলো গুছিয়ে রাখ তো' প্রভৃতি বলা। ত্রুটির ক্ষেত্রে কথা ও কাজের শুদ্ধ রূপটি বলিয়ে ও করিয়ে নেওয়াই সংশোধনের প্রকৃষ্ট পন্থা। দু-কথা শুনিয়ে দেওয়ার লোভ ত্যাগ ক'রে চলতে হবে।

ভাবজীবন যথাযথ গড়ে উঠলে প্রণালীর জন্য আটকাবে না। 'ধর্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের অকপট প্রেমেই ধর্ম।' বলেছেন স্বামীজী। এই ধর্মের বুকে আমাদের মতিগুলোকে যদি স্থির নিবদ্ধ করতে পারি, শিশুর মতির বিকাশে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করি, তাহলে শিশুরাই আপন আপন জীবনের তাগিদে সুমতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে।

ঝুলন-পূর্ণিমা

শ্রীনিমাইচরণ বসু

বরিষণহীন স্বচ্ছ আকাশে
তারা অগণ্য জ্বলে,
উজলি ভুবন পূর্ণ শশীর
শুভ্র হাসিটি দোলে।
দিগ্‌বধূদের কলরব শোন
মাতিয়া উঠেছে উৎসবে কোন
গম্ভীর বেশ ঢাকা পড়ে গেছে
উচ্ছলতার তলে।
শান্ত প্রকৃতি মুখর আজিকে
স্পন্দন হিল্লোলে॥

কলমুখরিত এমনি সন্ধ্যা
না জানি কিসের আশে,
স্মৃতিসমুদ্র মন্থিত করি'
সম্মুখে এসে ভাসে।
না-দেখা কী এক দূরের পরশ
অননুভূত সে কোন্ হরষ
মনের গোপনে গুঞ্জরি ওঠে
অবিরত কলভাষে।
স্বপ্নজাগর তন্দ্রিমা শুধু
ঘিরে আসে চারিপাশে॥

সুদূর অতীত, দৃষ্টি চলে না
অনন্ত পারাবার,
(তবু) শত শত যুগ ব্যবধান আজি
ভেঙে হয় একাকার।
নীপশাখে বাঁধা ঝুলনের দোলা
বৃন্দা-বিপিন জ্যোছনা-মেখলা
স্তব্ধ যমুনা বিগতছন্দ
উদ্দাসে আরবার।
অতি বিচিত্র জাগে সে চিত্র
অপূর্ব মহিমার॥

অরূপ-সুষমা আসন পেতেছে
সসীম রূপের মাঝে,
বনমর্মরে মিলন-সাহানা
ক্ষণে ক্ষণে ঐ বাজে।
রাধা সনে শ্যাম নওল কিশোর
দোলেন ঝুলায় মত্ত বিভোর,
ভুবন-ভোলানো মধুর হাসিতে
অপূর্ব শোভা রাজে।
মাটির বুকে কি স্বরগ নেমেছে
পথ ভুলে এই সাঁঝে?

নীল নভ-তলে হর্ষপ্লাবিত
ধরণীর আঙিনাতে,
পরমা প্রকৃতি মিলিয়াছে তার
দয়িত পুরুষ সাথে।
যুগ-যুগবাহী কঠোর সাধনা
লভিয়াছে তার সিদ্ধির কণা,
সাধক-সাধ্যে মিলন হয়েছে
আজিকার এই রাতে।
তটিনীর ধারা মিশিয়াছে যেন
মহাসাগরের সাথে॥

ভারত-তীর্থে•

এলিজাবেথ ডেভিড্‌সন

[গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫, নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-কেন্দ্রে বক্তৃীর প্রদত্ত ভাষণ হইতে সঙ্কলিত।

অনুবাদক : শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়]

আমাদের চারমাসব্যাপী সাম্প্রতিক ভারত-ভ্রমণের সময় আমাদের মন যে বিচিত্র ভাবসমূহে পূর্ণ হয়েছিল সেই সব স্মৃতির কিছু কিছু আপনাদের বলতে পারা এক আনন্দের বিষয়। এইবারকার ভারত-যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শত শত ভক্ত সন্তানের সঙ্গে একযোগে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সুযোগ-গ্রহণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি ছাড়াও, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে যে সব প্রাচীন মন্দিরে সাধন-ভজন করে গেছেন সেই স্থানগুলিতেও আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে এই বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দের প্রতি সম্যক্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি অক্ষম। শ্রীশ্রীমায়ের সম্মানার্থে আহূত শতবার্ষিকী উৎসবগুলি এক বছর ধরে ভারতের প্রতিটি অংশে অনুষ্ঠিত হয়ে গত ডিসেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠে চূড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত হয়।

এদেশে সম্পূর্ণ অন্য প্রতিবেশে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা যতখানি আন্তরিকতা ও পূর্ণ আত্মোৎসর্গের সঙ্গে আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন, তাঁদের নিজেদের দেশে সর্বত্র তাঁর শিক্ষা প্রচারার্থে, ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন তেমনই একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বরানুভূতি ও মানবসেবার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ভ্রাতৃ-সংঘ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রাণবন্ত প্রেরণা দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষের প্রশান্তিতে এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর শুদ্ধ ও পবিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমরা সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছিলাম। অর্ধ শতাব্দীর স্বল্প পরিসরে, রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের পূর্ণ জাগরণের ক্ষেত্রে এক অবিভক্ত শক্তিরূপে পরিণত হয়েছে; এই সংঘের সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করে ভিতর ও বাহির দুই দিকের জীবনেই সমুন্নতির পথে ভারত এক প্রাণবন্ত গতিবেগ লাভ করছে।

ভারতভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গেসঙ্গেই দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য ও ভারতানুরাগী রূপে আমাদের স্বাগত জানান হল। স্বামী নিখিলানন্দের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ সদয় ব্যবহার করেছিলেন খুবই; আমেরিকা ভারতকে যন্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বলে আমাদের কাছে তিনি ভারতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ও আমেরিকা-বাসীরা বিদেশে কর্মরত রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং স্বামী নিখিলানন্দের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারককে পেয়ে ইতোমধ্যেই যে লাভবান হয়েছেন তাও বললেন। আমাদের নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দজী আমেরিকায় একজন ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যাতারূপে যে উচ্চ সমাদর লাভ করেন ভারতেও যে তিনি সমভাবেই সম্মানিত তা আমরা অচিরেই অবগত হলাম। বহু স্থানে তাঁর সম্মানার্থে সাধারণ সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সভানেত্রীত্বে দিল্লীতে দুই সহস্র নর-নারী তাঁর ভাষণ শুনতে সমবেত হয়েছিলেন। মাদ্রাজে তাঁর নাগরিক সম্বর্ধনার সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজের নগরপাল। এই চার

মাস নিখিলানন্দজী নিজ দেশবাসীকে যেমন স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তাঁদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যগুলিকে অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি সমান উদ্যমে তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, পাশ্চাত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির দৃঢ় ভিত্তির মূলে রয়েছে কঠোর শ্রম, শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সামাজিক নীতি। আমাদের এই ভেবে দুঃখ হল যে, আমেরিকাস্থ হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন না হয়ে, আমেরিকান দর্শকগণ ভারতে গিয়ে প্রায়ই ভারতের আদর্শ, সংস্কৃতি ও সমস্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত অজ্ঞতা ও সংবেদনের অভাব প্রদর্শন করেন।

ভারতীয় জীবনের প্রাণশক্তি যে আধ্যাত্মিক সাধনার উপর দাঁড়িয়ে, তার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উপলব্ধি করতে আমরা ব্যগ্র ছিলাম এবং সেইজন্যে উত্তুঙ্গ হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারত-ভূমির পাবন ছ'টি* বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থানগুলিতে ও ভারতাত্মার প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-পরিপুষ্ট রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি দর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। যেখানেই গিয়েছি সন্ন্যাসীরা আমাদের জন্যে প্রাচীন রক্ষণ-শীল মন্দিরগুলির প্রবেশপথ খুলিয়ে দিয়ে ও অসীম অতিথিবৎসল ভারতীয় গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে, ভারত-বর্ষের মর্মস্থলে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।

বহু শতাব্দী পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অর্জুনকে গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন, দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্রের সেই প্রাচীন যুদ্ধভূমিতে আমাদের প্রথম তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়। দুপাশে গাছের সারি বসানো রাজপথ দিয়ে, স্বচ্ছ উষ্ণ বাতাস ভেদ করে, বিশাল বিস্তারিত গম ও ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে খড়ের ছাউনি ঘেরা গ্রাম দেখতে দেখতে, পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ী বা সাইকেল কিংবা পুরাকালীন বাসে চেপে চলেছে এমন সব বিচিত্র মানবতার প্রবাহ ভেদ করে, আমরা মোটর গাড়ীতে চলেছিলাম। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মন্দিরে পূজা করেন ও গ্রাম্য বালকদের গীতা পড়ান যে সব ব্রাহ্মণ-পুরোহিত—তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে, পুকুর ও স্নানঘাট সমন্বিত ছোট ছোট তপোবন দেখলাম। শান্তিপূর্ণভাবে ধ্যান-ধারণা অনুষ্ঠানের উপযোগী এই রকম পবিত্র স্থান ভারতে প্রচুর ছড়ানো আছে।

দিল্লী হতে উত্তর মুখে ট্রেন ও মোটরযোগে, রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম, প্রথম পার্বত্য বাধার পাদদেশে। পুরা একটি দিন বিপদ-সংকুল শৈলপথে আরোহণ করে রাত্রিতে কাশ্মীরের উপত্যকায় এলাম। এখানকার স্থির হ্রদে চতুষ্পার্শের পর্বতশিখরগুলি প্রতিবিম্বিত—আর এই সব পাহাড়চূড়ার খাঁজে খাঁজে পশমী মেঘ বাসা বেঁধে রয়েছে। কাশ্মীর তার ছবির মত মোগল উদ্যান, হাউস বোট ও সবুজ ধান ক্ষেতের জন্যে পরিচিত হলেও, উন্নত শালবনের মধ্যে লুক্কায়িত জগন্মাতা ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে মোটরে করে যাওয়ার স্মৃতি আমরা কখনো ভুলতে পারব না। এখানের এই প্রাচীনপন্থী ভারতীয় মন্দিরে আমাদের অঞ্জলি এই প্রথম গৃহীত হল এবং পুরোহিত ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। পঞ্চাশ বছর আগে এই মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীর মহাশক্তি ও মানুষের নগণ্যতা সম্বন্ধে এক আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করেছিলেন।*

পরের সপ্তাহে আমরা এলাম পুণ্যক্ষেত্র হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে। গঙ্গা এখানে উৎপত্তি-স্থলের কাছে বলে দ্রুত প্রবহমানা। এখানকার সহস্র সহস্র যাত্রীর মধ্যে কেউ কেউ চলেছেন হিমালয়ের তীর্থ কেদার-নাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শনে, কারাও বা আমাদের মত কেবল মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা ও তাঁর

* লেখিকা পশ্চিম পাকিস্তানে যাননি বলে সিন্ধু নদী দর্শন করতে পারেন নি, তাই সাত নদীর উল্লেখ না করে ছয় নদীর কথা বলেছেন।—উঃ সঃ

* স্বামিশিষ্যসংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৬শ বল্লী দেখুন।—উঃ সঃ

পুণ্যসলিলে স্নান করেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেন যে এত শ্রদ্ধা করতেন তার মর্ম আমাদের কাছে কি স্পষ্টভাবেই না প্রকটিত হল! হরিদ্বার হতে গঙ্গার উপত্যকা ধরে আমরা নেমে এলাম গোপীবৃন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে; তারপর গঙ্গা ও নীলবরণী যমুনার পুণ্য সংগমক্ষেত্র প্রয়াগে। এখানে অন্যান্য তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আমরাও স্নান করেছিলাম। উড়োজাহাজ হতে দেখলাম প্রয়াগের দক্ষিণে পবিত্র কাশীধাম ছড়িয়ে রয়েছে নীচে গঙ্গার বিশাল অর্ধচন্দ্রাকারের ওপর; এখানে গঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন গতিপথে স্নান-ঘাট ও মন্দিরগুলি যেন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে। এই অতি প্রাচীন নগরীর আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমরা একটি সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বা হোম অফ সার্ভিসের আমরা অতিথি হয়েছিলাম এবং এখানের হাঁসপাতালে বৃদ্ধ ও অসক্ত যাত্রীদের প্রতি সেবার মধ্যে, কাজ ও পূজার সঙ্গতিতে কি মধুর ফল ফলেছে তা দেখলাম।

বাঙলার বিখ্যাত দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে অক্টোবরের গোড়ার দিকে আমরা বেলুড় মঠে এলাম। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের যে মন্দির ও উদ্যানে, তারই বিপরীত দিকে অবস্থিত মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র। কালীমন্দির দেখতে যাবার দিনটির জন্যে অতিকষ্টে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে জগন্মাতার সঙ্গে, আত্মবিমোহিত সমাধিমগ্ন হয়ে অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন হয়েছিলেন, ঠিক সেই মন্দিরে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পূজায় যোগ দিয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটিতে এখনও যেন তাঁর উপস্থিতি বোধগম্য; শ্রীম যেমন বলেছিলেন "সেখানে যেন সর্বতীর্থের সমাগম" হয়েছে। সংকীর্ণ একটি উদ্যান পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌছলাম নহবত ঘরে। এরই নীচে শ্রীশ্রীমা থাকতেন ও এই ছোট ঘরে চাল-ডালের ঝুড়ি, মাথার উপরে শিকায় জ্যান্ত মাছ জিয়ানো একটি হাঁড়ি; এরই মধ্যে থেকে তিনি ঠাকুরের খাবার তৈরী করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্‌ভাব দেখে দেখে ও তাঁর গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাগুলি শুনতে শুনতে শ্রীমা এখানে বহু বৎসর কাটিয়ে গেছেন। আজ তাঁর ঘর একটি মন্দিরে পরিণত, সেখানে তিনি নিত্য পূজিত। এখন শ্রীশ্রীমায়ের যুগ; বহুকাল গোপন থাকার পর এইবার তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং ভারতের কোটী কোটী নরনারী তাঁকে তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরুরূপে পূজা করে থাকেন। তাঁর সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি, সেবা, সন্তোষ, পবিত্রতা, প্রেম এবং অন্যান্য গুণ ভারতীয় দৃষ্টিতে চিরসমাদৃত। জননী সারদাদেবীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির শক্তির মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় নারীত্বের শক্তি নিহিত!

স্বীয় তপশ্চর্যা ও ভক্তির বলে স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দ প্রাচীনপন্থী দক্ষিণ ভারতীয়দের যেখানে তাঁর গুরুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন সেই মাদ্রাজে, রামকৃষ্ণ মিশনের অতি উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কেন্দ্র অবস্থিত। প্রত্যেক রামকৃষ্ণ আশ্রমের মতো, এখান-কারও ক্ষুদ্র উপাসনালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার ছবি নিত্য পূজিত। তাঁদের উপস্থিতি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শক্তির হেতু এবং সদাপ্রসরণশীল জনহিত-কর ক্রিয়াকলাপের মূলকারণরূপে গণ্য। মাদ্রাজে মিশনের স্কুলসমূহে ও কলেজে শত সহস্র যুবক-যুবতী সাংস্কৃতিক, ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করছে এবং পরবর্তীকালের বালক-বালিকাদের মধ্যে তাদের নবলব্ধজ্ঞান যথাক্রমে সঞ্চার করে যাচ্ছে।

মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্চী ও মাদুরার মন্দির-গুলি, যুগ যুগ ধরে দূর দূরান্তর হতে যাত্রীদের আকর্ষণ করে এনেছে; এই সব মন্দিরের অত্যুচ্চ গোপুরম্ ও পীঠস্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর গঠনের বীজস্বরূপ ছিল। আরও দক্ষিণে, খেজুর ও তাল গাছ দেখতে দেখতে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা

কন্যা কুমারিকায় পৌঁছলাম ও সেখানে দেখলাম আরব সাগরের বুকে অস্ত যাচ্ছে সোনালী সূর্য— ভারত মহাসাগরের কোল হতে আবার ওঠবার জন্যে। এইখানে পঞ্চাশ বছর আগে, সবচেয়ে দূরের এক শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজীর মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পারস্পরিক মঙ্গলার্থে উভয়ের মিলন ঘটাবার এক পরিকল্পনা জেগে ওঠে এবং ভারতে পরিব্যাপ্ত গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা চিন্তা করতে করতে তিনি দেখলেন, উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতবাসীর অন্তর অনন্তের পিপাসায় আকুল। কন্যাকুমারীর মূর্তিতে এই ব্যাকুলতার নিদর্শন বর্তমান। শিবের বাগ্‌দত্তা কন্যা কুমারী এখানে হাতে মালা নিয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, তাঁর কোমল মুখমণ্ডল আশার আলোকে আলোকিত। শিব তবুও তাঁর হিমাবাসে নির্গুণের ধ্যানে অবিচল।

মায়া তীর অদ্বৈত আশ্রম আবার আমাদের উত্তরদিকে আকৃষ্ট করল এবং পথে বোম্বাইএর অপর পার্শ্বে, ঐতিহাসিক ইলোরা ও অজন্তাগুহার কাছ বরাবর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চ মালভূমি পার হয়ে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত পবিত্র নাসিক নগরে আমরা রইলাম। বহুযাত্রী এই নদীতে স্নান করে। এর তীর ধরে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে। এখান থেকে পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে মোটরযোগে গিরিপৃষ্ঠের যেখান হতে গোদাবরী উত্থিত হয়েছে তারই নিকটবর্তী গভীর সৌন্দর্যমণ্ডিত নির্জন মন্দির ত্র্যম্বকেশ্বরে গেলাম।

ট্রেনের দূর ও ক্লান্তিকর যাত্রা শেষ করে হিমালয়ের পাদদেশে টনকপুরে এলাম। এখানকার শাল ও দেওদার বনের মধ্যে দিয়ে, পার্বত্য নদী ও খাড়া পর্বতগাত্রের সঙ্গে দৃঢ়ালিঙ্গিত ক্ষুদ্র গ্রামগুলি পার হয়ে আমরা ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। ঠিক সূর্যাস্তের আগে আমাদের মাথার ওপরে আকাশে তুষারমণ্ডিত একটি পার্বত্যচূড়া দেখে বিস্ময়ে অনন্ত তুষারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সারা এক সপ্তাহ চোখের সামনের উজ্জ্বল পার্বত্য সীমায় সদা পরিবর্তনশীল আলোকের খেলার মাঝে সোনালী প্রভা, দিনের ঔজ্জ্বল্য ও সূর্যাস্তের রক্তিমাভাকে ধূসর হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখেছি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৫ হাজার ফুট উচ্চে, নন্দাদেবীর বরফাবৃত শিখরদেশ, ত্রিশূল ও কেদারনাথের জানা অজানা বহু চূড়ার বিশালশ্রেণী, বায়ুতাড়িত তুষারাবৃত হয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সাত হাজার ফুট উঁচুতে উঠে আমাদের দম ফুরিয়ে আসতে লাগল; আর এগুতে পারলাম না। তবুও অনন্তের ধ্যানে মগ্ন দেবাদিদেব মহাদেবের মহান উপস্থিতি অনুভব করলাম।

বেলুড় মঠে এক বিস্ময়কর বিদায়জ্ঞাপন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে কয়েকদিনের ভ্রমণ ব্যতীত আমাদের তীর্থযাত্রা এইখানেই শেষ হল। বেলুড় মঠে চারদিন ধরে শ্রীশ্রীমার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, গান ও ধর্মোপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গাতীরস্থ শ্রীমার মন্দিরে যখন হাজার হাজার লোক সমবেত হল তখনকার দৃশ্য কখনও ভোলবার নয়। শেষদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে এক বিরাট শোভাযাত্রা মাল্যভূষিত শ্রীশ্রীমার ছবির সঙ্গে পতাকা, বাদ্য ও ছন্দান্বিত নৃত্যযোগে বেলুড় মঠের তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট মন্দির প্রদক্ষিণ করে এবং জনতা অনেক রাত্রে ছত্রভঙ্গ হয়।

কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর নীরব পবিত্রতা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল; অনাগত কালে বিশাল জগৎ হতে যাত্রীরা দলবেঁধে আসবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার মন্দিরে, নিজেদের উন্নতি ও জড়ের উপর আত্মার বিজয় ঘোষণা করতে।

ভারতীয় নারীত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ শ্রীশ্রীমা যে আমাদের মত পাশ্চাত্ত্য মহিলাদেরও মা, সে কথা যেন ভুলে না যাই। তাঁর ধর্ম, আত্মোৎসর্গ ও সকলের প্রতি পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরশ আমরাও পেতে চাই। তাঁর পুণ্য জীবনের ধ্যান করলে মন স্থির হয় এবং শেষে বুঝতে পারি, শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে আমাদের এই স্থূল মানবেচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে এক করে ফেলতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান, বাহ্য পদার্থের জ্ঞান (Material Science) আর প্রজ্ঞানের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান—পরম আত্মজ্ঞান (Spiritual Science)। নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় শান্ত ব্রহ্মের বুকে যখন তাহার ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তখন ঐ ক্রিয়াশক্তির নাম হইতেছে প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে অনন্ত দৃশ্যরূপে, পদার্থরূপে, জীব জগৎ। এই জীব-জগতের পদার্থ-সমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া যন্ত্রাগারে যন্ত্র সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় উহার নামই বিজ্ঞান। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ সসীম ও অপূর্ণ, তাই নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে উহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের জ্ঞানগোচর করাই বিজ্ঞানের কার্য। যতকিছু আবিষ্কার এই বিজ্ঞান বলেই সাধিত হইয়াছে। মানুষের অভাববোধ দুর করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করিবার জন্যই মানবমনের এই প্রয়াস। অনাদি কাল হইতেই এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। যতই বিজ্ঞান সহায়ে মানুষ তাহার অভাব দূর করিতেছে ততই মানুষের অদমিত কামনা-বাসনা নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিতেছে এবং বিজ্ঞান তাহা দূর করিতে করিতে বর্তমানের এই সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই সেই সমস্ত সুখ-সম্পদ্ লাভ করিয়া মানুষ কি প্রকৃত সুখ লাভ করিয়াছে? মানুষ কি তাহার বাসনার তাড়না হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছে? বিজ্ঞান দিয়াছে মানুষকে অতুল সম্পদ্ মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া দিয়াছে তাহার অতৃপ্ত অভাব। আবার বিজ্ঞানই দিয়াছে মারণাস্ত্র মানুষের সর্বনাশের জন্য। তাই আমরা দেখিতে পাই বিজ্ঞান জন-কল্যাণে এতদূর অগ্রসর হইয়াও মানবের অভাববোধকে আদৌ দূর করিতে পারে নাই বরঞ্চ তাহাদের সর্বনাশেরই কারণ হইয়াছে। কামনায় প্রলুব্ধ মানুষ তাহার নিজের দেশকে বড় করিবার জন্য, তাহাদের স্বকীয় যশঃ, সম্পদ্, ও সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য বহু যুদ্ধ-সরঞ্জাম, এটম্ বম, হাইড্রোজেন বম প্রভৃতি সৃজন করিয়াই অপর রাষ্ট্রকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ধ্বংসের নিমিত্ত কতই না ষড়যন্ত্র ও মতলব আঁটিতেছে। কেহই চেষ্টা করিতেছে না এই সমগ্র বিশ্বকে একই সংসার, একই পরিবার মনে করিয়া বন্ধুত্ব-সূত্রে গ্রথিত করিতে। কেহই মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়া এই সংসারকে সুখময় করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ইহার কারণ, মানুষ চায় প্রধানতঃ নিজ সুখ, তারপর নিজের সঙ্গে যাহারা জড়িত অর্থাৎ যাহাদের সুখের সহিত নিজের স্বার্থ জড়িত তাহাদের সুখ, আর চায় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের সঙ্গে একত্র হইয়া বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে নিজস্ব সমাজ ও ক্ষুদ্র দেশ গড়িয়া তুলিয়াছে সেই নিজ দেশ ও নিজ সমাজের সুখ ও উন্নতি। স্বার্থ-সংকীর্ণ মানবচিত্ত নিজ স্বার্থ লাভের জন্যই সর্বদা প্রয়াসী, তাই অপরের স্বার্থে হানা দেয়, অপরের দেশ জয় করিয়া তাহাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। মানবগণ নিজ সমাজ ও ধর্মকে বড় করিতে গিয়া অপরের সমাজ, দেশ ও ধর্মকে আক্রমণ করে, তারই ফলে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে মারামারি।

ইহাই যত যুদ্ধবিগ্রহের ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ। মানুষের মনে যতদিন হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা ও স্বার্থ-লোলুপতা থাকিবে ততদিন পরপীড়ন-প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে এবং ততদিন বিশ্বে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক প্রজ্ঞানবিহীন বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি ও পূর্ণানন্দ কিছুতেই দিতে পারিবে না। বিজ্ঞান দিয়াছে আমাদিগকে প্রকৃতির বাহ্য-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত যে পদার্থ ও জীবসমূহ তাহাদেরই জ্ঞান আর প্রজ্ঞান দিয়াছে প্রকৃতির অন্তরে অর্থাৎ প্রতি পদার্থে ও প্রতি জীবের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন যে চৈতন্য, সেই আনন্দময় চৈতন্য-সত্তার জ্ঞান। সেই চৈতন্যময় সত্তাই সূত্রাত্মারূপে (প্রাণরূপে) সমগ্র বিশ্বের জীবসমূহকে, পদার্থ-সমূহকে এবং অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন একই সূত্রে—গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" অর্থাৎ সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতে (ভগবান) সমস্ত জীব ও সৃষ্ট পদার্থসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে, এই সমগ্র বিশ্বের জীবগণ সেই ব্রহ্ম বা ভগবানেরই ইচ্ছায় তাঁহারই প্রকৃতির নিয়মে সকলেই প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিজ নিজ কর্মানুবর্তন করিতে করিতে এই সমগ্র সংসারকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। সুতরাং বিশ্বের মানবগণ একই প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ একই মাতার কোলে ভ্রাতৃভাবে পালিত হইতেছে এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, ওই ব্রহ্মপ্রকৃতির ইচ্ছার অনুবর্তন করিয়া ব্রহ্মকর্মই করিতেছে। এই যে ব্রহ্মপ্রকৃতির বা ব্রহ্মশক্তির নিয়ম উহা পালন করাই জীবের কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম।

প্রকৃতি আর ব্রহ্ম একই বস্তু কারণ শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, সুতরাং প্রকৃতির যে নিয়মে এই বিশ্ব শাসিত হইতেছে, চালিত হইতেছে উহাই ভগবৎ ধর্ম, উহাই বেদ বা প্রজ্ঞান। ওই প্রজ্ঞান যখন প্রকাশ পায় তখন আমরা প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করি। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা সকলে পরস্পর এমনই অংশাংশী-ভাবে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে, প্রকৃতির কোন অংশ অর্থাৎ কোন জীব নিজ স্বার্থের জন্য অপর কোন জীবের প্রতি অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির বুকেই লাগে। কোন জাতির প্রতি কোন জাতি অন্যায় করিলে, কোন ধর্মের প্রতি অপর ধর্মাবলম্বী কেহ বা কাহারা অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির নিয়ম (Administrative laws of God) সেই আইনভঙ্গকারী জীবকে বা জাতিকে শাস্তি দিবেনই —ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিশোধ নহে—ইহা হইতেছে প্রকৃতিরূপিণী জননীর সন্তানকে শিক্ষা দিয়া প্রকৃত জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা, সুতরাং ইহাও তাঁহার করুণা। অতএব প্রজ্ঞান মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে ভ্রাতৃভাবেরই শিক্ষা দিয়া বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করে। এই প্রজ্ঞানই মনুষ্যগণের কামনাবাসনা শান্ত করিয়া এবং তাহাদের উদ্দাম লালসাকে সংযত করিয়া তাহাদিগকে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যাদি গুণাবলীতে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রজ্ঞানই মানব-জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ এবং ইহার অনুশীলনই আমাদিগকে সর্ব অভাবের তাড়না হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পরম শান্ত অবস্থায় স্থিত করে। সুতরাং যতদিন বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের অনুশীলন না হইবে ততদিন মানবের প্রকৃত সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং এই প্রজ্ঞান মানুষ যতটুকু লাভ করিবে ততটুকুই তাহার সুখ ও শান্তির কারণ হইবে। এমন একদিন আসিবে এবং সেদিনের দেরি নাই, যেদিন এই ভারতই তাহার প্রজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট বেদজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীকে দান করিয়া জগতের বরেণ্য হইবে।

শ্রীম-স্মরণে

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(রামকৃষ্ণ-কথামৃত রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশ্যে)

সারাটি জীবন যেন পরিপূর্ণ একটি প্রণতি,
সজল মেঘের মত বিনম্র, বিমুগ্ধ, অবনত।
একটি বিহ্বল চিত্ত, রামকৃষ্ণে নীরব আরতি।
পার্থিব জগৎ হতে বিরাম সে মাগিছে সতত।

এনেছ ব্যাকুল অর্ঘ্য, সযতনে ভরি চিত্ত কায়,
পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণে, কী সহজ আত্মসমর্পণ।
মুক্তির আনন্দ সুর ধ্বনিতেছে প্রসন্ন হিয়ায়,
জীবনের নবজন্ম, সমস্ত সংশয় নিরসন।

ভক্তির উচ্ছল ধারে সমগ্র জীবন আলোকিত,
শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বৈরাগ্যের অমিত দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল
আনন্দ সঙ্গীত বাজে চিত্ত মাঝে, স্বতঃ-উৎসারিত।
একটি প্রদীপ-শিখা নিবাত-নিষ্কম্প অচঞ্চল।

আপন কর্মের মাঝে চাহনিক আপন প্রচার,
সঙ্গোপনে রহিয়াছ, পরিপূর্ণ নামের আড়ালে।
সে-নাম অমৃত মাঝে, বুঝেছ এ মূঢ়তা তাহার,
নিজেকে প্রচার করা পার্থিব নামের অন্তরালে।

আমার প্রণাম লহ, শ্রদ্ধানত, হে মৌন সাধক !
মরতের অধিবাসী, পেয়েছ অমৃতে অধিকার
তোমার অম্লান দীপ্তি, উজলিয়া রামকৃষ্ণলোক
আজিও আলোক দেয় রামকৃষ্ণ-কথামৃতকার॥

কথামৃত

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

(শ্রীম'র অমর গ্রন্থের উদ্দেশ্যে)

গ্রন্থ তো নয়, ওরা অসংখ্য গ্রন্থি !
বিপুল আয়াসে জ্ঞান-সমুদ্র মন্থি'—
কই ওঠে সুধা ? তীব্র গরল
লয়ে কাড়াকাড়ি চলে অবিরল,
ব্যাপ্ত বিশ্বে কূট হলাহল বিষাক্ত দুর্গন্ধী।

গ্রন্থে গ্রন্থে ক্রমেই বাড়িছে গ্রন্থি;
যার যটা 'পাস'—ততগুলি পাশে
নিত্য বাঁধিছে তারে আশে পাশে
যেন নির্মম অক্টোপাশের ভীম বন্ধনে বন্দী
গ্রন্থের মাঝে গুপ্ত রয়েছে গ্রন্থি।

অহঙ্কারের অন্ধ-কারায় বন্দী
পণ্ডিতদল শকুনের মতো
ভাগাড় খুঁজিয়া ওড়ে অবিরত,
লুব্ধ দৃষ্টি গলিত-শবানুসন্ধী।
পণ্ডিতদল গ্রন্থ-কারায় বন্দী।

গ্রন্থ যেথায় অমৃত-নিস্যন্দী—
ফোটায় জ্ঞানের শুভ্র কমল
ভক্তিস্নিগ্ধ-রসবিহ্বল
সে জ্ঞানীর পূত চরণকমল নত মস্তকে বন্দি;
গ্রন্থ সেথায় গ্রন্থিবিহীন, অমৃত-নিস্যন্দী।

"বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধুসঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সান্ত্বনা

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(একটি চিঠি হইতে)

[ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) জন্মদিন এবার পড়িয়াছে ১লা শ্রাবণ। তাঁহার একটি ইংরেজী পত্রাংশের এই বঙ্গানুবাদ দ্বারা আমরা পুণ্যচরিত্র মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাণী-পূজা নিবেদন করিলাম। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি। — উঃ সঃ]

তুমি আমার নিকট সংসারপাশ হইতে মুক্তি-লাভের উপদেশ চাহিয়াছ ইহার উত্তরে আমি তোমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, শত শত জন্মের প্রারব্ধের এক দিনে বিলোপসাধন করা যায় না। হ্যাঁ, তুমি যাহা বলিয়াছ ঠিকই। এই মুহূর্তেই আমাদের সংসারপাশ হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতে হইবে; কারণ কে জানে কাল কখন আমাদিগকে প্রিয়জনের বাহুবন্ধন হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা এই বুঝায় না যে, চলার পথে হঠাৎ আমরা একটা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া বসিব। সাফল্য-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হইল এই: শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যেমন রাখিয়াছেন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক। বালক যেমন সাহায্যের জন্য মাতাপিতার দিকে তাকায় তোমার মনও সেইরূপ সর্বদা ভগবানের দিকে নিবদ্ধ রাখিও। প্রভু তোমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় শান্তমনে অবস্থান কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিম্নোক্ত উক্তিটি পাঠ করিয়া ইহা অনুধ্যান করিবে: চারা গাছকে প্রথমে বেড়া দিয়া রাখতে হয় যেন ছাগলগরুতে না খেয়ে ফেলে, গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার হয় না; তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না। এই সময় শতশত ছাগলগরু বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় লইয়া থাকে। সুতরাং যখন সৌভাগ্যক্রমে সামান্য বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের ভাব কাহারও মনে অঙ্কুরিত হয় তখন উহা সযত্নে রক্ষণ ও পোষণ করা উচিত। এজন্য বিষয়ী লোক হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে; কিন্তু বৈরাগ্যভাব একবার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেলে কেহই উহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না। সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে। আমি 'ঈশানুসরণ' (Imitation of Christ) বইখানার কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, এই অমূল্য পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সান্ত্বনা ও প্রকৃত ভক্তির কথা পাইবে, সেগুলি অন্তরে গভীরভাবে সংবদ্ধ করিও। ঐ গ্রন্থকর্তা টমাস্ এ কেম্পিস্ ভগবান ও তাঁহার প্রেরিত পুত্র যীশুর একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন।

মানুষ ও পশুতে প্রধান পার্থক্য এই: পশু যতদিন পর্যন্ত আহার্য ও আশ্রয়স্থান পায় ততদিন সে অন্য স্থানে যাইতে চায় না, কিন্তু মানুষ যদি সে খাঁটি মানুষ হয়, সর্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে বিচরণ করিতে সচেষ্ট হয়। উচ্চতর আদর্শের প্রতি নিরন্তর অনুরাগ যথার্থ মানুষের বিশেষত্ব। যাহারা সৎ ও মহৎ হইতে চায় 'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই উপদেশ বাক্য পালনই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে আমরা সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পথ বিভিন্ন। প্রত্যেককে আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে এবং ভগবান যাহার জন্য যেরূপ যান-বাহনের ব্যবস্থা করিবেন তাহারই সাহায্যে গন্তব্যপথে চলিতে হইবে। আমাদের সকলেরই শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু হঠাৎ এক আঘাতে শৃঙ্খল ভাঙিয়া যাইতে কেহ দেখিয়াছ কি? যদি তুমি শৃঙ্খল-মুক্ত হইতে চাহ, তবে সহিষ্ণুতার সহিত উহাতে একাদিক্রমে বহুবার আঘাত কর। কোনরূপ কল্যাণ-ই হঠাৎ সংঘটিত হয় নাই। যখন বৈরাগ্যের ভাব অন্তরে প্রবল হয় তখন কোনরূপ বন্ধনই তোমাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না; ফল পাকিবামাত্র যেমন উহা মাটিতে পড়িয়া যায়, সেইরূপ প্রবল বৈরাগ্য হইলে তুমিও শ্রীহরির কোলে আসিয়া পড়িবে।

তুমি বলিতেছ সংসার বড় প্রলোভনের স্থান।

তাহা খুবই সত্য। কিন্তু ইহা কি জান না যে, প্রবল বিরুদ্ধ বায়ুই দুর্বল বৃক্ষের শিকড় শক্তিশালী করে? তোমার ভিতর এখন যে সৎ মনোবৃত্তি বর্তমান তাহা তত প্রবল নহে, কিন্তু প্রলোভনের সহিত নিরন্তর সংগ্রামের ফলে উহা বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। ক্রমাগত ব্যায়াম ও নিয়মিত শ্রমের ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিও এই নীতির বহির্ভূত নহে। বস্তুতঃ এই পথ এত পিচ্ছিল যে, কোন লোকই একবার পড়িয়া না গিয়া অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু মানুষ যদি চলার পথে কোনরূপ পতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইতে থাকে তবে ইহা নিশ্চিত যে, সে পঙ্কিল গহ্বরকেও অতিক্রম করিতে পারিবে। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মানুষকে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; যে পর্যন্ত না সে বিপন্মুক্ত স্থানে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিতে পারিবে সে পর্যন্তও সে যেন দমিয়া না পড়ে, সেই গন্তব্যস্থলেই তো সে তাহার একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিবে যাঁহার জন্য সে এতকাল পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে। সময় সময় পদস্খলন হইলেও তাহাতে বিচলিত হইবে না। মানুষ মাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। কিছুতেই নিরুৎসাহ হইও না। দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে থাক। কেহই জগতের পিচ্ছিল কর্দম ময় পথ অক্ষত দেহে অতিক্রম করিবার আশা করিতে পারে না। পথ অতিক্রমণের চেষ্টা করিলে পতনের আশঙ্কা আছে বলিয়া কাদার মধ্যেই বসিয়া পড়া নিতান্ত মূর্খতার কাজ। 'পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর'—এই নীতিবাক্য ভুলিবে না। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রবার্ট ব্রুস্ ছয়বার চেষ্টা করিয়াও যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সপ্তম বারে তিনি জয়লাভ করেন—এই কথাটি স্মরণ করিবে। তোমার ভাগ্যে যাহা আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। জানিয়া রাখিবে, সব কিছু শ্রীভগবানের নিকট হইতেই সাক্ষাৎভাবে আসে। নিরন্তর তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিবে না। তিনি অনুগ্রহ করিলে যাহা তোমার পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর তাহাই দিতে পারেন। সর্বদা বিশ্বাসপূর্বক তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া চলিবে। সদা শান্ত ও স্থির ভাব অবলম্বন করিবে। চঞ্চলতা রোগ-বিশেষ। ইহা জানিবে যে, ধর্মের অর্থ পরোপকারের ইচ্ছা এবং সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণজনিত পরিতৃপ্তিলাভ।

ব্রহ্মদেশ ও বাংলা*

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
(অ্যাড্‌ভোকেট্, রেঙ্গুন হাইকোর্ট)

ভারত তথা বাংলা আমাদের জননী মাতা, আর বর্মা আমাদের পালয়িত্রী মাতা। এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্মরণাতীত কাল হইতে।

যদিও বর্মীজাতি মঙ্গোলজাতি-সম্ভূত, তথাপি তাহাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভারতীয়। এমনকি ইহাদের লৌকিক কাহিনী পর্যন্ত ভারতীয়।

এই দেশে কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ বা কাহিনী আছে।

(ক) খৃষ্টপূর্ব নবম শতকের মধ্যভাগে অভিরাজ নামে শাক্যবংশীয় এক রাজপুত্র কপিলাবস্তু হইতে উত্তর বর্মাতে আসিয়া বর্তমান মোগগ্ জেলার টাডাউং নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন, এবং কিছুদিন পরে আরাকান জয় করিয়া সেখানেও রাজ্য বিস্তৃত করেন।

(খ) বুদ্ধদেব স্বয়ং বর্মার লেগাং নামক স্থানে এবং বর্তমান মিনবু জেলার শোয়েসেট্টো নামক স্থানে আসিয়াছিলেন এবং শোয়েসেট্টো'স্থিত চাউংডায়া বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেবের তিনহস্ত-পরিমিত পায়ের ছাপ আছে। রেঙ্গুনের শোয়েডাগন বৌদ্ধমন্দির ও পেগুর শোয়েম'ড' বৌদ্ধমন্দির (যাহা গত বৎসর

* ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ হইতে সঙ্কলিত।

পুনর্নির্মিত হইয়াছে) বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

(গ) দত্তপং নামক এক রাজা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার রাজধানীতে ৩০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল।

(ঘ) সম্রাট অশোক শোন ও উত্তর নামক দুই জন বৌদ্ধ ধর্মযাজককে বর্তমান তাঠোনে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন; এবং তাঁহারা ৬০০০০ (ষাট হাজার) লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

(ঙ) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে সিংহল হইতে ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র নিয়া তাঠোনে আসেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র আরাকান ও শান প্রদেশে প্রচারিত হয়।

ঐতিহাসিকগণ এই প্রবাদগুলি গ্রহণ করেন না। ভারতীয়, চীনা বা সিংহলের ইতিহাস এই প্রবাদ সমর্থন করে না। এই প্রবাদের প্রচলন ও বিশ্বাস দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে বর্মীদের প্রবাদ ও কাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক।

বর্মার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র একাদশ শতক হইতে পাওয়া যায়। তবে কতকগুলি তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী কাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইতেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে পূর্ব ভারতবাসীরা—উৎকলবাসী, তেলেঙ্গানাবাসী দ্রাবিড় জাতি ও গৌড়ীয়গণ—দক্ষিণ বর্মাতে ধীরে ধীরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে টালাইং নামে যে উপজাতি মৌলমিন-তাঠোন অঞ্চলে বাস করে, তাহারা তেলেঙ্গানা হইতে আগত ভারতীয়দের বংশধর। উপনিবেশকারীদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম এই দেশে আসে।

বৌদ্ধধর্ম কাঞ্চিপুর (মাদ্রাজ প্রদেশে কঞ্চিভরম) হইতে প্রথম আসে—সিংহল হইতে নয়।

উত্তর ব্রহ্মেও উত্তর ভারত হইতে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। প্রোমে মৃতের ভস্ম পরিপূর্ণ একটি পাত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে সংস্কৃত লিখন আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে বিক্রমবংশীয় রাজগণ নবম শতকে প্রোমে রাজত্ব করিতেন। প্রোমে ও পাগানে আবিষ্কৃত সংস্কৃত লেখা হইতে বোঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল।

সিনবিউসিন ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্মাতে রাজত্ব করেন। তিনি বেনারস হইতে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রাজগুরুরূপে বরণ করিয়া বর্মাতে আনেন। সেই পণ্ডিতদের সহায়তায় মংডং সায়াড সংস্কৃত হইতে সারস্বত ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ফলিত জ্যোতিষের বই, ঔষধাবলী রস-রত্নাকর, ধাতুপুষ্টি, কামরত্ন, দ্রব্যগুণ, সামুদ্রিক লক্ষণ, সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষাট খানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বর্মী ভাষায় অনুবাদ করেন। যেহেতু প্রথম ব্যাকরণ অনুবাদ করা হয়, সেইজন্য এই সকল পুস্তকাদি বিয়াকরণ নামে প্রচলিত। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে, আজও বর্মী ভাষার জ্যোতিষশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, হস্তরেখা-বিচার, ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরিভাষাসমূহ সংস্কৃত ভাষার—পালি ভাষার নয়।

বর্মার উত্তরপশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য মণিপুর অবস্থিত। সেখান হইতে মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-সংস্কৃতি সমগ্র ব্রহ্মে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা পোঁনা নামে বর্মাতে পরিচিত। তাঁহারা হিন্দু আচার-ব্যবহার ও বৈষ্ণব ধর্ম ব্রহ্মদেশে আনেন। যদিও বৈষ্ণব ধর্ম এদেশবাসীদের প্রভাবান্বিত করে নাই, তবু অনেক হিন্দু আচার-ব্যবহার ইহাদের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

এই প্রকারে দীর্ঘকাল বর্মা ও ভারতের সম্বন্ধের দরুণ বর্মীদের ভাষায়, ধর্মে, ব্যবহারে, শাস্ত্রে ও দৈনিক জীবনে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আমি উহার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ দিব।

প্রথমতঃ ভাষা,—ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, বর্মী অক্ষর দক্ষিণ ভারতের অক্ষর হইতে আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সবচেয়ে পুরাতন শিলালিপি—কলাণী লিপির অক্ষর পল্লভী। পরে এই অক্ষরের উপর দেবনাগরী অক্ষরের প্রভাব নাকি লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমি একবারে অনভিজ্ঞ। আমি কেবল পণ্ডিতদের মত বলিলাম।

বর্ণমালাগুলির লিখিবার পদ্ধতি যদিও সংস্কৃত ভাষানুযায়ী বা দেবনাগরী নয়—তবুও বর্ণমালাগুলি সংস্কৃত বর্ণমালার ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন কা, খা, গা। বর্ণমালার উচ্চারণ বাংলা ভাষার ন্যায় বাংলা অকাবান্ত ক' খ' গ' মত নয়। তবে বর্মী ভাষায় ত-বর্গ নাই। ট-বর্গ দুইটি। বাংলা ভাষায় দুইটি 'ব'র উচ্চারণ একই প্রকার। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দুইটি ব, ব উচ্চারণ ভিন্ন। বর্মী ভাষার ব সংস্কৃতের ন্যায় ওয়া উচ্চারিত হয়। বর্মী ভাষার 'র' এর উচ্চারণ নাই। 'র' বর্ণের উচ্চারণ 'ইয়া'। শ, ষ, স-র উচ্চারণ তা। যদিও বর্মী ভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত বা বাংলাভাষা হইতে আসিয়াছে, কিন্তু 'র' স, ষ, শ-র উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য আমরা সেই শব্দগুলি বুঝিতে পারি না। যেমন ইয়ান্ বলিলে আমরা বুঝি না যে, এই শব্দটি আমরা জানি, আমরা বাংলা ভাষায় এবং সংস্কৃতে বলিব 'রণ'। বর্মী ভাষার পদবিন্যাসের সহিত বাংলা ভাষার পদবিন্যাসের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। বর্মী ভাষার একবাক্যের পদগুলির স্থানে বাংলা প্রতিশব্দ বসাইয়া গেলে সুন্দর বাংলা হইবে। আশা করি কোন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ শীঘ্রই বর্মীভাষা ও ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিবেন। আমার উপরোক্ত কথাগুলি শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে বর্মীভাষা ভারতীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। বর্মীভাষা ভিন্নভাবে কথিত ভাষা হিসাবে বহু শতাব্দী প্রচলিত থাকার পর বর্ণমালা এবং পরে লিখিত ভাষা আসে।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম। এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ, পঞ্চম শতকে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে আসে। উত্তর ভারতে মহাযান বা মহায়ণ বৌদ্ধধর্ম অধিক প্রচলিত ছিল। হীনযান বা হীনায়ণ দক্ষিণ ভারতে বেশী প্রচলিত ছিল, সেখান হইতে নিরীশ্বর তেরাবাদ হীনযান বৌদ্ধধর্ম বর্মাতে আসিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পূর্বে, সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে হিন্দুধর্ম ব্রহ্মদেশে আসিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বর্মীরা নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের উপাসক হইলেও তাহারা 'নাট্' বলিয়া এক শ্রেণীর দেবতাকে পূজা করে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধমন্দিরে এই বিভিন্ন প্রকারের নাট্ বা দেবতার মূর্তি দেখা যায়। আমার মনে হয় যে এই নাট্ পূজা হিন্দু দেবদেবী পূজার রূপান্তর মাত্র। আমাদের মন্দিরে আসিলে বর্মী বৌদ্ধরা আমাদের দেবদেবীর মূর্তির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় উ নু রামকৃষ্ণ মিশনের সোসাইটি-মন্দিরে আসিলে রামকৃষ্ণদেবকে পূজা করেন। মাননীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মন্ত্রী উ উইন ৺দুর্গাপূজার সময় স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে আসেন, এবং প্রণাম করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সাংসারিক ব্যাপারে আসিতেন না। মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা বা ভারতবর্ষ হইতে রাজগুরু-রূপে আগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ আজও বর্মাতে আমাদের দেশের পুরোহিতের কাজ করিতেছেন। মেগুালেতে পৌনারা এখনও দশ বার খানা দুর্গাপূজা প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া করে। উহাদের মধ্য দিয়া হিন্দু আচারব্যবহার ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে যখন কোন পুত্রকন্যার জন্ম হয়, তখন পৌনাব্রাহ্মকে বা বেডিন সায়াকে ডাকিয়া তাহার জাটা বা ঠিকুজী তৈয়ারী হয়। এই জাটা প্রস্তুত করা আজ অবধি প্রচলিত আছে। পূর্বে জাটা সব সময় পৌনারা তৈয়ারী করিত, এখন বর্মী বেডিন সায়া বা সময় সময় বৌদ্ধভিক্ষু যিনি ফলিত জ্যোতিষ

শাস্ত্রে পণ্ডিত, তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা যেমন কুষ্ঠির সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ বলা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করে—বর্মীরাও তাহাই বিশ্বাস করে। হিন্দুরা যে রাহুকেতু সমেত নবগ্রহে বিশ্বাস করে, বর্মীরাও সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের ফলিত জ্যোতিষ এই দেশে এখনও প্রচলিত।

হিন্দুরা যেমন শুভ দিনক্ষণ বিশ্বাস করে, বর্মীরাও তাহা করিয়া থাকে। যখন বর্মা স্বাধীনতা লাভ করে তখনও শুভক্ষণ দেখিয়া ব্রিটিশ পতাকা নামাইয়া বর্মী পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল। ব্রিটিশদের এই দেশে স্বত্বত্যাগ-কার্য শুভমুহূর্তে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী শেষরাত্রি প্রায় চারিটার সময় নিরূপিত হইয়াছিল। তবে হিন্দুদের ন্যায় বর্মীদের মধ্যেও এখন এই বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে যেমন অন্নারম্ভ শুভ দিন দেখিয়া করা হয়, ইহাদের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত আছে।

যদিও ব্যবহারশাস্ত্র (law) অনুসারে বৌদ্ধদের বিবাহ চুক্তিমূলক (contract), তবুও প্রথম বিবাহ শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া সম্পন্ন হয়।

বর্মীদের মধ্যে হিন্দুদের মতন বরকনের হাত বাধিয়া দেওয়া হয়, মঙ্গল কলস স্থাপিত হয়।

আমাদের দেশে যেমন কর্ণবেধ ও উপনয়ন আছে ইহাদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা বর্তমান। মেয়েদের কর্ণবেধ করা হয় এদেশে অনেক সময় বেশ ঘটা করিয়া। ছেলেদের কর্ণবেধ হয় না। তাহাদের বেলা হয় 'সিনবিউ'—অর্থাৎ কয়েকদিনের জন্য বালককে ব্রহ্মচারী ভিক্ষু করা হয়। প্রথাটা আমাদের দেশে দ্বিজদের মধ্যে উপনয়নের সময় ব্রহ্মচারী হওয়ার ন্যায়। আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের মত এখানেও ভিক্ষা চাহিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন অন্যের ছেলেকে উপনয়ন দেওয়া পুণ্যের কাজ বলিয়া বিশ্বাস আছে, এখানেও পরের ছেলেকে সিনবিউ করা পুণ্যের কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।

যদিও সাধারণতঃ মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের সমাধিস্থ করা হয়, তবুও বহু পরিবার আছে যাহাদের মধ্যে দাহ-প্রথা প্রচলিত। প্রাক্তন বৈদেশিক মন্ত্রী উ টিন টুটের হত্যার পর বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তাঁহার মৃতদেহ অন্যান্য শহীদদের মৃতদেহের সহিত আরজানী হলে রাখার প্রস্তাব করেন, তাঁহার পরিবারের লোকেরা ঐ মহাসম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের কুলপ্রথা-অনুসারে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করে। আমাদের দেশে মৃত্যুর পর দাহ করিবার পূর্বে যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে এবং পরে শ্রাদ্ধ করে, বর্মীদের মধ্যে মৃত্যুর পর মৃতদেহ দুই তিন দিন ঘরে রাখিয়া সমাধিস্থ করার পূর্বে শ্রাদ্ধের অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ করা হয়।

ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপার ব্যতীত ব্যবহার-শাস্ত্রেও হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) প্রত্যেক দেশেরই প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশে কিন্তু প্রথম লিখিত সম্পূর্ণ ব্যবহার-শাস্ত্র যাহা পাওয়া যায় তাহাতে হিন্দু প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। বর্মীদের ৩৬ খানা ব্যবহার-শাস্ত্রের পুস্তক আছে। উহাদিগকে 'ধর্মতট্' বলা হয়। ধর্মতট্ শব্দ ধর্মশাস্ত্র বা ধর্ম সত্তম শব্দের অপভ্রংশ। ইহাদের শাস্ত্রদাতার নামও মনু, যেমন আমাদের মানবধর্ম-শাস্ত্রকারের নাম মনু। বর্মার ব্যবহার-শাস্ত্রে যে সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মতট্ পাওয়া যায় তাহার নাম ওযারু বা ওয়াগুরু। ইহা বর্মী সন ৬৪৩ সালে (খৃষ্টাব্দ ১২৮৪) রচিত হয়। আমাদের মনুর মতন ব্যবহার শাস্ত্রকে অষ্টাদশ ভাগে ভাগ করিয়া শাস্ত্র প্রণীত হয় এবং এই অষ্টাদশ ভাগের মধ্যে ১৪।১৫টি মনুর সঙ্গে হুবহু মিলে। তবে সব ব্যবস্থাগুলি মনু হইতে লওয়া হয় নাই।

অধিকাংশই মনু হইতে লওয়া হইয়াছে। বাকী-গুলির অধিকাংশ কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু একটি আশ্চর্য প্রভেদ আছে আমাদের শাস্ত্র হইতে। ইহার মধ্যে ধর্ম বা নীতি-শাস্ত্রের কোন কথা নাই যেমন আমাদের শাস্ত্রে আছে। কেবল প্রথম পরিচ্ছেদটি বাদ দিলে আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের লিখিত পুস্তকের ন্যায় এই ধর্মতট্ লিখিত হইয়াছে।

এই ছিল আমাদের বর্মীদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইংরেজ আসার পূর্বে। কিন্তু আমরা ঊনবিংশ শতকে যখন বর্মায় আসিলাম তখন আসিলাম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অনুচর হইয়া। আমরা ইংরেজদের শাসন-কার্যের সহায়ক ছিলাম মাত্র। ইংরেজরা ছিলেন বড় সাহেব আর বাঙ্গালীরা নিজেদের মনে করিতেন ছোট সাহেব। যদিও বহু শিক্ষিত ভারতবাসী বর্মাতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা ঐতিহ্য লইয়া গবেষণা করেন নাই। ভারতবাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে আসিয়া এই দেশবাসীদের হীনচক্ষে দেখিয়াছেন। বর্মীরা ভারতবাসীদের এই মনোবৃত্তি অত্যন্ত অপমান-জনক মনে করিতেন। ভারতীয়দের এই মনোবৃত্তি এই দেশে ভারতীয় বিদ্বেষের অন্যতম কারণ। ইহার আরেকটি কারণ ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদীরা যখন দেখিলেন যে, ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্য ভারতীয়দের আর প্রয়োজন নাই তখন তাঁহারা বর্মীদের জন্য বর্মা (Burma for Burmans) ধুয়া উঠাইলেন। এই ধুয়ার প্রকৃত অর্থ যে বর্মা ইংরেজদের জন্য। তাঁহারা এই প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ভারতবাসীরা বর্মীদের শোষণ করিতেছে, তাহারা কোটি কোটি টাকা দেশে লইয়া গিয়া ব্রহ্মদেশকে দরিদ্র করিতেছে। বর্মীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্মীরা তখন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, এখানে যে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবাসী ছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই উপার্জন অত্যন্ত সামান্য কিন্তু মুষ্টিমেয় ইংরেজ কোটি কোটি টাকা লইয়া যাইতেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সমালোচনা

টেস (প্রথম খণ্ড)—টমাস হার্ডি প্রণীত; অনুবাদক—শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি ও শ্রীশোভনা মাইতি; প্রকাশক—বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুল-গাছিয়া, পোঃ—মহেশরেখা (হাওড়া) পৃষ্ঠা—১৩৮; মূল্য—৩৲ টাকা।

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৮) Tess of the d'urber-villes নামক ইংরেজী উপন্যাসের বর্তমান বাঙলা সংস্করণটি বঙ্গসাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সম্পদ্ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। হার্ডি এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। কাহিনীর পটভূমি ইংলণ্ডের কোন পার্বত্য অঞ্চলের উপত্যকা ও গ্রাম। প্রকৃতির কোলে অনাড়ম্বর গ্রামীণ পরিবেশে লালিত-পালিত সরলা বালিকা টেস্‌কে ঘটনাচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া বহুতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংঘাতের মধ্য দিয়া কত ব্যথা ও বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহার করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় মানুষের দুঃখে দ্রব হইয়া উঠে। আবার শক্তিমান্ লেখক যখন বহুতর বিপর্যয় এবং বর্বরতার দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মানবাত্মার অম্লান মহিমার দীপটি তুলিয়া ধরেন তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চিত্ত এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক প্রেরণা উপলব্ধি না করিয়া পারে না।

হার্ডি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য না নীতিমূলক, না আক্রমণাত্মক··· ইহা দৃশ্যাংশে প্রতিচ্ছবিমূলক এবং ভাবনাংশে প্রতীতি অপেক্ষা ভাব ও ধারণায় পরিপূর্ণ···।" কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 'বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ' জন-মানসের সহিত গভীরভাবে পরিচিত তথা উহাদের সমস্যাবলীর প্রতি প্রখরভাবে সংবেদনশীল মনীষী লেখক তাঁহার কাহিনীতে এবং 'ভাব ও ধারণাগুলির' মধ্যে হয়তো তাঁহার অজান্তেই একটি সুসমঞ্জস লক্ষ্য এবং নীতিকে অভিব্যঞ্জিত করিয়াছেন, যাহা ভারতীয় মনের নিকট বিশেষভাবে সমাদরণীয়। মানুষের অন্তরে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার-নিরপেক্ষ যে পবিত্রতা-প্রেম ও সাধুতার একটি সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে লেখক যেন উহারই প্রতি বার বার অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনিকগণের ন্যায় গ্রন্থকার জীবনের কতকগুলি মৌলিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজিতেছেন—

"সংসারের রীতিই এই। সুবিবেচিত পরিকল্পনা যখন কুবুদ্ধিবশে ভ্রান্তপথে চালিত হয়, তখন যাহাকে ডাকি সে সাড়া দেয় না। যখন হৃদয় ভালবাসিবার জন্য বিকশিত-দল পদ্মের মত উন্মুখ হইয়া থাকে, তখন ভালবাসার পাত্র জুটে না। যখন একটুমাত্র সচেতন করিয়া দিলে, অনেক ভুল ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত, তখন নির্দয়া প্রকৃতি তাঁহারই সৃষ্ট জীবের প্রতি সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন না। অসহায় মানুষ যখন অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া মরে, তখন তিনি নির্বাক হইয়া তাহার ঐ ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করেন। *** তারপর জীবনব্যাপী লুকাচুরি খেলার শেষে যখন জীবনে ট্র্যাজেডির মেঘান্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখনই তিনি অবোধ জীবের চৈতন্যোৎপাদন করেন। মানবসভ্যতা যখন উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিবে, তখন কি মানুষের জীবনে অন্ধ নিয়তির এই নিষ্ঠুর লীলার অবসান হইবে? তখন কি সে এমন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইবে, যখন সংসারে অন্যায়-অবিচার বলিয়া কিছু থাকিবে না? এমন নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন শুধু অসম্ভব নয়, বাতুলতাও বটে।" (পৃঃ ৪৮-৪৯)

আগামী দিনের মানুষ তাহার ধর্মবোধে খ্রীষ্টধর্মের অযৌক্তিক পাপ-বাদ হইতে ক্রমশঃই যে সরিয়া আসিবে লেখক তাহার আভাস দিতেছেন—

"লোকটি লিখিল—'শাস্তির দেবতা ঘুমায়ো না তুমি' (THY DAMNATION, SLUMBERETH NOT, 2 Pet. ii 3) শান্তস্নিগ্ধ প্রান্তর, ধূসর বনানী এবং দিগন্তের নীলিমা—এই তিনে মিলিয়া যে বিস্তীর্ণ পটভূমি রচনা করিয়াছিল, তাহার উপর রক্তবর্ণ রেখাগুলি নক্ষত্রের মত দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, কথাগুলি যেন সদম্ভে আত্মঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিন মানব-সমাজে উহাদের যথেষ্ট মূল্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান আর আগের মত নাই। তাই হয়ত কেহ কেহ ঐ কথাগুলি দেখিয়া কারুণ্য ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিতসুরে বলিবে 'হায় ধর্মতত্ত্ব, তোমাদের দিন ত অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। আর কেন?" (পৃঃ ১০৭)

পুঁথির কথা তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া এবং ভাবহীন গতানুগতিক লোকাচার যন্ত্রের ন্যায় মানিয়া যথার্থ ধার্মিকতা গড়িয়া ওঠে না। ইহা বরং নাস্তিকতা। জনৈক ধর্মযাজকের সম্বন্ধে হার্ডি বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না—

"টেসের সম্ভ্রমব্যঞ্জক কথাবার্তা, অদ্ভুত মধুর কণ্ঠস্বর দুই একত্র হইয়া তাঁহার মহত্তর বৃত্তিগুলির তন্ত্রীতে—মহত্তর না বলিয়া বলা ভাল যে, সত্যকার নাস্তিকতার সহিত যান্ত্রিক বিশ্বাস সংযোজিত করিবার দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রয়াসের পর তখনও যে বৃত্তিগুলি বাঁচিয়াছিল—আঘাত করিল। ভদ্র-লোকের মধ্যে মানুষ ও ধর্মযাজকের সংগ্রাম বাধিল এবং পরিণামে মানুষই জয়ী হইল।" (পৃঃ ১৩২)

টমাস হার্ডির এই বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ-কার্যে সাহিত্যিক দম্পতি শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি ও শ্রীমতী শোভনা মাইতি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আত্ম-প্রকাশের অপেক্ষায় সাগ্রহে চাহিয়া রহিলাম।

—'অনিরুদ্ধ'

বৈদিক জীবনবাদ—ডক্টর মতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি, প্রণীত; শিব-সাহিত্যকুটীর, ৩০।৬ সি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীযুক্তা প্রীতিরানী দাশ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা - ৬৫, মূল্য—১৲ টাকা।

গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু বক্তা' হিসাবে, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩ তারিখে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সংগ্রথন এই পুস্তিকাখানি। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য দেশে বেদবিদ্যার প্রচার। বেদ-পন্থা অনুসরণ করিলেই ভারতবর্ষ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে ইহা তিনি বিশ্বাস করেন, আমরাও করি। গ্রন্থকারের কয়েকটি মত আমাদের একদেশী মনে হইল। তিনি বলিতেছেন—

'যে ভীরু পলায়নপর বৈরাগ্য একদিন আমাদের দেশে ধর্মের পরম-প্রকাশ বলে সম্মানলাভ করেছিল, সেই আত্মঘাতী আত্ম-নিপীড়ন বৈদিকযুগে ধর্মের নামে জয়গৌরব পায়নি। (পৃঃ ১।২)

'ধর্ম তাঁদের (বৈদিক ঋষিদের) বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত করায় নি! পার্থিব যা কিছু তাকে নস্যাৎ করে তাঁরা কেবল পারলৌকিক চিন্তায় বিহ্বল হন নি'। (পৃঃ ১৪।১৫)

'এই কর্মবাদকে বৈরাগ্যের উত্তর হিসাবেই দেখতে চেয়েছি। একদিন এই দুর্ভাগ্যদেশে বৈরাগ্য-সাধনাই মুক্তির উপায় বলে মানুষ স্থির করেছিল। সংসার মায়াময়, এখানে সবই তুচ্ছ, সবই হেয়, সবই ঘৃণ্য। এই মনোভাব আমাদিগকে ইহলোকবিমুখ এবং পরলোকপ্রেমিক করে তুলেছিল। এই পলায়নপর বৈরাগ্যবোধ আমাদের দেশের মহৎ সর্বনাশ করেছিল এবং এখনও করছে। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আমাদের গৌরবময় (বৈদিক) সংস্কৃতি এই মৃত্যুর সঙ্গীত শোনায়নি—আমাদের (ঋষি) পিতামহেরা জলদ-নির্ঘোষে জীবনের জয়গাথা গেয়েছেন এবং কর্মের মহিমা প্রকাশ করেছেন।' (পৃঃ ৩৭)

লেখক, পৃঃ ১১, ৩১, ৪০এ যথাক্রমে শিবসংকল্পোপনিষৎ ও ঈশোপনিষদের মন্ত্রবিষয় প্রমাণার্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা নিম্নলিখিত উপনিষদ্-মন্ত্রগুলি তাঁহার উপর্যুল্লিখিত মতগুলির সহিত আলোচনা করিবার জন্য উদ্ধৃত করিলাম। উপনিষদ্ বেদই। যে বেদ অবলম্বন করিয়া তিনি উপরের মতগুলি প্রকাশ করিয়াছেন সেই বেদ হইতেই তাঁহার মতের বিরোধী ভাবও পাওয়া যাইবে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের ১ম খণ্ডে ১ম হইতে ৩য় মন্ত্রে দেখিতে পাই, 'ভগবন্, আপনি আমাকে অধ্যয়ন করান' এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়াছ আমার নিকট প্রকাশ কর—আমি তাহার পরবর্তী জ্ঞান উপদেশ করিব। তাহাতে নারদ ঋগ্বেদ ইত্যাদি ২২টি অধীত শাস্ত্রের জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে ভগবন্, এত জানিয়াও আমি শব্দার্থমাত্রই জানি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারি নাই। আপনার সদৃশ ব্যক্তিদের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, আত্মজ্ঞানীরা শোকের পারে গমন করেন; আর আমি শোকসম্পন্ন। হে ভগবন্, আমায় শোক-সমুদ্রের পারে লইয়া যান।' সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ তৎসমস্ত কেবল নামমাত্র।' ইহার পর সনৎকুমার 'নাম', 'বাক্', 'মনঃ', 'সঙ্কল্প', 'চিত্ত', 'ধ্যান', 'বিজ্ঞান', 'বল', 'অন্ন', 'অপ্', 'তেজঃ', 'আকাশ', 'স্মর', 'আশা', 'প্রাণ', ইত্যাদির উপাসনা দেখাইয়া ২৩ খণ্ডে ১ম মন্ত্রে বলিতেছেন—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্ ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।' পুনরায় ২৪ খণ্ডে ১ম মন্ত্রে বলিতেছেন 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ অথ যদ্ অল্পং তন্মর্ত্যং'—ইহার অর্থ—যাহা ভূমা (মহত্তম) তাহাই সুখ, অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে) সুখ নাই, ভূমাই সুখস্বরূপ, ভূমাই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য।

এই অমৃতত্ব-লাভ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষি আশ্বলায়নকে বলিতেছেন। (কৈবল্যোপনিষৎ প্রথম খণ্ড, ২য় মন্ত্র) 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'। ইহার অর্থ—কর্মদ্বারা, পুত্র বা ধনের দ্বারা নয় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ (মহর্ষিগণ) করিয়াছেন। নারায়ণো-পনিষদে (১।১১।১৪) অথবা (২।১২।৩), ঐ একই মন্ত্র বলা হইয়াছে।

এই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বিষয়ে জাবালোপনিষৎ চতুর্থ খণ্ডে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছু মহারাজ জনককে বলিতেছেন—

ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি-বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

ইহার অর্থ—ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া (গুরুর আজ্ঞায় দারপরিগ্রহ করিয়া) গৃহী হইবে, (শাস্ত্র-সম্মত) গার্হস্থ্যাশ্রম সমাপনান্তে বাণপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে (যথাবিধি) বাণপ্রস্থাশ্রমের ধর্মপালন করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস গ্রহণ) করিবে। যদি (পূর্বেই বৈরাগ্য-বশতঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। গার্হস্থ্য বা বাণপ্রস্থ (যে কোনও) আশ্রম হইতেও (প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে)। আবার যদি (কেহ) (ব্রহ্মচর্যব্রতে) ব্রতী হইয়া অথবা ব্রতী না হইয়া (ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠব্রত সমাপনান্তে) স্নাতক হইয়া অথবা (সমাপন না করায়) অস্নাতক হইয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত অগ্নির উপাসনা এবং আশ্রম সমাপনান্তে অগ্নি নির্বাপিত (করিবার জন্য অপেক্ষা) না করিয়া (যদি বৈরাগ্যসম্পন্ন হয় তাহা হইলে) সেই দিনই প্রব্রজ্যা করিবে।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজে যে প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণের ২য় মন্ত্রে আছে।

গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠায় ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'জ্ঞানবাদীরা কষ্ট-কল্পিত অন্য যে অর্থ করেন, সেই সাম্প্রদায়িক অর্থ নিলে ভুল বিচার হবেই।' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

"নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে……নরত্বাভিমানী তোমার পক্ষে উক্ত প্রকার কর্মানুষ্ঠান সহকারে জীবন-ধারণ ভিন্ন এমন আর কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা তুমি অশুভ কর্মের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার।"

এই ভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য বলিয়াছেন, 'এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথে-তরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ।' অর্থাৎ যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী, তাহারা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের (বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এবং আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া (অনুভূতি দ্বারা) আত্মার রক্ষা করিবে। আত্মজ্ঞানের অনধিকারী (বলিয়া) আত্মানুভূতি বিষয়ে অক্ষম যাহারা তাহাদের জন্য এই মন্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে। এষণাত্রয়সন্ন্যাস যে প্রয়োজন তাহা আচার্য পূর্ববর্তী ঈশাবাস্যম্ ইত্যাদি মন্ত্র-ভাষ্যে প্রমাণ করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ আচার্যের উল্লিখিত মন্তব্যকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার 'জ্ঞানবাদীরা কষ্টকল্পিত সাম্প্র-দায়িক অর্থ' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। আত্ম-জ্ঞানের জন্য সর্বত্যাগ করিবার কথা উপনিষদের মন্ত্র হইতে আমরা উপরে দেখাইয়াছি। এইরূপ কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং অবতার ও আচার্যকল্প পুরুষদের উপদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সকল

কথা শুধু এদেশের শাস্ত্রাদিতে যে পাওয়া যায় তাহা নয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে অনেক পাওয়া যায়। 'কাজেই জ্ঞানলাভেচ্ছুদের কথা কষ্টকল্পিত নয়, সাম্প্রদায়িকও নয়।

উপরে আচার্য শঙ্করের মত উপনিষদের আলোচ্য মন্ত্র-বিষয়ে উল্লেখ করিলাম। কারণ উপনিষদেই আছে 'আচার্যাদেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।৯।৩) অর্থাৎ আচার্য হইতে বিজ্ঞাত বিদ্যাই অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। গ্রন্থকার তাঁহার আলোচ্য মন্তব্য এবং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সে সকলের কোন্‌টি কোন্ আচার্যের বৈদিক মন্ত্র ভাষ্য অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে জানিতে পারিলে আলোচনার সুবিধা হইত।

পরিশেষে আমাদের মত এই যে সার্বভৌমিক ত্যাগসম্পন্ন উদার বেদ মনুষ্যের অসংখ্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টার পূর্ণতা সাধনের জন্য অসংখ্য প্রকারের উপদেশ দিয়াছেন ইহার প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ সার্থকতা আছে—কোনটি অপরটির বিরোধী নয়। সেইজন্য বেদকে অবলম্বন করিয়া 'কর্ম' বা 'জ্ঞানের' 'গার্হস্থ্য' বা 'সন্ন্যাসের' তুলনামূলক সমালোচনা করা সম্ভব নয়।

—স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

ভারত-শাসনতন্ত্রসার—'অভিজ্ঞ শিক্ষক' কর্তৃক প্রণীত; 'প্রকাশিকা লিমিটেড' কর্তৃক ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৮৮+৪; মূল্য আট আনা।

প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে আলোচ্য পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। লেখক একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। পুস্তিকাটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকতা প্রভৃতি রাজনীতিশাস্ত্রের অতি আবশ্যকীয় কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী আটটি অধ্যায়ে ও তিনটি পরিশিষ্টের মাধ্যমে ভারত শাসনব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল, ভাষা সুষ্ঠু ও রচনাশৈলী প্রশংসনীয়। সংক্ষেপে ইহা একটি সুখপাঠ্য রচনা বলা চলে।

কিন্তু অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততার দরুণ পুস্তিকাখানি স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও অতি আবশ্যকীয় তথ্যাদির স্থান আছে। *পুস্তিকাটিতে ভারতীয় সংবিধানের একটি* অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—"নাগরিকের মৌলিক অধিকার"—আদৌ আলোচিত হয় নাই বলা চলে। "রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশনামা" শীর্ষক অধ্যায়ের উল্লেখ মাত্রও নাই। নাগরিকের সাধারণ অধিকার ও কর্তব্য যে অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, সেখানেও জ্ঞানার্থীর সুবিধার্থে কোনওপ্রকার ব্যাখ্যা সংযোজিত নাই। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র একথা উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্র কি—তাহার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—কোথাও দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ ও প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত রাজ্যগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে অথচ তাহাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও মর্যাদার পার্থক্য আলোচিত হয় নাই। এই আলোচনা ব্যতীত উক্ত রাজ্যগুলির শ্রেণী-বিভাগের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। ভারতীয় সংবিধানের অবতরণিকা পুস্তিকার ভূমিকার পূর্বে কেন দেওয়া হইল বোঝা কঠিন। অবতরণিকাটির আলোচনা পুস্তিকাটির প্রথম অধ্যায়ে হওয়া উচিত ছিল। অবতরণিকায় ভারত-রাষ্ট্রকে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" বলা হইয়াছে। "প্রজাতন্ত্রে"র পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ব্যতীত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বোঝা দুষ্কর। মোটের উপর অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত একটি ব্যাখ্যার অভাবে পুস্তিকাটির অঙ্গহানি

ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে ছাপার ভুল ও মারাত্মক বানান ভুলও দৃষ্ট হয়।

এই সকল ত্রুটীবিচ্যুতি সত্ত্বেও লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সর্ব সাধারণ, যাঁহাদের পক্ষে সুবৃহৎ মূল সংবিধান পাঠ করা ও আয়ত্ত করা সম্ভব নহে তাঁহারা এই পুস্তিকাপাঠে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করিয়া উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত (অধ্যাপিকা)

মানসোল্লাস—আচার্য সুরেশ্বর প্রণীত; অনুবাদক—স্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরী। প্রকাশক—বসুমতী-সাহিত্যমন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা—৸৴৹+১১৮; মূল্য এক টাকা।

ভগবান শংকরাচার্য বিরচিত সর্বজন-পরিচিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র গুরুরূপী ব্রহ্মোপাসনার ও সসীমের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিবার একটি অনবদ্য পন্থা। শংকরাচার্য-শিষ্য শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য উক্ত, অনুক্ত, দ্বিরুক্ত প্রভৃতি বিচার দ্বারা এই স্তোত্রের উপর 'মানসোল্লাস' শিরোনামায় অতি গম্ভীর ও মনোজ্ঞ বার্তিক রচনা করেন। এই বার্তিক অনুষ্টুপ্ ছন্দের মাধ্যমে ৬৭টি শ্লোকে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; প্রতিটি শ্লোক যেন এক একটি উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড আর সমগ্র বার্তিকটি বেদান্তরসিক আত্মজ্ঞান-পিপাসুর কণ্ঠাভরণযোগ্য মহামূল্য মণিরত্নমালা। অনুবাদ মূলানুগ ও সাবলীল হওয়ায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহজবোধ্য হইয়াছে। প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ মহোদয়ের বহুস্থলে টিপ্পনী-সংযোজনা ও পরলোকগত দার্শনিকপ্রবর মহেন্দ্রনাথ সরকারের প্রস্তাবনা আলোচ্য পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন মাতৃভবন—৭এ, শ্রীমোহন লেনে (কলিকাতা—২৬) স্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রীভগবানের কৃপায় যোগ্যতর কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পঞ্চম বর্ষ অতিবাহিত করিল। ১৯৫০ সালে পরলোকগত দাতা রামপ্রসাদ রায় তাঁহার বসতবাটী এবং গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট ও শেয়ার ইত্যাদিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে মাতৃভবন-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দান করেন; তাঁহারই উপরোক্ত ঠিকানার গৃহে ১০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগ সমন্বিত হইয়া এই জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এখানে শয্যা-সংখ্যা ১৬, ইহার অর্ধেক সমাজের সর্বস্তরের দরিদ্র রোগিণীগণের বিনা-খরচে সেবার জন্য সংরক্ষিত। উপযুক্ত কক্ষ ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অবৈতনিক শয্যাবৃদ্ধি (free bed) সম্ভব হইতেছে না। দুই জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাতৃ-ভবনের সেবায় তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন। প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কার্যই স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শে অনুপ্রাণিতা ত্যাগব্রতধারিণী মহিলা কর্মীদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ—কলিকাতা পৌর সভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-সেবা বোর্ড, নিউ দিল্লী আলোচ্য বর্ষে যথাক্রমে ৪০০০৲, ১৫০০০৲ এবং ১৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মাতৃভবনে জাত প্রতিটি শিশুকে অতি যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়া তাহাদের মাতৃগণকে প্রাথমিক শিশুপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি

শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে শিশু-জন্মগ্রহণের পূর্বে চিকিৎসিত রোগিণীর সংখ্যা ৫৪৬৬ (তন্মধ্যে নূতন ১২৮০), অন্তর্বিভাগে প্রসূতি ছিলেন ৮৯৬ জন (তন্মধ্যে বিনা-খরচে ৪৯৯ জন)। মাতৃভবনের কার্যাবলীর উপদেষ্টা ও পরিদর্শক স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগে প্রতিষ্ঠানটির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

প্রচার—বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একটি প্রচার-সফরে বহির্গত হন। তাঁহার পরিভ্রমণের এলাকা ছিল উত্তর প্রদেশ, ওড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বজনীন বাণী ছিল তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয়বস্তু। কয়েকটি স্থানে (ভুবনেশ্বর, মেদিনীপুর, কলিকাতা) তিনি কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী-সভাতে বিদ্যার্থিজীবনের আদর্শ এবং শরীর ও মনের সুসমঞ্জস গঠনের প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণমঠে এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনি ভগবান তথাগতের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন। তেজস্বী-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদারচেতা সদাপ্রফুল্ল প্রাচীন সন্ন্যাসীর পবিত্রসঙ্গ এবং উপদেশ সকল স্থানেই বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। সর্বসমেত তিনি কুড়িটি বক্তৃতা দেন।

স্বামী পূর্ণানন্দ গত ৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল) রাণীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে দুই সহস্র নরনারীর একটি সম্মেলনে বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্য-যুগের মানব-কল্যাণকারী মাতৃসাধনা ও শ্রীমা সারদার অবদান সম্পর্কে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। পরের দিন তিনি কুলটিতে 'মনুষ্যজীবনে ধর্মের প্রয়োজন' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। উক্ত সন্ন্যাসি-প্রচারক ১০ই বৈশাখ খড়্গপুর দুর্গামন্দিরে একটি এবং ১৬ই হইতে ২৯শে বৈশাখ হুগলী জেলার বিরাটী ও ছাপ্রা গ্রামে ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ এই চারদিন কুচবিহার শহরে তাঁহার চারটি ভাষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিষয়বস্তু যথাক্রমে—'শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনা', 'বিশ্বপ্রেমী বিবেকানন্দ', 'মনুষ্যজীবনে মায়ের অবদান' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

গত ১৩ই ফাল্গুন ১৩৬১ (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বেলুড়মঠের অন্যতম ছায়চিত্র-প্রচারক স্বামী প্রণবাত্মানন্দ পূর্বপাকিস্তানের নানাস্থানে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ-সংগঠন বিষয়ে ৫৪টি (৪৭টি ছায়াচিত্র যোগে) বক্তৃতা দিয়াছেন। ঢাকা, মৈমনসিং, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং দিনাজপুর —এই কয়টি জেলাতেই তিনি সফর করিয়াছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণই আগ্রহসহকারে তাঁহার সভাতে যোগদান করিতেন। কোন কোন সভায় লোকসমাগম হইয়াছিল পাঁচ হাজারেরও উপর।

স্বামী গঙ্গানন্দজীর দেহত্যাগ—বেলুড়-মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী গঙ্গানন্দজী (গঙ্গারাম মহারাজ) গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন, ১৯৫৫) বিষ্ণুপুর সর্বমঙ্গলা মৃন্ময়ীক্ষেত্রে লালবাঁধের ঘাটে জলমগ্ন অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জননী সারদাদেবী তাঁহাদের জীবিতকালে এই পবিত্র দেবক্ষেত্র দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।) দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেকার ২ দিন গঙ্গানন্দজী জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে শেষ তীর্থযাত্রা করিয়া আসেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর হইয়াছিল।

স্বামী গঙ্গানন্দ খ্রীঃ ১৯০২ সালে কাশীতে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন

এবং তপোনিষ্ঠার জন্য পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

গঙ্গারাম মহারাজের সুদীর্ঘ সাধুজীবন প্রায় পরিব্রজ্যা ও তপস্যাতেই কাটিলেও মাঝে মাঝে জনগণের মধ্যে ধর্মভাব ও সামাজিক সংহতি প্রচারের জন্য তাঁহার নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যমও উল্লেখযোগ্য। বহু শাস্ত্রে বিশেষতঃ যোগশাস্ত্রের তত্ত্ব ও অভ্যাস উভয় দিকেই তাঁহার ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল। হিন্দীতে তিনি কয়েকখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন।

পরমদেবতার শাশ্বতসত্যে ঐকাত্ম্যপ্রাপ্ত নির্মৎসর সন্ন্যাসীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্পণ করিলাম।

ভগবান বুদ্ধ এবং আচার্যদ্বয়ের স্মরণে— মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শংকর ও রামানুজ জয়ন্তী বিগত ১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল, '৫৫) মঙ্গলবার শুভ পঞ্চমী তিথিতে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই বৈশাখ রবিবার। শংকরের দিগ্বিজয়, তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী, তাঁহার দর্শন ও ধর্মসংস্কার আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য। শ্রীডি রামস্বামী আয়েঙ্গার শ্রীরামানুজ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রসঙ্গে রামানুজের নির্দেশিত পন্থায় শাস্ত্র-গ্রন্থ পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, একই সময়ে একই স্থানে দুই মহান্ ধর্মাচার্যের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ তাঁহাদের পারস্পরিক সান্নিধ্যেরই সূচক।

বিগত ২১শে বৈশাখ (৬ই মে) বুদ্ধপূর্ণিমায় বুদ্ধজয়ন্তী পালন করিবার পর ২৩শে বৈশাখ সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। আশ্রমের সুবৃহৎ কক্ষে পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত ভগবান্ বুদ্ধের মনোহর ধাতব মূর্তির সমক্ষে বহুসংখ্যক ভক্ত সমবেত হন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রী টি এম্ পি মহাদেবন্ বুদ্ধদেবের জীবনানুশীলনের গভীরতা ও তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠান— শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের (৯৯, ল্যান্সডাউন রোড্, কলিকাতা) দুইটি নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন, ১৯৫৫) এবং ৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) উক্ত প্রতিষ্ঠানে দুইটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গৃহদ্বয়ের একটি সেবিকাগণের জন্য, অপরটি ত্যাগী কর্মী ও চিকিৎসক প্রভৃতির জন্য। প্রথমদিন নূতন উপাসনাগৃহে আনুষ্ঠানিক পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করেন স্বামী ওঁকারানন্দজী। বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আগমনে অনুষ্ঠান খুব প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়দিন আমন্ত্রিত বন্ধু ও অনেক বিশিষ্ট নাগরিকের উপস্থিতিতে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গৃহগুলির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রসূতিসদনের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মসচিব স্বামী দয়ানন্দজী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী পাঠ করিলে রাজ্যপাল এই জনহিতকর সেবাকার্যের প্রশংসা করিয়া ভাষণ দেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপাল এবং সমবেত অতিথিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) **শিক্ষাপ্রসঙ্গ**—স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা—১৬২ ; মূল্য—১॥০ আনা। দশটি অধ্যায়ে স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ক উক্তি ও আলোচনাগুলির সুসম্বদ্ধ সংকলন। প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়।

(২) Laghu Vakya-Vritti পৃষ্ঠা—৪৪ ; মূল্য ৸০ আনা। আচার্য শঙ্করের উক্ত নামীয় প্রকরণ-গ্রন্থের মূল, সংস্কৃত টীকা এবং ইংরেজী অনুবাদ। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলমোড়া।

বিবিধ সংবাদ

মণিপুরে অনুষ্ঠান—ইম্ফল (মণিপুর) স্থানীয় মহিলা-সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই জানুয়ারী বাবুপাড়া থিয়েটার হলে এবং ছাত্রদের উদ্যোগে D. M. College-এ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাবুপাড়া থিয়েটার হলে এক সভার অধিবেশন হয়। ছাত্রছাত্রীরা রচনা, আবৃত্তি (বাংলা, মণিপুরী ও ইংরেজী) ও ভজন সংগীত, এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা দ্বারা ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ-সমিতির উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে ২৮শে মে বাবুপাড়া পূজা-মন্দিরে একটি বিরাট জনসভা আহূত হয়। মাননীয় শ্রীব্রিজ নারায়ণ, (Sri Brij Narain) জুডিসিয়েল কমিশনার, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আবৃত্তি, গান এবং হিন্দী, ইংরেজী ও মণিপুরী ভাষায় বক্তৃতা হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচনা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মণিপুরী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মণিপুরের কৃতী শিল্পী শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিত্রপ্রদর্শনীর নিমিত্ত শ্রীশ্রীমায়ের ত্রিশখানি জীবনালেখ্য শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য প্রস্তুত করেন। এই মনোরম ছবিগুলির জন্য শিলং মিশন হইতে শ্রীসানু শর্মাকে একটি মেডেল দেওয়া হয়।

কয়েকটি স্থানে উৎসবের সংবাদ—নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে :—

(১) জয়নগর-মজিলপুর (২৪ পরগণা); উৎসব তারিখ—১২ই ও ২২শে ফাল্গুন ১৩৬১ বক্তা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (বেলুড় মঠ) ও শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ।

(২) ইছাপুর (২৪ পরগণা) প্রবুদ্ধভারত-সঙ্ঘ; বক্তা—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীঅমর নন্দী (হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকা) ও স্বামী অনিকেতানন্দ (বেলুড় মঠ)।

(৩) লাহেরিয়া সরাই (দ্বারভাঙ্গা); উৎসব-কাল—১২ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬১; বক্তা—অধ্যাপক ডক্টর বাগ্‌চী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর হৃষীকেশ গোস্বামী এবং ডাঃ রণজিত সান্যাল।

(৪) ধূম (চট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতি; উৎসব তারিখ—২০শে চৈত্র ১৩৬১; বক্তা—স্বামী সত্যকামানন্দ (বেলুড় মঠ), স্বামী শর্মানন্দ (বেলুড় মঠ)।

(৫) বর্ধমান; উৎসবকাল—২৫শে চৈত্র হইতে ২৭শে চৈত্র; বক্তা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডক্টর শ্রীপ্রবোধ বাগ্‌চী, পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীমতী এটা ঘোষ, ডক্টর শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক বিজয় রাহা।

(৬) সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ; উৎসবকাল—২৪শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র; বক্তা—বেলুড় মঠের স্বামী ওঁকারানন্দজী, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী মনীষানন্দ, স্বামী শান্তিনাথানন্দ; শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেদশাস্ত্রী, শ্রীমতী চারুলীলা দেবী, শ্রীমতী বেলারাণী দে ও শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তী।

(৭) কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম; উৎসব তারিখ—৩রা বৈশাখ; বক্তা—অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়নাথ চৌধুরী ও স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (বেলুড় মঠ)।

(৮) তারকেশ্বর; উৎসব তারিখ—১৭ই বৈশাখ; বক্তা—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রেম-রূপানন্দ (বেলুড় মঠ); ডাঃ রাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীতুলসী-দাস ঘোষ।

উদ্বোধন

মুক্তের স্বভাব

সর্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সমস্তবাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্বত্র রাজতে॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্ণাতি মুক্তঃ সর্বত্র নীরসঃ॥
সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১৭।১১-১৪

[যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন সেই মুক্তপুরুষের অন্তরের অনুভূতি এবং আচারব্যবহারের দিগ্‌দর্শন করা সহজ কথা নহে। সংসারের অজস্র নরনারী যে ভাবে চলেন ফিরেন, চিন্তা করেন তিনি অবশ্যই সেরূপ করেন না। তাঁহার শরীর-মনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পৃথক্]।

যিনি মুক্ত তিনি সকল অবস্থাতেই আত্ম-সত্যে অবস্থান করেন, তাঁহার হৃদয় সর্বদাই নির্মল, যেখানেই তিনি যান ও থাকেন কোন বন্ধনই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। সকল বাসনা-কামনা হইতে তিনি যে চিরকালের মতো নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। তাই তো তিনি 'মুক্ত'।

দেখা, শোনা, স্পর্শ ও ঘ্রাণ করা, খাওয়া, (কোন কিছু) নেওয়া, বলা, চলা সবই হয়তো তিনি করিতেছেন কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-প্রদীপ্ত মহান্ চিত্তে কোন কাজেরই পিছনে অহঙ্কার-প্রসূত কর্তৃত্ববুদ্ধি নাই, চেষ্টা এবং অচেষ্টা এই দুইয়ের কোনটাই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। এই জন্যই তিনি 'মুক্ত'।

'মুক্ত' কাহারও নিন্দা করেন না, স্তুতিবাদও করেন না। না হন তিনি হর্ষে বিহ্বল, না ক্রোধে আত্মহারা। দান করিবার প্রয়োজন তাঁহার ফুরাইয়াছে, গ্রহণ করিবার আগ্রহও তাঁহার নাই। সর্বক্ষেত্রেই তিনি আসক্তিশূন্য।

যিনি 'মুক্ত' তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয়তে সমান বুদ্ধি। বহুজনকাম্যা অনুরাগবতী পরমাসুন্দরী রমণীকে দেখিয়াই বা কি, আর সর্বসন্ত্রাসকর মৃত্যু সম্মুখে আসিলেই বা কি—আত্মসত্যে অবস্থিত তাঁহার অক্ষোভ্য প্রশান্ত অন্তঃকরণে একটুও বিহ্বলতা আসিবে না।

কথাপ্রসঙ্গে

সপ্তম দ্বারে

শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত উপমা—

জনৈক রাজদর্শনপ্রয়াসী আর একজন সঙ্গীর সহিত প্রাসাদের প্রথম দ্বারে উপস্থিত। সঙ্গীটির রাজবাড়ীর সব জানাশোনা, রাজাকেও দেখিয়াছে কিন্তু সে নিজে রাজৈশ্বর্যের কিছুই জানে না। তোরণে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সুবেশ, সুদর্শন প্রহরীকে দেখিয়াই সে মনে করিল, ইনিই রাজা। ভূমিতে আনত হইয়া করজোড়ে প্রসাদ-ভিক্ষা করিতে উদ্যত। সঙ্গী হাসিয়া কহিল, ইনি রাজা নন্, আরও ভিতরে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারে যে দণ্ডায়মান তাহার সাজসজ্জা আরও পরিপাটি। আগন্তুক ভাবিল ইনিই নিশ্চিত রাজা। সঙ্গী আবার ভুল ভাঙিয়া দিল, না ইনিও নন্, আরও চলিতে হইবে। ক্রমে তৃতীয় দ্বার, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দ্বার; প্রত্যেক দ্বারে ঐশ্বর্যের প্রকাশ উত্তরোত্তর অধিক, দৌবারিকের পোষাকপরিচ্ছদ-আকৃতিও আড়ম্বরপূর্ণ। আগন্তুকের বিস্ময় বাড়িয়াই চলিতেছে। কোথায় রাজা? এত যে বিভব, এখানেও তিনি নাই? অবশেষে সপ্তম দ্বার ছাড়াইয়া রাজসিংহাসনের স্থান। রাজা বসিয়া আছেন স্বকীয় মহিমায়। এবার আর রাজদর্শনার্থীর মুখে কথা নাই, সকল জিজ্ঞাসা মুহূর্তেই মিটিয়া গিয়াছে, সন্দেহের অবসান হইয়াছে। রাজা যে কে সঙ্গীকে বলিয়া দিতে হয় নাই। রাজা আর সাত দরজার দৌবারিকগণে কত পার্থক্য তাহা রাজাকে দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তেমনি ভগবানকে যখন পাই নাই তখন কত সম্মুখাগতকেই চরম ও পরম বলিয়া ভ্রম করিয়াছি, তাঁহার বিষয়ে কত জল্পনা-কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু ভগবানকে যখন দর্শন করিলাম, দেখিলাম তাঁহাতে আর আগে-দেখা আকর্ষণগুলিতে কী বিপুল ব্যবধান!

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ দরজায় বসিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—'যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এই দেহে রামকৃষ্ণ'? সপ্তম দ্বারে তো নয়। তাহা হইলে ঘোষণা করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? যদি রাম ও কৃষ্ণের যুগ্মসত্তাই তাঁহাতে থাকে তাহা হইলে লোকের চোখে এত ধোকা লাগিল কি করিয়া? তাহারা বুঝিবে না বলিয়াই তো লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে নিজের মহিমা নিজের মুখেই প্রচার করিতে হইল! অতএব সপ্তম দ্বারে আসন পাতেন নাই। তবে কি ষষ্ঠ দ্বারে? পঞ্চম-চতুর্থ-তৃতীয় দ্বারে? বোধ করি কোন দ্বারেই নয়। সদর দেউড়ির তকমা-আঁটা, দ্বারবান্‌কে দেখিয়াও লোকে যেটুকু সমীহ করে শ্রীরামকৃষ্ণের কখনো কখনো সেটুকুও জুটে নাই। কলিকাতার বাবু রাসমণির বাগানে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহাকেই মালী ভাবিয়া ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তিনি বাবুর আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। মথুরের মোসাহেবের বুটের লাথিও খাইতে হইয়াছিল। যদি রাজপ্রাসাদের কোন একটি দ্বারেই তাঁহার অধিকার, তাহা হইলে সেই দাম্ভিক ধনী-প্রসাদ-লিপ্সু একটুও বুঝিতে পারিল না কেন, রাজগৌরবকে সে অপমান করিতে বসিয়াছে? অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ স্থান-হীন, নিদর্শন-হীন, পরিচয়-হীন একান্তই জনতার সাধারণ মানুষ। তবু তাঁহাকে বলি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার নিজের উপমা নিজের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল না কি?

এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি 'হাঁ' এবং 'না' দুইই। মানুষদেহধারী ঈশ্বরাবতারের কখনও বাহিরের ঐশ্বর্য থাকে, থাকিবার প্রয়োজন হয়। সে ঐশ্বর্য সপ্তম দ্বারেরই ঐশ্বর্য। জগতের অন্য কোন

ঐশ্বর্যের সহিতই উহার তুলনা হয় না। তখন কবির ভাষায়—

বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।

দেখিয়াই সমস্ত বিশ্ব চরণে লুটাইয়া পড়ে, ভাষাহীন বিস্ময়ে লক্ষ চিত্তে অনুভব জাগিয়া ওঠে—'তুমি ভগবান।' কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় নাই নদীয়ার পথে কীর্তনীয়াদলের মাঝখানে মহাভাবে নৃত্যপরায়ণ অনিন্দ্যসুন্দর যুবক নিমাইপণ্ডিত সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ নন্, দেবলোকের আলোক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাহিরের আকৃতিতেই গৌরসুন্দরের সপ্তমদ্বারবাসিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

অর্জুন যখন বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, যাহার মূল্য কোটি টাকা তাহার মাত্র একশত বা এক হাজার মুদ্রা দর দিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের চোখে নূতন চশমা পরাইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে হইল। অমনি অর্জুনের সকল বাচালতা স্তব্ধ। করযোড়ে বলিলেন,—ক্ষমা কর প্রভু, আগে বুঝি নাই তুমি কে; তোমার সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া, নিরন্তর তোমার স্নেহ-বেষ্টনে মুগ্ধ থাকিয়া ভাবিতাম, তুমি আমাদেরই মতন একজন। এখন বুঝিলাম, নরদেহে তুমিই 'অব্যয় শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতন পুরুষ।' অধ্যাত্মরামায়ণের লিপিবদ্ধ প্রমাণ—বালী এবং রাবণ উভয়েরই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তায় বিশ্বাস হইয়াছিল তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব শৌর্য দেখিয়া। এই শৌর্য তো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বারের বিভূতি নয়, একেবারে সপ্তম দ্বারের।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপর্যুক্ত ধরনের বাহিরের বিভূতিপ্রকাশ নাই বলিলেই হয়। সপ্তম দ্বারে যে তাঁহার অবস্থান বাহিরের দিক্ দিয়া ইহা বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না।

হাঁ, উপমা ব্যর্থ। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে পারি, না, সপ্তম দ্বারের উপমা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় নাই। সে দিক্ আন্তর ঐশ্বর্যের দিক্, অনন্ত ভাগবত শক্তিকে ভিতরে চাপিয়া রাখিবার দিক্। ঈশ্বরাবতারদিগের জীবনে এই আত্মসঙ্কোচেরও প্রয়োজন হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লৌকিক ব্যবহারসমূহ একজন পিতৃভক্ত রাজকুমার বা ভ্রাতৃবৎসল জ্যেষ্ঠ অগ্রজের মতো, ধর্মপত্নীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ একজন আদর্শ স্বামীর মতো। ভগবত্তার সেখানে নামগন্ধ নাই। বস্তুতঃ ভরদ্বাজাদি কয়েকজনমাত্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বাকি অনেক ঋষি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্যান্য অবতার পুরুষের জীবনেও এই আত্মগুপ্তির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা যে বিশেষ ব্রত লইয়া পৃথিবীতে আসেন উহারই সংসিদ্ধির জন্য যেমন কখনও কখনও ঐশ্বর্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তেমনি সময়ে সময়ে উহা লুকাইয়াও রাখিতে হয়। এই লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নহে। যে ভিখারী তাহার পক্ষে ভিখারী সাজা অনায়াস-সাধ্য কিন্তু যিনি সম্রাট্ তাঁহাকে অপরের কাছে ধরা না পড়িয়া ভিক্ষুকরূপে চলিতে ফিরিতে হইলে অনেক সতর্কতা, অনেক শক্তিমত্তার প্রয়োজন।

এই দিক্ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিমত্তার যেন তুলনা নাই। নিজেকে তিনি কী আশ্চর্যরূপেই না লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন! বাহিরে কোন বিভূতি নাই কিন্তু তাঁহার অন্তরলোকের ঐশ্বর্য কী বিরাট! একটি সহজ স্বাভাবিক জীবনধারার মধ্যে এত বড় আধ্যাত্মিক তেজ ও শক্তিকে মিশাইয়া রাখিতে তিনিই পারিয়াছিলেন এবং পারিয়াছিলেন বলিয়াই কি তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'অবতারবরিষ্ঠ'?

দ্বারে দ্বারে কতপ্রকৃতির মানুষ দেখিয়া চলিয়াছি। আমাদের মানুষ দেখিবার অভিযান। বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তা-আচারনিষ্ঠায় গৌরবভাজন কত মানুষ দেখিলাম,—কত জ্ঞানী গুণী, বাগ্মী, কবি,

দার্শনিক, শিল্পীও দেখিলাম,—কত মনীষী, কত নেতা, কত কর্মী চোখে পড়িল কিন্তু ভগবানের সহিত দিবারাত্র মিশিয়া-থাকা এমন সরস সরল মনের মানুষ আর দেখিয়াছি কি? সপ্তম দ্বারে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমায় দণ্ডায়মান নরদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। বাহিরের কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিও না। ভিতরের মানুষটির দিকে তাকাও—দেখ তঁহার পবিত্রতা-আত্মত্যাগ-বৈরাগ্য, তাঁহার উর্জিতা ভগবদ্ভক্তি, ভাস্বর তত্ত্বজ্ঞান, তাঁহার সহিষ্ণুতা-নিরভিমানতা-উদারতা, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা-নির্ভীকতা-দৃঢ়তা, তাঁহার অত্যদ্ভুত মানবপ্রেম। আন্তর ঐশ্বর্যের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই মহামহিম সম্রাট্। এত ভাব-সম্পদ্ অন্য কোথাও দেখি নাই। তাঁহাকে দেখিলে পূর্ব পূর্ব দেখা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। তাঁহারই উপমার কথা বার বার মনে পড়ে। রাজার কাছে আসিলে আর বলিয়া দিতে হয় না—ইনি রাজা।

ধর্ম ও মানুষ

জনৈক পত্রলেখক দুটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। (১) ধর্ম কি মানুষের জন্মগত অধিকার? (২) মানুষ হঠাৎ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া আবার নিবৃত্ত হয় কেন?

হাঁ, ধর্ম মানুষের জন্মগত অধিকার তো বটেই, বোধহয় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলা উচিত —প্রকৃতিগত অধিকার। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ রূপকচ্ছলে এই বিষয়টি চমৎকার উপন্যস্ত করিয়াছেন। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিবার পরও পূর্ণ সংহতি ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছেন না, কিসের যেন অভাব থাকিয়া যাইতেছে। চাতুর্বর্ণ্যে বিভক্ত মানুষের সংরক্ষণ, পারস্পরিক মিলন ও সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য একটি কল্যাণ-শক্তি চাই। তখন তিনি "তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মম্"—সেই শ্রেয়ের নিদান ধর্মকে সৃষ্টি করিলেন, ধর্ম—যাহা মানুষকে ধরিয়া রাখিবে,—বিশ্লেষ হইতে, বিচ্ছিন্নতা-অবসন্নতা-বিমূঢ়তা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।

ধর্মের কাজ অতএব মানুষের জীবনযাত্রার আরম্ভ হইতেই। মনুষ্যত্বের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ধর্মকে তাহার জীবন-সহচর না করিলে উপায় নাই। উক্ত উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন, "যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ"—যাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিলাম তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে 'সত্য'। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে মানুষকে সত্য-নিষ্ঠ হইতে হইবে, ইহাই ধর্মাচরণ। এই ধর্মাচরণের দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে, তাহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন পূর্ণতা উত্তরোত্তর ব্যঞ্জিত হয়, অবশেষে সে দেবতা হয়, সত্যস্বরূপ ভগবানের সত্তাকে স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে যে মানুষ সত্যের মর্যাদা রাখে না, তাহাকে আর মানুষ বলিতে পারি না। মনুষ্যত্বকে যাহা ধরিয়া রাখিবে সেই ধর্মকেই যে সে পায়ে দলিয়াছে! সে নিজের প্রকৃতিকেই আঘাত করিয়াছে, তাহার ন্যায় আত্মঘাতী আর কে?

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন (বৈশেষিক-দর্শন, ১।১।২), "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"—যাহা হইতে মানুষের অভ্যুদয় (উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম। ধর্মের কাজ মানুষের সমগ্র জীবনকে লইয়া। অপরকে বঞ্চিত না করিয়া, অন্যের অনিষ্ট না ঘটাইয়া সাংসারিক উন্নতি-বিধান ধর্মেরই প্রেরণা। আবার সংসারের ঊর্ধ্বে বিষয়বন্ধনবিমুক্ত মানুষের যে পরম শ্রেয় পারমার্থিক জীবন আছে ধর্ম তাহাও স্মরণ করাইয়া দেয়, মানুষকে ঐ শ্রেয়োলাভে উৎসাহিত করে, সহায়তা করে। মানুষ পৃথিবীর, আবার পৃথিবীর অতীত। ধর্ম দুইয়েরই পথ-প্রদর্শক, বিধায়ক।

পত্রলেখকের দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নটির সহিত সঙ্গতভাবে জড়িত। ধর্ম যদি মানুষের জন্মগত

অধিকার, তাহা হইলে মানুষ ধর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় কেন? ধর্মানুরাগে তাহার জোয়ার-ভাটা আসে কি করিয়া?

আসে তাহার বিপরীত সংস্কারের প্রাবল্যে। মানুষ যতদিন না ভগবানকে লাভ করিতেছে ততদিন মানুষের ভিতরকার পশু তো একেবারে মরে না, সুযোগ পাইলেই সে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চায়। ক্ষুদ্র স্বার্থলিপ্সা তখন বড় হইয়া পড়ে, আপাতরমণীয় বিষয়ভোগের আকর্ষণ তখন মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে। মানুষ তাহার মনুষ্যত্বকে ভুলিয়া যায়, ধর্মের মঙ্গলময় আদর্শ বিস্মৃত হয়। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিতে হইলে তাই প্রখর সতর্কতা প্রয়োজন। ধর্ম আমাদের মহৎ জন্মগত সম্পদ্ বটে কিন্তু অতি যত্নে এই সম্পদ্‌কে রক্ষা করিতে হয়। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বিদ্যার্থী বাল্যকাল হইতে শিখিত—"সত্যং বদ। ধর্মং চর।···সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন-প্রমদিতব্যম্।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ১।১১।১) বাক্যে সত্যপরায়ণ হইবে। আচরণে ধর্মকে ফুটাইয়া তুলিবে। সত্য হইতে যেন কখনো বিচ্যুত হইও না। ধর্মানুশীলনে যেন প্রমাদ না আসে, ঔদাস্য-আলস্য উপস্থিত না হয়।

ছেলেবেলায় যে সংস্কার চিত্তে বসিয়া যাইত তাহা সারাজীবন ধরিয়া পরিপুষ্ট হইত এবং ফলে ধর্মনিষ্ঠা ছিল তখনকার মানুষের চরিত্রে একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। ধর্মকে অম্লান রাখিবার জন্য মানুষ কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিত না, হাসিমুখে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করিতে পারিত। এখন আর সে দিন নাই। শিশুকাল হইতে আমরা এখন গড়িয়া উঠি ভিন্ন পরিবেশে। ধর্মের সংস্কার শিশুকালে তো দূরের কথা, সারাজীবনেও মনে পড়িবার সুযোগ আসে কিনা সন্দেহ। ধর্ম এখন আমাদের জীবন-সত্য নয়, বাঞ্ছিততম অধিকার নয়—অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিলাস মাত্র। কাজেই ধর্মানুরাগে যে আমাদের জোয়ার-ভাটা আসিবে ইহা আর বিচিত্র কি!

'ভারত-রত্ন'

সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব-ইয়োরোপে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী সাম্প্রতিক ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গত ২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই) দিল্লীর বিমান-ঘাটীতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী তাঁহাকে যে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহা হইতেই দেশবাসীর হৃদয়ে নেহরুজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের গভীরতা বুঝা যায়। আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য ভারতবাসীর সহিত আমরা ভারতমাতার এই আদর্শ সেবকের দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করি।

গত ৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক প্রধান-মন্ত্রীর সম্মানার্থ একটি বিশেষ ভোজসভা আয়োজিত হয়। রাষ্ট্রপতি শ্রীনেহরুকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন,—

"আমাদের দেশের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কিভাবে তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে, তাঁহার বৃহৎ প্রচেষ্টায় যে সমগ্র জাতির সমর্থন রহিয়াছে, তাহা কিভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে জাতির প্রতি তাঁহার সারাজীবনের সেবার কথা লিখিত আছে। মানব-সমাজের শান্তিস্থাপন-কল্পে তাঁহার বীরোচিত প্রচেষ্টা তাঁহার বিরাট জীবনের অধুনাতন অধ্যায়। ইহা তাঁহাকে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হয় জাতির সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করাই তাঁহার প্রতি যোগ্য সমাদর প্রদর্শন করা হইবে।"

নেহরুজী প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহারই যোগ্য। এই সম্মানের জন্য ব্যক্তিগত বিন্দুমাত্র দাবি যে তাঁহার মনের কোণে স্থান পায় নাই তাহা তাঁহার উক্তিতে সুস্পষ্ট। তিনি স্মরণ করিয়াছেন তাঁহার কর্মজীবনের সকল সহযাত্রীকে,

স্মরণ করিয়াছেন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে—যাহার মর্মকথা হইতেছে বিশ্বের মঙ্গল ও শান্তি। যাহা কিছু গৌরব তাহা ভারতমাতার, প্রত্যেক ভারত-কর্মীর। নেহরুর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাক্যের আড়ম্বর নাই, আছে প্রাণের গভীর উপলব্ধি। শ্রীজবাহরলাল নেহরু সত্যই ভারত-রত্ন, শুধু রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক অনুমোদনেই নয়, ভারতবর্ষের যুগ-যুগ-পরিপুষ্ট মানব-মহত্ত্বের বিচারে। ভারতবর্ষের জয় হউক, ভারতের এবম্বিধ মনুষ্য-রত্নের জয় হউক।

নেহরু যে পঞ্চশীলের কথা বিদেশে শুনাইয়া আসিয়াছেন তাহার ভিত্তি রাজনীতি নয়, মানুষের সহিত মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক। মানুষ যখন মানুষকে ভুলিয়া মানুষেরই গড়া যন্ত্রের, নিয়মতন্ত্রের এবং গণ্ডীবদ্ধ অধিকার-নীতি বা ভ্রান্ত মর্যাদা-বোধের অধীন হইয়া পড়ে তখনই মানব-সমাজের বৃহৎ বিপদ উপস্থিত হয়। এই বিপদের প্রতীকার মানুষের মনুষ্য-মুখীনতা। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বদেশে যে প্রথম বক্তৃতা দেন (কলম্বো, ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৭) উহার কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে—

"বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। জগতে অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবসমূহ বিদ্যমান থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পরে বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে—আমাদের মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের নিকট এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। * * * এই শান্তভাব, এই তিতিক্ষা, এই পরধর্মে-দ্বেষরাহিত্য, এই সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবরূপ মহতী শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব জাতি সর্ব বর্ণ শিক্ষা করিতে পারে।"

(ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৫)

আশ্চর্য, স্বামীজী পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে সংঘর্ষ পরিহার এবং শান্তি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কয়েকটি সর্বজনীন নীতি অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন সেগুলিও সংখ্যায় পাঁচ!

অভিনন্দনীয়

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সত্য আবিষ্কার করিয়া যান, সেই সত্যের প্রয়োগ কে কতটা কিভাবে করিবে সেদিকে সব সময়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। রাসায়নিক এবং পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এতদিন পরমাণুর যে সকল রহস্য একটার পর একটা আবিষ্কার করিয়া আসিতেছিলেন উহারা মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে কিছু ক্ষতি আনিতে পারে নাই, বরং তত্ত্বের (theory) দিক্ দিয়া উহারা মানুষের জ্ঞানকে প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ করিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি আণবিক বিজ্ঞানের চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। উহার অপপ্রয়োগ কত ভয়াবহ হইতে পারে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে সমস্ত বিশ্ববাসী এক দিনেই তাহার প্রমাণ পাইল। বৈজ্ঞানিকগণও বুঝিলেন নৈর্ব্যক্তিক সত্যসাধনা কত কঠিন। জ্ঞানের সাধনা যদি রাজনীতির সহিত মিশিয়া পড়ে, তাহা হইলে যে কোন মুহূর্তে ঐ সাধনা মহামৃত্যুর বাহন হইয়া আসে। আণবিক বোমার অন্যতম আবিষ্কর্তা রবার্ট ওপেনহেমারকে বিবেকের দংশন অনুভব করিতে হইয়াছিল। (উদ্বোধনের শ্রাবণ, ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আণবিক বোমা ও ভগবদ্গীতা'—প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ভবিষ্যতে আণবিক যুদ্ধজনিত ব্যাপক ধ্বংসের দায়িত্ব যে অনেকটা আণবিক বোমার আবিষ্কর্তাদের এই চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল।

অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন্ গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৫) মৃত্যুর প্রাক্কালে আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্কতাবাণী-সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যান। বিভিন্ন দেশের আরও সাত জন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উহাতে সই করিয়াছেন। পৃথিবীর পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্টগুলিকে সম্বোধন করিয়া লিখিত ঐ ঘোষণাপত্রটি ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্র্যাণ্ড রাসেল কর্তৃক প্রস্তুত। বিজ্ঞান যাহাতে মানুষের ধ্বংসকার্যে প্রযুক্ত না হয় তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণের এই সক্রিয় প্রচেষ্টা বিশেষভাবে অভিনন্দনীয় সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলী আটজন বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষরিত ঐ ঘোষণাপত্রটিকে "মানব কল্যাণের এক মহান্ অবদান" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

রয়টারের ১৫ই জুলাই তারিখের পরিবেশিত একটি সংবাদে প্রকাশ ছয়টি রাষ্ট্রের ১৮ জন নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পশ্চিম জার্মাণীর মৈন শহরে একটি বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত হন। তাঁহারাও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির প্রতি অনুরূপ একটি 'আবেদন' প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন। ঐ আবেদনে আছে—

"বিজ্ঞান মানুষকে আত্মঘাতী পথে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা শঙ্কিত। পরমাণুকে মারণাস্ত্র করিলে রেডিও-রশ্মি এরূপভাবে পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিবে যে সমগ্র মানবজাতির বিলোপ ঘটিবে।"

শ্রীভগবান বৈজ্ঞানিকগণের সাধুপ্রচেষ্টা সফল করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বরদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ইন্দিরা দেবীর মীরা-ভজনের অনুবাদ)

শোন্ সখী মরি মরি,　　　মানসমোহন হরি
অতুলন কলতানে ঐ গান গায়!
ঠুমুক ঠুমুক তালে　　　আলোকতিলক ভালে
কৃষ্ণ গোপাল ডাকে: আয় আয় আয়!

রুম ঝুম রুম ঝুম নূপুর শোন্ লো বাজে!
শ্যামল রচিল রাস ভুবনমোহন সাজে!

কুঞ্জ কুঞ্জ তলে হেলিয়া দুলিয়া চলে অনুপম-রূপে দেখ্ প্রিয়তম তায়।
নেচে নেচে যমুনার তটে নাথ চ'লে যায়,
চরণ চুমিতে যার যমুনাও উছলায়!
চাঁদিনী রজনী ভোর করি' ঐ চিতচোর মধুবনে ঝঙ্কার অঝোরে ঝরায়।

চল্ রে বৃন্দাবনে মীরা আজ অভিসারে:
অন্তরতম তোরে ডাকে শোন্ বারে বারে!
অফুর পুলকে কত মধুর ঝলকে কত দরশন-তৃষা প্রিয় আজিকে মিটায়!

কথামৃত ও গীতা*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সমস্ত উপনিষদ্‌রাশি গাভীস্বরূপা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের ক্ষুন্নিবারণার্থ সুধী ব্যক্তিগণের জন্য গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করেছেন। 'সুধী'-র অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নয়। সুধী বলতে বোঝায় শ্রীভগবানে যাঁর বিবেক হয়েছে, যিনি গীতামৃত পান করে সাধনার পথে অগ্রসর হন। অন্যত্র উক্ত হয়েছে যে, শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতা ভাল করে পাঠ করলে সমস্ত শাস্ত্রের সার জানা যায়। গীতার বাণী ও উপদেশ জানা হলে অন্য শাস্ত্ররাশি পাঠের প্রয়োজন থাকে না।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনেক দিন পরে একবার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—"কুরুক্ষেত্রে তুমি যে গীতার কথা শুনিয়েছিলে সে সব ভুলে গেছি। আর একবার যদি শোনাও!" শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"অর্জুন, তুমি আমাকে বিপদে ফেললে। সে সময় আমি পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলাম। পরমাত্মাই আমার ভিতর দিয়ে সব বলেছিলেন। এখন আমার সে অবস্থা নেই। সে সমস্ত কথা পুনর্বার বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলতে পারি।"

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর "কথামৃত" কোথা থেকে বলতেন? মস্তিষ্কের ভিতর থেকে নয়। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমরা যে বাণী, যে "কথামৃত" পাই, তা পরমাত্মার কথা। অনুভূতির ভিতর দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে বলেছেন বলেই "কথামৃতে" আমরা সর্বধর্মের সার পাই। কোনো ধর্মকেই বাদ দেননি ঠাকুর। তাঁর বাণী ও উপদেশ জগদম্বাই তাঁর ভিতর দিয়ে বলেছেন।

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম চিরকাল থাকে। অন্যান্য ধর্ম তা থেকে বেরোয় আবার তাতেই লয় পায়। ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সনাতন ধর্মের উদ্দেশ্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহনান্তর অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র জগৎকে পান করিয়েছেন। আবার ঠাকুর অবতীর্ণ হয়ে নির্জনে দৈ পেতে সূর্যোদয়ের পূর্বে 'মাখন' তুলে দিয়ে গেলেন। তাঁর তোলা মাখনটি কি? সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সনাতন ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সমস্ত ধর্মই তার অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুরা মন্দিরের মধ্যে যে ভগবানের আরাধনা করছে—মসজিদে মুসলমানেরা, গির্জায় খ্রীষ্টানেরা এবং গুরুদ্বারে শিখেরা সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করে। ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে লোকে এ তত্ত্বটি বিস্মৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছিল,—"আসল ধর্ম আমাদের ধর্মস্থানেই রয়েছে। এখানে এসে ঈশ্বরকে ডাকো।" তখন সনাতন হিন্দুধর্মও ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা হয়ে চাপা পড়েছিল। সেই গ্লানি দূর করে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের জন্যই ঠাকুরের আবির্ভাব। সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি সনাতন ধর্মকে উপলব্ধি করেছিলেন।

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৭-৫-৫৫ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের বক্তৃতা। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রুতলিখিত।

জগদম্বাকে তিনি বলেছিলেন,—"মা আমাকে নিয়ে চল্, গির্জায় খ্রীষ্টান কিভাবে তোকে ডাকে আমি দেখবো।" এটি ঠাকুরের জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস। এর আভাসমাত্র পাই আমরা গীতায়—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৪।১১

"অর্জুন, আমার ভাব অনন্ত। আমাকে সগুণ, নির্গুণ, অবতার যে ভাবে যে উপাসনা করে আমি তাকে সেই ভাবেই কৃপা করি।" জন্মান্তরের কর্মানুযায়ী ভিন্ন রুচি, ভিন্ন পথ। ঠাকুরের আবির্ভাবে এই জিনিসটি আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়। সনাতন ধর্ম উপলব্ধির পর ঠাকুর অন্যান্য ধর্মের সাধনা করেছিলেন। অরূপেরও অনুভূতি করেছিলেন। তাঁর মতো এত বিভিন্নভাবে সাধনা কোনো অবতার বা সাধকের জীবনে পাই না।

কেশব সেন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মে পার্থক্য কি? যারা শুধু পণ্ডিত, কেবল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে খানিকটা বুঝেছে, তারা এই পার্থক্য বলতে পারবে না। ঠাকুর বললেন—"নহবৎখানায় সানাই বাজে, একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে, কিন্তু আর একজন—তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়। আমি সাতটা ফোকরে সানাই বাজাই। আমি এক থেকে বহুতে যাই, বহু থেকে একে আসি। আবার একের পারেও যাই।" তাঁর উত্তর শুনে কেশব বললেন,—"এখানে অপূর্ব জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখছি।"

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "সাধক যে পথ দিয়েই আসুক না কেন, আমার কৃপালাভ করে।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুর সনাতন ধর্ম, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, পার্শীর জেন্দাবেস্তা—এ সমস্তের সার উপলব্ধি করতেন তাঁর সাধনার নানা স্তরে নানা ভাবে। তাঁর বিচিত্র প্রত্যক্ষানুভূতির তুলনা নেই। তাঁর আবির্ভাবে আমরা খুব জোরের সঙ্গে তাঁরই কথায় বলতে পারছি, 'যত মত তত পথ।'

শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি আমাকে কিভাবে চিন্তা করো?" হনুমান্ বললেন, "যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। নিজেকে যখন জীবাত্মা বলে বোধ হয়, তখন আমি তোমার অংশ। ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমি আর একটি স্তরে উঠি; সেখানে আত্মস্বরূপে আমিই তুমি।" ঠাকুর এই তিন ভূমিতেই দর্শন করেছেন।

আশ্চর্য এই "কথামৃত"! ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে আমরা সব পাচ্ছি। তাঁর বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির কথা রয়েছে "কথামৃতে"। আসলে সবই বুঝাচ্ছেন সেই জগদম্বা। ঠাকুর সমাধির অবস্থা থেকে নেমে এসে এই সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন। যখন যে ভাবের কথা, তখন সেই স্তরের সমাধি।

গীতার ভাব এত উদার যে তা সকল সম্প্রদায়ের জন্য। তার একটি শ্লোকে সমন্বয়ের ভাব রয়েছে, তা আগেই বলেছি। কিন্তু ধর্মসমন্বয়ের ভাব একটি মাত্র শ্লোকে কি পরিষ্কার হবে! গীতায় যে উপদেশ অসম্পূর্ণ ছিল, ঠাকুর তা সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। দ্বাদশ বর্ষের সাধনার মধ্যে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ-যুক্ত অবস্থায় ঠাকুরের মন যে যে স্তরে উঠেছে নেমেছে, সেই সমস্ত স্তরের কথাই রয়েছে "কথামৃতে"। এতে আমরা সব শাস্ত্রের সার পাচ্ছি। সারা "কথামৃত" নিংড়ালে ঠাকুরের দুটি প্রধান নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়—"এগিয়ে পড়ো" ও "ডুব দাও"। এই আমাদের শাস্ত্র, পথ, উপায়।

পৃথিবীতে কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ এক একটি লোকের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল সেই সেই লোককে বাদ দিলে তারা নস্যাৎ হয়ে যায়। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঠাকুরের বাণী প্রচার করেছিলেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন

নি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন। স্বামীজী সেখানে ঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন রাখলেন; সমগ্র জগৎ ঠাকুরের বাণী মাথা পেতে নিল।

যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য আরও কত সব মহামানব অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যা অসম্পূর্ণ ছিল ঠাকুর তা সম্পূর্ণ করেছেন। দ্বাপরযুগের পর লোকের শরীর ও মনের উপর কত পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে। বুদ্ধ ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তার শিষ্যদের কতকটা নাস্তিক ভাব। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে তারা চুপ করে থাকতো। বৌদ্ধগণ কত বেদ—কত ব্রাহ্মণ ধ্বংস করেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ভগবান শঙ্করাচার্য জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীশ্রীঠাকুর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবৎ, মস্তিষ্কে শঙ্করসদৃশ। ভাষ্য দিয়ে গীতা বুঝা যায় না। এক এক পণ্ডিত এক এক রকম ভাষ্য করেছেন। ভাষ্যে ভাষ্যে বিরোধ রয়েছে। গীতা বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণের ভিতর দিয়ে, তাঁর জীবন থেকে। ঠাকুরের জীবনটাই আবার গীতা, উপনিষদ্ ও অন্যান্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের ভাষ্য।

শ্রীভগবান ভক্তের জন্যই অবতীর্ণ হন, অভক্তের জন্য নয়। ভক্তকে তিনি কত ভালবাসেন! অভক্ত গীতায় অধিকারী নয়। অর্জুন শ্রীভগবানের বড় প্রিয়। গীতার শেষে তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অযাচিতভাবে তাঁকে গুহ্যতম পরম উপদেশ দিচ্ছেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেননি। সেই গুহ্যতম উপদেশ—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

"হে অর্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা প্রাণিসমূহকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রমণ করিয়ে সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন।" শ্রীভগবান সর্বজীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আগে তিনি, তারপর তুমি, আমি। তিনি আছেন বলেই আমাদের উৎপত্তি। হৃদয় শ্রেষ্ঠ মন্দির। উপনিষদে হৃদয়কে রথ বলা হয়েছে। শ্রীভগবান আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে, চোখে মোহের ঠুলি বেঁধে দিয়ে, মায়ার নাগরদোলায় আমাদের ঘোরাচ্ছেন। রাম-প্রসাদের গানে এই ভাবটি রয়েছে।

মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
কি দোষে করিলে মা আমায় ছটা কলুর পদানত॥

এই অসহায় অবস্থাটির অনুভূতি না হলে, নিজেকে একেবারে নিঃসম্বল বোধ না করলে, ঈশ্বরকে সম্বল করা যায় না। যতক্ষণ অভিমান, যতক্ষণ আমিত্ব, ততক্ষণ আমরা কারুর কাছে সাহায্য চাই না। তাই আসল কথাটি শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকেই বলছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
১৮।৬২

সর্বভাবে একমাত্র ঈশ্বরেরই শরণ নিতে হবে। তাহলেই সেই আসল পরমা শান্তি লাভ করবে এবং সে অবস্থা থেকে বিচ্যুত হবে না। আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না। 'সর্বভাবের' অর্থ—কায়মনোবাক্যে, মনমুখ এক করে, ভাবের ঘরে চুরি না করে।

ঠাকুর মাস্তুল আশ্রয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন "কথামৃতে"। তাঁর শ্রীমুখকথিত গল্পটি এই। একটা পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে বসেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহা-সমুদ্রে এসে পড়লো। তখন পাখীর চটকা ভাঙলো, দেখলে কূলকিনারা নেই। সে ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়লো, তবু কূলকিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে—জাহাজে ফিরে এলো। অনেকক্ষণ মাস্তুলে বিশ্রাম করে আবার উড়ে গেল—এবার পূর্বদিকে। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না। কেবল অকূল পাথার! তখন ভারি

পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসলো। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূলকিনারা নেই, তখন সেই যে মাস্তুলের উপর বসলো, আর উঠলো না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোনো চেষ্টাও নেই।

মনপাখী উড়তেই চায়। যতক্ষণ না ডানা বেদনা হয় ততক্ষণ উড়ছেই। আমাদের ভিতরে যে ভগবান রয়েছেন তিনিই মাস্তুল। মাস্তুল আশ্রয় করার অর্থ —ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। ঠিক শরণাগত ভাবটি সাধন বিনা হয় না। ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সেটি উপস্থিত হয়। ডানা বেদনা হয়।

মহাত্মা কবীরের উপদেশে আছে,—"চল্‌তি চাক্কি সব কোঈ দেখে কীল না দেখে কোঈ।" মায়ার জাঁতা ঘুরছে, সব জীবকে পিষে ফেলছে। জাঁতায় একটা পাথরের ওপর কীল-এর দ্বারা আর একটি পাথরের চাকা বসানো থাকে। উপরের চাকা ঘুরে চলে আর শস্যগুলি নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। দু-চারটি দানা ছুটে গিয়ে কীল-এর কাছে দাঁড়ায়। তারা পিষ্ট হয় না। সংসারেও তেমনি গুটিকতক লোক মায়া-যন্ত্রের হাত এড়িয়ে অক্ষত থাকতে পারে।

আসল কথা—ভিতরে যেতে হবে। "আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে।" বাইরের কোনো বস্তুর উপর ভরসা নেই। এগিয়ে পড়ো। ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত কাঠুরের গল্পেতে আছে—প্রথমে চন্দনের বন, তারপর ক্রমান্বয়ে রূপোর খনি, সোনার খনি, হীরের খনি। গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভিতরে যে দেবতা রয়েছেন তাঁর শরণ নিয়ে পড়ে থাকো। ঠাকুরও বলেছেন,—"এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কাজ করো।

*　　*　　*

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
১৮।৬৬

শ্রীভগবান প্রথম শ্লোকটিতে ভগবৎকৃপা-লাভের গুহ্য উপায়স্বরূপ এই চারটি সাধনের কথা বলছেন। প্রথম, আমাতেই মন সমাহিত কর। যে কাজই করতে হয় আমাতে মন সমাহিত করে কর। দ্বিতীয়, আমারই ভক্ত হও; তাহলে আমাতে মন সমাহিত করতে পারবে। তৃতীয় আমাকেই পূজা কর। চতুর্থ, আমাকেই নমস্কার কর। মাথা নীচু কর, কাঁচা আমিটাকে মারো। ·· এই সাধন করলে আত্মসমর্পণ আসবে। বাকিটা শ্রীভগবান নিজেই করে নেবেন। তাঁর প্রসাদে তাঁকেই প্রাপ্ত হবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন,—"কেউ ঈশ্বরের দিকে এক পা এগোলে তিনি তার দিকে একশো পা এগিয়ে আসেন।"

লোকে মন্দকে ছেড়ে ভালোকে, পাপকে ছেড়ে পুণ্যকে, অজ্ঞানকে ছেড়ে জ্ঞানকে আশ্রয় করে। উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে শ্রীভগবান বলছেন,— "সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। (তারপর নিজের কর্তব্যটাও বলে দিচ্ছেন) আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। শোক কোরো না।" ছেলে যেমন গুমূত মেখে মায়ের চরণে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর মা ধুয়ে-পুঁছে তাকে সাফ করে নিচ্ছেন।

প্রথম অবস্থায় সাধক ভগবানের হাত ধরে চলতে চায়। "কথামৃতে" ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত এই গল্পটি আছে। ছেলে বাপের হাত ধরে আলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছিল। এমন সময় আকাশ পথে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল। ছেলে তাই দেখে আনন্দে বাপের হাত ছেড়ে দিলে। অমনি সে খানায় পড়ে গেল। আর এক ছেলে, যে বাপের কোলে চড়ে যাচ্ছিল, বক দেখে আনন্দ

করলো বটে, কিন্তু তাকে খানায় পড়তে হলো না। ছেলে যদি বাপকে ধরে চলে, তাহলে বরং পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলেকে ধরে, সে ছেলে কখনও পড়ে না।

ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত বিড়াল-ছানার দৃষ্টান্তও রয়েছে "কথামৃতে"। বিড়াল-ছানা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যা করে। কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, একান্ত আত্মসমর্পণ।

"কথামৃতে" ঠাকুর বলেছেন,—"সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ে এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। এখন সংসারে ফেলেছেন। ভালো, এখন সেই স্থানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভালো জায়গায় লয়ে যাবেন, তখন যা হয় হবে।"

ঈশ্বরেচ্ছার উপর ষোল আনা নির্ভর চাই। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতো।

* * *

একটু সংস্কৃত না জানলে গীতা পাঠ করা যায় না। তোমরা "কথামৃত" পাঠ কোরো। তাহলেই সব শাস্ত্র পড়া হয়ে যাবে।

সাধুদর্শনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বড়ই আমি প্রগল্‌ভ, আর বড্ড অহঙ্কারী,
অসাধারণ যেথায় দেখি চিন্‌তে তবু পারি।
বিস্ময়কর তোমার আবির্ভাব,
করিয়াছ এই দেহেতেই দিব্য দেহ লাভ,
অমৃতময় তুমি, চিন্তামণির অধিকারী।

২

দেহে মনে পাচ্ছি আমি তোমার আকর্ষণ,
দিব্য জীবন দাও আমাকে, অনন্ত জীবন।
যুগে যুগে করিয়াছ কতই তপস্যা,
শব-সাধনে কাটাইলে ঘোর অমাবস্যা
দিলেন শিব-সীমন্তিনী হাসিয়া দর্শন।

৩

ভাষা তোমার সঙ্গীতময় ইঙ্গিতময় বটে,
আনে সুদূর অমৃতলোক চোখের সন্নিকটে।

স্নিগ্ধ শান্ত পরম তুমি প্রিয়,
একেবারে অনির্বচনীয়,
প্রণাম করি, থাকো ঠাকুর, আঁকা মানসপটে।

৪

ভেল্‌কী কাহার ? বুঝ্‌ছি আমি আজকে তোমায় পেয়ে,
মা যে আমার, মা যে আমার বাজিকরের মেয়ে।
কি ভেল্‌কী মা লাগিয়ে দিলে চোখে,
বল্‌ছি তাঁকেই—মরছি বোকে বোকে,
বিস্ময়ে ও আনন্দেতে অশ্রু আসে ছেয়ে।

ভারতের প্রাণবহ্নি*

শ্রীগগনবিহারী লাল মেহ্‌তা

(আমেরিকাস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত)

ইতিহাসের স্তরে স্তরে তিন হাজার বৎসরেরও অধিককালের পদচিহ্ন অঙ্কিত রাখিয়া ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে—কালের তরঙ্গাঘাতে আজও সে অবিচলিত। ভারতে যে সভ্যতার ধারা প্রবহমান তাহা বহুবহু শতাব্দীর উদয়াস্ত পার হইয়া আসিয়াছে—সেই সভ্যতা সুপ্রাচীন চৈনিক ও মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন এবং গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার অগ্রজ। সেই সভ্যতা আজও এদেশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,—তাই না প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে—এমনকি শীত-ঋতুতেও, জীর্ণবাসপরিহিত সহস্র সহস্র নরনারীর পুণ্যতোয়া নদনদীর পূত সলিলে অবগাহন করিতে যাওয়ার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি প্রভাতী দৃশ্যের স্মৃতি আমার মনে পড়ে। দেখিলাম গায়ে একখণ্ডও শীতবস্ত্র নাই, হাতে একটি করিয়া পিতলের পাত্র—দলে দলে মহিলারা পবিত্র গঙ্গাস্নানে চ[illegible]া, সকলেই নগ্নপদ। মনে মনে বলিলাম, এইতো যথার্থ ভারতবর্ষ—বোম্বাই, কলিকাতা বা দিল্লী-নগরীতে কলকাকলিপূর্ণ পানাহারের আমোদসভায় যাহাদের সমাবেশ হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের সন্ধান মিলিবে না—শৌখিন ক্লাবগৃহে বা বড় বড় হোটেলে যাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও ভারতবর্ষের পরিচয় নয়—ভারতবর্ষের স্বরূপ এই সব সাধারণ লোক—এই সব সরল স্পর্ধাহীন বিনম্র জনসাধারণ, এবং ইহাদেরই প্রাণস্পন্দনের প্রসঙ্গে দুইচারিটি কথা আমি আজ বলিবার প্রয়াস পাইব।

এই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে—বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহার মন্দিরে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, তাহার কাব্যে এবং লোকশিক্ষার গল্পসম্ভারে। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ। রামায়ণ ভগবান

* ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ তারিখে নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটিতে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ হইতে সঙ্কলিত।

অনুবাদক : শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

বিষ্ণুর অবতার সেই রাজ্যেশ্বর রামের উপাখ্যান—যিনি দুষ্টদমন এবং এক পরাক্রান্ত দানব নিধন করিয়াছিলেন। "মূল রামায়ণ আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে রচিত। কিন্তু তুলসীদাস নামক একজন কবি এই মহাকাব্য আমাদের জাতীয় ভাষা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। যদিও রামায়ণের কাহিনী শিশুকাল হইতেই সকলের সুবিদিত তথাপি রামায়ণ-আবৃত্তি প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে সুগভীর আনন্দের হিল্লোল সঞ্চার করে। বস্তুতঃ এদেশে মায়েরা তাঁহাদের সন্তানদের নিকট মুখে মুখে যে সব কাহিনীর গল্প বলেন, যে সব কাব্যের উপাখ্যান বর্ণনা করেন, রামায়ণ তাহাদের অন্যতম; আর ঐসব ছেলেমেয়েরা লিখিতে বা পড়িতে না জানিলেও এই কাব্যগুলি তাহাদের সুপরিচিত। দুই এক-পুরুষ পূর্বেতো এই কাব্যগুলি সকলের কণ্ঠস্থ থাকিত।

ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-ঐতিহ্য লইয়া এই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে; ইতোমধ্যে অপরাপর কত সভ্যতা পৃথিবীর বুক হইতে অবলুপ্ত হইয়াছে, আবার কত আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। তাই প্রশ্ন জাগে—এই ভারতের বুকে শাশ্বত ধন কী রহিয়াছে? চিন্তার পর্যায়ে—ধ্যানালোকের পরিমণ্ডলে সমগ্র জগৎকে পরিবেশন করিবার মতো ঐশ্বর্য এই ভারতবর্ষের কি কিছু আছে?

এখন কথা এই যে, কোনও দেশের স্বকীয় ভাবধারার আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেকের পক্ষে এরূপ একটি ভঙ্গী অবলম্বনের সম্ভাবনা থাকে যাহা জাতীয়তাবোধজনিত ঔদ্ধত্য অথবা বর্ণাহঙ্কারের অনুরূপ। প্রতিনিয়তই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জাতির একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; কোন জাতি সঙ্গীতবিদ্যায় উন্নত, কোন জাতি কাব্যপ্রতিভায়, কোন জাতি বা দার্শনিক ক্ষেত্রে—এইরূপ। কিন্তু এইরূপ ঢালাসিদ্ধান্ত করিতে নিরতিশয় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন—এমনকি একটি দেশের মর্মবহ্নি বা ভাবধারার কথা বলিতেও। কারণ প্রথমতঃ কোনও সংস্কৃতিই নিছক স্বতন্ত্রভাবে একক গড়িয়া উঠে না। সর্বযুগেই সমস্ত দেশই অপরাপর দেশ হইতে ধার করিয়া আসিয়াছে এবং একদেশের সংস্কৃতি অন্যান্য দেশ হইতে উপাদান আহরণ করিয়া স্বীয় সত্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একটি জাতির ক্রমবিকাশ সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ঘটিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার পাকে পাকে কতনা তন্ত্রী জড়িত—কত জাতির, কত কৃষ্টির তন্ত্রী—আবার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক প্রভাব, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হেরফের এই ক্রমবিকাশের পাকে পাকে উপাদান জোগাইয়া থাকে। সুতরাং দেশবিশেষের মর্মবাণী বা ভাবধারার প্রসঙ্গের অবতারণায় আমাদের সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি।

আবার কোনও দেশের ভাবধারার কথা বলিতে আমাদের এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, সেই ভাবধারা প্রায়শই তাহার ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবর্তিতরূপ হইতে বিভিন্ন। আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এই যে, আমাদের ধর্মে অথবা আমাদের জাতীয়জীবনে যাহা সর্বোত্তম, অর্থাৎ যাহা আমরা আদর্শ হিসাবে শুধু প্রচার করিয়া থাকি—হয়তো আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী বা আমাদের মহাপুরুষদের উদ্দীপনাময়ী দিব্যবাণী—তাহার সহিত আমরা অপরাপর জাতির ব্যাবহারিক জীবনে বা অপরাপর ধর্মের ব্যাবহারিক দিকে যাহা অপকৃষ্ট তাহার তুলনা করিয়া থাকি। আমাদের অবতারমুখনিঃসৃত কোনও অনুপম বাণী আমরা মনে মনে জল্পনা করি এবং তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলি, এই তো আমাদের হিন্দুধর্ম, বা এই তো আমাদের খ্রীষ্টধর্ম বা ইস্‌লামধর্ম। কিন্তু অপরপক্ষে একথা ভুলিয়া যাই যে, এই সব বাণী যাহারা দিনের

পর দিন ব্যাবহারিক জীবনে নিজেদের কর্মের মধ্য দিয়া রূপায়িত করে তাহারা নিতান্তই সাধারণ নরনারী। তাই আমাদের ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বাস্তবজীবনে প্রয়োগকালে এই সব বাণীর আদি-নির্মলতা কিছুটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

আবার ঐহিক পরিস্থিতিও মানুষের আধ্যাত্মিক আদর্শ, উচ্চাভিলাষ এবং মহৎ প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে ম্রিয়মাণ করে। যাহা হউক কোন দেশের আদর্শগত ভাবধারা ঐ দেশের সমাজসংস্থা ও বিধান-অনুষ্ঠান অপেক্ষা সব সময়েই শ্রেষ্ঠ। মানুষ যখন নিজেদের ভাবধারাকে বাস্তবক্ষেত্রে সংস্থানুষ্ঠানে, রীতিনীতি ও আচারব্যবহারে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে, তখন যে ভাবেই হউক সেই ভাবধারার অপরিমেয় মহিমা আংশিক ম্লান হইয়া যায়। তাই সব সময়েই দেখা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রেই হউক বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হউক, লৌকিক সংস্থা অপেক্ষা অন্তর-লোকের ভাবধারার স্থান উচ্চে। এই কারণে একটা জাতির প্রতিভার অনবদ্য বিকাশের কোন কোন ধারা সামরিক নৈপুণ্যে স্ফুরিত হয় না—সামাজিক অনুষ্ঠানেও নয়। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেতো কোনক্রমেই নয়,—স্ফুরিত হয় শিল্পকলায়, দর্শনে, ধর্মে এবং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায়।

প্রথমেই তবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভারতের ঐক্য বলিয়া কিছু আছে কি? আপনাদের কানে এই প্রশ্নটি অদ্ভুত শুনাইতে পারে। কিন্তু যে সুদীর্ঘকাল আমরা বিদেশীশাসনাধীন ছিলাম সেই সময় আমরা এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছি যে, 'ভারতবর্ষ' বলিয়া প্রকৃত কোনকিছুর অস্তিত্ব নাই—'ভারতবর্ষ' একটি 'ভৌগোলিক বাক্য' মাত্র এবং ভারতে কোনও প্রকার মূলগত আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক ঐক্য নাই। কিন্তু জনৈক ইংরেজ ইতিহাসবিদ্ ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—একথা সন্দেহাতীত সত্য যে, ভারতে একটি সুগভীর অন্তঃসলিলা মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান—ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য বা রাজনৈতিক পরাকাষ্ঠা যে ঐক্য আনয়ন করে তাহা অপেক্ষাও সেই ঐক্য গভীর। সেই ঐক্য জাতি, বর্ণ, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং সম্প্রদায়ের অসংখ্য বৈচিত্র্যকে ছাড়াইয়া বিরাজ করিতেছে। এই বিষয়ে আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না।

ভারতের এই ঐক্যের অস্তিত্ব যদি সত্য, তবে উহার প্রধান প্রধান লক্ষণ কি? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রধানতম অবদান কি? আমি বলিব ভারতের দান প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারায়, ধর্মে এবং দর্শনের ক্ষেত্রে। আধুনিক মানের মাপকাঠিতে একজন অশিক্ষিত ভারতীয়কে অজ্ঞ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার সত্তার অন্তস্তলের গভীরে এমন একটি বস্তু রহিয়াছে যাহাকে আমরা ধর্মাত্মক চেতনা নামে অভিহিত করিতে পারি।

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মেরও অন্তর্গত বহু সম্প্র-দায় বিদ্যমান, এবং সেখানে বহু সংস্কারমূলক আন্দোলনেরও উদ্ভব হইয়াছে—যে সব আন্দোলনে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচার করা হইত। কিন্তু ভারতীয় সংস্কার-আন্দোলনসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণে উহারা ধর্মাশ্রয়ী। কোন কোন আন্দোলনধারা কিছুকাল উল্টাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া সুপ্রাচীন বেদের শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তবে তাহাদের নূতন দাবি এই যে, সনাতন বেদের উপর পরবর্তী কালের মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির জলুশ বর্জন করিতে হইবে। অপর কোন কোন সংস্কার-আন্দোলনের বিতর্ক এই যে, মূর্তিপূজা এইরূপ অনুষ্ঠান নহে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের সহিত যাহার সংহতি পাওয়া যায়। এই সব আন্দোলনের কোন কোনটি নিঃসন্দেহে অপরাপর ধর্মধারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে—ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত ধর্মসংস্কার-সঙ্ঘের মতাবলম্বী এক ভদ্রলোকের

ঘটনা। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন প্রধানতঃ বাঙলা-দেশেই নিবদ্ধ ছিল। যদিও ভারতের অন্যান্য কোন কোন স্থানেও ইহঁার কিছু কিছু বিস্তার হইয়াছিল। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস, ঈশ্বর নিরাকার এবং যে শ্রেণীর মন্দিরেই মূর্তি বা প্রতিমা পূজা হয় সেই স্থানে হিন্দুধর্মের মূলভাবটি প্রকটিত হয় না। এই মতবাদে বিশ্বাসী, উচ্চশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যদর্শনে সুপণ্ডিত এক ভদ্রলোক আমাদের পবিত্র তীর্থ বারাণসীর মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন—একটি দরিদ্রা রমণী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল, বিগলিতধারায় তাহার নয়নের অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে—আনন্দের অশ্রু—বহুকষ্টের পরে পরিশেষে মন্দির-দর্শনলাভের এবং পরমেশ শিবের মূর্তির সম্মুখে প্রণিপাত করিতে পারার আনন্দে উদ্‌বেলিত অশ্রু। এই দৃশ্য দেখিয়া ঐ ভদ্রলোক আমার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই রমণীটি যে ঐ মন্দিরে তাহার ভগবানের দর্শন-লাভ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।"

আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়িল। ভারতের একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপ কুমার রায়, একদিন কলিকাতার একস্থানে বাঙলা-ভাষায় একটি অতি মধুর গান করিতেছিলেন। গানের পদগুলির ভাবার্থ এইরূপ,—"যারা তোমাকে চিনে না তারা তোমাকে বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমি যে তোমায় চিনি, তাই তোমাতে আমার পরম বিশ্বাস—আমি তোমাকে দেখিয়াছি আমার অন্তরের মণিকোঠায়।" গানের কলিটি ছিল মর্মস্পর্শী। আমার মনে আছে, তিনি যখন সেদিন ঐ গানটি গাহিতেছিলেন তখন উপস্থিত অন্ততঃ ছয়সাতজন মহিলা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। হয়তো তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে আঘাত পাইয়া থাকিবেন—কেহ হয়তো তাঁহার কোন প্রিয়জনকে হারাইয়া থাকিবেন—কাহারও হৃদয় গভীর ভক্তির ভাবে ভরপুর ছিল। এই সব ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগকে এই কথা বুঝাইতে চাই যে, ভারতের অতি সাধারণ অনাড়ম্বর নরনারীর চেতনার গভীরে এমন একটি ভাবের আবেগ রহিয়াছে যাহাকে শুধু আত্মার আকুল আকিঞ্চনের মূর্ছনাবিশেষ বলিয়াই বর্ণনা করা চলে।

ভারতের ঐতিহ্যপ্রাপ্ত ভাবধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী। বহুভাবেই ভারতবর্ষ যেন একটি মহাসাগর—স্মরণাতীত কাল হইতে কতনা জাতির কতনা ধর্মের ধারা বহিয়া আসিয়া এই মহাসাগরের বুকে মিশিয়া গিয়াছে! সেই সব ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহাদিগকে নিজের বিশালতার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মভূত করিবার শক্তির প্রাচুর্য ভারতবর্ষের রহিয়াছে। এইরূপ আত্মস্থী-করণ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রসঙ্গত এখানে আরও বলা যায় যে, এমনকি বহুবহু শতাব্দী পূর্বেও অন্যান্য দেশে যাহারা ধর্মের জন্য নির্যাতিত হইত তাহারা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিত এবং ভারত তাহাদিগকে সাদরে আশ্রয়দান করিত।

ভারতবর্ষ বিদেশাগত বিভিন্ন মতবাদেরও সামঞ্জস্য-সাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছে। ফলে যাহারা বিদেশ হইতে আগমন করিত তাহাদের অনেকেরই ধর্মান্ধতার উচ্ছ্বাস এবং অপরকে ধর্মান্তরিত করিবার উৎসাহ কিছুটা অন্তর্হিত হইত। উপরন্তু তাহারা ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল এবং কিয়ৎপরিমাণে তিতিক্ষার ভাব উপচয় করিতে লাগিল—যে তিতিক্ষা পূর্ণপ্রদীপ্ত হিন্দুধর্মের মধ্যমণি। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম অন্যান্য মতবাদের রসগ্রহণে এতদূর উদার যে, অনেক সময়ই হিন্দুধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা করা অথবা এমনকি তাহার মূল তত্ত্ব নির্ণয় করাও কঠিন হইয়া পড়ে। হিন্দুধর্মে এত সম্প্রদায়, এত দেবদেবীর সমাবেশ যে, অনেকে মনে করে

ইহা একটি কুসংস্কারপূর্ণ বুনো ক্রিয়ানুষ্ঠানসমাকীর্ণ বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশেষ। কিন্তু মনুষ্যমন এযাবৎ যে-সব সুগভীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার অনেকখানিই এই হিন্দুধর্মের পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত ধর্মেই পূজাপার্বণ এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান ইত্যাদি রহিয়াছে—অপরের নিকট সে সমস্ত যুক্তিবিচারসিদ্ধ মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটি চৈতন্যাশ্রয়ী ধর্মবিধানের অর্থ ও তাৎপর্য গভীরতর। আর হিন্দুধর্মে ধর্মবিধান ও দর্শন ওতপ্রোত বিদ্যমান।

এই সমন্বয়প্রবণতার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সুফিবাদ এই দর্শনদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের একজন মহাসাধক ভক্ত কবীর এমন একটি ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং নিজেও সেই মতে সাধনা করিয়াছিলেন যাহা হিন্দু ও ইসলাম এই উভয় ধর্মের ভাবধারার একটি মিলন-প্রয়াস। আর সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট আকবর এমন একটি ধর্ম উদ্ভাবিত করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা হইবে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশের সম্মিলন। এমনকি তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে একজন পাদ্রী পুরোহিতও রাখিয়াছিলেন। আকবরের পরিকল্পিত সেই ধর্ম ("দীন্-ইলাহি" এই নামে উহা অভিহিত হইত) ভারতীয় প্রাণবহ্নির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রহিয়াছে জড় অপেক্ষা চৈতন্যের প্রাধান্যে বিশ্বাস। এইরূপ উক্তিতে আমি নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন করিতেছি না। অবশ্য এইরূপ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য-প্রণিধানে অর্থবিভ্রম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু আমি ঋষিদের উপদেশ ও আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রনিহিত বাণী উদ্ধৃত করিব না—দেশের সাধারণ লোকের মনোগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই বলিব। একজন সাধারণ অশিক্ষিত কৃষকেরও জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ইহজগতের পরপারে অপর একটি জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে, জন্মান্তরে ইহজীবনের সুকৃতির ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে, এমনকি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণোন্মুখতার, এবং বোধ করি বলিতে পারি বৈরাগ্যপ্রবণতার একটি দার্শনিক মনোভঙ্গী রহিয়াছে। অশিক্ষিত হইলেও ভারতের সাধারণলোকই আমাদের মতো শিক্ষিতদের তুলনায় ভারতের আত্মার প্রকৃষ্টতর প্রতীক। ভারতের এইরূপ একজন সাধারণ লোক যদি তাহার কোন প্রিয়জনকে হারায়—সেই প্রিয়জন যদি তাহার একমাত্র পুত্রও হয়—তবে সে মর্মাহত হইবে এবং শোকপ্রকাশ করিবে ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি বলিবে "ইহা ভগবানের অভিপ্রায়।" এইরূপ আত্মসমর্পণের ভাব হয়তো সময়ে সময়ে মানসিক পক্ষাঘাতের পূর্বাবস্থা বলিয়া মনে হইতে পারে। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় আসিলে লোকে যদি জলসেচনের সুব্যবস্থা এবং বাঁধ প্রস্তুত না করিয়া অথবা জমির উর্বরতা-সংরক্ষণের কোনপ্রকার পন্থাবলম্বন না করিয়া শুধু নিশ্চিন্ত মনে বলে, "আহা, ইহা তো ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে," তবে তাহা আর সত্যই "চৈতন্যের" লক্ষণ নয়। ইহা বিষাদকাতর তৃপ্তির মোহ—কর্মবিমুখতা ও নিশ্চলতা হইতে এই তৃপ্তির মোহের উদ্ভব। কিন্তু এই প্রকারের আত্মসমর্পণ বাঞ্ছনীয় নয় একথা স্বীকার করিলেও আপনারা কি মনে করেন না যে, মানুষ সর্বশক্তিমান্—এই জগতে মানুষ যাহা ইচ্ছা সাধন করিতে পারে এইরূপ বলিলে কি যেন একটি সত্য অব্যক্ত রহিয়া যায়? এই উক্তিটিকে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন নাই কি? কেননা, শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে অনেক কিছু দেখা যায় যাহা মহাশক্তিমান্ পুরুষও আয়ত্তাধীন করিতে পারে না। বার্টাণ্ড রাসেলের ন্যায় একজন ঘোর জড়বাদী দার্শনিকও তাঁহার "একজন মুক্ত ব্যক্তির উপাসনা" (A Free Man's Worship) নামক একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধে বলিয়াছেন, দুদিন পূর্বেই হউক কি পরেই

হউক মানুষের জীবনে এই পরম নির্বেদ—এই জ্ঞান উদিত হয় যে আমাদের ভোগের জন্য এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নাই, এবং যে-সব বস্তুর জন্য আমরা উদগ্র কামনা করি তাহা আমাদের পক্ষে যতই বাঞ্ছিত হউক না কেন শেষ পর্যন্ত আমাদের অধিগত হয় না।

আমাদের অহংবুদ্ধির মোহে একথা যেমন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন যে, এই পৃথিবী আমাদের ভোগের জন্য নয়, তেমনই আমি মনে করি, আজই হউক কি কালই হউক ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের জন্মের বহু পূর্বেও এই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল এবং আমাদের তিরোধানের পরেও সুদীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ব থাকিবে। তাই আমার মনে হয়, ঐরূপ একটি বৈরাগ্যের কিছুটা প্রেরণা থাকা শুধু বিচক্ষণতাই নহে, সুখানুভূতিরও পরিপোষক—অন্তর্লোকের সাম্যসঞ্জাত সুখানুভূতি—যে সুখানুভূতি শুধুমাত্র পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যজনিত সেই সুখানুভূতি নহে।

এই বৈরাগ্যের প্রেরণা আছে বলিয়াই—অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মে যাহাকে আমরা 'ত্যাগ' বলিয়া অভিহিত করি, তাহার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আমাদের 'গীতা' বলেন, "এই জগৎ উপভোগ করিতে হইলে ত্যাগের পথ অবলম্বন কর।" এবং পুনঃপুনঃই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা সত্যই একটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। যে সর্বস্ব ত্যাগ করে সে-ই পরিশেষে সর্বস্ব লাভ করে। আমি বলিতে চাহিতেছি না যে, একথার এই তাৎপর্য যে আমাদিগকে দারিদ্র্য বরণ করিতেই হইবে, অথবা আমাদের পার্থিব যে-সব সম্পদ্ রহিয়াছে তাহা অবশ্যই সব পরিত্যাগ করিতে হইবে—আমার পক্ষে এইরূপ উক্তি ভণ্ডামির সামিল হইবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কমবেশী পার্থিক সম্পদ্ থাকা সত্ত্বেও আরও পাইবার—নূতন কিছু—বিশাল কিছু অধিগত করিবার এই যে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা, এই যে উন্মত্ত উদ্যম—মানুষের মনের দিক্ দিয়া ইহার নিশ্চয়ই একটা সীমা রহিয়াছে। কারণ, আমার বিশ্বাস জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতেই পাই—প্রত্যেকেই আমরা দেখিতে পাই যে, চরম বিশ্লেষণের পরীক্ষোত্তীর্ণ যথার্থ সুখ অন্তরের উৎস হইতেই উদ্গত হয়—বহির্জগতে তাহার সন্ধান মিলে না। এবং আমার মতে ইহাই হিন্দুধর্মের অন্তঃসলিলা চিন্তাধারা। একটি গাথা প্রচলিত আছে; তাহার ভাবার্থ এই—"ধনসম্পত্তির প্রসাদে নয়, বংশ-মর্যাদার দৌলতে নয়—একমাত্র ত্যাগের পথেই অমরত্ব লাভ হয়।"

বুদ্ধদেবের একটি উপাখ্যানে এই ত্যাগ সম্পর্কিত একটি অতি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। "প্রভু বুদ্ধের জন্য আজ কিছু ভিক্ষা দাও গো—আমি সেই ভিক্ষার অর্ঘ্য বহিয়া লইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে চাই"—এই যাচ্ঞা করিতে করিতে একদা বুদ্ধদেবের এক সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তিপুর নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার ডাকে তখন ধনবান্ ব্যক্তিরা তাঁহাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মণিমাণিক্য দান করিলেন, রমণীরা রত্নালঙ্কার দান করিলেন, আবার অনেকে অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু অনাথপিণ্ডদের মন ভরিল না—তিনি এসব কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি চলিতে লাগিলেন—চলিতে চলিতে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিলেন। পরিশেষে তিনি যখন নগরের উপকণ্ঠে দীনহীনদের পল্লীতে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন দেখিলেন একজন রমণী একটি বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহার অঙ্গের একমাত্র পরিহিত বস্ত্রখানি খুলিয়া লইয়া বুদ্ধদেবের জন্য দান করিল। বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডদ মনে মনে বলিলেন, "ইহাই আজিকার শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, কেননা, এই

বস্ত্রখানিই ছিল এই রমণীর একমাত্র সম্বল। এমনকি সে বুক্ষের অন্তরালে নিজের লজ্জা গোপন করিয়া এই বস্ত্রখানি দান করিয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন, "মেঘের দল যেমন পৃথিবীকে জীবনদায়িনী বারি দান করিতে নিঃশেষে গলিয়া নিজেদের বিলোপ করিয়া দেয়, সেইরূপই ত্যাগ, কারণ ত্যাগের হোমাগ্নি হইতেই অবশেষে নূতন জগতের ক্রমাগত উদ্ভব হইয়া আসিতেছে।"

ভারতের মর্মবাণীর অপর মহান্ মন্ত্র হইল অনুকম্পা—যাহাকে আমরা 'করুণা' বলি—সমস্ত জীবের প্রতি করুণা, যে-ভাবেই যাহারা ব্যথিত, ক্লিষ্ট, তাহাদের সকলের প্রতি করুণা। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগকে আমি দুইটি মাত্র শিক্ষা দিতেছি—দুঃখ এবং দুঃখ হইতে মুক্তি।" মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি মানবের দুঃখের কারণ জানিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবন এই 'করুণা'র আদর্শে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আবার আমাদের ধর্মগ্রন্থরাজির অন্যতম 'ভাগবতে'র একটি সুন্দর শ্লোকে—একজন ভক্ত ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, অমরত্ব চাই না—চাই শুধু জগতের দুঃখজর্জরিত মানবের দুঃখের উপশম করিবার শক্তি।" ইহাই মনে হয় মানবের আধ্যাত্মিক আকিঞ্চনের আকাশচুম্বী জলদার্চিরেখা।

ভারতের ভাবধারার অপর বৈশিষ্ট্য তিতিক্ষা বা সহনশীলতা। এই দাবি আমি একান্ত বিনয়ের সহিত করিতেছি। একথায় এইরূপ বুঝায় না যে ব্যষ্টিহিসাবে আমরা অসহিষ্ণু নই, অথবা এমনকি সমষ্টিহিসাবেও কখনো কখনো অসহিষ্ণু হইতে পারি না। কিন্তু একথা আমি নির্ভয়ে বলিতে চাই যে, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যাঁহারা গরিষ্ঠ তাঁহারা সকলেই এই তিতিক্ষার মাহাত্ম্য শুধু প্রচারই করেন নাই, নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসের পথে নিজেদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু মনীষী স্বীয় মতাতিরিক্ত অন্যান্য অভিমতও স্বচ্ছন্দমনে মানিয়া লন এবং সেই সব মতও যে প্রণিধানযোগ্য তাহা স্বীকার করেন। আপনারা এই উপাসনালয়ের* দেওয়ালে এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" (তিনি এক—ঋষিরা সেই এককেই বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।) ইহাই ভারতের মর্মনিঃসৃত ভাবধারার সার কথা। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "পথ বহু, কিন্তু আলোকশিখা মাত্র একটি" এবং হিন্দুরা একথা অকপটে বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ আমি যতদূর জানি হিন্দুধর্মে অপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তর গ্রহণ করাইবার কোন মতবাদও নাই, প্রথাও নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, যাহারা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলে এবং নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করে তাহাদের প্রত্যেকেই সত্যপথে চলিয়াছে, কেননা তাহাকে উৎকৃষ্টতর পন্থা নির্দেশ করিবার মতো যথেষ্ট প্রাধান্য কাহারও নাই। সকল ধর্মই সত্যে পৌছিবার পথ। একটিমাত্র মিথ্যা ধর্ম আছে—ভণ্ড ও প্রতারকের ধর্ম। কারণ ধর্মের পথ যাহাই হউক না কেন, সে পথে পৌছিতে হয় ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তির একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার ধারা বহিয়া—মানুষ এবং ধর্ম উভয়েরই অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বতত্ত্ব সম্বন্ধেও ক্রমবিকাশের মতবাদ পর্যন্ত গ্রহণ করে। সমগ্র মানবজাতির জন্য একটিমাত্র একছাঁচে-ঢালা পদ্ধতি নাই। কেহ পূজা করে মন্দিরে, কেহ পথে ঘাটে রচিত অস্থায়ী কুটীরে ও তাঁবুতে, কেহ উপাসনা করে গির্জায় আবার কেহ মস্‌জিদে। কিন্তু যদি অকপটভাবে করে, যদি নিরহঙ্কারের সহিত ভক্তিসহকারে করে তাহা হইলে অপরের পক্ষে তাহাকে তাহার নিজস্ব পথ হইতে

* নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটির উপাসনালয়

বিচলিত করিয়া অন্য কোন মতে প্রবৃত্ত ও দীক্ষিত করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

কেননা, হিন্দুমত-অনুযায়ী মানুষের ক্ষেত্রে স্তরে স্তরে চলিয়াছে ক্রমবিকাশ—এমনকি তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্তরেও। কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত মতবাদের ও সম্প্রদায়ের বহুলতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের একটি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্‌জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেন এক প্রকার ক্রমান্বয়িক পর্যায় বা উচ্চনীচ স্তরের পরিমণ্ডল রহিয়াছে এবং আমাদের ভগবদনুভূতির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবার পথও সেই স্তর-অনুযায়ী বিভিন্ন। যাঁহারা নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসক তাহাদের স্থান সকলের উচ্চ স্তরে। তাঁহাদের নীচের স্তরে রহিয়াছেন সগুণ বা লীলাময় ঈশ্বরের উপাসকেরা। তাহার পর আসেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অবতারের উপাসকেরা। তাঁহাদের নীচে রহিয়াছেন যাঁহারা পূর্বপুরুষের, দেবদেবীর এবং ঋষিমহাপুরুষদের পূজা করেন। আর যাহারা তুচ্ছ নৈসর্গিক শক্তি এবং ভূতপ্রেতের পূজা করে. তাহাদের স্থান সকলের নীচে। কাহারও কাহারও দেবদেবী জলে বিরাজ করে—যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাহাদের দেবদেবীর লীলাভূমি স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ। ধর্মজ্ঞান যাহাদের অপরিণত তাহারা মূর্তি পূজার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু ঋষি-ব্যক্তি নিজের গভীর অন্তর্লোকেই ভগবানের সন্ধান পায়।

হিন্দুধর্মের এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতার জন্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ নিজ মুক্তির পথ নিজেরই সন্ধান করিতে হয়। হিন্দুধর্মের এইরূপ মত ও বিশ্বাসের জন্য অনেকে মনে করেন হিন্দুধর্মে কোন শাশ্বত মূল্যবোধ নাই, ইহা অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল। এইরূপ অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হিন্দু-ধর্মে অনেক অনাপেক্ষিক পরম সত্য রহিয়াছে। কিন্তু এই ধর্মের এইরূপ শিক্ষা নয় যে, ঐ সত্যগুলি অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি শুধু বলপূর্বক স্বমতে আনয়নের কথাই বলিতেছি না, এমনকি শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা চাপাইবার কথাও বলিতেছি। কেননা, যে-কেহ নিজের ভাব-অনুযায়ী ভগবানকে বরণ করিয়া লইয়াছে—তাহার পথে আর অন্তরায় সৃষ্টি করা সঙ্গত নহে। হিন্দুধর্মে সুনির্দিষ্টতা নাই বা সংহতি নাই এইরূপ যে প্রচলিত ধারণা সেই সম্পর্কে আমি ফিলিপ্‌ থেয়ারের (Philip. W. Thayer) অধুনা প্রকাশিত "অদূর ভবিষ্যতের জগতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া" (South-East Asia in the Coming World) নামক পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি : -

"জাতীয় অথবা আন্তর্জাতীয় যে ভিত্তিতেই বিচার করা হউক না কেন প্রাচীন হিন্দু-আইন-প্রণালীর পিছনে একটি নীতিমূলক তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল—যাহাকে বলা হইত ধর্ম। ইহা এই জাতীয় বিভাবনা যাহার অনুশাসন ব্যষ্টির পক্ষেও যেমন, পারস্পরিক সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনই বাধ্যতামূলক ছিল। চরম বিশ্লেষণে ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেককেই ন্যায়সঙ্গত কার্য করিতে হইবে—শুধু এই কারণে যে উহা ন্যায়সঙ্গত। উহার স্বীকৃতির মূলে ছিল উহার অলঙ্ঘনীয় দৈবাদেশমূলক উৎপত্তি। হিন্দু-আইনের একেবারে ভিত্তির গভীরে ধর্মের এই প্রতীতির মূল প্রোথিত বলিয়া আইনের সর্ববিভাগেই—তাহার অপরিসীম প্রভাব পড়িত। এই আইনের কোন কোন অংশ বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রবর্তিত ও ক্রমে ক্রমে তথায় আত্মলীন হওয়ার ব্যাপারে ধর্ম তাহার নীতি-মূলক তাৎপর্যের সমগ্র গুরুত্বসহ একটি বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

এই উদাহরণে আমার বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করি।

পরিশেষে বক্তব্য—যুগে যুগে শান্তি ও মিলনের উচ্চতানে ও কামনার আবেগে ভারতের মহান্ মর্মবাণী উত্থিত হইয়া আসিতেছে। "ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ" এই মন্ত্রে আমাদের সকল উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। ইহার অর্থ শান্তি-কামনা। আর, অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকে উদ্‌গীত হইয়াছে—"সমগ্র জীবকুল সমগ্র মনুষ্যকুল সুখী হউক।" —পার্থিব ধনসম্পত্তি লাভে সুখী হওয়ার অর্থে নয়—পরন্তু নিজের সসীম সত্তা এবং সম্মুখস্থ অনন্ত অসীমতা এই দুই-এর অনুভূতিপ্রদীপ্ত অন্তর্লোকের ঐশ্বর্যে সুখী হইবার অর্থে।

পুতুলের বিয়ে

শ্রীকংসারি চট্টরাজ, বি-এল্

গিন্নীপনায় এমনি পাকা আমার কোলের খুকু
সকল গুণে মায়ের শিশু সংস্করণটুকু !
ঝিয়ের সাথে সেদিন মেলায় আনলো পুতুল কিনে,
মা-হারানো মেয়েকে মা ফেলল যেন চিনে।
মাটীর পুতুল হলে কি হয় ? স্নেহের জীয়ন কাঠি
ছুঁইয়ে তারে বাঁচিয়ে দিলো পাঁচ বছরের মা-টি।
নাওয়ায় খাওয়ায় ঠিক সময়ে পাড়ায় তারে ঘুম
কাঁদলে পরে যায় পড়ে তার আদর করার ধুম।

* * *

খেলাঘরের পঞ্জিকাতে একদিনেতে বছর—
দুসপ্তাহে শুনছি খুকুর মেয়ের বিয়ের খবর।
শিশু ঘটক-ঘটকীদলে খুঁজে বেড়ায় বর
পাড়াটাময় বিয়ের যোগাড় চলছে অতঃপর।
মুখুজ্জেদের টুনুর ছেলে পাত্র চমৎকার
তার ছেলেকেই ঘটকীদলে করলো আবিষ্কার।
পাত্রের মা'র মত করতে দিতে হোলো ঘুষ
আধেক খাওয়া সন্দেশ আর কিছু লজেঞ্জুস্।

* * *

দুই বেয়ানের ঘর দু' পাড়ায়, যোগ করে এক নালা
বর্ষা-ভেজা গাঁয়ের গলায় পরিয়ে জলের মালা।
বাদল দিনে পাঠায় খুকু মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী
শ্রীহরি শ্রীদুর্গা বলে নৌকা দিলো ছাড়ি।
নালার জলে চললো বেয়ে কচুর পাতার না',
সবার সাথে দাঁড়িয়ে দেখে পাঁচ বছরের মা।
বৃষ্টি নামে সবাই পালায়, সে থাকে ঠিক চেয়ে—
চোখ ফেটে তার জল পড়ে, সে দেখছে জামাই মেয়ে।
দূরে দূরে আরও দূরে—আরতো দেখছে না—
বট গাছটার গোড়ায় মিলায় কচুর পাতার না'।

বৃষ্টি থামে টুনুর বাড়ী সবাই ছুটে যায়,
তাদের বাড়ীর নালার ধারে নৌকো যদি পায়।
বৃষ্টি নামে, এল খবর যায়নি পাওয়া তরী।
বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌ছে খুকু দিচ্ছে গড়াগড়ি।
বলছি নতুন পুতুল দেবো, আবার হবে মা
সেইটাই চাই কী বায়না, কান্না থামে না।
দুপুর রাতে ঘুমের ঘোরে কয় "সেইটাই চাই,"
বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র বাহু হাতড়ে কোথায় পাই ?
শ্রান্তিবিহীন শ্রাবণধারার শব্দ ঝুপ্‌ঝুপ্
চৌদিকে মোর কেঁদে বেড়ায় শিশুর স্বরের রূপ।
হা-হা করে দমকা হাওয়া হু-হু করে মন।
আকাশ পাতাল এক করে এই কিসের অন্বেষণ ?
ভাবছি তোমার অগম্য ঠাঁই নাই হে ভালবাসা,
ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়েতেও বাঁধলে আপন বাসা !

* * *

জড়ের জগৎ চেতন জগৎ কোনও তফাৎ নাই
হারিয়ে অণু পরমাণু কয় "সেইটাই চাই।"
'সেইটাই চাই' এই ধ্বনিটার কাতর প্রতিধ্বনি
আছ্‌ড়ে কাঁদে হিয়ায় হিয়ায়, এ চাওয়া চিরন্তনী।
শিশুর রোদন গড়ছে কী যে ব্যথার আবহাওয়া
পড়ছে মনে 'সেইটাই চাই' আজও যা নয় পাওয়া।
যা ছিলো 'নাই', আজও সুদূর 'সেইটাই চাই' রব,
অনির্বাণ এ চিতার আগুন শোকের মহোৎসব !

"সংহতিই শক্তির মূল। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র মিলন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জ্ঞান ও কর্ম

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

অর্জুন নামিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে—যুদ্ধ করিতে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যও তাঁহাকে যুদ্ধেই প্রণোদিত করা, তবে জ্ঞানের উপদেশ কেন? একটি বইয়ে 'কুরুক্ষেত্র' শব্দের অর্থ দেখিয়াছিলাম,···কুরু + ক্ষেত্র অর্থাৎ 'কর' ইহাই যে ক্ষেত্রের বাণী, তা শব্দার্থ যাহাই হোক কর্মে বিরক্ত অর্জুনকে কর্মের প্রেরণা-দান যে ভগবানের উদ্দেশ্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। কাজ করিতেই হইবে—না করিয়া উপায় নাই, 'করিষ্যসি অবশোঽপি তৎ'। প্রত্যেকের স্বভাবই কাজ করাইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তবে আর উপদেশের প্রয়োজন কি?

উপদেশের প্রয়োজন এই জন্যই যে স্বভাববশে কাজ করিতে করিতেও আবার স্বভাববশেই মনে প্রশ্ন জাগে, শোক-দুঃখ দেখা দেয় এবং মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে! মানুষের অন্তরই তখন নিজের 'বিবেক', 'বিচার' অথবা 'গুরু', যাহাই বলিনা কেন কোন পথের সন্ধানীর কাছে পথ চায়, একটা আশ্রয় চায় যেখানে বলিতে পারে 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'। পথ বলিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমেই আত্মবিষয়ক জ্ঞানোপদেশ করিলেন, তারপর বলিলেন 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'। বিষয়টি গীতার তত্ত্বোপলব্ধির দিক্ হইতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেহ কেহ বলেন প্রথম কর্ম তারপর জ্ঞান—'কর্ম' সোপান, 'জ্ঞান' লক্ষ্য। আবার কেহ বলেন ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পরে সংসার করিতে।

আমার মনে হয়, গীতায় কথিত 'জ্ঞান' ভবিষ্যতে সাধনার দ্বারা প্রকাশ্য কোন বস্তু নয়—এই জ্ঞান বর্তমান মুহূর্তেরই সত্য এবং চিরকালেরই সত্য। কর্ম-সম্পর্কে যে কথা সত্য তাহাই গীতা অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক অর্জুনকে দেখিতে বলিতেছে মাত্র, কর্মদ্বারা লভ্য সত্যের ইঙ্গিত করে নাই। 'দিবসে সূর্য আছে' এ কথা যেমন সূর্যের অস্তিত্বের সত্যতাই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছে, সূর্যের থাকা যেমন ঐ বলা বা না বলার উপর নির্ভর করিতেছে না, কর্ম-সম্বন্ধে গীতোক্ত সত্যও সেইরূপ—উহা একটি Statement of fact—প্রকৃত বিষয় বা অবস্থার কথনমাত্র। কর্ম-সম্পর্কে অর্জুনের একটা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই অর্জুনের ভাল-মন্দ, পাপপুণ্য ইত্যাদি বুদ্ধি আসিয়াছে, আবার 'অশোকে'র বস্তুতে শোকের সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ম-সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন প্রকৃত সত্যটিকে দর্শন, ইহাই অর্জুনকে প্রদত্ত 'জ্ঞান', উহা কর্মদ্বারা লভ্য কোন বস্তু নহে। কর্মের প্রকৃত সত্যটিকে দর্শনপূর্বক কর্ম করা—ইহাই কর্ম-যোগ। কাজেই গীতায় কথিত কর্মযোগ—জ্ঞানযোগ হইতে অভিন্ন, ইহাই বলিতে চাই।

এই জ্ঞান বা সত্যটিকে লাভ করার অর্থই ভ্রান্তিটিকে দূর করা, ভ্রান্তিটিকে দূর করার অর্থই সত্যটিকে লাভ করা। অর্জুনের ভ্রান্তি সংসারাসক্ত বিচারহীন লোকমাত্রেরই ভ্রান্তি। 'কাজ কে করিতেছে'—এই ব্যাপারেই অর্জুনের এবং সংসারী লোকমাত্রের গোড়ার ভুল, আর এই ভুলেই শোক, দুঃখ। দেহ, মন, বুদ্ধি কাজ করিতেছে বুঝিলাম—কিন্তু এই দেহ-মনের করাই কি আমার করা? দেহাতীত কেহ কি 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপে নাই? গীতা সেই আত্মার কথাই, আমার প্রকৃত স্বরূপের কথাই বলিতেছে। গীতার মতে আত্মা কিছুই করে না। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে যাঁহারা বিচার করেন বা বিশ্বাসের দিক্ হইতে মানেন তাঁহাদেরই কাছে গীতোক্ত বক্তব্যের অর্থ আছে। অধিকাংশ মানুষই

বিচার বা বিশ্বাসের দিক্ হইতে আত্মাকে স্বীকার করেন। কাজেই এই আলোচনা তাঁহাদেরই সঙ্গে চলিতে পারে। অধিকাংশ লোক আত্মায় বিশ্বাসী বলিয়াই গীতোক্ত আলোচনা যুগে যুগে সেই অধিকাংশকে আলোকদানে সমর্থ।

দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অর্জুন স্বীকার করেন। শুধু ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সে আত্মাই কর্ম করে কিনা। আত্মা বলিতে তো 'আমি'ই, আমার প্রকৃত 'আমি', অন্তরতম 'আমি'। প্রকৃত 'আমি' যে—সেই আত্মা এবং সেই আত্মার একান্ত বিনাশ নাই। আমার দেহের বিনাশ আছে, আমার মনের চেতন, অবচেতন, অচেতন অবস্থা থাকিতে পারে, হয়তো বিনাশও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বিনাশ নাই। এই আমার সর্বযুগীয় অস্তিত্ব বা অমরত্বে বিশ্বাসই আত্মায় বিশ্বাস। 'আমি ছিলাম না এমন সময় কখনো ছিল না, আমি থাকিব না এমন সময়ও কখনো আসিবে না'—এই জাতীয় বিশ্বাসই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটিকে যদি একটু স্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখি তবে ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা গীতোক্ত জ্ঞান বা সত্যকে প্রকাশমান দেখিব। আমার প্রকৃত স্বরূপের যদি বিনাশ না থাকে তবে তো জন্মও নাই। কারণ যখনই জন্ম কল্পনা করা হইল তখনই জন্মের পূর্বে অনস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্মায় বিশ্বাস অর্থই হইল অনাদি অনন্ত কালে কোন-না-কোন ভাবে আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস। কেহ হয়তো বলিবেন, আত্মায় বিশ্বাসের অর্থ—অনাদি অনন্ত কালে পরিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত সেই পরিবর্তনশীল অস্তিত্বে বিশ্বাস। উহাতে একই অচঞ্চল কোন সৎ-স্বরূপে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দেহাতীতে একটা সত্তাকেই তো 'আমি' বা 'আত্মা' বলিয়া মানা হইতেছে, যাহা দেহের ভস্মাবসানেও থাকে, মনের সুষুপ্তি বা লয়েও থাকে। মোট কথা আত্মাকে আমাদের অন্তরতম, সূক্ষ্মতম, উপনিষদের ভাষায় 'অণোরণীয়ান্' রূপেই তো আমরা মানিতেছি। অনন্ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া এবং অনন্ত পরিবর্তনকে আত্মার স্বরূপের মধ্যেই ধরিয়া যে আত্মার স্বরূপ-স্বীকৃতি ইহা কিছুটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। শঙ্কর এই মতবাদের ত্রুটি দেখাইয়াছেন। যখন বলা হইল 'ক' 'খ'তে পরিণত হইল তখন কি 'ক'র সম্পূর্ণ বিনাশ কল্পনা করা যায়?—আর যদি না যায় তবে 'খ'তে তো 'ক'র কিছুটা রহিয়াই গেল। ঐ যাহা 'ক' ও 'খ'তে সাধারণ তাহাকেই তো তবে সেখানে পরিবর্তনহীন বলিয়া স্বীকার করা হইল। আর যদি 'ক'র সম্পূর্ণ বিনাশে 'খ'এর উৎপত্তি, তবে তো সব পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যে একটা সূত্র তাহাই ছিঁড়িয়া গেল। সেই ক্ষেত্রে আত্মার অমরত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। গীতায় বলা হইয়াছে আত্মা অমর এবং ইন্দ্রিয়াতীত। সে কিছুই করে না, মরেও না—'করিতেছি'—এই অহংকার ভুল, 'মরিতেছি বা মারিতেছি'—এই অহংকারও ভুল। আত্মার অমরত্বের উপর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত এই জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন।

'করে' কে?—দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সমন্বিত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোসমন্বিত প্রকৃতিই করে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া—প্রতি অণু, পরমাণুর ভিতর দিয়া—মন, বুদ্ধি, অহংকারের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতির করাই চলিতেছে। 'আমি করিতেছি' ইহাই ভুল। বিচার করিলেই দেখা যাইবে—'করিতেছে' আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার ইত্যাদি। প্রকৃত 'আমি' উহার অন্তরালে কোথায় তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এই করার খেলা চলিয়াছে আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার সমন্বিত এই যন্ত্রটিতে। মূলে 'বাসনা' রহিয়াছে। কিন্তু কে খুঁজিয়া দেখিয়াছে ঐ বাসনারও মূলে কে এবং কি?—কোথা হইতে এই কর্মপ্রেরণা

আসিতেছে—'মনসঃ মনঃ প্রাণস্য প্রাণঃ'—কে? গীতা অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, 'তুমি করিতেছ না—করিতেছে তোমার দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকার—এক কথায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী প্রকৃতি।' কিন্তু এই 'প্রকৃতি' কার? —ঈশ্বরেরই।

"দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ৭।১৪

'আমি করিতেছি' রূপ উক্ত অহংকারও প্রকৃতিরই খেলা। প্রকৃতিই করে, জীবের ভ্রান্তি হয় 'আমি করি'। আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা এই সত্য দেখা যায় যে, 'আমি প্রকৃতপক্ষে আত্মা। আমি কিছুই করি না।'

অর্জুনকে কর্মপ্রেরণা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ভ্রান্তিটুকুই দেখাইয়া দিয়াছেন, বুঝাইয়াছেন যে, অর্জুনের আত্মা প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না। 'আমি করি' এই ভুল ধারণায় অর্জুন শোকগ্রস্ত হয়।

'আমি করি না'—একথা না হয় আমার অন্তরতম সত্তার দিক্ হইতে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহাতে কি এই দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া যেরূপ কর্ম চলিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে? —না। শুধু কর্মে এমন একটা নিরহংকার ভাব আসিবে যে, সব 'তিনি' করেন। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া তাঁহারই খেলা চলিয়াছে, তিনিই করিয়া চলিয়াছেন—আমার দেহাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে 'করা' চলিয়াছে উহা তাঁহারই 'করা'। তিনিই ঐ অজ্ঞানরূপী তামসী অহংকার দিয়াছেন, কিন্তু তিনিই আবার অন্তরে ঐ সত্যদর্শনের নির্দেশ এবং বিচারও দিয়াছেন :—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ৯।২৭

তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতিই সব করিয়া চলিয়াছে, 'আমি কর্তা নই' ইহাই জ্ঞান, ইহাই কর্মসম্বন্ধে সত্য। কর্মসম্পর্কে এই সত্যকে দেখা এবং স্মরণ রাখাই গীতার নির্দেশ। ইহাই কর্মযোগ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতায় জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ ভিন্নবস্তু নয়, জ্ঞানের দৃষ্টিতেই 'যাঁর কর্ম তাঁতে সমর্পণ' বা কর্মযোগ সম্ভব। "তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে 'করি আমি'।" সব বুঝিলাম। বিচারেও হয়তো সিদ্ধান্ত হইল যে 'আমি করি না,' ঐশ্বরীয় প্রকৃতিই করে, কিন্তু একথা মনে থাকে কোথায়? মনে রাখা শক্ত তো হইবেই। কারণ ঐ অহংকার তো আর আমাদের সৃষ্ট নয় বা আমাদের আয়ত্তে নয়। উহা ঈশ্বরেরই সৃষ্ট 'মায়া'—'মম মায়া দুরত্যয়া'—তাই বুঝিয়াও বিস্মৃতি আসে, ভুল হয়। শ্রেষ্ঠ 'উপায়' সেই জন্যই বলা হইয়াছে, ঐ মায়াধীশ পুরুষোত্তমের আশ্রয়-গ্রহণ করাকে, যাঁর কাছ হইতে ঐ মায়া আসিতেছে :—

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

তাই প্রত্যেক ধর্মেই তাঁর নিকট প্রার্থনা, অনন্যমনে তাঁর আশ্রয়চিন্তাকে শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। যে সত্য সহজ এবং সরল তাহাকেই দেখার জন্য, তাহাকেই স্মরণ রাখার জন্য আমাদের ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন—কারণ সত্যের প্রতি 'অন্ধ' হওয়া এবং সত্যকে বিস্মৃত হওয়াই যেন আমরা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি।

"কর্মযোগ,—কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে—সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা-জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশুকদেব

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "বেদে আছে হোমা-পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে। —কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"*

কারা এই হোমাপাখীর পর্যায়ভুক্ত? সংসারের আবিলতা-মলিনতা যাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, ঈশ্বরাভিমুখীনতাই যাঁদের জন্মগত সংস্কার তাঁরাই এই হোমাপাখীর দল। যুগে যুগে ক্বচিৎ এঁরা লোকশিক্ষার জন্যে আসেন ও নিবৃত্তিমার্গের পথ দেখিয়ে চলে যান।

পুরাণে আছে, জগৎসৃষ্টির পর শ্রীভগবান্ এর স্থিতির ইচ্ছায় প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করে তাঁদের বেদোক্ত প্রবৃত্তিধর্মের উপদেশ দেন; তারপর সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার নামে চারজন মুনি উৎপাদন করে তাঁদের জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তিধর্মের নির্দেশ-দান করেন।†

সনকসনন্দেরাই 'হোমাপাখী'। এঁরা নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। আমাদের শাস্ত্রে উপনিষৎপুরাণে 'হোমাপাখী'র সন্ধান মাঝে মাঝে মেলে। এইরূপ একটি চরিত্র বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য। ইনি হলেন শ্রীশুকদেব। হোমাপাখীর সাথে তাঁর কী অদ্ভুত মিল! অতি বিচিত্র তাঁর জীবন কাহিনী। নশ্বর সংসারের মধ্যে মায়াবিষ্ট হবেন না এই ছিল শুকদেবের প্রতিজ্ঞা। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতে ইচ্ছা নেই পাছে মায়ার ফাঁদে পড়েন—আশঙ্কা! দু'এক বছর নয় জননীজঠরেই সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কেটে গেল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে। স্নেহময়ী জননী গর্ভ-ভারনিপীড়িতা। কতদিন আর এভাবে কাটাবেন! অবশেষে স্বয়ং ব্যাসদেব গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে আদেশ দিলেন। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর কথা শোনা গেল—বর প্রার্থনা করছেন, যেন সংসারের মায়া তাঁকে বিমোহিত করতে না পারে। ধরিত্রী নিমেষের জন্যে মায়াশূন্য হয়ে ব্রহ্মজ্ঞ পিতার আশীর্বাদধন্য নবজাতকে অঙ্কে ধারণ করলেন পরম শুভক্ষণে। আজ তাঁর আনন্দের আর পরিসীমা নেই। পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশবাতাস সবই যেন শিশুকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বরণ করে নিল। কিন্তু ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মাতৃগর্ভ হতে নির্গমনের পরই অনিন্দ্যসুন্দর কুমার কঠোর বৈরাগ্যের বশে অগ্রসর হতে লাগলেন। গতি অনির্দিষ্ট, কোথায় চলেছেন কিছুই ঠিক নেই। জন্মগ্রহণের পর গৃহত্যাগ, নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয়, সন্ন্যাস—কে কোথায় দেখছে, কে কবে শুনেছে এ রকম কাহিনী! কৌতূহলী দেবগণ অন্তরীক্ষ থেকে দর্শন করছেন আর বোধহয় ভাবছেন, 'অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—এ রকম মহাপুরুষের আবির্ভাব এর পূর্বে কখনও হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই।' কেউ বা দেখছেন, জগৎরূপ জাল ছিঁড়ে দুর্দান্ত সিংহ যেন বেরিয়ে আসছে—'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।' পিতা ব্যাসদেব পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পিছু পিছু চলেছেন। এমনই

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১।১।৭।৩৫

† শঙ্করাচার্য গীতা-ভাষ্যে এই মতের উল্লেখ করেছেন:—"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্মং জ্ঞানবৈরাগ্য-লক্ষণং গ্রাহয়ামাস।"—গীতা, শাঙ্করভাষ্য।

অপত্যস্নেহ। স্নেহের আকর্ষণ যে অতি দুর্বার! 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।'

* * *

বহুকাল মাতৃগর্ভে ধ্যানতদ্‌গতভাবে অহর্নিশি শ্যামের চিন্তায় শিশুর অঙ্গকান্তি হয়েছে শ্যামবর্ণ। অনুপম নবজলদ জিনি শ্যামতনু—নীলোৎপল আভা। আর মুখে মৃদুমৃদু হাস। যত দিন যায় ততই রূপের শোভা শশিকলার মতো বাড়ে আর কথায় অমিয় ঝরে। শুকপাখীর মতো মধুর কণ্ঠস্বর শুনে ব্যাসদেব আদর করে ছেলের নাম রাখলেন শুক। সকলেই বালককে দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। দেবতারাও এসেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র উপহার দিলেন। কিন্তু বস্ত্রপরিধানে কোন লক্ষণ নেই, নিস্পৃহভাব। দেবাদিদেব মহাদেব দেববিধানে শুকদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এইবার শাস্ত্রাভ্যাস। সুরগুরু বৃহস্পতি নিলেন অধ্যাপনার ভার। ব্যাসদেবও সর্বশাস্ত্র পড়ালেন সযত্নে। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! কোন কিছু একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায়। শ্রুতিধর ব্রহ্মচারী। অল্পদিনেই তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়মুকুরে সরহস্য বেদবেদান্তবেদাঙ্গ দীপ্যমান হল। আর সর্বদা জ্ঞানের অতি উচ্চ স্তরে অবস্থান করায় মহর্ষি ও দেবগণেরও মাননীয় হয়ে উঠলেন। বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ যে পূজার্হ! তাইতো 'গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।'

শুকদেব যেন মূর্তিমান্ যজ্ঞমূর্তি। অবিরত অধীত শাস্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করছেন। বিবেক-জ্ঞানের উদয় হয়েছে, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি হল কই? দৃঢ়বিশ্বাসে 'ইহাই বস্তু' প্রত্যক্ষ হবে কবে? পিতা সর্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপ্রাজ্ঞ। একদিন নির্জনে তাঁকে বললেন, "বাবা, এই মায়াময় সংসারের উৎপত্তি, পরিমাণ ও পরিণাম কি?" পুত্রের প্রশ্নে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যা কিছু জ্ঞাতব্য বর্ণন করলেন। কিন্তু পিতৃবাক্য শুকের পর্যাপ্ত মনে হল না। ভাবলেন, 'আমি বুদ্ধিবলে সমস্তই অবগত হয়েছি, বাবা তো তার বেশি কিছু বললেন না।' তখন অন্তর্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্যাসদেব শুকের মনোভাব বুঝতে পেরে পুনরায় বললেন, "আমার জানা সবই তোমায় বলেছি। যদি সংশয় না দূর হয়ে থাকে, তবে মিথিলায় রাজর্ষি জনকের কাছে যাও, তোমার অভীষ্ট লাভ হবে।"

রাজা জনক ছিলেন আবার ব্যাসদেবেরই শিষ্য। তিনি গুরুপুত্রের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আগমনের কথা পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিলেন। এত বড় একজন মহাপুরুষের পুত্র, আর যিনি নিজেও মহাত্মা এবং অতি উচ্চ অধিকারী, তাই রাজর্ষি জনক আগে থেকেই শুকদেবের পরীক্ষা ও অভ্যর্থনার জন্যে বিশেষ কতকগুলি বন্দোবস্ত করে রাখলেন।

পিতার আদেশে শুকদেব বিদেহ-রাজ্যে উপস্থিত। সেখানে ক্রমে ক্রমে একটি রমণীয় উপবনে উপনীত হয়ে দেখলেন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বিচিত্রবস্তুসম্ভার আর বিরাট জনমণ্ডলী। এই সমস্ত দর্শনে তাঁর মনের মধ্যে কিছুমাত্র বিকার এল না। তিনি মোক্ষচিন্তা করতে লাগলেন। উপবনের পরেই রাজপ্রসাদ। শুকদেব প্রাসাদ-দ্বারে পৌছুলেন। কিন্তু একি! কেউ তো তাঁকে অভ্যর্থনা করতে আসছে না? তিনি দ্বারদেশে দাঁড়িয়েই রইলেন। তবে কি মহারাজ জনক তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন। এই পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। পরীক্ষাই যোগ্যতার মানদণ্ড।

দৌবারিকগণ রাজর্ষিকে জানাল শুকদেবের আগমন-বার্তা। মহারাজ অবজ্ঞা-প্রদর্শন করে বললেন, "দাঁড়িয়ে থাকুক।" এইমাত্র বলে সাত-দিন মৌন রইলেন, কোন খবর নিলেন না বা কিছু পাঠালেন না। সপ্তাহান্তে মহারাজ তাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করালেন কিন্তু নিজে আরও কয়েকদিন অদৃশ্য-ভাবে থাকলেন। শুকদেব বার বার খোঁজ করছেন, রাজা কোথায়; কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা! কেউ

তাঁর কথার উত্তর পর্যন্ত দেয় না, দেওয়া প্রয়োজন বোধও করে না। তিনি রাজদর্শন না পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। দিন দিন মন খারাপ হতে লাগল। এত প্রচেষ্টা সবই বুঝি নিষ্ফল!

এদিকে রাজার আদেশে রাজপুরী-মধ্যে শুকদেবের যথোচিত সৎকার হতে লাগল। উচ্চ রাজকর্মচারীরা এসে অভিবাদন ও সুখসুবিধার ব্যবস্থা করছেন। যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা। সুগন্ধি-জলে স্নান করালেন, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দিলেন। আর কত রকমের যে আহার্য ও বিলাসদ্রব্য তার ঠিকানা নেই। তার উপর নৃত্যগীতবাদ্য ও কত আমোদ-প্রমোদ! কিন্তু মহাযোগী শুকদেবের চিত্ত স্থির—নিশ্চল, যেন প্রশান্ত গম্ভীর সমুদ্র! চিত্ত-বৈক্লব্যের কারণ থাকা সত্ত্বেও যাঁদের চিত্ত চঞ্চল হয় না তাঁরাই তো ধীর। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" শুকদেব ধ্যানী মৌনী আত্মনিষ্ঠ হয়ে স্বস্থভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর বদনমণ্ডল পূর্ণ-চন্দ্রসদৃশ প্রসন্ন ও সমুদ্ভাসিত।

রাজর্ষি জনক এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমুদিতাত্মা গুরুপুত্রের স্বভাব সম্যক্ বিদিত হলেন। তার পরে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' ভাবে পাদ্যঅর্ঘ্যসহকারে তাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। স্বাগত প্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসার পর বললেন, "হে শুক, তোমার আগমন শুভ হোক, তোমার অভিলাষ কি বল।" শুকদেব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এই সংসার কি প্রকারে উৎপন্ন হয়েছে এবং কিরূপেই বা এর শান্তি হয় তা' আমাকে শীঘ্র বলুন। পিতার আদেশে আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে শিষ্যরূপে আপনার নিকট সমাগত। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" রাজা তাঁকে কানায় কানায় ভরা একটি দুধের পাত্র দিয়ে সমস্ত সভাটি সাতবার প্রদক্ষিণ করতে বললেন। 'একটি ফোঁটা দুধও যেন না পড়ে'—এই আদেশ। শুকদেবের মনের উপর অসীম প্রভাব, অদ্ভুত তাঁর একাগ্রতা। উৎসব-মুখরিত রাজসভা একবার দুবার করে সাতবারই দেখতে দেখতে প্রদক্ষিণ করা হল, কিন্তু কই দুধের একটি ফোঁটাও তো পড়ল না! তখন মহারাজ জনক তাঁকে ব্যাসদেব যেরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন অবিকল সেই সমস্তই বললেন।

শুকদেব বললেন, "আমি তত্ত্ববিচারের দ্বারা যে সমস্ত জেনেছি, বাবাও আমাকে সেই উপদেশ দিয়েছেন; আপনার কাছে যা শুনলাম তাও একই। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপই দৃষ্ট হয়। আমি নিশ্চয় করেছি যে, এই সংসার কেবল স্বকীয় কল্পনায় সমুত্থিত হয়েছে, কল্পনার ক্ষয় হলে ইহাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসার। মহারাজ, আমার বিচারপ্রভব তথ্য সত্য কিনা বলুন।"

রাজর্ষি দেখলেন শুকদেবের প্রত্যেকটি কথায় প্রাণের আকুতি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বৎস, তুমি স্বয়ং যা জেনেছ এবং গুরুমুখে যা শুনেছ তাইই অবধারিত। এ ছাড়া আর কোন নিশ্চয় নেই। হে শুক, অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব কোথায়? সেই এক অদ্বয় পরমাত্মা স্বীয় সঙ্কল্পের বশীভূত হয়ে সংসারী ও জীবভাবে বদ্ধ হয়েছেন; ইনি যখন নিঃসঙ্কল্প হবেন তখনই হবে সংসারবিমুক্তি ও সুখ-দুঃখের চির অবসান।" ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে বিদেহ-রাজ উপদেশ দিয়ে চলেছেন—নিজের অধ্যাত্ম সম্পদ্ যেন নিঃশেষে উজাড় করে দিচ্ছেন। উপযুক্ত শিষ্যকে গুরুর অদেয় যে কিছুই থাকেনা! শুক অবধান-সহকারে প্রতিটি উপদেশ শুনছেন—প্রতিটি বাণী যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃকর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে আর আনন্দতরঙ্গে হৃদয় উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে।

জনক বললেন, "হে শিশু মহাবীর! ভোগ একপ্রকার রোগবিশেষ আর এই ভোগ অত্যন্ত দীর্ঘ; তুমি বাল্যকালেই যখন তাতে বিরক্ত হয়েছ

তখন তোমাকে মহাবীর বৈ আর কি বলি। তোমার পিতা ব্যাসদেব বেদবিভাগ করেছেন; তিনি আমারও গুরু, তিনি সমস্ত জ্ঞানের আকর। তুমি তাঁর প্রিয় পুত্র ও উপযুক্ত শিষ্য, তার উপর দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে সর্ববিদ্যা অধ্যয়ন করেছ। তোমার মতো ত্রিজগতে আর কে আছে? তুমি বাল্যকালেই যেরূপ পূর্ণজ্ঞানী হয়েছ, সুদীর্ঘ তপস্যা করে যোগী ঋষিদের পক্ষেও সেইরূপ জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য। পূর্বতন ঋষি ও আচার্যগণ মানুষের ধর্মশিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের সীমা-নির্ণয়ের জন্যে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্মসংস্থাপন করেছেন। লোকে সেই নিয়মানুসারে ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বহুজন্মের পর কর্মের শুভাশুভ পরিত্যাগ ক'রে মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ জন্মজন্মান্তরের তপস্যায় ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত ও পরিশোধিত করে, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করতে পারলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। সর্বদা তমোগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে পরমাত্মায় মনঃসন্নিবেশ কর্তব্য। ইহা যে কোন আশ্রমেই হতে পারে। ধন্য তোমার জীবন, যেহেতু বাল্যেই তুমি এই পরম সম্পদ্ মোক্ষফল লাভ করেছ। আমি বিদেহ অর্থাৎ শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং 'আমি শরীর নই, মন নই—নিত্যশুদ্ধ আত্মা' এই উপলব্ধি আমার হয়েছে। কিন্তু এই অনুভূতি তোমার মত ছেলেবেলাতেই আমার হয়নি। তোমার ভোগবাসনাও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। তাই তুমি ব্যাসদেব ও আমার চেয়েও মহান্। হে ব্রহ্মণ, তুমি যা পাবার পেয়েছ, কিছুই আর তোমার অপ্রাপ্য নেই। তুমি আর কোন দৃশ্যবস্তুতে নিমগ্ন নহ, সুতরাং মুক্ত। এখন সংশয় পরিত্যাগ কর।"

মহাত্মা জনকের এইরূপ মহত্তম উপদেশে শুকদেবের সমস্ত সংশয় তিরোহিত হল। তখন তিনি শোক, ভয়, আয়াস ও সর্বপ্রকার চেষ্টা পরিশূন্য হলেন। তারপর গুরুর চরণবন্দনা করে প্রসন্নমনে জনকপুরী থেকে বিদায় নিলেন।

পথিমধ্যে নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে মৌনভাবে যোগাসনে উপবেশন করলেন। ব্রহ্মজ্ঞের মুখমণ্ডলে অপূর্ব আনন্দজ্যোতি! যেন ভিতরের আনন্দস্রোত বাহিরে উপচে পড়ছে। দলে দলে অধ্যাত্মপিপাসুরা তাঁর চারিদিকে ভিড় করতে লাগল। কী সুন্দর সে দৃশ্য!

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥"

কী আশ্চর্য! বটবৃক্ষের মূলে তরুণ গুরু বৃদ্ধশিষ্যগণ-পরিবৃত। মৌনই গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যান এবং তাতেই শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে!

* * *

ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র রচনা করছেন। আর পুত্র ধ্যানতন্ময়ভাবে তাঁর সামনে বসে শুনছেন। ভবিষ্যতের কল্যাণদীপিকা এই বেদান্তগ্রন্থ। যখন বেদান্তসূত্রের রচনা শেষ হল, ব্যাসদেব অবাক্ হয়ে দেখলেন সমুদয় গ্রন্থ শুকের কণ্ঠস্থ এবং এর প্রতিপাদ্যবিষয় সম্পূর্ণরূপে অধিগত। তাই বলে উঠলেন—'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, অন্যো বেত্তি ন বেত্তি বা।—ব্রহ্মসূত্রের মর্ম আমি জানি, শুক জানে অন্য কেউ এর তত্ত্ব জানতে পারে, নাও পারে।' বেদান্তের প্রত্যেকটি সূত্র ও উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র যেন ভাস্বররূপ পরিগ্রহ করে শুকদেবের চোখের সামনে জলজল করছে—আর তিনি সচ্চিদানন্দ-সাগরে স্নান করছেন। আশ্চর্য অনুভূতি!

* * *

এর পরে মহামতি ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীহরির গুণ ও লীলা বর্ণন করে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করলেন। এই বিশাল গ্রন্থ-রচনায় শুকদেবের অবদানও কম নয়। জীবনব্যাপী সাধনার অমৃতনির্ঝর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমর

লেখনী দিয়ে বেরিয়ে এল। মানুষের কল্যাণের জন্য ভাগবত রচিত হয়েছে, এখন জগতে তার প্রচার না হলে লোকে কেমন করে সেই অমৃতের সন্ধান পাবে? তাই ভগবান্ স্বয়ংই যেন ঘটনা-পরম্পরার পরিবিস্তারে প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন।

দ্বাপরের শেষ সীমা উপস্থিত হতে চলেছে। পাণ্ডববংশাবতংস রাজচক্রবর্তী মহারাজ পরীক্ষিৎ বিধির বিধানে শাপগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি তো পরমভাগবত—তিনিও রেহাই পেলেন না। দুর্লঙ্ঘ্য বিধিলিপি! বনমধ্যে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে কী মতিভ্রম হয়েছিল তাঁর, ধ্যানস্থ শমীকঋষির গলায় মরা সাপ পরিয়ে দিলেন—তাইতো ঋষিপুত্র বালক শৃঙ্গী তাঁর প্রতি বাগ্‌বজ্র নিক্ষেপ করে ফেললেন—'বিনা দোষে পিতার আমার অবমাননা! আজ থেকে সাত দিনের দিন সর্পদংশনে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।' চারিদিকে হায় হায় রব পড়ে গেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ অভিশপ্ত। অমোঘবাক্ সত্যসন্ধ যে, বালক হলেও তার বাক্য নিষ্ফল হয় না!

দুর্বার অভিশাপ! মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে পুত্র জনমেজয়ের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে তিলে তিলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পুণ্যময়ী গঙ্গার তীর—প্রায়োপবেশনরত রাজা। সাত দিনের মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হবে—তবে নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্? এখন অনন্যমনে একমাত্র ভগবানেরই শরণ নেওয়া দরকার। প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার মিলনক্ষেত্রে অনশনের কথা রাষ্ট্রের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে। চতুর্দিক্ থেকে দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মুনি, ব্রাহ্মণ ও রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ দলে দলে প্রজাবৎসল মহারাজের কাছে সমবেত হচ্ছেন। বিপদের সময় যাঁরা পাশে এসে দাঁড়ান তাঁরাই তো বন্ধু। লোকপূজ্য ব্যাসদেব ও ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদও এসেছেন। স্বর্গ থেকে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করবার জন্যে যজ্ঞও আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু অব্যর্থ যে শাপ—তার যে কোন প্রতিকারই নেই! তবু কল্যাণকামীর মন মানে না, প্রতিকার চায়। পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে মরণের করাল ছায়া যেন ধেয়ে আসছে। সকলেই মলিন—বিষাদাচ্ছন্ন। কারুর মুখে কথাটি নেই—সবাই নির্বাক্, নিস্পন্দ, পাষাণবৎ সমাসীন। কেবল ভাগীরথীর কলধ্বনি এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। অমানিশার আকাশে মেঘের কোলে বিজলির হাসি যেমন অন্ধকার ভীষণতর করে তোলে সেইরূপ গঙ্গার তরঙ্গধ্বনিতে চারিদিকের নীরবতা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সহসা সভার সহস্র সহস্র চক্ষু এ'কার দিকে নিপতিত হল? সকলে সোৎসুকে কাকে দেখছেন? কে আসছেন—শ্যামবর্ণ, দিগম্বর, ধূলিধূসরিত তনু। আহা ভুবন-ভোলানো রূপ, পিঙ্গলকেশ আবার তপস্যার শক্তিতে শিরোপরি জ্যোতির বলয়াকার আবেষ্টনী—তার থেকে চারিদিকে আলো ঠিকরে পড়ছে! আশ্রম-চিহ্নবিহীন স্বৈরবিহারী চিরকিশোর কে ইনি? ইনি শ্রীশুকদেব। সবার মনে একটি কথাই জেগে ওঠে, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?' —গুণাতীত অদ্বৈত ব্রহ্মে বিচরণশীল জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সমস্ত বিধিনিষেধের পারে। বর্ষিষ্ঠ ঋষি-মহর্ষিগণও মুহূর্তে যন্ত্রচালিতের মতো ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা সেই পরম রমণীয় মূর্তিকে বরণ করে নিলেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে উপযুক্ত আসনে বসালেন। রাজচক্রবর্তী প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন দিগম্বর ভিক্ষুক!

আজ অভিশপ্ত রাজার আনন্দের সীমা নেই। ব্রহ্মজ্ঞের শুভাবির্ভাবে তাঁর মরণোন্মুখ জীবন অনন্ত জীবনের আশায় উদ্বেল! তিনি যোগীদের পরম-গুরুরূপে শুকদেবকে সম্বোধন করে বললেন,—

"কথয়স্ব মহাভাগ! যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥"

(ভাগবত—২।৮।৩)

"হে মহাভাগ, বিষয়সঙ্গশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করে দেহত্যাগের উপায় আমাকে বলে দিন।"

ব্রহ্মচারী শুকদেবের মুখ থেকে অজস্ররসধারায় নির্গলিত হল পুণ্য ভাগবতী কথা—দ্বাদশ স্কন্ধবিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাতদিন ধ'রে। এখনও ভক্তজন 'আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি।' আজও ভগবৎবিষয়ক প্রশ্ন, বিষ্ণুপদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতাকে সমভাবে পবিত্র করে থাকে।

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥"

ভাগবত—১০।১।১৬

যার জন্যে ধরাতলে অবতরণ সেই লোককল্যাণব্রত উদ্‌যাপিত হল। আর কেন? আর তো কোন বাসনা নেই, একেবারে নির্বাসনা হয়ে গেছে চিত্ত। এখন পরমব্রহ্মে বিলীন হতে হবে। শুকদেব চলেছেন নিঃসঙ্গ হয়ে কোন্ সুদূরের আহ্বানে কে জানে? নানা রমণীয় সুগম দুর্গম পথ অতিক্রম করে কৈলাস-শিখরে গমন করলেন। সেখানে যোগাসনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বহুদিন কেটে গেল একই ভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে। সলিলকণা যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেলে তার আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না সেইরূপ শুকদেবেরও আর পৃথক্ সত্তা রইল না, তিনি পরাৎপর পরমাত্মার পবিত্রপদে একীভূত হলেন। পশ্চাতে রেখে গেলেন অনন্ত-কালের জন্যে একটি আধ্যাত্মিকতার ভাবসমুদ্র—আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত রইল তার তরঙ্গ শুধু মহাতাপসদেরই অনুভূতিগম্য হয়ে।

আর্তি

শ্রীদিবাকর সেনরায়

মানস-দ্বন্দ্বের ক্ষত বেড়ে চলে দিন হতে দিন—
ক্ষুদ্রতার জয় আনে মহতের আশু পরাজয়,
এ জীবন-পারাবার সান্ত নয়—এ যে অন্তহীন—
শুধু দৈন্য, রিক্ততা যে প্রাণরসে করে ফেলে ক্ষয়।

অল্পতায়—দীনতায় আজ হতে হোক্ অবসান,
মৃত্যুর তুহিন তুলি আঁকে জানি কালো বর্ণ-ছায়া,
তবু নব দীক্ষা লয়ে সঞ্জীবিয়া ওঠো মোর প্রাণ,
মানস-গহন ছেড়ে কল্পময়ী ধরো তব কায়া।

ক্ষুদ্রতারে বিসর্জিবে যদি, খোঁজ উৎসটি তার—
কোথা হতে এ বিধ্বংসী বীজরাশি পড়ে উড়ে উড়ে,
খোঁজ তবে কবে সেই অবিমৃষ্য কোন্ পাপে কার
উঠেছিলো এতো জ্বালা বসুধার বক্ষটি ফুঁড়ে।

সেই জ্বালা আজো বুঝি ভোলে নাই এই সর্বসহা—
ভীতিময়—ভয়ানক স্মৃতিভারে কেঁপে কেঁপে ওঠে,
চক্ষে ঝরে—অশ্রু নয়, রক্তধারা—সর্ববুকদহা,
অপরাধ সন্তানের, অভিযোগ তাই ঠেকে ঠোঁটে।

সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠেছিলো অমৃতের সাথে,
গরলই তো পড়েছিলো আত্মভোলা মহেশের ভাগে—
অমৃত কেহ তো এনে দেয় নাই তুলে তাঁর হাতে,
বিষপানে নীলকণ্ঠ শিব, অন্যে অমৃত যে মাগে।

আমি জর্জরিত আজ কামনার তীব্র কালকূটে,
কোথায় সে নীলকণ্ঠ—গরল যে ধরেছিলো গলে?
আর্ত দিশাহারা আমি তাই আজ কৃতাঞ্জলিপুটে
ডাকি শিবে, যদি পান করে নেয় সেই হলাহলে।

স্বামী প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গে শেষ-সফর

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, এম্‌-এস্‌সি

শিয়ালদহ ষ্টেশনে গোয়ালন্দগামী ঢাকা মেল দাঁড়াইয়া আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন,—"তুইও যাবি নাকি ?" আমাদের তখন বি-এস্‌সি, পরীক্ষা চলিতেছিল। থিওরেটিক্যাল হইয়া গিয়াছে, প্র্যাক্‌টিক্যাল বাকী। বলিলাম,—"আজ্ঞে, এখনও একজামিন চলছে, একজামিনটা শেষ হলে আপনার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে চাই।" তিনি অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িল। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গে তাঁহার শেষ সফরে বাহির হইলেন ; সঙ্গে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) এবং আরও কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী। যতদূর মনে পড়ে এই সময়টা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস।[১]

পরীক্ষা শেষ হইতেই পরীক্ষার হল হইতে একেবারে উদ্বোধন অফিসে গেলাম শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের তখনকার অবস্থান জানিবার জন্য। তথায় জানিলাম, তিনি ঘারিন্দা গ্রামে কয়েকদিন থাকিয়া সিরাজগঞ্জে ফিরিবেন এবং তথা হইতে ময়মনসিংহ যাইবেন, কিন্তু সিরাজগঞ্জে ফিরিয়াছেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। পরদিন অনিশ্চিতের উদ্দেশেই রওনা হইলাম। মনে একটা অস্বস্তি রহিল, কারণ তখন সি, আই, ডি পুলিশের বড়ই জুলুম। মাস দুই পূর্বে লাট সাহেব (লর্ড কারমাইকেল) মঠ মিশনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতার কয়েকদিন পরে মঠে যাইলে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন,— "কিরে তোর ভয় ডর নেই ?" আমি ত অবাক্‌! বলিতে লাগিলেন,—লাট সাহেব বক্তৃতা দিয়েছেন, মঠ মিশন সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল, সেই অবধি মঠে তেমন লোকজন আসে না ইত্যাদি। এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিলাম। শেষটায় বলিলেন,—"আসবি, খুব আসবি, আসতে যেতেই হবে।" মনে মনে আওড়াইতে লাগিলাম 'আসতে যেতেই হবে,' আসতে যেতেই হবে।'

যাহা হউক সিরাজগঞ্জঘাটের টিকিট করিলাম। উদ্দেশ্য, উক্ত ষ্টেশনে নামিয়া যেরূপ খবর সংগ্রহ করিতে পারিব তদনুসারে সেখান হইতে সিরাজগঞ্জ শহরে অথবা ময়মনসিংহে রওনা হইব। সিরাজগঞ্জ ঘাটে নামিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম, মহারাজ ঘারিন্দা হইতে সিরাজগঞ্জে ফিরিয়াছেন এবং ডাক্তার শশীবাবুর বাসায় আছেন। তখন সেখান হইতে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শশীবাবুর বাসায় হাজির হইলাম। পূর্ববর্তী ষ্টেশন সিরাজগঞ্জ কোর্টে নামিয়া খোঁজ করিলে এতটা হাঁটিতে হইত না ; কিন্তু সি, আই, ডির ভযে তাহা করি নাই। আমার পৌঁছিবার একটু পূর্বেই মহারাজ মধ্যাহ্নের আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরে গেলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমায় কুশল-প্রশ্ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাহার করিতে বলিলেন। সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে সকলের সঙ্গে সলফ্‌ গ্রামে শ্রীযুত ভূপেন্দ্র সান্ন্যালের বাড়ীতে গেলাম।

ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া মহারাজ তথাকার ভক্তদের আনন্দবর্ধন করিলেন। ভূপেনবাবু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা করেন। তাঁহার বড় ভাই

১ প্রবন্ধের ঘটনাগুলি ১৯২৬ সনে স্মৃতি হইতে লিপিবদ্ধ এবং ১৯৫২ সনে পুনর্লিখিত।

ইহার বিরোধী, এবং এইজন্যই নাকি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করেন। ভূপেনবাবুর মা একদিন মহারাজের নিকট তাঁহার এই দুঃখ নিবেদন করিলেন। মহারাজের অনুরোধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাড়ীতে আসিলেন। তিনি বাঁয়া তবলায় পারদর্শী ছিলেন, এদিকে মহারাজের সঙ্গী একজন সন্ন্যাসী অতি উপাদেয় ভজন গাহিতেন। উভয়ের সহযোগে খুব ভজন-কীর্তন হইল। কিন্তু ভদ্রলোক মহারাজের স্নেহপ্রেমে ধরা দিলেন বলিয়া মনে হইল না। মহারাজ খুব উত্তেজিতভাবে ভূপেনবাবুকে একচোট বকিলেন,—"ঠাকুর স্বামীজী সকলকে ভালবেসে আপনার করেছিলেন, আর তুমি যদি ঠাকুর-স্বামীজীর নাম করে আপন ভাইকে পর করে দাও তো তবে ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার ঠাকুরের নাম লওয়া, ফেলে দাও ঠাকুর-স্বামীজীর ছবি পুকুরের জলে ইত্যাদি।"

মহারাজ একদিন ভূপেনবাবুর এক জ্ঞাতির বাড়ীতে সদলে ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাহাদের বাড়ীর একটি ছেলের খুব জ্বর ছিল, মহারাজ সেই ছেলেটিকে দেখিতে চাহিলেন। বাড়ীর লোকের ওজর আপত্তি না শুনিয়া মহারাজ রোগীকে দেখিলেন এবং "ভয় নাই ভাল হবে" বলিয়া আশ্বাস দিলেন। একদিন পাশের গ্রামের এক ভক্তের[২] বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিলেন। সেখানে বিশিষ্ট গায়কগণের কণ্ঠে ভজন খুব জমিয়াছিল, এবং আমরা ইতরে জনাঃ মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পাইলাম। এই শেষোক্ত জিনিসটাতেই আমাদের রুচি ছিল বেশী। একদিন এইরূপ মিষ্টান্নের আহ্বান উপেক্ষা করায় মহারাজ বলিয়াছিলেন "ওরে নাই যদি খাবি, তবে আমার সঙ্গে এলি কেন?" এখানে এক রাজবন্দীর মাতা মহারাজের কাছে অনেক দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজের এই সফরে দেখিলাম রোগশোকদারিদ্র্যের মতো রাজরোষও বাংলার ঘরে ঘরে দুঃখের তমিস্রা নামাইয়াছিল।

দীনেশ নামে একটি ছেলে মহারাজের বিশেষ স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। একদিন তিনি ওজন করার ভঙ্গীতে তাহার ডান হাতটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুর এইভাবে হাতের ওজন নিয়ে ভাল মন্দ লক্ষণ বুঝতে পারতেন।" ছেলেটি একদিন মহারাজকে বলিল 'তাহাকে কে বলিয়াছে, সাধুর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করার কি দরকার?' মহারাজ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলিলেন,—"সাধুকে দর্শন স্পর্শন করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে হয়।" একদিন স্থানীয় এক ফুটবল ম্যাচে দীনেশের দল জয়ী হইল। লোকে বলিতে লাগিল তাহার দল মহারাজকে প্রণাম করিয়া খেলিতে গিয়াছিল বলিয়াই জয়ী হইল।

তাহার পর একদিন পূর্বাহ্নে সকাল সকাল খাইয়া ময়মনসিংহ যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ রওনা হইলাম। অপরাহ্নে সিরাজগঞ্জে এক ভক্তের বাড়ীতে উঠা গেল। সেখানে শ্রীঅধর দাস নামে তফসিলী জাতির একজন প্রচারক মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা সকলে সিরাজগঞ্জ ঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমারের হিন্দু কর্মচারীরা, হিন্দুযাত্রীরা এবং ক্রমে মুসলমান কর্মচারীরাও মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে কীর্তন আরম্ভ হইল। উদ্দাম নৃত্যাদি সহ যখন কীর্তন সমাপ্ত হইল, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, ষ্টীমারও তাহার গন্তব্য পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ষ্টীমার পৌঁছিবার পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বৃষ্টি না থামাতে ষ্টীমার ভিড়িতে বিলম্ব হইতে লাগিল। যাত্রীরা নামিবার জন্য প্রস্তুত, মহারাজও উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গতরাত্রের আনন্দমূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে;

২ শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এ, হেড্ মাষ্টার।

মহারাজ এত গম্ভীর যে তাঁহার দিকে তাকান যায় না।

জগন্নাথগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। মহারাজ ময়মনসিংহে সদলবলে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। বছর দেড়েক পূর্বে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ একত্রে ময়মনসিংহে আসিয়া এই বাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আকর্ষণে বৈঠকখানায় বহুলোকের সমাগম হইত। মহারাজ সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, কখনও বা গায়ক সন্ন্যাসীটির ভজন হইত। সুপুরুষ এক ভদ্রলোককে প্রায়ই এই বৈঠকে দেখিতাম। তিনি মৌনীই থাকিতেন, হঠাৎ একদিন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন, ইনি (স্বামী প্রেমানন্দ) কত মহৎ। আমি সি, আই, ডি'র লোক, উপরওয়ালার আদেশে একদিন বেলুড় মঠে অনুসন্ধান করিতে যাই। গ্রীষ্মকালে দুপুর রোদে হাঁটিয়া মঠে পৌঁছি এবং উত্তাপ ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ি। মঠ তখন নিঝুম, সকলে বোধহয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোথা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি তখন এত অবসন্ন যে, কোন আপত্তি করিলাম না। পরে তিনি কিছু প্রসাদ ও পানীয় জল আনিয়া দিলেন। আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম এবং পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহার অজানা ছিল না, তথাপি তিনি আমার এরূপ সেবা করিলেন। কে তিনি জানেন? ইনি ইনি!"

এখান হইতে নেত্রকোণায় যাওয়ার কথা হইতে লাগিল। মহারাজকে সেখানে লইয়া যাওয়ার জন্য শ্রীনীরদ সান্যাল প্রমুখ কয়েকটি যুবক ভক্তের আগ্রহ। প্রথমে শুনা গেল, এক ভদ্রলোকের মোটর গাড়ীতে মহারাজকে ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোণায় লওয়া হইবে। সেটা বাতিল হইয়া গেল। ইহার পর শুনিলাম, ময়মনসিংহ-নেত্রকোণায় যে নূতন রেল লাইন হইয়াছে তাহাতে যাওয়া হইবে। যদিও তখন যাত্রীগাড়ী যায় না, কেবল Ballast train চলে, তথাপি পরিচিত লোকের সাহায্যে মহারাজের পার্টির জন্য ঐ ট্রেনে একখানা যাত্রীগাড়ী জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঐ দীর্ঘ, সংস্কার বর্জিত ও বিপজ্জনক ২৫ মাইল রাস্তা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইল। সকালবেলা রওনা হইয়া অতিকষ্টে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক ডাকবাংলোতে আহারাদির জন্য উঠা গেল। সড়ক অনেক স্থলে ভাঙ্গা ছিল। সমস্ত রাস্তায় কতবার যে সহিস গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ার ভয়ে তাহাকে ঠেলিয়া ধরিয়াছে, আর আরোহীদেরও যে কতবার নামিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। ডাকবাংলোতে খাওয়ার সময় এক পুলিশ অফিসার (D.S.P.) আসিয়া উপস্থিত। এই অফিসারটির (মুসলমান) নাকি আমাদের দেখিয়াই মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি নাকি মহারাজকে কি কড়া কথাও বলিয়াছিলেন। ইহাও নেত্রকোণার অপরিণত বুদ্ধি ছেলেদের অবিবেচকতার ফল। কারণ যদিও তাহারা ময়মনসিংহ হইতেই এই বাংলোয় আহার ও বিশ্রামের মতলব করিয়া আসিয়াছিল তথাপি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে অনুমতি লয় নাই। মহারাজ সমস্তই হজম করিয়া গেলেন। কেবল তাঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় আরক্তিম ও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তাঁহার বোধহয় সেখানে আর এক মুহূর্তও থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছিল, আমাদের আহারের জন্য তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। যথেষ্ট কলাপাতার যোগাড় ছিল না। তাতে কি আসে যায়? একজনের উচ্ছিষ্ট পাতে আর একজন খাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দারুণ রোদ, হাওয়া নাই, গাড়ীর ছাদ ভয়ানক তাতিয়া গিয়াছে। অল্প

বেলা থাকিতে নেত্রকোণায় যথাস্থানে পৌছিলাম অর্ধমৃত অবস্থায়। দেখিলাম বিরাট জনসভা, মহারাজ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি আমাদের কিছু আগে পৌছিয়াছিলেন। আমার জোয়ান বয়সেই যখন অতটা কষ্ট হইয়াছিল, তখন তাঁহার যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহা অনুমেয়। তিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন ঐ ছেলেগুলির মুখ চাহিয়া—এই কথা নিজমুখে পরে বলিয়াছিলেন।

একদিন নেত্রকোণার এস্‌ডিও আসিয়া দেখা করিলেন। পূর্বোক্ত পুলিশ-অফিসারের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, তিনি আসিয়া দেখা করিয়া যাইবেন। পরে একদিন ঐ অফিসার আসিলেন এবং মহারাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাগোছের করিয়া নিজের আচরণের সমর্থনে বলিলেন,—"আপনি তখন নিজের পরিচয় দিলে এইরূপ হইত না।" এস্‌ডিও মহারাজকে তাঁহার বাংলোয় খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আর একদিন নেত্রকোণার সরকারী ডাক্তারের বাড়ীতে নৈশ আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারের সময় ডাক্তার অনুপস্থিত, সবগুলি জিনিস খাওয়ার উপযুক্ত ছিল না—ফিরিবার পথে আমরা এই সব আলোচনা করিতেছিলাম। মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"ওরে, নেমকহারামি কচ্ছিস? যার খেলি তারই নিন্দা কচ্ছিস?" মহারাজের সাঙ্গোপাঙ্গদের খাওয়াইতে উৎসবের উদ্যোক্তাদের বেগ পাইতে হইতেছিল দেখিয়াই মহারাজ সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছিলেন, ইহাই আমার ধারণা।

মহারাজের কাছে সকালে বিকালে অনেক লোক-সমাগম হইত। তিনিও নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। একদিন ভিড় বেশী হওয়াতে তিনি আমাদিগকে বলিলেন—তাঁহার আরও কাছে আগাইয়া বসিতে। আমি তখনও তাঁর ও আমার মধ্যে ব্যবধান রাখিতেছি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি সাপ না বাঘ যে কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিস?" এইরূপ প্রসঙ্গকালে একদিন এক যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, কাম কি করে দূর হয়?" মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়; যাঁরা কাম জয় করেছেন—যেমন ঠাকুর স্বামীজী তাঁদের চিন্তা করতে হয়; আর মনে খুব জোর রাখা চাই—কি, আমি তাঁর সন্তান, আমার আবার কাম? 'দূর হয়ে যা যমের ভাটা, আমি ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা, তোর যমের যম হতে পারি ভাবলে মায়ের রূপের ছটা'—ইত্যাদি।" এইরূপ প্রসঙ্গের পরে একদিন বাহিরের লোক চলিয়া গেলে মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"আর রেখে ঢেকে বলতে পারি না। * * * ঠাকুরের নাম চিন্তা করলেই যে সব হয়।" তিনি সকলের সমক্ষে ঠাকুরের কথা বলিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রকাশ্যে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার রেওয়াজ তখনও হয় নাই।

মহারাজের নেত্রকোণাত্যাগের প্রাক্কালে তথাকার অনেকেরই চোখে জল দেখা গিয়াছিল। এক বৃদ্ধ উকীল একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহারাজ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, আপনি বেলুড় মঠে গিয়ে কিছুদিন আমাদের Guest-house-এ থেকে আসবেন—গঙ্গার ধার, ফাঁকা জায়গা, খুব নিরিবিলি আর শান্তিময় স্থান।

নেত্রকোণা হইতে রওনা হইতে হইতে বেলা ২৷৷-৩টা হইয়া গেল। এখান হইতে সেই ডাক-বাংলো পর্যন্ত মহারাজের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা হইল। কারণ রাস্তার এই অংশটাই বেশী খারাপ ছিল এবং এখানেই গাড়ীর ঝাঁকানিতে ও কাত হইয়া পড়ার আশঙ্কায় কষ্ট হইয়াছিল বেশী। কিন্তু পাল্কীর ঝাঁকানি না থাকিলেও নীচু ছাদের গরমে মহারাজের খুব কষ্ট হইয়াছিল। ডাকবাংলোর কাছে পৌছিয়া মহারাজ পাল্কী ছাড়িয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সন্ধ্যার পরেই ময়মনসিংহের অপর

পারে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আমাদের গাড়ী থামিল। নিজের কাপড়-বিছানার ছোট পুঁটুলিটি ঘাড়ে করিয়া খেয়া নৌকায় আসিয়া উঠিলাম এবং পুঁটুলিটি নামাইয়া তাহার উপর বসিব ভাবিতেছি এমনসময় মহারাজ পিছন হইতে আসিয়া অবসন্নভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। আবার যাইয়া শ্রীযুত জিতেন দত্তের বাড়ীতেই উঠা গেল। সেখানে রাত্রিবাস, রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখিলাম, মহারাজ বাহিরে যাইবার জন্য দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে যাইতে দিলেন না। অগত্যা ফিরিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরের দিন শুনিলাম তিনি ঘরে ঢুকিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক নেত্রকোণা হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার খুবই ক্লেশ হইয়াছিল। তথাপি তিনি ময়মনসিংহে একটা দিন বিশ্রাম করিতে রাজী হইলেন না। জিতেনবাবুকে বলা হইল মহারাজকে থাকার অনুরোধ করিতে, তিনিও তাহা করিলেন না। তাঁহার ভাব এই, যাঁহারা সকলের অন্তর দেখেন তাঁহাদিগকে আবার বলাবলি করিতে হইবে কেন? সকালের গাড়ীতেই মহারাজ ময়মনসিংহ হইতে নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হইলেন। শ্রীযুত নীরদ সান্ন্যাল আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ময়মনসিংহ হইতে বিদায় লইলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে ও উদ্যোগে মহারাজ নেত্রকোণা-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। নীরদবাবু তখন কলেজে ২য় বর্ষে পড়েন, বালক বলিলেও চলে। ঐ বয়সে এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া তিনি (পরে স্বামী অখিলানন্দ) নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে মধ্যাহ্নের আহার ও বিশ্রামের পর সেই দিনই বোধহয় ধীরেনবাবুর (পরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) আমন্ত্রণে সোনার গাঁয়ে রওনা হওয়া গেল। মহারাজ কতকগুলি সঙ্গী লইয়া একখানা ষ্টীমলঞ্চে উঠিলেন, অবশিষ্ট লোক সেই লঞ্চবাহিত একটি নৌকায় চলিলেন। লঞ্চে যাইবার জন্যই লোকের আগ্রহ। কিন্তু (কি কারণ মনে নাই) লঞ্চ বেশী দূর অগ্রসর হইল না। তখন মহারাজ নৌকায় আসিলেন এবং নৌকার অনেক লোক হাঁটিয়া চলিল। প্রথমে শুনিয়াছিলাম, রাস্তা বেশী নয় অল্প সময়েই পৌছান যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নৌকা হইতে নামিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে রাত ৯টা বাজিয়া গেল। সোনার গাঁয়ে ঘাটে পৌছিয়া মহারাজকে অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ তাঁহার জন্য পাল্কী ও ব্যাণ্ড আসিয়া পৌছায় নাই। অবশেষে ব্যাণ্ডের বাদ্যে গ্রাম কাঁপাইয়া মহারাজ সদলবলে গন্তব্যস্থানে পৌছিলেন। এদিকে অনেক রাত হইয়া গেল, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থায় কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ঢাকা হইতে সমাগত সাধুভক্তেরা রান্নাবান্নায় অগ্রসর হইলেন। সহকর্মীদের ত্রুটির জন্য বেচারী ধীরেন বাবু মহারাজের কিছু তিরস্কার শুনিলেন। পরের দিন মহোৎসব, জনসভা, মহারাজকে অভিনন্দনপত্র-প্রদান প্রভৃতি হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হওয়া গেল। মহারাজের সঙ্গে এক নৌকায় উঠিলাম। তাহাতে ঢাকার বীরেনবাবু (রাজামহারাজের শিষ্য) প্রভৃতি ছিলেন। অনেক রাত্রে নারায়ণগঞ্জে পৌছান গেল। পরদিন মহারাজের সর্দি হইল।

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমটি তখন নদীর পাড়ে ছিল। বিকালবেলা নদীর ধারে ছাদের উপর বসিলে বড়ই আরাম লাগিত। একদিন ঐরকম সকলে বসিয়া আছি এমন সময় মহারাজ বলিলেন,—"আর কেন, এইবার বাড়ী যা, কাছেই তো এসেছিস।" আমি উত্তর করিলাম, "আপনার সঙ্গে মঠ পর্যন্ত যাব।" ইহাতে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ যেন ধৈর্যচ্যুত

হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ সাধু হবে! ভিতরে গজ্‌গজ্‌ কচ্ছে সব!" ইহাতে সমস্ত আসরটাই খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

ইহার পরে ঢাকা মঠে কয়েকদিনের অবস্থানও বেশ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। মহারাজ সকালবেলা একটু বেড়াইতেন, আর আমরা তাঁহার ছাতাটা লাঠিটা বহন করিয়া ধন্য হইতাম। আর যদি ছোটখাট ফরমায়েস করিতেন তবে তো কথাই ছিল না। সকাল বিকাল দুই বেলাই বেশ লোক-সমাগম হইত। একদিন প্রফুল্লবাবুর (এনজিনীয়ার) শ্বশুরের সঙ্গে প্রসঙ্গকালে মহারাজ বলিলেন, "ভগবানের ধ্যানচিন্তা করবার আগে হাততালি দিয়ে হরিনাম করা ভাল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে পাপপাখী পালিয়ে যায়।" এই বলিয়া নিজেই হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভাবাবেশে উঠিয়া পড়িলেন এবং হাততালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

ঢাকাতে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে চিঠি দিয়েছিস?" কি উত্তর করিয়াছিলাম মনে নাই, তিনি বলিলেন, "ভাখ্, মা প্রত্যক্ষ দেবতা।"

ঢাকা মঠের গরমটাও উল্লেখযোগ্য। অত বড় কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ সীমানায় উত্তরদ্বারী বাসগৃহ, আর পূর্বধারে পশ্চিমদ্বারী মন্দির। মন্দির তখন অর্ধ-সমাপ্ত হইয়াছিল বলা চলে।

যোগেন্দ্র দে নামক শান্ত স্বল্পভাষী এক যুবকের আগ্রহে ও উদ্যোগে মহারাজ অতঃপর বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রামে যান, এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের পাকাবাড়ীর দোতলার হলঘরে মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজ বাস করেন। আমরা কয়েকজন ঐ হলেরই পাশের বারান্দায় থাকি। স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে একদিন মহোৎসব হয়। তার পূর্বদিন নগর-সংকীর্তনের সঙ্গে মহারাজও বাহির হইয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অবসাদবশতঃ অনেকক্ষণ শুইয়াছিলেন। সেবক য—মহারাজ এই সময় দুই একদিনের জন্য ঢাকায় গিয়াছিলেন। মহারাজ তখন প্রবন্ধকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাত পাতিয়া যখন দুটি লবঙ্গ বা অন্য মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিতেন তখন মনে হইত—এ কি মানুষের হাত, এত কোমল, এত রক্তিম! তাহা হইলে 'করকমল', 'পাদপদ্ম' প্রভৃতি কথাগুলি নিছক কবিকল্পনা নয়। এখানেও সকাল বিকাল অনেক লোকসমাগম হইত ও মহারাজ নানা সৎ-প্রসঙ্গ করিতেন। লোকে এতদূর আকৃষ্ট হইত যে 'এখন উঠুন' বলিলেও তাহারা উঠিতে চাহিত না। গোস্বামী উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ (যাঁহার অনেক শিষ্য ছিল) মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত (সাহিত্যসম্রাট) বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর পুকুরের ধারে ধারে কিছু কচুরী পানা ছিল। এইগুলি মহারাজকে খুব মনঃপীড়া দিতেছিল। একদিন পূর্বাহ্নে স্নানের সময়ে পুকুরের দিকে একটা কলরব উঠিল। দেখিলাম মহারাজ নীচের বারান্দায় একা দাঁড়াইয়া আছেন, অতিশয় গম্ভীর, পায়ে সাদা সাদা চন্দনের ছিটার মত দাগ। পুকুরধারে গিয়া দেখিলাম, জলে একটিও কচুরী নাই। শুনিলাম মহারাজ কচুরী পানার অনিষ্ট-কারিতার কথা বলিতে বলিতে নিজহাতে ২।৪টি তুলিতেই উপস্থিত সকলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পানা তুলিয়া নিঃশেষ করিয়াছে। পায়ের দাগগুলি কাদার ছিটা।

একদিন মধ্যাহ্নের আহারের পর আমরা এখান হইতে ঢাকার দিকে রওনা হইলাম। নৌকা করিয়া ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইতে হইবে। নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইলে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার

নৌকায় উঠিতে বলিলেন। নৌকা চলিতে আরম্ভ করিলে আরোহীরা আরামে ঘুমাইতে লাগিল। নৌকায় এমন কেহ ছিল না যে মহারাজের আরামের দিকে নজর দেয়। তিনি ছাপ্পরের একপ্রান্তে আমি আর একপ্রান্তে; আরোহীরা এমনভাবে শুইয়া যে তাঁহার কাছে যাওয়ার পথ নাই। অগত্যা ছাপ্পরের উপর দিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নৌকা পথে এক জাগায় ভিড়িল। আরোহীরা একটু পরিবর্তনের আশায় উপরে গেল। মহারাজ বলিলেন—তুইও একবার ঘুরে আয় না। কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্য আমার এত ভাল লাগিতেছিল যে আমি উঠিলাম না। তারপর মহারাজ নিজেই উঠিলেন। তখন আমিও সঙ্গেসঙ্গে গেলাম এবং দেখিলাম স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম। ষ্টীমারে শ্রীযুত নীরদ মজুমদার এস্রাজ বাজাইয়া মহারাজকে গান শুনাইলেন—"মলয় বাতাস পরশে যেমন মালতী ফুটেরে বনে, সাধু-সঙ্গের বাতাস লেগে নাম ফুটেরে মনে" ইত্যাদি। নদীবক্ষে এইরূপ পরিবেশে সকলেরই খুব ভাল লাগিল।

ঢাকা মঠে কয়েকদিন থাকিয়া মহারাজ সদলবলে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফিরিবার [illegible] তাঁহাকে কলমা হইয়া যাওয়ার জন্ত অনুরোধ হইলে তিনি অসম্মত হইলেন এবং তাঁহার পরিবর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে যাইতে ব[illegible]। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আর একজন সাধুর জন্ত ঢাকা হইতে তারপাশার টিকিট করা হইল; অন্ত সকলের জন্ত কলিকাতার। গোয়ালন্দগামী ষ্টীমারে যুদ্ধযাত্রী এক বাঙালী যুবক মহারাজের কেবিনে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনিও তাহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। তারপাশায় ষ্টীমার ভিড়িলে আমরা ভারাক্রান্তহৃদয়ে মহারাজের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গী ধুও নামিলেন। তাঁহারা কয়েকদিনমাত্র কলমায় [illegible]কিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই খবর প[illegible] পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ জ্বরে পড়িয়া[illegible] এই জ্বরই কালাজ্বরে পরিণত হইয়া তাঁহার কাল-স্বরূপ হইল, এবং বৎসরাধিককাল ভুগিয়া [illegible] নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্বপ্নভাস

শ্রীরবি গুপ্ত

মুক্তির বিহঙ্গ ওগো, ধরণীর লাগি'
কোন্ ঊর্ধ্ব-আকাশের আনো স্বপ্নভাস,
সুগহন বার্তা কোন্, ওগো অনুরাগী,
নিবিড় তিমিরতলে প্রভাত প্রকাশ!

স্বর্ণাভ্র-শিখর হ'তে লভিয়া কিরণ
রচিয়া তুলিতে চাও একখানি নীড়,
গাঁথিয়া তুলিতে চাও অলখ-স্বপন
ধূলিকার মর্মে চির সান্দ্র সুনিবিড়।

স্বপ্ন-আঁখি বুঝি মগ্ন ভবিষ্যের পানে—
নামে পৃথ্বী-বক্ষ-'পরে সমূর্ধ্ব-সোপান
সঙ্গীত-নির্ঝর তব মানবের প্রাণে
জাগে ধীরে নব উষা আনন্দ-অম্লান।

যায় প্লাবি' মন্দ্র-ধ্বনি অম্বুধি-কান্তার
লভে তন্ত্রী ধরিত্রীর অনিন্দ্য ঝংকার।

ধর্ম ও আধুনিকতা

শ্রীসুরথনাথ সরকার, এম্-এস্‌সি

ধর্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই। যুগ যুগ ধরে এ যেমন নানাভাবেই মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে তেমনি আবার বিরোধ ও হানাহানির উপলক্ষ্যও হয়ে উঠেছে। এই সেদিনকার ভারত-ব্যবচ্ছেদের ইতিহাস তারই এক মসীলিপ্ত উদাহরণ। তথাপি ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষ থাকতে পারে না, যদিও সময়ে অসময়ে তাকে নিয়ে সমালোচনার সীমা থাকে না।

ধর্ম হচ্ছে মানব জীবনের ফুলস্বরূপ। ফুল ফুটতে হলে যেমন আলো, বাতাস ও মাটির প্রয়োজন, অথচ ফুলের বিকাশের মধ্যে তাদের কোনটারই ছাপ বর্তমান থাকে না, তেমনি মানবজীবনে ধর্মের নিঃশব্দ বিকাশের মধ্যেও অন্তর্লোকে যে ধীর মন্থন চলে তার হিসেব পাওয়া যাবে না বাইরের জীবনধারা থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম বলতে ঠিক কি বুঝায়? উপাসনা, জপ-তপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিই কি ধর্ম, না তার অতীত এমন কোন কিছু আছে যাকে লাভ করাই ধর্ম? ধর্মজ্ঞজনেরা অবশ্য এগুলিকে ধর্মলাভের উপায় হিসেবেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন, দেহ ও মনের সাধারণ পরিক্রমা পেরিয়ে যে বিরাট ক্ষেত্র বিস্তৃত তার উপলব্ধির সূত্র ধর্মের মধ্যে নিহিত। ভোগবহুল জীবনের গতানুগতিক প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যাহা সূক্ষ্ম, উন্নততর বোধের সূচনা করে তাকে বলা যায় ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। আমাদের ভাষায় ধর্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে তার ধর্ম। তেমনই মানুষের ধর্মটি হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য। ······আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। ······সব মানুষেরই ধর্ম বলে একটা জিনিস রয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদিভাবে সে নিজেকে পরিচিত করার চেষ্টা করে। অথচ এর ফলে তার জীবনের মূলসত্য হয়তো তাতেই চাপা পড়ে যায়।"

সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম জিনিসটা কোন দিনই একটা সমস্যার বস্তু হয়ে উঠে না। তারা ধর্মের ব্যবহারিক দিকটাকেই বড় করে দেখে। তারা জানে তিথিবিশেষে উপবাস, পূজা-অর্চনা কিংবা গঙ্গাস্নান করা—এটাই ধর্ম। তারা মনে করে—এ সব বিষয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে মাথা ঘামানো কিংবা অনাবশ্যক প্রশ্ন করতে নাই। তাদের কাছে পাপপুণ্যের বিধিনিষেধের বাছ-বিচারটাই বড় কথা। যুক্তির চেয়ে অন্ধবিশ্বাস তাদের আকর্ষণ করে বেশী। চিরকাল সবাই করে আসছে এবং তার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত—এই সহজবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তারা ধর্মচর্চার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞান তথা আধুনিকতা বলছে "এই সব আচার-অনুষ্ঠানের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন বিশেষ কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না তখন ওগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকার সার্থকতা কি? এগুলিকে ধরে থাকার অর্থ হচ্ছে গতিশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করা, তাই এগুলিকে কুসংস্কারও বলা যেতে পারে। কাজেই ইহাদের বর্জন করাই উচিত।" সে যাই হোক, বিষয়টির আমরা ক্রমে আলোচনার চেষ্টা করব। তবে একটা কথা বলা দরকার, মানুষের যুক্তিবোধটাও

একান্তই অসম্পূর্ণ এবং তা বদলাতেও বেশী সময় লাগে না।

এই ধর্মবোধের উৎস কোন্‌খানে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কাহারও মতে উহা ধুরন্ধর ও সুবিধাবাদী উর্বরমস্তিষ্কের সৃষ্টিমাত্র। কেউ কেউ বলেন—ভয় থেকেই ধর্মবোধের উন্মেষ। সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন যখন চলে তখন ধর্মের কথাটা লোকের মনে বড় থাকে না। কিন্তু মানুষ যখন কোন বিপদে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তখন মনে হয় কোন উন্নত শক্তির কথা, জেগে ওঠে একটা কিছুকে অবলম্বন করে দাঁড়াবার প্রয়াস। তবে ধর্ম বলছে "মাভৈঃ"। ভয়কে জয় করাটাই আসলে ধর্ম। আবার কেউ বলেন—ধর্মের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। গীতা, চণ্ডী, ভাগবতই তার প্রমাণ। আত্মীয় স্বজনের হনন দেখে অর্জুনের মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল, তার থেকেই গীতারূপী ধর্মতত্ত্বের অবতারণা। চণ্ডীতেও দেখা যায়, সমাধি বৈশ্য এবং রাজা সুরথের বিষাদভাব থেকেই ধর্মপথে যাত্রা শুরু। শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে রাজা পরীক্ষিৎ সর্পাঘাতে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে শঙ্কাকুল হয়ে শুকদেবের কাছে ভাগবত-জীবনের সন্ধানলাভ করেছেন। অথচ গভীরভাবে দেখতে গেলে আনন্দই হচ্ছে ধর্মের স্বরূপ!

তবে মৃত্যুই সম্ভবতঃ মানুষের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুচিন্তাই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে—"জীবনের পরিণতি কোথায়? এর পরে আর কি কিছুই নাই?" প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পশ্চাতে কোন স্রষ্টা আছেন কিনা এই অনুসন্ধিৎসাই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই বিরাট বিশ্বে মানুষ তো সেদিনকার অতিথিমাত্র। তার সীমাবদ্ধ শক্তি যে কত ক্ষুদ্র এ চিন্তাই তাকে ধর্মবোধে উদ্দীপিত করেছে। আত্মচিন্তাই সকল ধর্মের মূল উৎস। তবে খুব কম লোকই জীবনে ধর্মবোধকে জাগ্রত রাখতে কিংবা সদা তার অনুভূতি প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় তথাকথিত সাধনায় মানুষ যখন শান্তির সন্ধান পায় না তখন হতাশ হয়ে ভাবে তার বুঝি দুকূলই গেল। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের এই ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীটিও মনে রাখা দরকার। ধর্ম মূলতঃ এক অপরিবর্তনশীল সত্য, তবে সামাজিক ক্ষেত্র ও পরিবেশ ভেদে তার বহিরঙ্গের রূপান্তর ঘটে থাকে। আজকাল সাধারণতঃ ধর্মবিষয়ে যে আলোচনা শোনা যায় তাতে আন্তরিকতার চেয়ে পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি থাকে বেশী। বাগাড়ম্বরের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞাপনের প্রচারের মতোই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার অপপ্রয়াস দেখা যায়। বস্তুতঃ এই বাগ্‌বিন্যাস না থাকলে দল উপদল তথা নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ হবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজকাল অনেকেই 'ধর্ম' কথাটা শুনলেই একেবারে উন্নাসিক হয়ে পড়েন। "এ যুগে এ সব ব্যাপার একেবারেই অচল"—এটাই হচ্ছে সাধারণের ধারণা। অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও অনেকেরই নাই। তার কারণও সম্ভবতঃ, বর্তমান যুগে যথার্থ ধর্মবোধের অবনতি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মর্মভাগ যা চিরকালের জন্য অমর তা হারিয়ে লোকের মধ্যে এখন খোলসটা নিয়েই কাড়াকাড়ি চলে। ফলে ধর্ম এখন ঢুকেছে হেঁসেলে আর মাদুলির মধ্যে। আধুনিক কালে তাই উহা কতক জনকে করেছে সুবিধাবাদী ও ভণ্ড, আর কতককে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় এবং বাকী অন্যান্যকে ভীতু ও গতানুগতিক করে তুলেছে। এ জন্যই ধর্মের বিষয় শুনতে হলে অনেকেই আঁৎকে উঠেন,—এই বুঝি আবার বকুনি শুরু হল। তবে মজার কথা এই যে, এযুগে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িরও অন্ত নাই। মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির ঘটাই তার প্রমাণ। পুরাণো কথাগুলিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে পারলে লোকের কাছে আজও বাহবা পাওয়া

যায়। তাই তো দেখি truth শব্দটাকে নিয়ে লোকের এত মাতামাতি !

মানুষ আজ যন্ত্রসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। তার চিন্তাধারায়ও যন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। যন্ত্রের নিষ্পেষণে জীবনের বৃত্তিগুলি বহির্মুখী হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, মানুষের সামগ্রিক লক্ষ্য ও চিন্তা যদি দেহ-সর্বস্ব হয়ে পড়ে সেখানে ধর্মকে অবান্তর বলে বিবেচনা করা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দেহাত্মবোধ এত বেড়ে গেছে যে, আমরা ভুলে যাই এই বহির্জগৎ মনোজগতেরই একটা প্রতিচ্ছবি। বিজ্ঞানের আলোচনায় মানুষ আজ একান্তই "অমনস্ক"। বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু স্রষ্টার প্রতি তার ঔৎসুক্য নাই। বিজ্ঞানের বিজয়োল্লাস মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে দিয়েছে ধাঁধিঁয়ে। এজন্যই বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জীনস্ বলেছেন—"Science has given man control over nature, before man has gained control over himself. Thus in respect of knowledge, each generation stands on the shoulders of his predecessors, but in respect of himself both stand on the same ground" জড়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে যেয়ে মানুষ আজ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আণবিক বোমা তারই ইঙ্গিত মাত্র। শক্তি-সাধনার উৎকর্ষে মানুষ যদি হৃদয়ের বৃত্তিসমূহকে উন্নততর করবার সুযোগ না পায় তবে অনর্থের সৃষ্টি অনিবার্য। আধ্যাত্মিক ও বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কল্যাণ নাই।

আমার কথা এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যতই বিরূপ হয়ে উঠিনা কেন—জীবন থেকে ইহাকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে পারছিনে। বস্তুতঃ ধর্ম কতক লোকের কাছে বিলাসমাত্র, আবার কারও কারও কাছে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই নিত্য প্রয়োজনীয়। আমরা সাধারণ লোক ধর্মাচরণের প্রয়াস পাই, আর এই শেষোক্ত মহাজনদের আচরণই ধর্ম হয়ে ওঠে এবং সমাজজীবন তাঁদের প্রভাবেই সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। কিসের প্রেরণায় মানুষ ভোগসুখ, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ছিন্নকন্থা ও জীর্ণবস্ত্রে বনজঙ্গলের নির্জনপ্রদেশে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করে, মানবচরিত্রের এ এক জটিল রহস্য। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁদের পদমূলে বসেই সংসারী শোকসন্তপ্তজন খোঁজে শান্তির আশ্বাসবাণী, চায় জীবনের হতাশায় নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। এঁদের সামান্য ইঙ্গিতে কত জনের জীবনে ঘটে যায় কী বিপুল পরিবর্তন !

কিন্তু যাঁরা জড়বাদে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী তাঁরা ইহারও অপব্যাখ্যা ক'রে অবজ্ঞা-প্রকাশের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তির পিছনে এমন একটি গোঁড়ামি বর্তমান, যার ফলে ধর্মের ভাল জিনিসটাকেও সংশয়ের চোখে না দেখে পারেন না। মানুষের সম্বন্ধে প্রধান কথা হল, মানুষ মননশীল, মনোজগতেই তার বাস। মানুষের পক্ষে খাদ্যের যেমন প্রয়োজন মননশীলতারও তেমনি প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মকে অবলম্বন করে কয়েক-জনের পক্ষে যে ব্যভিচার বা সুখভোগের সুবিধা দেখা যায় তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই এঁরা সমগ্র ধর্মবোধটাকে উচ্ছেদ করতে চান। কোন জিনিসে মন্দ থাকবে বলে তার ভালটুকুও বর্জন করতে হবে তার কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মানুষের এই অন্তর্জগৎ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড থেকেও অনেক বড় এবং তার চর্চার মধ্যেই হয়তো ধর্মের মূলসত্য নিহিত।

বর্তমান যুগে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ প্রধানতঃ আমাদের বস্তুবাগীশতা ও স্বার্থবোধ। বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবনে চাঞ্চল্য গেছে

অসম্ভবরকমে বেড়ে, তাই গভীরভাবে কোন কিছুই এখন দেখা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর এক প্রান্তের সামান্য একটু ঘটনা অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে। তদুপরি আমরা ভাবি ধর্ম করতে যেয়ে আমাদের বুঝি সব কিছুই বাদ দিয়ে এক অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। স্বার্থবোধকে বিসর্জন দিতে হবে সন্দেহ নাই। স্বার্থকে বাদ দিতে হবে ভেবেই আমরা মনে করি পার্থিব সুখভোগ ধর্মজীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। আসলে ব্যাপারটি ঠিক তার উল্টো। ধর্ম পরলোকের পথ প্রশস্ত করে কিনা জানিনা কিন্তু ইহা ইহলোকে বেঁচে থাকারই উপায়মাত্র। ধর্ম মানেই একটি উন্নত সামগ্রিক জীবনের ধারা। এই বৃহত্তর অর্থেই ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তাই বর্তমান যুগোপযোগী ধর্মীয় ব্যাখ্যারও প্রয়োজন রয়েছে। আগেকার দিনের নিভৃত ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে যা সহজসাধ্য ছিল আজকার কলকোলাহলে তা সম্ভব না হলে উহাকে ঢেলে সেজে নেওয়া চলতে পারে। Dr. Paul Brunton তাঁর 'The quest of overself' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :—"The conception of religion may change. There is but one Higher Power throughout the universe and whoever contacts today will find it exactly the same as it was two thousand years ago, and as it will be two thousand years hence. The divine essence does not change, but man's ideas about it do.……

There is somethiug of real worth in religion Close all the church-doors throughout the world—still there will rightly exist in human soul a spiritual hunger for all times. why? Because man has not lost, cannot lose his source in the Absolute. He has lost awareness of it. Religion reminds him of the loss."

সত্যের সাধনায় মানুষ বিজ্ঞানকে যেমন অবলম্বন করেছে তেমনি ধর্ম তথা প্রজ্ঞানকেও গ্রহণ করতে হবে। নতুবা উভয়ের সংঘর্ষে অকল্যাণেরই সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তাই ধর্মবোধকে উপেক্ষার কোন কারণ থাকতে পারে না।

ব্রহ্মদেশ ও বাংলা*

শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু

(অ্যাড্‌ভোকেট, রেঙ্গুন হাইকোর্ট)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বর্মার সহিত ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সম্বন্ধ আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও ইংরেজদের প্রচার আরম্ভ হইল যে, ভারতের সহিত বর্মার সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সম্বন্ধ কোন দিন ছিল না। ধর্মও তাহারা ভারত হইতে পায় নাই, পাইয়াছে সিংহল হইতে—আর বর্মীদের সংস্কৃতি চৈনিক এবং বর্মীদের ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বর্মার পক্ষে মঙ্গল। বর্মীদের দরদে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাণ

* ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীর সাহিত্যসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ হইতে সঙ্কলিত

কাঁদিয়া উঠিল। এখানকার ইংরেজ শাসক ও বণিক্-সম্প্রদায় এখানকার এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদের মনে ভারতীয় বিদ্বেষ এবং ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বর্মার পক্ষে মঙ্গল—এই দুইটি ধারণা বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হইয়া এখানকার শাসনকর্তা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে বলিলেন যে, বর্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়। পার্লামেণ্ট বলিলেন ভারত হইতে বর্মা বিচ্ছিন্ন হইবে কিনা এই বিচার্য বিষয় লইয়া সাধারণ নির্বাচন হউক। কিন্তু নির্বাচনে বিচ্ছিন্ন-কারিগণ নির্মমভাবে পরাজিত হন। কিন্তু ব্রিটিশ কূটনৈতিক গভর্ণর কিভাবে দেশের এই মত প্রকাশ সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। বর্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ডাক্তার 'বা ম' (Dr. Ba Maw) প্রধান মন্ত্রী হইয়া ব্রিটিশদের শোষণ-নীতি সামান্য রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার মন্ত্রিত্ব গেল এবং তাঁহার স্থান হইল জেলে। তারপর আসিল জাপানীরা। জাপানী অধিকারের সময় ভারত-বিদ্বেষ অনেকটা কমে। তাহার কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রভাব। তারপর আসিল ভারতের ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা। তখন দুই দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইল বন্ধুত্বের। উভয় জাতিই বুঝিল যে, উভয় দেশের ভবিষ্যৎ এক-সূত্রে গাঁথা। বর্মা এখন বুঝিতেছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ব্রহ্মসংস্কৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে স্থাপন করিতে পারিলে উভয় দেশের প্রভূত উপকার হইবে। এবিষয়ে আমাদের বাঙালীদের কর্তব্য আছে—সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে এই বন্ধুত্বের ভিত্তি-স্থাপনে সহায়তা করা। আমাদের কর্তব্য হইবে বর্মা এবং ভারত এই দুই দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা—এবং সেই সংস্কৃতির ও কৃষ্টির পুরাতন ইতিহাসের ভিত্তির উপর আমাদের বর্তমান বন্ধুত্ব স্থাপন করা—এবং আমাদের দুই দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান করা ও আমাদের বাংলার কবি ও মনীষীদের বাণী এদেশে আনয়ন করা—আবার এদেশের বাণী আমাদের দেশে লইয়া যাওয়া। এই দেশে বুদ্ধদেবের সমত্বের বাণী এবং বাস্তব জীবনে তাহার রূপায়ণ, আমাদের দেশে বহুল প্রচার কর্তব্য। সমগ্র জাতির মধ্যে একটি নিরাসক্ত ভাব প্রয়োজন যাহাতে দেশবাসী মহা বিপদেও বিচলিত না হয়। এই দেশবাসীর আনন্দবোধ ও আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতার উৎস আমাদের গবেষণা করিয়া বাহির করিয়া আমাদের দেশে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী বলিয়াছেন যে, বিদেশে প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বা দূত। ব্রহ্মবাসী বাঙালীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা শুধু বর্মাতে ভারতের প্রতিনিধি নই, ভারতে আবার আমাদের বর্মার প্রতিনিধির কাজও করিতে হইবে। ব্রহ্মের সংস্কৃতির ও কৃষ্টির প্রতিনিধি ভারতীয় দূত বা বর্মার দূত হইতে পারেন না কারণ তাঁহাদের জন-সাধারণের সহিত কোন যোগ নাই। উভয় দেশে আমাদের এই দৌত্য-কার্য করিতে হইবে—তবেই আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি এবং আমাদের পালয়িত্রী মাতার প্রতি কর্তব্য করিব। অতীতে আমরা কিছু করি নাই, তাহার কারণ আমরা তখন ব্রিটিশদের অনুচর হিসাবে ছিলাম। এখন আমরা ভারত, পাকিস্তান ও বর্মা তিনটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী। আমাদের দৌত্যকার্য পরস্পরের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিতরণ করা। বাঙালীরা বহু কার্যে ভারতে অগ্রগামী হইয়াছে—সেই হিসাবে সকলে একত্র হইয়া এই সংস্কৃতির বিনিময়ের দৌত্যকার্য করিয়া আমাদের তিন দেশকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা প্রয়োজন। বর্মার বাঙালী সবচেয়ে গরীব—কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমরা গরীব নই। আমাদের বিদ্যার সম্পদ্ আমাদের তিন দেশেরই কাজে লাগানো প্রয়োজন।

এখানকার বাঙালীদের অরাজনৈতিক সমস্যা ও তাহার সমাধানের আলোচনা করা আমাদের অন্যতর কর্তব্য। ব্রিটিশ শাসনকর্তারা সিমলায় বসিয়া যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপদ্ধতি কি হইবে তাহার একটি খসড়া করেন। যুদ্ধের পূর্বে এখানে অবর্মীদের ইংরেজীর মাধ্যমে এবং তাহাদের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অবর্মীর জন্য মধ্যম শ্রেণীর বর্মী ভাষা স্কুলে অবশ্য পাঠ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ সিমলায় খসড়া করিলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে সকল শিক্ষা ও পরীক্ষা বর্মী ভাষায় হইবে, এবং প্রত্যেককে উচ্চ শ্রেণীর বর্মী ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পরিবর্তনের জন্য এক বৎসর সময়ও দেওয়া হইল না। ইহা যে তাঁহারা বর্মীপ্রীতির জন্য করিয়াছিলেন তাহা নহে। ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় বালক-বালিকারা যাহাতে ব্রহ্মদেশে শিক্ষালাভ করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য তখন তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, ভারতীয়দের নয়—তাঁহাদের নিজেদেরই বিদায়ের দিন আগত। সুতরাং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের বাঙালীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন একটি বিশেষ সমস্যার আকার ধারণ করিল। তখন একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হইল। আমরা তৎকালীন অবস্থায় দেখিলাম যে, বর্মী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণ আমাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। যুদ্ধের চার বৎসর তাহাদের কোন শিক্ষাই হয় নাই। সুতরাং কমিটি মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। প্রথমে ১০।১২টি ছাত্র লইয়া ৪৫নং গলিতে বাণী-মন্দির-ভবনে বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের বাঙালীদের স্থাপিত বেঙ্গল একাডেমী নামে একটি খুব ভাল উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। আমরা সেই স্কুল পুনরায় গঠন করিব—এই আশায় স্কুলের নাম দেওয়া হইল বেঙ্গল একাডেমী। সেই স্কুল-ভবন তখন গবর্ণমেণ্টের অধিকারে ছিল, এবং পরে আমরা বিদ্যালয়-ভবনের অধিকার পাইলাম। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারশত হইল। ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইল।

তারপর ১৯৪৭ সালে আসিল স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্থান। রাজনৈতিক প্রয়োজনে আমাদের সোনার বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আসিল ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা। ব্রিটিশেরা বর্মীদের ভারতীয় বিদ্বেষ শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহারা তখন কল্পনাও করেন নাই যে, এই বিদ্বেষ শিক্ষার ফলে তাঁহাদের একদিন বর্মা ছাড়িতে হইবে। ভারতীয়েরা কিন্তু এই দেশে রহিয়া গেল। স্বাধীনতার পর মন্ত্রীমণ্ডলী নির্দেশ দিলেন যে, যাঁহারা এই দেশের নাগরিক না হইবেন তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের বা কর্পোরেশন বা পোর্টকমিশনার বা রেলওয়ের চাকরিতে রাখা হইবে না। শিক্ষিত বাঙালীরা অধিকাংশ চাকরিজীবী ছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিবারসহ দেশ ত্যাগ করিতে হইল। পূর্বপাকিস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুন যে সব বাঙালী বেসরকারী কাজে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবার ও ছেলেমেয়ে এদেশে আনয়ন করিলেন। সুতরাং ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়িল, কমিল না। আজ আমাদের বেঙ্গল একাডেমীতে প্রায় সাত শত ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়।

আমাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা-সমস্যা দেখা দিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্ চ্যানসেলার ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পরীক্ষা-বিষয়ে অনেক সুখ-সুবিধা করিয়া দেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক নৃপেশচন্দ্র দাস ও রমাপ্রসাদ চৌধুরীর চেষ্টায় এবং তৎকালীন ভারতীয় দূত ডাঃ রউফের এবং পরবর্তী ভারতীয় দূত মিঃ চেট্টুরের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য রেঙ্গুনে কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

কিন্তু প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাশের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের দেশে যাইতে হইত, কারণ ব্রহ্মভাষা না জানিলে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টার মিডিয়েট কলেজে ভরতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বি-এ. ক্লাসে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া বি-এ ক্লাসে ভরতি হওয়ার কোন বাধা নাই। সুতরাং অধ্যাপক নৃপেশচন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সহকর্মীর উদ্যোগে এবং দূতাবাসের দুইজন কর্মচারীর সহায়তায় ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ খোলার বন্দোবস্ত হয়। এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং ভারতীয় দূতের সহায়তায় এখানে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

স্কুল ও কলেজ উভয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিরূপে যে সব সমস্যা আমার নিকট আসিয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

এখানে বাঙালীরা তিন শ্রেণীভুক্ত—কেহ ভারত-রাষ্ট্রের, কেহ পাকিস্থানী রাষ্ট্রের, কেহ ব্রহ্মরাষ্ট্রের নাগরিক। ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অনেকে হয়তো চিরকালই এখানে থাকিবেন। যাঁহারা এখানে থাকিবেন তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের জন্য বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি। যাঁহারা ভারতীয় তাহাদের জন্য হিন্দীর ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, এখন যে পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা ভারতীয় দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে এখানকার কেন্দ্রে গৃহীত হয়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বৈদেশিক নাগরিকদের জন্য বিদেশে পরীক্ষা নিবেন কিনা, তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় শিক্ষক পাওয়া। বর্মাতে এখন যে শিক্ষকগণ আছেন, তাঁহাদের সকলেরই দেশান্তরবসতি-আইন অনুসারে বর্মাতে চিরকাল থাকিবার আদেশপত্র আছে। নূতন শিক্ষক আনা যে কত কষ্টকর, তাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানি। যদি বাংলাদেশ হইতে শিক্ষক আনা সম্ভবপর না হয়, তবে এই বিদ্যালয় বেশী বৎসর চলিবে না। শিক্ষক আনিতে পারিলে আমাদের আর এক সমস্যা হইবে তাঁহাদের বাসস্থান সংগ্রহ করা। তাহার উপর আমাদের আয়ের জন্য বিদ্যালয়ের কতকাংশে শিক্ষক এবং লোকদের বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে। এখন তাঁহাদের উচ্ছেদ করা আইন অনুসারে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-ভবনের আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

কলেজের সমস্যা আছে। কলেজ শুধু বাঙালী ছাত্রছাত্রী দ্বারা চলিতে পারে না। কলেজের জন্য পরিসর স্থান প্রয়োজন। লাইব্রেরীর প্রয়োজন। এখন কলেজের শিক্ষকেরা—একজন ব্যতীত কোন প্রকার বেতন বা ভাতা নেন না। কত বৎসর বিনা বেতনে তাঁহারা কাজ করিতে পারিবেন তাহা চিন্তনীয়। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, স্কুলের জন্য এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিব যেন তিনি কলেজেও শিক্ষা দিতে পারেন। এমন শিক্ষক আমরা গত বৎসর কয়েকজন নিয়োগ করিয়াছিলাম। আজ পর্যন্ত দেশান্তরবসতি-আইনের জন্য তাঁহাদের কাহাকেও আনা সম্ভবপর হয় নাই।

ইহা ব্যতীত আমাদের আর একটি কার্য আমাদের পূর্ব সংস্কৃতি রক্ষা, এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের সহিত সংস্কৃতির যোগাযোগ রক্ষা করা। সাহিত্য-সম্মেলন দ্বারা এই সংস্কৃতির যোগাযোগ আমরা রাখিতে চাই। আমাদের এখানে বেঙ্গলী এসোসিয়েসন আছে। তাঁহারা আমাদের কৃষ্টির রক্ষার জন্য অনেক কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রবাসী জীবনে বর্মী সংস্কৃতি এবং দেশের সংস্কৃতির যোগ এবং আদান-প্রদান আমাদের করিতে হইবে।

সর্বশেষে একটি কথা আমি বলিতে চাই। যদি বাংলা ভাষার এবং বাংলার নিজ সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় এবং ঐ কৃষ্টির উন্নতি-সাধন করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রবিভাগ সত্বেও উভয় বাংলার মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ রাখিতে

হইবে। পূর্ববঙ্গের আমাদের মুসলমান ভাইগণ বাংলা ভাষার জন্য যে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। উভয়বঙ্গের সাহিত্যিকগণকে এবং জনসাধারণকে বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, একদিকে হিন্দীর আক্রমণ হইতে অন্য দিকে উর্দুর আক্রমণ হইতে। বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষর প্রচলনের জন্য অবাঙালীরা অনেকে বলিতেছেন। উভয় বঙ্গের সাহিত্যিক মনীষিগণ ও জনসাধারণ এই বাংলা ভাষা ও বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করুন—এই আমার প্রার্থনা।

এখানে আমার বাঙালী ভাইবোনেরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেইজন্য আমাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন। আমি জানি—আমি এই কাজের কত অনুপযুক্ত। তবুও তাঁদের স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই। এখানকার সকল বাঙালীদের এই নিঃস্বার্থ স্নেহ আমার জীবনে একটি সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ এবং গৌরব। আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যেন আমি এই স্নেহের উপযুক্ত হইতে পারি। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সেই স্নেহের অবমাননা করিব না।

'সুন্দরম্'

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

যা' কিছু করেছি, যে কথা কয়েছি, লিখেছি যতেক গান,
অন্তরে যত ভাবনা ভেবেছি পলে পলে অবিরাম,
তরুতলছায়ে বাঁশী বাজাইয়া করিয়াছি যত খেলা,
অলসনয়নে সন্ধ্যা-প্রভাতে কাটায়েছি যত বেলা,
কাননে কুসুম ছিঁড়িয়া হেলায় গাঁথিয়াছি যত মালা,
মনেরে ভোলা'তে কোলাহল হ'তে খুঁজেছি যত নিরালা,
যেটুকু বেদনা দিয়াছি না জেনে' যাহাদের বুকে মনে,
সে সকলে তুমি ছিলে নাকি প্রভু, সদাই আমার সনে!
খেয়ালে জীবন-তরী যদি মোর কালের সলিলে ভাসে,
ডোবে ঘোরে নাচে ঢেউএর তালে ফিরে ফিরে যায় আসে,
কেন তবে বুকভরা ঐ কামনা!—কথা-খেলা-হাসি-গানে
দুখে শোকে নাশে বিষাদে বিপদে ছন্দাবর্ত আনে!
যে দিল আমারে এত রূপ রস ভোগ করিবার রীতি,
ধরণী ভরিয়া আলোক আঁধার হৃদয়ে পিয়াসা নিতি,—
সে যদি আড়ালে সরে যায় কভু ত্যজিয়া আমারে একা,
মুছে যাবে নাকি নিমেষে সকলি ভোগ্য-ভোগের রেখা?

ভক্তিশাস্ত্রের ভূমিকা

শ্রীমতী সুজাতা হাজরা

এ জগতে সেই সুখী হবে, যাহার হৃদয় আছে। শুধু সুন্দর নয়, শিব এবং সত্যও অনুভূতির মধ্য দিয়া সহজতর ভাবে ধরা দেয়। সুন্দরকে আমরা হৃদয় দিয়া অনুভব করি, শিবকে আমরা হৃদয় দিয়া বরণ করি, সত্যকে আমরা হৃদয় দিয়াই উপলব্ধি করি। চোখ দিয়া যাহা দেখিলাম, কান দিয়া যাহা শুনিলাম তাহা যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া হৃদয়কে স্পর্শ করিবে, ততক্ষণ রূপ ও শব্দ পূর্ণতা-লাভ করিবে না। সুর যখন কানের মধ্য দিয়া মরমে গিয়া প্রবেশ করে তখনই তাহা প্রাণকে আকুল করিয়া তোলে।

মনই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ভালমন্দের বিচারে হৃদয়ের প্রেরণাই আমাদের সহজে ঠিক পথে লইয়া যায়। মন যদি নিদারুণরূপে কুসংস্কারাচ্ছন্ন না থাকে তবে বুদ্ধির বিচার ছাড়াই স্থিরমনে সত্য আপনিই উদ্ভাসিত হয়। মনের অভাববোধ এবং হৃদয়ের অনুভূতিই মানুষকে উচ্চতর পথে ঠেলিয়া দেয়। রোগমৃত্যুপ্রপীড়িত মানবের দুঃখ বিলাসী রাজ-কুমারের হৃদয়কে যে মুহূর্তে স্পর্শ করিল, সেই মুহূর্তে সিদ্ধার্থের স্থানে মহামানব বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন। আমরা দেখিতে পাই জগতে যাঁহারাই হৃদয়ের পূর্ণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই বড় হইয়াছেন। হৃদয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য শুষ্ক জ্ঞান জগতের কোন উপকারে আসা দূরে থাকুক, জ্ঞানীর নিজের মনকেই তৃপ্ত করিতে পারে না। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রেমে। তাই যুগে যুগে জ্ঞানী মানব আর্তসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কাহাকেও শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া, কাহাকেও ধর্ম-দানের মধ্য দিয়া কাহাকেও সর্বাঙ্গীণ সেবার মধ্য দিয়া সেই হৃদয়ের ঋণ শোধ করিতে হইয়াছে।

হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ভক্তি। মানুষ তাহার অপেক্ষা উচ্চতর কাহারও নিকট যখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তখনই তাহার প্রাণে ভক্তির উদয় হয়। আমি যাহাকে ভক্তি করি, তাহাতে লেশমাত্র মালিন্য দেখিতে পাই না। ভক্তির পাত্রে দোষ দেখিলে ভক্তির হানি হয়। যাহাতে আত্মসমর্পণ করিব তাহার উপর আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু এই সর্বাঙ্গীণ নির্ভরতার আশ্রয় কোন সীমাবদ্ধ মানুষ হইতে পারে না। সেইজন্য প্রকৃত প্রেমের ঈশ্বরই একমাত্র বিষয়।

ভক্তির মূলে এই যে আত্মসমর্পণ, ত্যাগের মধ্য দিয়াই ইহার জন্ম। আত্মসমর্পণ—অর্থাৎ কিনা, আত্মাকেই সমর্পণ করিয়া দেওয়া। ভক্তের নিজের শুভাশুভ, সুখদুঃখ কিছুই থাকিবে না—নিজের জন্য তাহার একটি অঙ্গুলিও নড়িবে না—তাহার সমস্ত কর্মই ভক্তিভাজনের প্রীতির জন্য। "নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে"—(লঘুভাগবত) "গোপিকাগণ নিজদেহ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বলিয়াই বিভূষিত করেন।" তাহার সুখদুঃখ, কামনাবাসনা সবই ঈশ্বরকে ঘিরিয়া—সে সর্বদাই অনুভব করে "আমি তাঁহারই জন্য—তাঁহার প্রীতিসাধনই আমার জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য।" "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

ত্যাগী ভিন্ন কেহই এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না। প্রিয়তমের জন্য শুধু নিজের সুখ নয়, সুখের ইচ্ছাকেও না ত্যাগ করিতে পারিলে নিঃস্বার্থ প্রেমের উদয় হয় না। মনে করুন, আমি আমার পিতাকে ভালবাসি। তিনি হয়তো অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদ্য ঠিক মধ্যরাত্রে

তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইবার বিধি দিয়াছেন। আমি যদি যথার্থ নিঃস্বার্থভাবে পিতাকে ভালবাসিয়া থাকি, তবে আমি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ঔষধ দিবার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকিব। আমি যে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি নাই, পিতা সুস্থ হইলেই আমার তৃপ্তি। শুধু ক্ষণিক একটি কার্যে নহে—জীবনের সমস্ত কার্যে প্রতি মুহূর্তে যখন আমরা ঐরূপ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব তখনই মনে যথার্থ ভক্তির উদয় হইবে। কর্তব্যের খাতিরে বা লোক দেখাইবার জন্য আমরা অনেক সময় স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। কারণ আমরা আত্মপ্রসাদলাভ করিবার জন্য ঐরূপ ত্যাগ করিয়া থাকি। "আমার খুবই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কি করিব, কর্তব্যের খাতিরে আমাকে বাধ্য হইয়া এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।"—এইরূপ মনোভাব লইয়া ত্যাগ করিলে বাহ্যিক ত্যাগ হয় বটে, কিন্তু মনের ত্যাগ হয় না। এইরূপ ত্যাগ শুধু অহমিকাকেই পুষ্ট করিয়া তোলে।

প্রকৃত ত্যাগ সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের মনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কামনা সমূলে উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব কাজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, মানুষের মনের বাসনা অশ্বত্থগাছের ফেঁকড়ির মতো—আজ কাটিয়া দাও, কাল দেখিবে আবার গজাইয়াছে। হাইড্রার নিত্যজন্মশীল মস্তকের মতো এই কামনারাশিকে বশে আনিবার একমাত্র উপায় তাহাদের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া। ভক্তিপথে ভোগবাসনাত্যাগ সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিমূলক নহে। ভক্তের ত্যাগই উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্যের সহায়ক মাত্র। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহার প্রীতিসাধন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যাহা কিছু সবই ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগে বঞ্চিত হইবার দুঃখ নাই, আছে তৃপ্তির পবিত্র আনন্দ। "যৎ লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।" (নারদীয় ভক্তি-সূত্র ১।৪) যাহা আমাকে তোমা হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয় তাহা আমি কোনমতেই চাহি না, আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসিতে চাই। এই যে ভালবাসিয়া তৃপ্তি, ইহা ভক্তিপথকে এক অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ভালবাসা এমন একটি জিনিস যাহা সার্থক হইলেও মধুর, অসার্থক হইলেও মধুর। প্রেমের সাধনা সিদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে—ঈশ্বরকে যখন হইতে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত হইতেই ঈশ্বর আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এই যে ঈশ্বরপরায়ণতা—"তস্মিন্ অনন্যতা"—ইহাই ভক্তিমার্গের প্রথম ও শেষ কথা। এই পবিত্র পথের যাত্রী যাঁহারা—ঈশ্বর-কামনা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনও কামনা থাকে না। সকল নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মেশে, তেমনি তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্তবৃত্তিই ঈশ্বরাভিমুখী। প্রেমের যজ্ঞে 'অহং'ই একমাত্র আহুতি—এই অহং-ত্যাগের মধ্য দিয়াই প্রেমের জন্ম।

ভাদুর গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

মানভূমের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত 'ভাদুর গান'। ভাদ্রমাসে ভাদুর মূর্তি গড়িয়া ছড়া গাহিয়া ভাদুপূজা করা হয়। মানভূম হইতে পশ্চিম বঙ্গের নানা অংশেও ভাদুর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে সারা ভাদ্রমাস গান গাহিয়া কুমারী মেয়েরা এই পর্ব পালন করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ছোটনাগপুরের আদি-বাসীদের 'করম উৎসব' হইতে ভাদুর পূজার প্রচলন হইয়াছে। এই 'করম'ও সাঁওতালদের বর্ষার উৎসব, বাঙ্গালীরাও শেষ বর্ষায় ভাদুপূজা করিয়া থাকে।

অন্যান্য মেয়েলী পূজার ন্যায় ইহাতে আয়োজন বিশেষ কিছু লাগে না। মেয়েরাই ছড়া গাহিয়া, ফুল-ফল দিয়া ভাদুপূজা করিয়া থাকে, ভাদুর প্রতিমা অনেকটা লক্ষ্মী-প্রতিমার ন্যায়। বালিকারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিঁড়া, দই, মিষ্টি দিয়া তাঁহার পূজা করে।

সকল লৌকিক উৎসবের ন্যায় ভাদুপূজারও একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। মানভূম জেলায় পঞ্চকোট রাজ্যের রাজধানী ছিল কাশীপুর, সেথানে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা এক সময়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক বড় আদরের সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের আয়োজন হইল, নানাদেশ হইতে রাজ-পুত্রেরা রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে এক রাজপুত্রের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর বিবাহ স্থির হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পূর্বে বর্ষার এক ঘনঘোর দুর্যোগময়ী রাত্রিতে পথের মধ্যে বরের কলেরায় অকাল মৃত্যু ঘটিল। রাজা ভদ্রেশ্বরীর অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও সে আর বিবাহ করিল না, বাগ্‌দত্ত পতির চিতায় পুড়িয়া মরিল। শোকে দুঃখে রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাজ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মন্ত্রীরা উপদেশ ও সান্ত্বনাবাক্যে রাজার শোক দূর করিতে পারিল না, শেষে তাহারা এক অভিসন্ধি করিল। তাহারা গিয়া রাজাকে জানাইল, প্রজারা ভদ্রেশ্বরীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য সারা ভাদ্রমাস ধরিয়া পূজানুষ্ঠান করিবে, রাজাকে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। রাজা তখন হইতে আবার সিংহাসনে বসিয়া এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভাদুপূজার প্রচলন হইয়াছে।

ভাদুগানের তিনটি ভাগ—প্রথমটিতে ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকে তাঁহার আগমনী গান। কুমারীরা ভদ্রেশ্বরীর একটি মাটির পুতুল গড়িয়া তাঁহাকে গৃহে গৃহে গান গাহিয়া প্রতিষ্ঠা করে—যেমন—

ভাদুর আদর পেয়ে, ভাদু সে যে রাজার মেয়ে
ভাঙ্গে জুনার লো।
ওলো আয়লো ভাদু, খেতে দিব ডালভাঙ্গা
ফুলের মধু গো॥

কোথাও বা গাওয়া হয়—

ভাদু নিজগুণে
দয়া ক'রে এসেছে গো এখানে॥
কেহ বারি আন্‌তে চল গো, কেহ যাও ফুল-বাগানে।
(আবার) কেহ বা নিযুক্ত থাকো নৈবেদ্যের আয়োজনে॥

ভাদুপূজা উচ্চ-নীচ-বর্ণনির্বিশেষে সকল স্ত্রীলোকই করিয়া থাকে। তবে উচ্চবর্ণের বালিকারা সমবেতকণ্ঠে যখন ছড়া গাহে, তখন কোন বাদ্য বাজে না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বালিকারা নাচিয়া নানা প্রকার বাদ্যের সঙ্গে গান গায়। একজন গায় আর বাকী সকলে দোহারকি করে। নানাপ্রকার লোভনীয় সুখাদ্যের তালিকাই তাহাদের গানের বিষয়বস্তু।

—কলাপাকা আত্রটাবা গো, বাজার আন কিনে;
আরো কেহ বা মিষ্টান্ন আনো, ভুবন-ময়রার দোকানে॥
জিলাপী, খাজা লেডিকেনি গো, কিন্‌বে যে দেখে শুনে;
ভালো ক'রে পরখিবি, বাসি যেন আনিস্ নে॥

আগমনী গানের পর সারামাস ধরিয়া চলে 'ভাদুর মানভঞ্জন গান।' প্রিয়সখী ভাদুরানীর মানভঞ্জনের জন্য বালিকারা গায়—

ভাদু বিধুমুখি।
বদন তুলে হেসে কথা কও দেখি॥
বিরস বদন কেন লো, আজকে তোমায় নিরখি॥

ধনি, কিবা অভিমান হয়েছে, আমাকে বলো দেখি।
সুখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাঁকি।
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ॥

কোন কোন দিন, বিশেষতঃ বিসর্জনের পূর্ব দিন সারারাত্রি ধরিয়া ভাদুগান গীত হয়; তাহাকে বলে 'ভাদু জাগরণ।' নানা গার্হস্থ্য ও সাংসারিক খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ অবলম্বনে এ সকল গান রচিত হয়।

ভাদুজাগরণের এক বিরাট অংশ ভাদুর বিবাহের গান। প্রচলিত আখ্যানে আছে, বিবাহের পূর্বদিনে তাহার অকাল মৃত্যু হয়। তাই সেই করুণ-স্মৃতি বালিকারা বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বহন করে—

ভাদু আপন ভুলে, কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে॥
নবীনা প্রেমিকা ভাদুলো, কেমনে আছ ভুলে?

তরলমতি কুমারী বালিকা ও নববিবাহিতা কিশোরী বধূদেরই তো এসব উৎসব, তাহাদের কণ্ঠ বেশিক্ষণ বাষ্পরুদ্ধ থাকে না, অল্পক্ষণ পরেই তাহারা আবার রঙ্গ-পরিহাসে মাতিয়া উঠে। বাংলা দেশের চিরন্তন সেই তরজার লড়াই জমিয়া উঠে। প্রতিবেশিনী বালিকাদের সঙ্গে নিজেদের পূজা লইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। গানের আয়ুধেই একদল অন্যদলকে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ করে। ভাদুকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাদ-প্রতিবাদের লড়াই জমিয়া উঠে—

ভাইরে, মনে মনে।
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস্ কেনে?
আমার ভাদুর রূপটি তোদের চোখে লো বল সইবে কেনে?
সূর্যের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে॥
তেম্‌নি তোরা ভাদুধনে লো, দেখ্‌তে নারলি নয়নে।
তোদের ভাদু, আমার ভাদু, তফাৎ লো রাত্রি দিনে॥

বাস্তব-জীবন হইতে ভাদুপূজা বিচ্ছিন্ন নয়। সরলা সুশীলা বালিকারা ছলাকলা জানে না, তাহাদের মনের সকল কথাই ভাদুগানের মধ্য দিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে। সমস্যা, ঘটনাসংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনপ্রবাহ বহিতে পারে না, তাই প্রতিবৎসরই নূতন নূতন বিষয়ের গান পুরাতন গীতিসূত্রে যোজিত হইয়া চলিতেছে।

তারপর ভাদ্রসংক্রান্তির দিনে ভোরবেলায় ভাদুর বিসর্জনের গান। আনন্দে হাসিতে উৎফুল্ল কণ্ঠগুলি হঠাৎ বাষ্পভারাক্রান্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠে—

ভাদু তোমা ধনে,
ওগো বিদায় দিব কেমনে॥
যেও না যেও না ভাদুগো ধরি তব চরণে।
চলে গেলে আমরা বলো গৃহে রব কেমনে॥
দিবানিশি তোমায় হেরে গো থাকি আনন্দ মনে।
তুমি চলে গেলে প্রাণ ত্যজিব, কাজ কি এ ছার জীবনে॥

বালিকারা যেন বুঝিতে পারে না কিসের জন্য সখী ভাদুরানী এভাবে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে? অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো তাহাদেরও এইভাবেই অপরিচিত জীবনসাথীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয় হইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আসন্ন বিরহবেদনা, সেই রহস্যময় ভয়-ভাবনা ভাদুর ভাসান-গানে আভাসিত হইয়া আছে। তাহারা ভাদুকে আশ্বস্ত করে—

জলে হেল, জলে খেল, জলে তুমার কে আছে?
আপন মনে ভেবে দেখ জলে শ্বশুর-ঘর আছে॥

ভাদুর গান আগাগোড়াই তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে এইভাবেই পরিমূর্ত করিয়াছে।

এ গান তো কেবল সখী-বিরহে ব্যাকুলা বালিকাদের গান নয়, তাহার মধ্যে আছে বিচ্ছেদ-বেদনাতুরা মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। বাৎসল্যরসের পরিপূর্ণ কুণ্ডখানি উজাড় করিয়া এ সকল গান তাহাদের মায়েরাই রচনা করিয়া দেন। উমা-সঙ্গীতে মা মেনকা যেমন উমাকে আশ্বাস দিবার নাম করিয়া নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করেন। উমা-সঙ্গীতের সেই হৈমবতী ধারাই বাংলার রাঢ়ের রূঢ় মাটিতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে বাৎসল্যরসে উর্বরা করিয়াছে।

বালিকারা তাহাকে বিদায় দিতে আশ্বাসদানের মধ্যেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গান ধরে—

বিদায় দিতে মন সরে না ভাদু তোমারে।
নিশ্চয় যদি যাবি গো ভুলিস না গো আমারে॥
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদো না গো মনোমোহিনী।
আর বৎসর থাকি যদি আন্‌ব গো তোরে॥

বিজ্ঞান-সাধনা

শ্রীসুবর্ণকমল রায়

বৈজ্ঞানিকগণ নূতন কিছু আবিষ্কার করেন না তাঁহারা মাত্র প্রাকৃতিক গূঢ় রহস্যের এক একটি দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ সূত্র চিরকালই ছিল, এই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি বা জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। দিন দিনই নূতন রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। আপেক্ষিকবাদ আবিষ্কার করিয়া আইনষ্টাইন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বা বিজ্ঞানী বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন। এই আপেক্ষিকবাদও মহাত্মা আইনষ্টাইনের হাতের গড়া কিছু নয়, রহস্যময় প্রকৃতির বুকে ইহা লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু এতদিন সেইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দ্রষ্টার আবির্ভাব হয় নাই, তাই সূত্রটি ধরা পড়ে নাই। নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে আর একজন প্রকট হইবেন, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণতর মেধাবুদ্ধির জোরে অপর একটি অলৌকিক প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বিধান আবিষ্কৃত হইবে। এইরূপভাবে কতকাল এ আবিষ্কারের পালা চলিবে কে জানে? এসমস্ত মনুষ্যশক্তি অনন্তশক্তির বা অনন্তলীলার দুই একটি করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছে মাত্র। মনীষী নিউটন নিজেই বলিয়াছেন, "আমি সমুদ্রতীরস্থ অনন্ত বালুকারাশির দুই একটি বালুকা মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি অনন্ত বালুকারাশি সম্মুখে পড়িয়া আছে।"

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ, ডলটনের পারমাণবিক সূত্র, বয়েলের আইন্ ইত্যাদি সবই অতি সনাতন জিনিস। ইঁহারা গবেষণারূপ খনন-কার্য দ্বারা সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, যেমন মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের কিছু পুরাতন সভ্যতা, কৃষ্টি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শেষোক্ত আবিষ্কারগুলি দ্বারা আমরা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, ঐ সমস্ত স্থানে পুরাকালে এক অতি উন্নত সভ্যতা বা জ্ঞানবুদ্ধি-বিরাজ করিত। ইহাই যদি যথার্থ হয়, তবে নিশ্চয়ই এক অতি পুরাতন বিচক্ষণ অসীম মহতী চিৎশক্তি দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে, যাহার বিশাল ক্রিয়াকাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র সূত্র আবিষ্কার করিয়া উক্ত মনীষিগণ বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। যদি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক খননকারিগণ পূজার্হ হন, তবে সেই অজ্ঞাত, অনন্ত-শক্তিময় বিজ্ঞানী পূজার্হ হইবেন না কেন? আইন-ষ্টাইন, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ধীশক্তির পরিচয় লইয়া আমরা বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হই, কিন্তু অনন্ত ধীশক্তির কথা ভাবিতে ভুলিয়া যাই। এমনকি তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার তারতম্য বেশ দেখা যায়। কেহ অধম গবেষক, কেহ মধ্যম গবেষক, কেহ বা উত্তম গবেষক। শক্তি যদি এইরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে তবে অনন্ত শক্তির কথা ভাবিব না কেন? রাজার উপরে যদি রাজা থাকেন তবে অনন্ত শক্তিময় রাজা থাকিবেন না কেন?

অনন্তশক্তির পরিচয় বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া যেরূপ প্রকাশমান এইরূপ আর কোথাও নাই। তাঁহাকে ধরিবার বা চিনিবার এইরূপ চমৎকার সূত্র আর নাই। পেনিসেলিন আবিষ্কর্তাকে আমরা পূজা করি, কত শ্রদ্ধা নিবেদন করি, কিন্তু যিনি বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণ-বায়ু ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে বা তাঁহাকে স্মরণ করিতে ভুলিয়া যাইতেছি। বায়ুর মধ্য দিয়া শক্তিময়ের রাসায়নিক খেলা এক অপরূপ ব্যাপার! আমরা দেখি বায়ু পৃথিবীর উপরে খেলা করিয়া বেড়ায়, আর যেন কোন কাজ নাই। কিন্তু আমরা খবর রাখিনা

ঐ নৃত্যপরায়ণ বায়ুর মধ্য দিয়া কে একজন বিশ্ব-জোড়া রাসায়নিক হস্ত পরিচালনা করিতেছেন। সেই ক্রিয়াকাণ্ড খুবই চমৎকার। উহাতে না আছে তাপাধিক্য, না আছে চাপের প্রাচুর্য। এক শান্ত সমাহিত পরিবেশের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। এক নিপুণ রাসায়নীয় নির্দেশে গাছপালা, প্রাণিজগৎ বায়ুর স্পর্শ পাইয়া প্রাণবন্ত হইয়া আছে। এই প্রয়োজনীয় পদার্থটি ছাড়া কি আমরা একদিন বাঁচিতে পারি? তিনি বিনামূল্যে অযাচিতভাবে আমাদের ইহা দান করিয়াছেন, তবু দিনান্তে একবারও আমরা তাঁহাকে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি না।

পেনিসিলিন্, ক্লোরোমাইসিন্, প্লাস্টিক্, কৃত্রিম রবার ও মিল্ক প্রভৃতি তৈয়ার করিতে একজন রাসায়নিকের প্রয়োজন মাত্র। বিশ্ব জুড়িয়া এই যে থৈ থৈ জল—ইহার প্রস্তুতির পেছনে কি কোন রসায়নবিদ্ নাই? নিশ্চয়ই আছেন। কি সুন্দর টল টল, নির্মল জল! জলের তুলনা কেবল জলই। জল ও বায়ু বিশ্বরাসায়নিকের দুইটি অপরূপ দান। ইহাদের না আছে রূপ, না আছে গন্ধ, না আছে বর্ণ, না আছে স্বাদ। ইহারা সেই অরূপেরই যেন প্রতিচ্ছবি। যে রূপে বাঁধ সেইরূপই ইহারা প্রাপ্ত হয়। যে গন্ধে আপ্যায়িত কর সেই গন্ধেই ইহারা ভুর ভুর করে। আমরা চিত্তাকর্ষক কত মনোরম জিনিসই বৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈয়ার করিয়াছি। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী সর্বত্র উহাদের ভারে ভারে সাজাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এইরূপ দুইটি অতি সহজ ও সরল জিনিস কি কেউ তৈয়ার করিতে পারিয়াছে? এরূপ আনন্দমাখানো জিনিস মানুষ কি তৈয়ার করিতে পারে?

যিনি এই অপরূপ জিনিস দান করিয়াছেন তাঁহাকে মানিব না কেন? তাঁহাকে বাদ দিয়া কোথায় যাইব? আমার নিজের কৃতিত্ব কোথায়? সবই তো তিনি কোন্ এক আদিকালে রূপায়িত করিয়া রাখিয়াছেন আমাদের দ্বারা খেলা করিবেন বলিয়া। আমরা তাঁহার হাতের কতকগুলি পুতুল বা যন্ত্র। পুতুলের আবার অহঙ্কার! যন্ত্রের আবার দম্ভ!

আমরা সেই অনন্ত পুরুষের একটু সামান্য শক্তির সন্ধান লইয়া অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়াছি। গীতায় সেই আসুর সম্পদের কথা মনে পড়ে। আমরা আজ আসুর সম্পদের মালিক হইয়াছি। জগৎ এখন আমাদের কাছে ঈশ্বরশূন্য। আমরা এখন দম্ভপরায়ণ, মানী, মদান্ধ, ভোগসর্বস্ব। বিষয়-ভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক দ্রব্য বা অর্থ সঞ্চয় করিতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। আজ ইহা পাইলাম, এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; এত ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে…আমি বলবান্, আমি সুখী, আমার মতো আর কে আছে—পরমপুরুষকে ভুলিয়া যাওয়াতে এই ভাবগুলি আমাদের একদম গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে কখনও শান্তি হইবে না। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া যতই কার্যদক্ষতার পরিচয় দিই না কেন, তাঁহার নিপুণতার কাছে আমাদের নিপুণতা কতটুকু? কাজেই অনন্ত শক্তিকে স্মরণ করিয়া প্রতিকার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, আমার কাজের মধ্যে তাঁহারই কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে—এই ভাব লইয়া বিজ্ঞান-চর্চা করিলে প্রকৃত বিজ্ঞান-সাধনা হইবে এবং তাঁহারই পূজা সম্পাদন করা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনাবিল শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব।

"ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

বৈতরণী

[শ্মশান-দর্শনে]

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

ভোর হয়ে আসে রাত্রি ধূসর আকাশে—
নগর-সৌধ-শিয়রে উষার বাতাসে
চিম্‌নির কালধূম মেলিয়াছে পাখা,
তন্দ্রালু মেঘের নীচে নদী আঁকাবাঁকা,
পাড়ি দিয়ে দেশান্তরে চলেছে বলাকা।

এপারে দহন-মত্ত ক্ষুধিত শ্মশান
উন্মত্ত আরক্ত জিহ্বা ঊর্ধ্বে লেলিহান
লেহিছে ক্ষ্যাপার মত চিতা অবিশ্রাম ;
আর পারে কর্ম-ভূমি—চঞ্চল, উদ্দাম,
মধ্যে বহে তরঙ্গিনী বৈতরণী নাম।

সপ্তর্ষির সভা-দীপ গিয়াছে নিবিয়া
চন্দ্রমা চলেছে অস্তে কক্ষে সুধা নিয়া
ওপারের তন্দ্রাহারা বাঁশীর আহ্বানে
জাগিয়া পারের যাত্রী নদীর উজানে
রাত্রি হতে চলিয়াছে আলোকের পানে।

নদীর সীমাটুকুর এপারে ওপারে
জীবনের জয়-যাত্রা আলোকে আঁধারে ;
একপারে সূর্য ওঠে, অস্ত আর পারে,
নিশীথ সঞ্চয় ভরি' জীবন-সম্ভারে
উদায়াস্ত খেয়া-তরী বহে বারে বারে।

দূর হতে শোনা যায় জীবনের গান—
সৃষ্টি-প্রবাহের নিত্য এই অভিযান
সুপ্তির বিলুপ্তি হতে প্রভাতের ভালে
সিঞ্চিয়া জীবন-সরণী ঘুমের আড়ালে
প্রাণের প্রেরণা-শিখা জ্বালে অন্তরালে।

রিক্ততা উদ্ভিন্ন করি' উদয়-শিখরে
দেখা দেয় জ্যোতির্লোক বিলুপ্তির স্তরে
মঞ্জরিয়া দিবসের প্রহরে প্রহরে
সৃষ্টির মদির স্বপ্ন। বৈতরণী তটে
রাত্রির আসন্ন সন্ধ্যা ঘনায় নিকটে।

মৃত্যুর রহস্য ভেদি' সদ্য এই ঘাটে
ছাড়পত্র পেল যারা চলিয়াছে বাটে,
জীবনের অভিসার ক্ষণেক রহে না—
নিত্যই বিশ্বের হাটে আছে বেচাকেনা,
আজিকার পণ্যগুলি কালিকার দেনা।

সঞ্চয় কুড়ায়ে হেথা আখেরী পারাণি
মৃত্তিকার দেহ দিয়ে গড়া পাত্রখানি
পৃথ্বীরে সঁপিয়া দিয়া গোধূলি বেলায়
তারপর দিনগোনা নতুন আশায়,
প্রভাতের বর্ষপঞ্জী নতুন ভাষায়।

গুরু ও শিষ্য

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতের আত্মাকে বুঝিতে হইলে ইহার অণু, পরমাণু, ইট, পাথর, গাছপালা, জীবজন্তু সমস্তকেই বুঝিতে হইবে। এই বিরাট আত্মার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ঘূর্ণিবাত্যার মতো কত সন্ন্যাসী বনে ও গিরি-কন্দরে দিন কাটাইয়াছে, কত গৃহী তীর্থের পর তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়াইয়াছে! দীর্ঘদিন তপস্যার ফলে অনেক সাধক হয়তো ভূতভবিষ্যৎ বলিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের গণনা কোনটা

সঠিক হয়, কোনটা বা অস্পষ্ট থাকিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। এই পৃথিবীর পথ পিচ্ছিল, সকল সময় পদস্খলনের সম্ভাবনা। যদি গুরু না পাওয়া যায় তাহা হইলে পথ দেখাইবে কে? গুরু শিষ্যকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। সংসারী মানুষের মন বিষয়াসক্ত, ঠিক যেন মাতালের মত। যতক্ষণ গুরুবাক্য শোনে ততক্ষণ মাতাল অর্থাৎ বেঘোরে থাকে আবার নেশা কাটিয়া গেলে অসৎ-রিপুর বশবর্তী হইয়া যায়। কখনও তাহারা নিজেদের মনকে ক্ষুদ্র সংসারকুণ্ড হইতে বিরাটের মধ্যে স্থাপন করিতে পারে না। যাহা কিছু করে নিজের জন্য বা নিজের নাম করিবার আশায়। অনাসক্ত হইয়া সংসারে জীবের সেবা করিতে আসে এইরূপ লোক অত্যন্ত কম দেখা যায়। এই সংসারের বিরাট ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কত লীলা হইয়া থাকে তাহা দেখিয়াও কাহারও মোহ ভঙ্গ হয় না। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমে সদ্‌গুরু প্রয়োজন অর্থাৎ যিনি জীবনের দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রটিকে নিজের জীবনের প্রতিটি কার্যে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন সেইরূপ গুরু দরকার; কিন্তু সদ্‌গুরু পাওয়া বড় কঠিন। এইরূপ গুরু ও শিষ্যকে দর্শন করিলে মনে হয় মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। একটি কথা আছে "গুরু লাখ লাখ পাওয়া যায়, শিষ্য পাওয়া ভার।" জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে শিশু তাহার জনককে দেখে কিন্তু সে তাহার পিতার যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে পিতার চরিত্রের বহু অংশ প্রতিফলিত হয়। জীবনের সূত্রপাতে যদি উপযুক্ত গুরু পাওয়া তাহা হইলে সারা জীবনের পাথেয় সঞ্চিত হইয়া থাকে। একটি লোককবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

"দয়াল গুরু আমায় পারে লয়ে চল,
তুমি দীনহীন কাঙালের বন্ধু, বান্ধব আর
কে আছে তাই বল।"

একমাত্র গুরুই ঝঞ্ঝাসঙ্কুল সমুদ্র হইতে পারে তুলিতে পারেন।

আদর্শ গুরুশিষ্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা। জহুরী যেমন জহর চিনিতে পারে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ চিনিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথকে, গুরু ও শিষ্য মিলিত হইলেন কিন্তু শিষ্যের মন সারা দিল না। তিনি নানান ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর সন্ধানে দৌড়াইলেন। কেহই তাঁহার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না 'ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?' এর জবাব আসিল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে 'উহাতে সন্দেহ কেন? আমি মার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তাঁহাকে সর্বদা দেখিতেছি।' ইহা যেন নরেন্দ্রনাথের নিকট পাগলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইল। সময় আসিল যখন তিনি চারিদিকে বিফল-মনোরথ হইয়া ক্লান্তপদে ফিরিলেন দক্ষিণেশ্বরে। দ্বারে ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি ফিরিয়া ভাবিতেছেন সংসার-যন্ত্রণার কথা বলে কেমন করিয়া—সহজ বটে, কিন্তু ভীষণ জটিল। গুরু অন্তর্যামী—ফাঁকি দেওয়া তত সহজ নয়। তাঁহার চোখ এড়ায় না, তিনি বলিলেন, 'এই তো সময় নরেনকে পাবার, এই সুবর্ণ সুযোগ হারান উচিত নয়।' গুরুর পরশে শিষ্য দেখিলেন নূতন জগৎ। এই পৃথিবী হইতে তিনি হইলেন মায়ামুক্ত, পাইলেন সর্বদা আনন্দ, দুঃখের রাত্রি শেষ হইল, দেখা দিল জ্যোতির্ময়।

এইবারে শিষ্য গুরুকে যাচাই করিলেন যেমন কষ্টিপাথরে সোনা কষে স্বর্ণকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, টাকা হাতে দিলে জ্বলে যায়। ইহার পরীক্ষা করিলেন নরেন্দ্রনাথ গুরুর শয্যার নীচে একটি টাকা রাখিয়া। সেই কথা 'জ্বলে গেল, জ্বলে গেল' 'নিয়ে যা, নিয়ে যা'—শিষ্যের সন্দেহ ঘুচিল। গুরু বুঝিলেন, এইরূপ শিষ্যেরই প্রয়োজন যে খাঁটি ও মেকি যাচাই করিয়া নেয়। ভারত দেখিয়াছিল

দ্রোণাচার্য ও একলব্যের মতো গুরু-শিষ্যকে। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের মতো গুরু শিষ্য দেখা যায় না। একদিন তুলসীদাস বসিয়া আছেন শিষ্যমণ্ডলী লইয়া। একজন সংসার-ত্যাগী লোক ঘুরিতে ঘুরিতে হাজির হইলেন সেইস্থানে। লোকটি কোনকথা না বলিয়া তুলসীদাসকে ভণ্ড মনে করিয়া আঘাত করিলেন তাঁহার মাথায়। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। শিষ্যেরা সহ্য করিতে না পারিয়া আততায়ীকে মারিতে গেল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওরে তোরা ওকে চিনিসনি, ওযে গুরু খুঁজতে বেরিয়েছে, ও সব জায়গায় ঠকেছে তাই অধীর হয়ে মেরেছে, ওর তো দোষ নেই।' সকলেই স্তব্ধ এইরূপ গুরুবাক্য কখন শোনেনি। নবাগত শিষ্য গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িল। 'লোকে মাটির হাঁড়ি কিনতে গিয়ে দশবার বাজিয়ে নেয়, ওযে চিরজন্মের মতো গুরু করতে এসেছে, বাজিয়ে নেবে না!' গুরু নির্বাচনে ইহা স্মরণীয়, নরেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অধ্যাত্ম-জগৎকে অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লয় নাই। তিনি নিজে নিজেকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন সেইজন্য গুরুকে যাচাই করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

এই সংসারে সাচ্চা ও ঝুটা চেনা বড় কঠিন। চারিদিকে যেন রাতদিন অনবরত বহিতেছে মিথ্যার বিষাক্ত হাওয়া। সৎলোকও এই হাওয়ায় প্রতি-নিয়ত অবগাহিত হইতেছে। সাংসারিক ভারে ভারাক্রান্ত দেহ যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন যে যেমন পারে ঠকাইয়া লয়। এই সংসারে জীবের মুক্তি-সাধন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ উদয় হইলেন রানী রাসমণির মন্দিরে। ভোগবিলাসের ছড়াছড়ি। ঠাকুরের ভোগরাগ হইতেছে ধুমধামে আর কাঙালী-ভোজন মহাসমারোহে, কিন্তু নেই যেন ভক্তিরসের সংস্রব—মানুষের ব্যথার কোন সমাধান। যেন উদর-পূর্তির জন্য কাঙালের জন্ম ও এলাহি অর্থ খরচের জন্য বড়লোকের আত্মতৃপ্তি। কি সাংঘাতিক সামাজিকতা, যেন মানুষে মানুষে তেপান্তরের ব্যবধান! শাস্ত্রের কর্মফলের বিচার—এযে মিথ্যার প্রচার! ছি ছি করিয়া উঠিল মন রামকৃষ্ণের। পাগল ভোলানাথও মানুষের চিত্তহীনতা দেখিয়া প্রতিবাদ করিলেন। দূরে বসিয়া রহিলেন যেন নিস্পৃহ হইয়া। তখন হইতে মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল এমন একটি শিষ্য তৈয়ার করিবার জন্য—যে হইবে বজ্রের চাহিতেও ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড এবং তেজবান্—লক্ষ্যভ্রষ্ট গলিত সমাজকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া তৈয়ার করিবে নূতন সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের ভিত্তি—যাহা ভারতকে করিবে অচল অটল মহীয়ান্। রামকৃষ্ণের মনের মতো শিষ্য তৈয়ারী সার্থক হইল। শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরুও চাহিতেছিলেন এইরকম—যাঁহার কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না—যিনি হইবেন ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলের আশ্রয়স্থল। তিনি হইবেন তান্ত্রিক কিন্তু চৈতন্যের মত প্রেমময়। আর হইবেন বড় বৈজ্ঞানিক—প্রমাণ দেখাইবেন হাতে হাতে। নরেন্দ্রনাথ পাইলেন সেইরূপ গুরু, যাঁহার নিকটে মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী দেখিয়া জন্ম সার্থক করিলেন। এইরূপ গুরু ও শিষ্য যুগে যুগে দুর্লভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

জনশিক্ষা—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ জনশিক্ষা-মন্দিরের (১২, লালাবাবু সায়র রোড, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া) উদ্যোগে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত হাওড়া, চব্বিশ পরগণা ও বীরভূম জেলার কয়েকটি স্থান এবং কলিকাতা হইতে সমবেত প্রায় ৮০ জন ছাত্র ও গ্রামসেবকদিগের জন্য সমাজসেবা-শিক্ষণের একটি শিবিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

প্রাথমিক চিকিৎসা, গ্রন্থাগার-পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য, সব্জী বাগান গঠন, সমাজবিজ্ঞান, বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র-পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থিবৃন্দকে ঔপপত্তিক (theoretical) এবং ব্যবহারিক (practical) শিক্ষাদান করা হয়। শিবিরটির উদ্বোধন করেন বিচারপতি বি, কে, গুহ। যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ভার লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য :—শ্রীকেশবন্ (গ্রন্থাগারিক, ন্যাশনাল লাইব্রেরী), শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট, ন্যাশনাল লাইব্রেরী), শ্রীসুবোধ মুখো-পাধ্যায় (লাইব্রেরীয়ান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীনিখিলরঞ্জন মজুমদার (প্রধান পরিদর্শক, পশ্চিম বঙ্গ সমাজশিক্ষা-বিভাগ), শ্রীমন্মথ রায় (সমাজ-শিক্ষাচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), শ্রীক্ষিতীন রায় (শারীরশিক্ষা-প্রদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীএস্, চৌধুরী (বালি মিউনিসিপ্যালিটি), ডাঃ মন্মথনাথ সরকার ডাঃ বি, কে, রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের অন্তিম সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং শিক্ষার্থিগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীরামনিবাস ঝুন্ঝুন্ওয়ালা জনশিক্ষা মন্দিরের কাজের জন্য ৫০০১ টাকা দান করিয়াছেন, ইহা সভায় ঘোষিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ্ কালচার

কলিকাতা ১১১, রসারোডস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের '৫৪ সালের (সপ্তদশ বার্ষিক) কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :—

আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন ৪০২ জন, তন্মধ্যে ১৬ জন জীবনব্যাপী সভ্য। গ্রন্থাগারে ২৪৯ খানি পুস্তক সংযোজিত করিয়া মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২২৪২৬; ১২৮৪টি পুস্তক পঠনার্থে এবং ৮৯৪টি সূত্রনির্দেশের জন্য (for reference) দেওয়া হইয়াছিল। ২২২ খানি ভারতীয় ও বৈদেশিক পত্রিকা সমন্বিত পাঠাগারে পাঠকবর্গের দৈনিক উপস্থিতির গড় ৫০। ভারত ও বিদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী-প্রদত্ত সমাজ ধর্ম ও কৃষ্টি বিষয়ক ৪২টি বক্তৃতায় ২০০ হইতে ৫০০ শ্রোতা আগমন করেন। ভারতের স্বাধীনতা-দিবস, সম্মিলিত রাষ্ট্র-দিবস, মানবীয় স্বত্বাধিকার দিবস প্রভৃতি এবং বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৪টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক ধর্ম-ক্লাশের মধ্যে স্বামী ওঁকারানন্দ ৩৭টি (উপনিষদ্), স্বামী সৎস্বরূপানন্দ এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৩৮টি (গীতা) এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ৩০টি (মহা-ভারত) পরিচালনা করিয়াছেন। শ্রোতৃসংখ্যা দুইশত হইতে সাড়ে সাত শতের মধ্যে। ৮ জনের একটি সাপ্তাহিক শিক্ষাচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রতি-সপ্তাহে দুই দিন করিয়া পণ্ডিত শ্রীভুবনেশ্বর ঝা ১৭৬ জনকে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন; পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রভাষাপ্রচার সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রাবন্তিক ও প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ৮২ জন। পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী তর্কবেদান্ততীর্থের পরিচালিত সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ১৩ জন ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন সময়ে ৬টি শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতা-বলী, পুস্তক-সমালোচনা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া ইনষ্টিটিউট্ পত্রিকা (Bulletin) পঞ্চম বর্ষ অতিবাহিত করিল। ভারত-সংস্কৃতি ৪র্থ খণ্ডের (The cultural Heritage of India, Vol IV) প্রকাশন যোগ্য কার্যাদি চলিতেছে। ছাত্রাবাসে বিদ্যার্থী ছিল ১৭ জন, ৪ জন রিসার্চস্কলার সংস্কৃত-সাহিত্য, ভারত-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করেন।

চিকাগো বেদান্ত-কেন্দ্র — চিকাগো (আমেরিকা) বেদান্ত-কেন্দ্রে বিগত ৬ই মে, ১৯৫৫ (২২শে বৈশাখ, '৬২) পুণ্য বুদ্ধ-পূর্ণিমা তিথিতে একটি নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা ও ভজনালয়ের শুভ উদ্বোধন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি হয়; স্বামী অখিলানন্দজী, স্বামী পবিত্রানন্দজী, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী এবং স্বামী বিশ্বানন্দজীর সুষ্ঠু পরিচালনায় মাঙ্গলিক ক্রিয়াগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সায়াহ্নে সাধারণ সভায় দূরবর্তী অনেক নগর হইতেও বেদান্ত-প্রিয় ব্যক্তিবৃন্দ আগমন করেন। হিন্দুধর্মসংগীত গীত হইলে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দজী ভাবগম্ভীর-কণ্ঠে মঙ্গলাচরণের পর প্রারম্ভিক ভাষণ দেন;

তিনি বলেন, চিকাগো নগরী মহাতীর্থ—এখানকার পবিত্র মাটিতেই হয় প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সুধীসন্তদের সমাবেশে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্মরণীয় ধর্মমহাসভা, যেখানে জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসী ভ্রাতাভগিনীগণের নিকট ভারতঋষিদের 'সত্য এক' এই মহাবাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বামী অখিলানন্দজী পাশ্চাত্ত্য ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারে চিকাগোর মহাদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন, বর্তমান যুগ শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগ—আধুনিক জগতে সবই এমনকি ধর্মপর্যন্তও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা না হইলে লোকের বিশ্বাস হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সর্বধর্ম-ঐক্যবিধায়ক বাণী অনুরাগিগণেরও হৃদয়কে স্পর্শ করে। সুবিখ্যাত ধর্মযাজক ফাদার রোগারস্ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ধর্মে বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টধর্মে নূতন আলোক-সম্পাত হইয়াছে এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় জগতের কাছেই মহান্ হিন্দু-ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। স্বামী পবিত্রানন্দজী বলেন, বুদ্ধদেব বারাণসীতে তাঁহার প্রথম বাণী দেন, স্বামীজীও সেইরূপ চিকাগোতেই তাঁহার প্রথম ভাষণ প্রদান করেন, তাই চিকাগো বারাণসী-তুল্য। বুদ্ধের মত হৃদয়বত্তা লইয়া আসিয়াছিলেন স্বামীজী, জগৎকে তিনি এক পবিত্র উন্নতস্তরে উঠাইতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার ভাবধারা মানব-সমাজের মধ্যে এখনও নিঃশব্দে সকলের অজান্তে কাজ করিয়া চলিয়াছে। চিকাগো উত্তরপশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল স্কিল্ তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে স্বামীজীর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব বিশ্লেষণ করেন; তিনি বলেন, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টোপদেশের মতোই স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি হইতেছে। স্বামী সৎ-প্রকাশানন্দজী আচার্য শংকরের সহিত স্বামীজীর তুলনা করিয়া দেখান যে, স্বামীজী প্রাচীন যুগের সত্যকে বহু সমস্যাপূর্ণ বর্তমান যুগ সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সভান্তে ভারতীয় প্রথায় সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

আবেদন

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বহু-আকাঙ্ক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-প্রতিষ্ঠা তাঁহার তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পরে হইলেও শ্রীভগবানের অপার করুণায় ১৯৫৪ সালের মে মাসে সম্ভব হইয়াছে। ইতোমধ্যেই আশ্রম-কর্তৃপক্ষ একটি অবৈতনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়, একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং প্রতি-সপ্তাহে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা-সভা নিয়মিতভাবে চালাইতেছেন। চিকিৎসালয়টি এবং আশ্রমের কার্যাবলী খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে যে পরিবেশে আশ্রমটি অধিষ্ঠিত তাহা ঠিক আশ্রমোপযোগী নয় এবং আশ্রমের প্রয়োজনীয় গৃহবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত স্থানও ইহার চতুষ্পার্শ্বে নাই, সেইজন্য শহরের কেন্দ্রের দিকে আশ্রমটিকে সরাইয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। ইহার জন্য উপযুক্ত জমি ক্রয় করিতে হইবে। জমি ক্রয় এবং গৃহাদি নির্মাণের জন্য প্রথমেই লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীনগরে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন-কেন্দ্রটি যাহাতে দেশে বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখার ন্যায় জনগণের সেবায় পরিপূর্ণ সহযোগিতা দিতে পারে সেইজন্য আমরা বদান্য ব্যক্তিগণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শ্রীনগর, কাশ্মীর—এই নামে চেক্ বা ড্রাফ্ট্ (নিরপত্তার জন্য crossed করিয়া) পাঠাইতে পারেন। কোন গৃহের আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াও প্রিয়জনের স্মৃতি চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় করা যাইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
করণ-নগর,
শ্রীনগর (কাশ্মীর)

নিবেদক
স্বামী অসঙ্গানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ

উদ্বোধন

কবে ?

বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং
নমস্যদার্তিক্ষপণে কৃতক্ষণম্।
ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজম্
কদা নু সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ॥

—যামুনাচার্য (আল্‌ওয়ান্দার)-বিরচিত
স্তোত্ররত্ন, ৩০, ৪৬

কবে সেই সুদিন আসিবে—জন্মজন্মান্তরের প্রতীক্ষিত সেই সুদিন ?

প্রণতজনের আর্তি দূর করিবার জন্য অনুক্ষণ উদ্‌গ্রীব তোমার যে চরণদ্বয় একদা (বামনাবতারে দানগর্বিত বলিরাজার দর্প চূর্ণ করিতে) লীলাচ্ছলে স্বর্গ ও মর্ত্যকে অতিক্রম করিয়াছিল সেই পাদপদ্ম স্বচক্ষে কবে দেখিতে পাইব ? ঐ রাতুল পদদুটিই যে আমার একমাত্র জুড়াইবার স্থান, অনন্তকালের অভয় আশ্রয়, ঈপ্সিততম সম্পদ্। কবে, প্রভু, কবে আপনার ধন আপনি চিনিয়া লইব ?

মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র আকর্ষণ লইয়া সমুপস্থিত অগণ্য চঞ্চল মনোরথ নিঃশেষে শান্ত হইয়া গিয়াছে, তোমারই চিন্তায় তোমারই আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, সেবায় জীবন নিরন্তর ভরপুর হইয়া আছে—এমন শুভ সময় কবে আসিবে ? একান্ত তোমারই-নিত্যকিঙ্কর-হইয়া-থাকা—তোমাকেই জীবনের একমাত্র-স্বামী-করিয়া-চলা—তোমার প্রীতির জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত-করিয়া-রাখা সেই মহাজীবন কবে লাভ করিব ?

কথাপ্রসঙ্গে

সংসার ও ভগবান

ভারত-সংস্কৃতি সংসারের সহিত ভগবানের কোন বিরোধ দেখে নাই—তবে বিরোধ দেখিয়াছে সাংসারিকতার সহিত। সংসার ও সাংসারিকতা এক কথা নয়। সংসারে আমরা যখন ভগবানকে হারাইয়া ফেলি তখন উহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় সং-সার অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর মাত্র। ভগবানকে বাদ দিয়া সংসারে মত্ত থাকার নাম সাংসারিকতা—সে সংসার যতই ধন মান ঐশ্বর্য বিভব দ্বারা পূর্ণ হউক না কেন। ভারত-মানস চিরদিন সাংসারিকতাকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছে।

'আধুনিক' সভ্যতা যে জীবনধারাকে সারা মনঃ-প্রাণে বরণ করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব, নিঃসঙ্কোচে ভারত একদিন তাহাকে আসুর বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। উদগ্র লোভ, স্বার্থপরতা, দশজনকে বঞ্চিত করিয়া ধনসঞ্চয়, দুর্বার ক্ষমতাস্পৃহা, দম্ভ এইগুলিই তো উন্নতির নামে আজকাল 'সভ্য' মানুষের সর্বথা অনুসরণীয় দেখিতে পাই। যে যত এই পন্থায় আগাইয়া যাইতে পারে আধুনিক সভ্যতার বিচারে সে তত বাহবা লাভ করে। কিন্তু ভারত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলিয়াছিলেন?—

ধর্ম-আড়ম্বর, দর্প—শুন মহাবল
অভিমান নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ আর অজ্ঞানতা
অসুর-ভাবের এই লক্ষণ সকল।

* * *

কহে তারা—"সত্যহীন এ ভবমণ্ডল .
নাহি কিছু পাপপুণ্য , সংসার ঈশ্বর-শূন্য
আপনা-আপনি হয় উৎপত্তি সকল।"
সৃষ্টির কারণ তারা এই জানে সার—
স্ত্রীপুরুষ-কামনায় বাড়িছে সংসার।

* * *

যাবৎ না তাহাদের ছাড়ি যায় প্রাণ,
অনন্ত চিন্তার বশে, সুখ-ভোগ অভিলাষে
কাম-ভোগ সংসারের সার করি জ্ঞান।
শত আশা-পাশে বদ্ধ, কামক্রোধে মাতি
ছলে বলে অর্থলাভে মত্ত দিবারাতি।
ভাবে তারা নিশিদিন উন্মাদ যেমন
অদ্য এই লাভ ভবে কল্য আশা পূর্ণ হবে,
অদ্য এই আছে, কল্য হবে এই ধন!
এই শত্রু নাশিয়াছি বধিব অপর
আমি ভোগী সিদ্ধ সুখী আমিই ঈশ্বর!

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬।৪,৮,১১-১৪;
কুমারনাথ সুধাকর কৃত পদ্যানুবাদ)

আসুর মানুষের শ্রীকৃষ্ণোক্ত বিশ্লেষণ আজও কি সমানভাবে সত্য নয়? যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে উক্ত মানুষেরা আজ এত মর্যাদা পাইল কি করিয়া? তাহাদের জীবনরীতি 'প্রগতির' নামে ব্যাপকভাবে সহস্র সহস্রকে আকর্ষণ করিতেছে কেন? বোধ করি, সভ্যতার মূল্যবোধ বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া। সংসার হইতে ভগবান নির্বাসিত হইয়াছেন বলিয়া।

সভ্যতার মূল্যবোধকে সংশোধিত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সংশোধনের দায়িত্ব ভারতকেই সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইয়া লইতে হইবে, যে যাহাই বলুক, আজকালকার 'সভ্যে'রা যতই উপহাস করুক। বিদেশের অনেক রাষ্ট্র-প্রতিনিধি এবং ভ্রমণকারী বর্তমান ভারতবর্ষের কলকারখানা প্রভৃতি দেখিয়া মুরুব্বীর মতো সার্টিফিকেট দিয়া যাইতেছেন, 'হাঁ, ভারতবর্ষ আগাইয়া যাইতেছে' এবং আমরাও তৃপ্তিবোধ করিতেছি—'তবে তো ঠিক আমরা চলিতেছি, সভ্য জাতিসমূহের দরবারে আমাদের উত্তরোত্তরই উচ্চশ্রেণীর টিকিট মিলিতেছে, সাবাস আমরা।'

কিন্তু দুই তরফেরই দুটি প্রাথমিক ভুল রহিয়া

গেল। তাঁহারা বুঝিলেন অগ্রগতির অর্থ তাঁহাদিগের নিকট যাহা, ভারত তাহাই মানিয়া লইয়াছে। আর আমরা আমাদের প্রগতির নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বিস্মৃত হইলাম। ত্রুটি ভুলই মারাত্মক। তাঁহাদের নিকট শিল্প-বিজ্ঞান, যান্ত্রিক উন্নতির শিক্ষা ভারত সোৎসাহে লইবে, কিন্তু ভারত যে সভ্যতা বলিতে এইটুকুই বুঝে না, এই উন্নতি ভারত-দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতির সবটা তো নয়ই, অতি অল্পমাত্র—এই কথা স্বাধীন-ভারত তাঁহাদের নিকট বলিতে কুণ্ঠিত হইবে কেন? সভ্যতার—বিশ্বকল্যাণকর সভ্যতার স্রষ্টা আসুর মানুষ নয়, দেব-মানুষ—ভারতের এই সনাতন শিক্ষা পাশ্চাত্ত্য প্রগতির মোহে ভারতবাসী যদি অনাদর করে তাহা হইলে শুধু ভারতের ক্ষতি নয়, সারা পৃথিবীরই ক্ষতি। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া আসুর সভ্যতার—আড়ম্বর-দম্ভ-কাম-লোভের যে নির্লজ্জ প্রকাশ চলিয়াছে তাহার প্রতিরোধ আবশ্যক, মানব-প্রগতির জন্যই আবশ্যক। সাংসারিকতা বর্জন করিয়াও যে সংসারের উন্নতি বিধান করা চলে—ভগবানকে সংসারের পুরোভাগে রাখিয়া যে প্রগতি উহাই যে যথার্থ প্রগতি, ভারতকে আজ ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইতে হইবে এবং অপর দেশকেও শুনাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"নবীন জাতিগুলির নিকট এখনও মূল প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। তাহারা জোর করিয়া বলিতে পারে না শান্তিই স্থায়ী হইবে, না যুদ্ধবিগ্রহ; তিতিক্ষা টিকিয়া থাকিবে, না অসহিষ্ণুতা; সততা না সৌজন্য; শারীরিক বলের জয় হইবে, না মানসিক শক্তির; ইন্দ্রিয়পরতা বাঁচিবে, না আধ্যাত্মিকতা। আমরা কিন্তু বহু যুগ পূর্বে এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছি।

সুদিন ও দুর্দিনে আমরা ঐ সমাধানটিই আঁকড়াইয়া রহিয়াছি এবং শেষ পর্যন্ত থাকিবও। আমাদের সমাধান—ভোগ নহে, ত্যাগ; সাংসারিকতা নহে, সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি।"

সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি বলিতে স্বামীজী নিশ্চিতই সাংসারিক অভ্যুদয়ের বিরোধিতা বুঝেন নাই। ভারতে সাংসারিক অভ্যুদয় চতুর্বিধ পুরুষার্থের দুইটি—(অর্থ ও কাম) দ্বারা সংজ্ঞিত। সাংসারিক অভ্যুদয় অবশ্যই চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই ভগবান—পুঁথির বা গির্জার বা সামাজিক অনুষ্ঠানের মৃত ভগবান নয়, মানুষের সকল চিন্তা-কর্ম-আশা-আকাঙ্ক্ষার বিধারক, সামঞ্জস্যবিধায়ক, সত্য শক্তি ও আনন্দদায়ী জীবন্ত ভগবান।

বৈজ্ঞানিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

"বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা কি সম্ভবপর?"

এই নামে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওয়ারেন উইভার (Warren Weaver; ইনি 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্‌ভান্স-মেণ্ট অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং গত বিশ বৎসর ধরিয়া রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের বিজ্ঞানপ্রসার বিভাগের অধিকর্তা) 'লুক' (Look) পত্রিকায় সম্প্রতি (৫ই এপ্রিল, ১৯৫৫) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, ক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গী পাশাপাশি বিশ্লেষণ করিবার পর লেখক বলিতেছেন,—"অনেকে মনে করেন বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মোটেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণেরই বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। অদৃশ্য এবং প্রধানতঃ অনির্দেশ্য বস্তুতে আস্থা স্থাপন করিতে তো তাঁহারাই বেশী অভ্যস্ত।" লেখক একটি উদাহরণ দিতেছেন:

বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে অখিল জড়-

জগতের উপাদান হইল বিদ্যুতিন্ বা ইলেক্‌ট্রন। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এ পর্যন্ত অতিক্ষুদ্র এই বিদ্যুৎকণা ইলেক্‌ট্রন চোখে দেখেন নাই বা ভবিষ্যতেও ইহাকে যে কোনকালে প্রত্যক্ষ করা যাইবে তাহাও মনে করেন না। ইলেক্‌ট্রনের যাহা প্রকৃতি তদনুসারে উহাকে প্রত্যক্ষ করা বা যথাযথ নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব—উহা একপ্রকার অতীন্দ্রিয়, অনির্ণেয়। তথাপি ইলেক্‌ট্রনের চেয়ে সত্যবস্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট আর কিছু থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক যখন গভীরভাবে চিন্তা করেন তখন চেয়ার, টেবিল, গাছ, পাথর এগুলি তাঁর কাছে খুব 'সত্য' নয়। আণবিক পদার্থবিদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে টেবিলটি কতকগুলি ছায়াময় ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক চার্জের সমষ্টি (বৈদ্যুতিক চার্জ জিনিসটিও আবার অতি অস্পষ্ট এবং ধরাছোঁয়া দিতে নারাজ)। অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে টেবিলের যে বৃহৎ কঠিন বাস্তবতার প্রতীতি—উহা বৈজ্ঞানিকের মননে ন স্যাৎ হইয়া যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিকের মাথায় জগৎ সম্বন্ধে দুই ধরনের চিন্তা রাখিতে হয়। (১) যখন 'ব্যবহারিক' ক্ষেত্রে চলেন ফিরেন কাজ করেন তখন তিনি সরল সর্বজনপ্রচলিত ধারণাগুলির প্রয়োগ করেন (২) যখন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন উঠে তখন সাধারণ প্রতীতির ঊর্ধ্বে গভীরতর ধারণাগুলিতে মনোনিবেশ করেন।

সাধারণ লোককে তুমি, আমি, টেবিল, চেয়ার, গাছ পাথর প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ঘনতা, দৃঢ়তা, অবস্থান, বাস্তবতা প্রভৃতির ধারণা রাখিতে হয়। এই সব ধারণা না থাকিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অচল হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকও এই ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন কি করিয়া? তাঁহাকেও তো ব্যবহারিক জগতেই থাকিতে হইবে। তথাপি বৈজ্ঞানিক জানেন যে, এই আপাতপ্রতীয়মান ধারণাগুলি প্রখরতর পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির মূল সত্য অন্বেষণ করিলে সম্পূর্ণ অভিনব তাত্ত্বিক ধারণানিচয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 'ব্যবহারে' যাহা দৃঢ় ঘন বস্তু (solid) ছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে দৃঢ় বা ঘন নয়।

ইলেক্‌ট্রনের কথাই ধরা যাক্। প্রথম প্রথম পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন উহা একটি কণা (particle)। পরে তাঁহারা দেখিলেন, না, উহা একপ্রকার তরঙ্গ-গতি (wave motions)। আজকাল তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ইলেক্‌ট্রন কণা এবং তরঙ্গ-গতি দুইই। প্রহেলিকা?

আবার ইলেক্‌ট্রনের অবস্থান সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আরও কুয়াসা আসে। কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে একটি ইলেক্‌ট্রন কোথায় আছে বা কোন্ দিকে গতি লইবে তাহা বর্তমান বিজ্ঞানের অনির্ণেয়।

দৃশ্যমান প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্ণনা করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কঠিন নয়। এই এই ব্যাপার যদি দেখা যায় তো বৈজ্ঞানিক সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতে পারেন এই এই পরবর্তী ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বোকা বনিয়া যান। এই মুহূর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট ইলেক্‌ট্রনের আচরণ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক বলিতে পারিবেন না পরমুহূর্তে উহার আচরণ কি হইবে। বড় জোর তিনি বলিবেন—'এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা।' শুধু 'সম্ভাবনা'! নিশ্চয়তা কিছু নাই। কার্যকারণশৃঙ্খলা যাহা বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড, ইলেক্‌ট্রনের জগতে যেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে!

বৈজ্ঞানিক আজ দেখিতেছেন কোন কিছুর সম্পূর্ণ 'ব্যাখ্যা' করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। পরিচিত এবং প্রচলিত ধারণা দিয়া অভিনবকে 'ব্যাখ্যা' করা ছিল এতদিনকার বৈজ্ঞানিক রীতি। আজ 'পরিচিত' এবং 'প্রচলিত'গুলি সম্বন্ধেই সংশয় উঠিয়াছে। 'পরিচিত' এবং 'প্রচলিত'গুলিকে

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উত্তরোত্তর আমরা 'অজ্ঞেয়'তে আসিয়া হাজির হইতেছি।

আজিকার বৈজ্ঞানিক অতএব, তাঁহার চিন্তা-জগতে দ্বিধারা রাখিতে বাধ্য। 'প্রতীয়মান' সমস্যা সম্বন্ধে একটি সহজ উত্তর দিতে তিনি সঙ্কুচিত। 'প্রতীয়মান'কে তিনি মানেন, লইয়া ঘর করেন—কিন্তু তিনি জানেন উহাদের মূলে একটি বহু সূক্ষ্মতর দুর্নির্ণেয় রহস্য আছে। ঐ অদৃশ্য গভীর সম্বন্ধে শেষ উত্তর না পাওয়া গেলেও উহা কিন্তু সত্য, অপ্রত্যাখ্যেয়।

আজিকার বৈজ্ঞানিকের এই দৃষ্টিভঙ্গী এবার ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে প্রয়োগ করা যাক্। ডক্টর উইভার বলিতেছেন—"ঈশ্বরের ধারণা জটিল ও বস্তু-নিরপেক্ষ (abstract) বলিয়াই উহা সত্য নয়, এমন কথা আর যিনিই বলুন, বৈজ্ঞানিক কখনই উহা বলিতে পারেন না, কেননা তিনি জানেন, টেবিল, গাছ, পাথর প্রভৃতির যে প্রাত্যহিক বাস্তবতা তাহা একটি মায়া মাত্র, প্রকৃত বস্তুসত্তা অতি সূক্ষ্ম, দুর্নিরীক্ষ্য, কুহেলিকাময় ব্যাপার।"

বৈজ্ঞানিক দেখেন, কোন একটি সংজ্ঞা কুহেলিকাময় হইলেও সক্ষমভাবে কার্যকরী কিনা। কতকগুলি ঘটনাসমষ্টির 'নাম' হইতেছে 'ইলেক্‌ট্রন' (উহাকে সম্পূর্ণ বুঝি বা না বুঝি)। এই ঘটনাগুলি কি, সে সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত। আবার উহারা যে নিয়মগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। অতএব 'ইলেক্‌ট্রন'—এই সংজ্ঞাটি 'কার্যকরী'। 'ঈশ্বর' বিষয়টি সম্বন্ধে মানুষের উক্ত ধরনের একটা সর্বজনীন ঐকমত্য না থাকিলেও ডক্টর ওয়ারেন উইভার লিখিতেছেন—

"তথাপি তিনটি কারণে আমি ঈশ্বর-ধারণাটি গ্রহণ করি। (১ম) মানুষের সমগ্র ইতিহাসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সাধারণ স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইলেক্‌ট্রনের স্বীকার যুক্তির দিক দিয়া যত সুনির্দিষ্ট, ঈশ্বর-স্বীকার হয়তো ততটা নয়, কিন্তু একথা সত্য যে, যত লোকে ইলেক্‌ট্রনকে বিশ্বাস করে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে বা করে। (২য়) জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ সমস্যাগুলি লইয়া আমি যেভাবে চিন্তা করিতে পারি ধর্মীয় অনুভূতির ক্ষেত্রে আমি হয়তো সেরূপ সন্তোষজনক ভাবে পারি না, কিন্তু আণবিক-বিজ্ঞানীকেও তো অসম্পূর্ণ এবং পরস্পরবিরোধী মত লইয়া চলিতে হয়। ঐ মতগুলি 'কার্যকরী' এবং একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার সূচক। ঈশ্বর সম্বন্ধেও আমার মনন 'সম্পূর্ণ' ও 'নিখুঁত' না হইলেও উহা 'কার্যকরী'। (৩য়) আমি ভগবান সম্বন্ধে দুটি পৃথক শ্রেণীর ধারণা গ্রহণ করিব (ইলেক্‌ট্রনের স্বরূপসম্বন্ধীয় দ্বিধারা চিন্তার ন্যায়)। প্রথম—জনসাধারণের হৃদয়াবেগস্থিত ও অন্তর্ধ্যান-লভ্য ঈশ্বরের ধারণা; দ্বিতীয়—বুদ্ধিবিচারলক্ষ্য বস্তুনিরপেক্ষ ঈশ্বরের ধারণা। দুটিই আমাকে পরিতুষ্টি দেয়। এই দুটি ধারণা পরস্পর অত্যন্ত পৃথক জানি, কিন্তু তাহাতে আমি বিচলিত নই। একটি ইলেক্‌ট্রনে যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় থাকিতে পারে ঈশ্বররূপ অতি মহান্ তত্ত্বের ধারণায় বিরুদ্ধতা কিছু থাকিবে না এমন আশা করা উচিত নয়।"

"জনসাধারণের হৃদয়াবেগস্থিত ও অন্তর্ধ্যানলভ্য ঈশ্বরের ধারণা" ডক্টর ওয়ারেন উইভারের মতে উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়—যেমন, চেয়ার, টেবিল বা দৈনন্দিন আরও অজস্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় আমরা অস্বীকার করিতে পারি না সেইরূপ।

"যখন আমি বিপদে পড়ি বা আতঙ্কগ্রস্ত হই, ছেলেবেলায় গির্জায় শোনা সুন্দর ভগবৎ-প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি যখন আমার কানে বাজে তখন ঈশ্বরকে আমি নিকটে পাই আমার হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া—এক সান্ত্বনাদায়ী, সঙ্কটত্রাতা পিতারূপে। যখন আমি একটি ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন,

তখন ঈশ্বরকে আমি পাই আমার অন্তরের সুস্পষ্ট বিবেক-বাণীর মাধ্যমে। কি করিয়া কোথা হইতে ঐ বাণী উঠে তাহা আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু জানি, উহার নির্দেশ শুনিলে আমার সমস্যার মীমাংসা হইবে।"

উপরোক্ত উদাহরণ দুইটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের হৃদয়-মনের অনুভব। বহিঃপ্রকৃতির ঘটনার মতো উহারাও ঘটনা—মানুষের অন্তর্জীবনের ঘটনা। এই টেবিলটি, এই পাথরটি কঠিন নয় ইহা যেমন কেহ বলিতে পারে না, তেমনি উপরোক্ত মানস-অনুভবে যে ঈশ্বরকে লোকে পায় সেই ঈশ্বর নাই ইহাও বলা চলে না। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এই ঈশ্বরানুভবের চুলচেরা নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক (যেমন, চেয়ার টেবিল প্রভৃতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ঈশ্বর তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে পরিণত হন একটি সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য সত্তায়। (যেমন গভীরতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে চেয়ার টেবিলের রূপ নেয় দুর্জ্ঞেয় ইলেকট্রনে সেইরূপ)। এই বুদ্ধি-বিচারের ঈশ্বরও ন স্যাৎ নন্। মনের কোন বিশেষ অবস্থায় ইঁহাকেও আমাদের প্রয়োজন হয় (বৈজ্ঞানিক সত্যের অবধারণে ইলেকট্রনের ধারণার ন্যায়)।

মনীষী বৈজ্ঞানিক-লেখকের বিচারধারা অনুসরণ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক-চিন্তার সহিত ঈশ্বর-চিন্তার কোন বিরোধ নাই ইহা তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত মনে হইতেছে। লেখকের মতে, দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধিবিচার দ্বারা নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের যে ধারণায় আমরা উপনীত হই তাহার উপযোগিতা আছে, তবে উহা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।

ভারতবর্ষের বেদান্ত-বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্য নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে (যাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে) একটি দুর্জ্ঞেয় কুহেলিকার মধ্যে রাখেন নাই। উহা একটি কল্পনা (idea) মাত্র নয়, আর ঐ কল্পনা 'কার্যকরী' বলিয়াই যে উহাকে মানিব তাহাও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। বেদান্ত-বিজ্ঞান চরম সত্যে সংশয়ের, দ্বন্দ্ববুদ্ধির কোন লেশ দেখেন নাই। এই চরমসত্য মানস কল্পনা নয়, সকলেরই প্রত্যক্ষ-যোগ্য আত্মচৈতন্যস্বরূপ। উহা অপেক্ষা নিঃসন্দিগ্ধ 'বৈজ্ঞানিক' সত্য আর কিছু হইতে পারে না।

হিংসা ও অহিংসা

সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনায় হিংসা ও অহিংসা লইয়া ভারতীয় জনসাধারণের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। অহিংসপন্থী একাধিক নেতা দুষ্টের শাসনের জন্য নিছক অহিংসা পথ ত্যাগ করিয়া সঙ্গত হিংসার সমর্থন করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীবেদপ্রকাশ ভাটিয়া নামক অম্বালার জনৈক পত্রলেখক 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ন্যায় আরও শত শত দেশবাসীর মনের কথা, সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত ভাটিয়া লিখিতেছেন—

"দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অনেকে ইহাই বলিতে চান যে, অশুভপ্রতীকারের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইল অশুভকে শুভ-বিনাশের প্রশ্রয় দেওয়া আর শুভের ক্রমাগত নির্মম আত্মত্যাগের ফলে কোন না কোন উপায়ে অশুভ একদিন দূর হইবে বা উহার প্রকৃতি বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী অন্য কথা বলে। * * * বোধ করি বার্নার্ড শ' ঠিকই বলিয়াছিলেন, —'ইতিহাস হইতে আমরা কেবলমাত্র এই শিক্ষাটিই লাভ করি যে, ইতিহাস হইতে আমরা কিছুই শিখি না।' * * * দুর্যোধন কি পাণ্ডবগণ এবং কৃষ্ণের একান্ত তোষণ-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নত হইয়াছিলেন? বুদ্ধের নির্ভেজাল অহিংসা-বাণী এবং উহার অপরিহার্য ফলস্বরূপ ভারতীয় চরিত্রে শৌর্যবীর্যভাবের ক্ষীণতাই কি বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় নাই? দিনের পর দিন আমরা শুনিতেছি যে ভারত শুধু অহিংসারূপ মহাস্ত্রের সহায়েই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয়, ইহা মাত্র আংশিকভাবেই সত্য। প্রচার-ভিত্তিম কখনও বাস্তবের স্থান অধিকার করিতে পারে না। গান্ধীজী এবং তাঁহার অহিংস অসহযোগের আবির্ভাবের পূর্বে

অসংখ্য বিপ্লবী যে স্বাধীনতার ভূমি তৈরী করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলিতে পারি কি? নেতাজীর অবদান, আর-আই-এন বিদ্রোহ এবং ১৯৪২ সালের সহিংস বিপ্লবের কথা? * * * অহিংসা ভাল নীতি, কিন্তু উহা কার্যকরী না হইলে সত্য ও ন্যায়ের রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় ধর্মসঙ্গত।"

হিংসা ও অহিংসার বিচারে বেদ-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত আমাদের ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্তব্য। শান্তি, মৈত্রী, বিশ্বকল্যাণ এইগুলিই সর্বজনীন লক্ষ্য—অহিংসা উহার একটি সাধন মাত্র। স্থলবিশেষে হিংসাও ঐ সাধনের স্থান অধিকার করিতে পারে—যেমন শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের দুর্দম্য উচ্ছৃঙ্খল ক্ষাত্রশক্তির দমনের জন্য। অহিংসা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন, যেমন মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে নির্ণয় করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের সামগ্রিক সাধনার বহুবিধ বিভাগের একটিমাত্র বিভাগ 'অহিংসা'। মনে হয়, এই অহিংসাকে অধিকারি-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের অনুসরণীয় জীবনাদর্শ বলিয়া ঘোষণা করা ভারতবর্ষের বহুদর্শী জ্ঞানী ঋষিমুনিগণের সিদ্ধান্তের বিরোধী। স্বামী বিবেকানন্দও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নূতন দৃষ্টি

কলিকাতা-মুখী বেনারস এক্সপ্রেসের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উপরের বাঙ্ক্‌এ শুইয়া সমীরবাবু সামনের বাঙ্ক্‌টিতে শয়ান সহযাত্রী ষোড়শবর্ষীয় হিন্দুস্থানী বালক খিলনরামের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। খিলনরামের বাড়ী জৌনপুর জেলায়। বাড়ী হইতে কাশী আসিয়াছিল, এখন চলিতেছে কলিকাতা।

"কি উদ্দেশ্যে?"—সমীরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

খিলনরাম একটু হাসিল—বড় সরল হাসি। বলিল,—"কি আর মতলব বাবুজী, কিছু টাকা কামানো দরকার, তাই যাচ্ছি।"

"কলকাতায় কি কাজ করবে? কোথায় থাকবে?"

"কেন, চাচার কাছে।"

খিলনরামের চাচা 'পানিকা মশিনমেঁ' অর্থাৎ জলসরবরাহ-সংক্রান্ত কোন কারখানায় মিস্ত্রিগিরি করে। খিলনরাম কি কাজ করিবে? দুই হাতের শক্ত গুলি দেখাইয়া প্রাণখোলা হাস্যে সে কহিল, সে ভাবনা তাহার নাই। দেহে শক্তি আছে, যে কোন কাজে সে লাগিয়া যাইবে এবং পয়সা কিছু রোজগার করিয়াই ঘরে ফিরিবে, ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই।

দূর জৌনপুর জেলার একটি সুদূরতর গ্রামের এই অশিক্ষিত 'কিসান'-বালক সমীরবাবুর চোখে একটি নূতন চশমা পরাইয়া দিয়াছে। সে মুখে বলে নাই, কিন্তু তাহার অকথিত আরও অনেক কথা যেন সমীরবাবু শুনিতে পাইলেন তাহার চোখের চাহনিতে, তাহার সরল হাস্যে, কথার ভঙ্গিতে, আচরণে। কেবল চাচাজীর মুখ চাহিয়াই বা শুধু তাহার হাতের গুলির 'সহারা'য় (সহায়তায়) সে 'বঙ্গাল মুলুকে' অর্থোপার্জনের চেষ্টায় যাইতেছে না। প্রধান ভরসা তাহার উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস, জীবনের অনাড়ম্বরতা (খিলনরাম একবস্ত্রে চলিতেছে, গায়ে একটি কোর্তা, মাথায় গামছা—অন্য কোন তৈজসপত্রের বালাই নাই। সকাল হইলে ঝাঁঝা ষ্টেশনে সমীরবাবুকে চা খাইতে হইল, সঙ্গে জলখাবারও। ।৵০ আনা খরচ হইয়া গেল। খিলনরামকেও 'অফার' (offer) করিয়াছিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করিল। তেলে সাঁতলানো লঙ্কা দেওয়া চানা যাইতে দেখিয়া লজ্জিত হাস্যে ঐ দিকে তাকাইতেছিল—সমীরবাবু এক ঠোঙ্গা কিনিয়া দিলেন, খরচ হইল মাত্র ৴০ আনা। খিলনরাম কিন্তু বিনা টিকিটে চলিতেছে না; কাপড়ের কোনে অনেকগুলি গাঁট দিয়া বাঁধা কাশী-হাওড়ার টিকিটখানি এক অবসরে বাবুজীকে দেখাইয়া

লইয়াছিল—ঠিক আছে কিনা।)। সমীরবাবু ভাবিতেছিলেন শত শত বাঙ্গালী বেকার যুবকদের কথা। খিলনরামের কাছে তাহাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে—চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নয়, 'সাংস্কৃতিক'-অভিনয়-আবৃত্তি-বক্তৃতা-কাব্য-চর্চা নয়, রাজনৈতিক বাদবিতণ্ডা, দলীয় ধর্মঘট-ডিমনষ্ট্রেশন প্রভৃতিও নয়—জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ করিবার, জয়ী হইবার অপরিহার্য প্রাথমিক কৌশল—সাধ্যানুযায়ী যে-কোন প্রকার কায়িক পরিশ্রম হাসিমুখে স্বীকার করিবার উৎসাহ, অশন-বসনের সরলতা, আত্মবিশ্বাস, প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের সাহস দিয়া, আত্ম-সন্তুষ্টি দিয়া অনুকূল করিয়া লইবার মনোবৃত্তি ও অভ্যাস।

কলিকাতায় ফিরিলে ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে আচার্য যদুনাথ সরকারের 'বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথ' প্রবন্ধটি সমীরবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জীবন-প্রান্তে বসিয়া বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখে ঘনিষ্ঠ দরদী বন্ধু ভূয়োদর্শী জ্ঞান-তাপস লিখিতেছেন—

"আজিকার তরুণদের যদি বড় হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তবে……বাঙ্গালীকে জীবন-যাত্রায় সরল, চরিত্রে সবল হইতে হইবে। বিলাস ও ভোগের বাসনা দমন করিয়া কঠিন শ্রমে বিদ্যালাভ করিয়া, যন্ত্রচালনার শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন করিতে হইবে!…… নূতন ধরনের শ্রমিক জীবনের জন্য নিজকে উপযুক্ত করিতে হইবে।……

পথ চলিতে দেখি যে, অসংখ্য লোক ছোট ছোট লেথ বিদ্যুতের সাহায্যে চালাইয়া spare parts তৈরি করিতেছে, ভাঙ্গা যন্ত্র মেরামত করিতেছে, অবিশ্রান্ত টাকা উপার্জন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে ভদ্র বাঙ্গালীর স্থান এত কম কেন? যদি আমরা শক্ত হইতে পারি, 'বাবু' থাকিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নহে।"

অমরনাথ

'অনিরুদ্ধ'

দুর্গম পথের শেষে নিভৃত গুহায়
অকস্মাৎ চাহি যবে দেখিনু তোমায়
তুষার-গঠিত-দেহ শুভ্র মহেশ্বর
মনে পড়ে কি পুলকে ভরিল অন্তর!
ভাষা যেন গিয়াছিল সেদিন ফুরায়ে
শুধুই মহিমা তব সারা প্রাণ ছেয়ে
নিস্তব্ধ রাজিতেছিল। তোমার প্রসাদ—
অক্ষোভ্য প্রশান্তি এক, হে অমরনাথ।

আজ ফিরিয়াছি শত কোলাহল মাঝে
সেই মহামৌন শুধু স্মৃতিরূপে রাজে।
তবু যেন বাণী তব লভিনু হেথাই
বিমূঢ় আবেশে যাহা হোথা শুনি নাই।
জেনেছি নিগূঢ় গুহা আমারি অন্তরে
আমাতেই শুভ্র শিব অমর বিহরে।

একাগ্রতা

স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বে অপ্রকাশিত স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি, ১৬ই মার্চ, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্কো শহরের ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাঙ্কেতিক লিপিকার এবং অনুলেখিকা—আইডা আন্‌সেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কথা ধরিতে পারেন নাই সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন —যথা……দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনী'র ( ) মধ্যেকার শব্দ বা বাক্যগুলি স্বামীজীর নিজের নহে, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য অনুলেখিকা কর্তৃক নিবদ্ধ। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। —উঃ সঃ]

কি বহির্জগতের, অথবা কি অন্তর্লোকের—আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা লাভ করি একটি মাত্র উপায়েই ; উহা হইল মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা সম্ভবপর হয় না, যদি না সেই বিষয়ে আমরা মনকে একাগ্র করিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন····· এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মনের রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মনকে একাগ্র করিয়া উহার নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এই জগতে একটি মনের সঙ্গে অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। দুই জনের মধ্যে যাহার তন্ময়তাশক্তি বেশি সে-ই অধিক জ্ঞান আহরণে সমর্থ।

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকেই তোমরা 'প্রতিভাশালী' বলিয়া থাক। যোগ-বিজ্ঞানের মতে দৃঢ়প্রচেষ্টা থাকিলে আমাদের সকলের পক্ষেই প্রতিভাবান্ হওয়া সম্ভবপর। আমরা দেখিতে পাই কেহ কেহ অধিকতর যোগ্যতা-সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের করণীয় কাজগুলি বেশ দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন করিয়া চলেন। ইহা আমরা প্রত্যেকেই যে না পারি তাহা নয়। ঐ শক্তি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। মনকে জানিবার জন্য উহাকে কিভাবে একাগ্র করা যায় তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্তু। যোগিগণ মনঃসংযমের যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আজ রাত্রে তাহাদের কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি।

অবশ্য, মনের নিবিষ্টতা নানা পথ দিয়া আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে একাগ্রতা আসিতে পারে। সুমধুর সংগীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়, কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া। ·····এরূপ লোকও আছে যাহারা তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটার আসনে শুইয়া বা ধারাল নুড়িসমূহের উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়া থাকে। এগুলি সব অসাধারণ উদাহরণ, ইহাদের প্রণালী খুবই অ-বৈজ্ঞানিক। ক্রমিক পর্যায়ে মনকে নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞানসম্মত।

একটি লোক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া মন একমুখী করিতেছে। শারীরিক নির্যাতনের দ্বারা সে তাহার ঈপ্সিত একাগ্রতা পাইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই অস্বাভাবিক।

ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এ সম্বন্ধে কতকগুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে উহা অতিক্রম করিয়া মনের অতি-চেতন অবস্থায় পৌছানই আমাদের লক্ষ্য। যোগীর নিকট নীতিশাস্ত্রের মূল্য এইজন্য যে উহা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। মন যত পবিত্র হইবে উহা সংযত করাও তত সহজ। মনে যে কোন চিন্তা উঠুক না কেন মন উহা ধরিয়া রাখে এবং বাহিরের কর্মে রূপায়িত করে। যে মন যত স্থূল উহাকে বশ করা ততই

কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র কলষিত হইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন কখনও সম্ভবপর নয়। সে যদি মনঃ-সংযম আরম্ভ করে তো প্রথম প্রথম হয়তো কিছু সফলতা আসিতে পারে, হয়তো বা একটু দূর-শ্রবণশক্তি লাভ হইল··· এবং এই শক্তিগুলিও তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। মুস্কিল এইখানেই—অনেক ক্ষেত্রে যে সকল অসাধারণ শক্তি আয়ত্তে আসিবার কথা শোনা যায় ভালভাবে যদি অনুসন্ধান কর তো দেখিতে পাইবে উহাদিগকে লাভ করিতে কোন নিয়মিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। যাহারা যাদুবলে সর্প বশীভূত করে তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই। ···কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে তো সে পরিণামে ঐ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করে। তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার মনের সমতা রক্ষা করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে।

মনোনিরোধের অনুশীলনটিকে নিরাপদ দিকে রাখা উচিত। চাই বিজ্ঞানসম্মত, ধীর ও শান্তি-পূর্ণ প্রণালী। প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরায়ণ হওয়া। এইরূপ ব্যক্তি যদি দেবতাদের নামাইয়া আনিতে চান তো তাঁহারাও মর্ত্যধামে নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাই হইল আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সার কথা—সম্পূর্ণ ভাবে সুনীতিনিষ্ঠ হওয়া। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—ইহার অর্থ কি। কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা, নিখুঁত কৃচ্ছ্রতা। এইগুলি একান্ত আবশ্যক। কাহারও মধ্যে যদি এই সমস্ত গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয়, তাহা হইলে আর কি চাই বল দেখি। যদি কেহ সকল জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাব বিমুক্ত হন··· (তাঁহার সমক্ষে) প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ করিবে। যোগমার্গের আচার্যগণ সুকঠিন নিয়মাবলী সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন।···(সে গুলি পালন না করিলে কেহই যোগী হইতে পারিবে না।) যেমন দানশীল না হইলে দাতা আখ্যা লাভ করিতে পারা যায় না।

তোমরা বিশ্বাস করিবে কি? আমি এমন একজন যোগী পুরুষ দেখিয়াছি যিনি ছিলেন গুহাবাসী, এবং সেই গুহাতে বিষধর সর্প ও ভেক তাঁহার সঙ্গেই একত্রে বাস করিত।* (আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি একবার তাঁহাকে গোখরো সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েকঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই স্থির করিয়াছিল কিন্তু শেষে তিনি পুনরায় বাঁচিয়া উঠেন আর তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ও সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "ঐ গোখরো সাপটি আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতস্বরূপে আসিয়াছিল।") তিনি কখনও কখনও (দিনের পর দিন মাসের পর মাস) উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। সর্বদাই চুপচাপ থাকিতেন। একদিন একটি চোর আসিল।·· (সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি করা জিনিসের পোঁটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু পোঁটলাটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন, শেষে তাহার পদপ্রান্তে পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করযোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন ও অতি কাতরভাবে জিনিসগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এগুলি আমার নহে তোমার।")

আমার বৃদ্ধ আচার্যদেব বলিতেন, "ফুল ফুটলে

* স্বামীজী স্পষ্টতই এখানে পওহারী বাবার কথা বলিতেছেন। ব্র্যাকেটের মধ্যস্থ অংশ পওহারী বাবার কাহিনীটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্বামীজীর 'পওহারী বাবা' নামক পুস্তিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।—সঃ

মৌমাছি আপনি এসে জোটে।" এরূপ লোক এখনও বর্তমান। তাঁহাদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না।·· যখন মানুষ অন্তরের অন্তস্তল হইতে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে তিলমাত্রও ঘৃণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই (তাহার সম্মুখে) হিংসাদ্বেষ বিসর্জন দেয়। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। সমাজে অন্যান্য সকলের সহিত আমাদিগের মেলামেশার জন্য এইগুলি আবশ্যক।···সকলকেই ভালবাসিতে হইবে।···অপরের দোষক্রটি দেখিয়া বেড়ানো তো আমাদের কাজ নয়। উহাতে কিছুই হয় না। এমনকি, ঐগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। শুধু সদ্ভাবনা লইয়াই আমাদের কারবার। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো মিস্ অমুক আসিয়া হাজির। বলিলেন, —"আমি যোগসাধনা করিব।" বিশ বার তিনি আপনার অভিপ্রায়ের কথা অপরের কাছে বলিয়া বেড়াইলেন। হয়তো ৫০ দিন ধ্যান অভ্যাস করিলেন। পরে বলিলেন, এই ধর্মে কিছুই নেই; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই।"

(ধর্মজীবনের) ভিত্তিটাই এখানে নাই। ধার্মিক হইতে হইলে পূর্ণ নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্যক)। ইহাই কঠিন কথা ···· ···

আমাদের দেশে নিরামিষভোজী সম্প্রদায়সমূহ আছে। ইঁহারা প্রত্যূষে পিপীলিকার জন্য সেরের পর সের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া দিয়া থাকেন। একটি গল্প শোনা যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিঁপড়াদের চিনি দিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াগুলি মাড়াইয়া ফেলিল। তখন প্রথম ব্যক্তি "হতভাগা, তুই প্রাণি-হত্যা করলি!" বলিয়া দ্বিতীয়কে এমন এক ঘুঁষি মারেন যে লোকটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

বাহ্যিক পবিত্রতা তো সহজসাধ্য, আর সারা জগৎ (উহার) দিকেই ছুটিয়া চলে। কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যদি নৈতিকতার পরিমাপক হয়, তবে যে কোন মূর্খই তো তাহা·পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মনবস্তুটিকেই লইয়া যখন ধস্তাধস্তি তখন উহা কঠিন ব্যাপার।

শুধু বাহিরের ভাসাভাসা অভ্যাস লইয়া যাহারা থাকে তাহারা নিজে নিজেই এত ধার্মিক বনিয়া উঠে! মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। (একবার বাইবেলে বিবাহ-ভোজের বিষয়টি পড়ি)। অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে থাকি, 'অহো, উনি মদ ও মাংস খেয়ে-ছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধু পুরুষ হতে পারেন না।"

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সব সময়েই যেন আমাদের নজর এড়াইয়া যায়। সামান্য বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূর্খেরাও তো উহা দেখিতে পারে। কিন্তু অশনবসনের বাহিরে দৃষ্টি যায় কয়জনের? হৃদয়ের সংস্কৃতিই আমাদের কাম্য।······ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখনও কখনও দিনে বিশ বার স্নান করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্যন্ত তাহারা কুণ্ঠিত হয়।·· স্থূল ব্যাপার, বাহ্যিক আচার মাত্র! (যদি কেবল স্নান করিয়াই পবিত্র হওয়া যাইত) তবে তো মৎস্যকুলই সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী।

স্নান, পোষাক, খাদ্যবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য তখনই যখন ইহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরি-পূরক হয়।······আধ্যাত্মিকতার স্থান প্রথমে, এগুলি সহায়কমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ঘরে যদি শূন্য থাকে তবে যতই ঘাসপাতা খাওয়া যাক না কেন, কোনই কল্যাণ নাই। বুঝিয়া ঠিকমত অনুষ্ঠান করিলে ইহারা জীবনের অগ্রগতির পথে সহায়তা দেয়, নচেৎ অন্ধবৎ অনুষ্ঠানে ইহারা পথের ঘোর বিঘ্নস্বরূপ।

এই জন্যই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মেই অজ্ঞ লোকদের হাতে পড়িয়া সব কিছুই অবনতি প্রাপ্ত হয়। বোতলে কর্পূর ছিল, সমস্তটাই উবিয়া গেল—এখন শূন্য বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি।

আরও একটি কথা।······(আধ্যাত্মিকতা) লেশমাত্রও থাকে না, যখন লোকে বলিতে আরম্ভ করে 'আমারটাই ভাল, তোমার যা কিছু সবই মন্দ'। সম্প্রদায় ও বাহিরের কাঠামো লইয়াই বিবাদবিসম্বাদ, আত্মা বা শাশ্বত সত্যে কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গৌরবময় ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয়া গেল।······ (খ্রীষ্টধর্মেও এইরূপ)। তাহার পরে কলহের সূত্রপাত হইল—এক ঈশ্বরে ত্রিমূর্তি সম্মিলিত, না ত্রিমূর্তিতে এক ঈশ্বর। কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে চায় না, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির স্পৃহা জাগে না। আমাদিগকে স্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌঁছাইয়া দেখিতে হইবে তিনি 'একে তিন না তিনি এক'। আর ইহাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা। মনঃসংযোগের জন্য কোন না কোন আসনের প্রয়োজন। যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন তাঁহার পক্ষে উহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড সহজভাবে রাখাই নিয়ম। উহা শরীরের ভার বহিবার জন্য নয়।····· আসন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয় —যে-কোন আসনেই বসা হউক মেরুদণ্ডটিকে শরীরের ভারমুক্ত করিয়া সহজ ও সরলভাবে রাখিতে হইবে।

ইহার পর (প্রাণায়ামের) ···· শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম। ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ······যাহা বলিতেছি তাহা ভারতের কোন সম্প্রদায়-বিশেষ হইতে সংগৃহীত একটা শিক্ষা নয়। ইহা সর্বজনীন সত্য। যেমন এই দেশে ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়, (ভারতবর্ষে) বালক-বালিকাদিগের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা হয় ·········।

ভারতের শিশুগণকে দুই একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্মের কোন মতবাদ চাপাইয়া দেওয়া হয় না। পরে তাহারা নিজেরাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এমন কাহারও অন্বেষণ করে যাহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে পারা যায়। অনেকের কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের সন্ধান মিলে। তখন বোঝা যায়—"ইনিই আমার গুরু!" তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা-লাভ হয়। একই পরিবারের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রের আলাদা আলাদা গুরু থাকিতে পারে। দীক্ষার কথা কেবল গুরু ও শিষ্যের মধ্যেই গুপ্ত থাকে। স্ত্রীর সাধনপ্রণালী স্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেননা ইহা সুবিদিত যে নিজের সাধনপ্রণালী কেহ বলিবে না।······ অনেক সময় দেখা যায় যাহা একজনের নিকট হাস্যাস্পদ তাহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। ······প্রত্যেকেই নিজের নিজের বোঝা বহিতেছে; যাহার মনটি যেভাবে গঠিত সেইভাবেই তো তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে যাহা সকল আচার্যই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল ভারতীয় উপাসনা-প্রথা।

গঙ্গার তীরে আমরা দেখিতে পাইব কত নরনারী ও বালকবালিকা প্রণায়াম ও পরে ধ্যান (অভ্যাস) করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাহারা প্রণায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা জীবনের ইহাই প্রধান অনুশীলনরূপে

স্থির করিয়া লইয়াছে তাহারা নানা প্রণালী অভ্যাস করে। চুরাশী প্রকার পৃথক্ পৃথক্ আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশে চলে তাহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

ইহার পরেই আসে 'ধারণা' (একাগ্রতা)। ······মনকে দেহের কতকগুলি স্থানবিশেষে ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।

হিন্দু বালক-বালিকারা ···দীক্ষা গ্রহণ করে। গুরু একটি শব্দ বলিয়া দেন। ইহাকে বীজমন্ত্র বলে। গুরু উহা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের গুরুর নিকট হইতে। এইভাবে মন্ত্রগুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। 'ওঁ' এইরূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ আছে, এই অর্থ গোপন রাখা হয়, লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করে না। গুরুর কাছে কানে শুনিয়া মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া শিষ্য উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিয়া চলে।

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও ঐ ভাবে উপাসনা করিয়াছি। বর্ষাকালে একটানা চার মাস ধরিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর গঙ্গাস্নান ও আর্দ্র-বস্ত্রে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্য ভাত বা অন্য কিছু। বর্ষাকালে এইরূপ চাতুর্মাস্য!

মানুষের সাধ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই নাই—ভারতীয় মনের ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহাকে কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যায়। ভারতে কিন্তু এমন লোকও আছে যাহার বিশ্বাস মন্ত্রশক্তির দ্বারা অর্থলাভ সম্ভব। তাই সেখানে দেখা যাইবে যে, ধনাকাঙ্ক্ষী হয়তো বৃক্ষতলে বসিয়া মন্ত্রের মাধ্যমে ধনকামনা করিতেছে। (চিন্তার) শক্তিতে সব কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য। এখানে তোমরা যে ধন সৃষ্টি কর ইহারও প্রণালী একই প্রকার। তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি ধনোপার্জনে নিয়োগ করিয়া থাক।

কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় হঠযোগী।····· তাঁহারা বলেন মৃত্যুর হাত হইতে শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।···তাঁহাদের সমস্ত সাধন শরীর-সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ বৎসর লাগে! সেইজন্য অল্পবয়স হইতে আরম্ভ না করিলে ইহা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ···হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন আছে: প্রথম শিক্ষার্থী যখন অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে একাকী চল্লিশ দিন থাকিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াগুলি একে একে যথারীতি অভ্যাস করিতে হয় ও শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে হয়।······

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বাঁচিয়া আছেন, বলিয়া দাবি করেন। অনেকে আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতামহেরাও এই লোকটিকে দেখিয়াছিলেন।···তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কুড়ি মাইল করিয়া বেড়ান; ইহাকে ভ্রমণ না বলিয়া দৌড়ান বলাই ভাল। তাহার পর কোন জলাশয়ে গিয়া আপাদমস্তক কাদা মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে জলে ডুব দেন, আবার কর্দমলেপন।··· এই সবের মধ্যে কোনও কল্যাণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। (লোকে বলে সাপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে।) সম্ভবতঃ লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমার ১৪ বৎসর যাবৎ ভারত ভ্রমণে যেখানেই আমি গিয়াছি সেখানে প্রত্যেকেই তাঁহার কথা জানে দেখিয়াছি। লোকটি সারা জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছেন।··· ··(হঠযোগী) ৮০ ইঞ্চি লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে। দৈনিক চার বার শরীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ হঠযোগীকে ধুইতে হয়।

প্রাচীরগুলিও তো সহস্র সহস্র বৎসর একই ভাবে থাকিতে পারে।…তাহাতে হয়ই বা কি? এত দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা আমার নাই। "এক দিনের বিপর্যয়রাশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!" অজস্র ভ্রান্তি এবং সীমায় ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট।

অন্যান্য সম্প্রদায় আছে · । একটি সম্প্রদায় 'সঞ্জীবনী রস' দিয়া থাকে। উহার এক ফোঁটা খাইলে যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে। ···· কত যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মাস লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দিকে (জড় জগতের মধ্যেই)। প্রতিদিন এক একটি নূতন দলের সৃষ্টি······ ।

সকল সম্প্রদায়েরই শক্তির উৎস কিন্তু মন। মনকে ধরিয়া রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মন একাগ্র করিয়া একটি স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহারা বলেন শরীরাভ্যন্তরস্থ মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে বা স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে মনকে যদি স্থির রাখা যায় তবে যোগী শরীরের উপর আধিপত্যলাভ করিতে পারেন। যোগীর শান্তিলাভের ও উচ্চতম আদর্শের প্রধান অন্তরায় হইল শরীর। সেইজন্য তিনি চান ইহাকে অধীনে রাখিতে ও ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে।

এইবার ধ্যানের কথা। ইহাই হইল সর্বোচ্চতম অবস্থা।…যখন (মনে) সংশয় থাকে তখন উহার অবস্থা উন্নত বলিতে পারা যায় না। ধ্যানেই উহার উর্ধ্বস্থিতি। উন্নতমন বিষয়সমূহ দেখে বটে কিন্তু কোনও কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলে না। যতক্ষণ আমার দুঃখের অনুভূতি আছে ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সুখ বা আনন্দবোধ করি, আমি দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছি। কিন্তু সুখ, দুঃখ দুইটিকেই যখন পরমানন্দে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা জন্মে তখনই হয় উচ্চ অবস্থা।····· ধ্যান মাত্রই সাক্ষাৎ অতি-চেতন বোধ। মনঃসংযমের পূর্ণতায় স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবাত্মা নিজের স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন প্রার্থনা-মাত্রই ঈপ্সিত ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানেই ছিল শুধু তাহাদের প্রকাশ হয় নাই। জীবাত্মা শক্তিহীন জড়ের সহিত তাদাত্ম্যবোধের ফলে কাঁদিয়া মরে, হায় হায় করে। নশ্বর আকৃতিসমূহকে উহা 'আমি' বলিয়া মনে করে।····· কিন্তু মুক্ত আত্মা যদি কোন বিভূতি প্রয়োগ করিতে চান তবে উহা তাঁহার কাছে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে যদি তাঁহার ঐরূপ স্পৃহা না থাকে তাহা হইলে বিভূতি দেখা যায় না। যিনি ঈশ্বরকে জানেন তিনি ঈশ্বরই হইয়া যান। এইরূপ মুক্ত পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভাব্য নয়। তাঁহার পক্ষে আর জন্ম ও মৃত্যু নাই। তিনি চিরকালের জন্য মুক্ত।

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

স্বামী—

স্বামী অখণ্ডানন্দ, অতি সাধারণ লোকের মত সারগাছির মাঠে চাষাভুষোর মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসর কাটিয়ে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর—তিনি কি করে গেলেন? কি তাঁর সাধনা, বৈশিষ্ট্যই বা কি? এসব প্রশ্ন আজ স্বভাবতই মনে জাগছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান হিসাবে তাঁর অপূর্ব জীবন, উপলব্ধি, ভাব-ভক্তি, অতলস্পর্শ অধ্যাত্মিক চেতনা, মানুষের পূজা, সর্বভূতে নারায়ণ-দর্শন,—এসবও গভীর ধ্যানের বিষয়।

"সাধারণ লোকের মত"—কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। অনেকেই তাঁকে দেখেছে নিজের হাতে আশ্রমের জমিতে ফুলের ও তরকারির বাগান

করতে। ১৮৯৮ সালে তিনি প্রথম আশ্রমস্থাপন করেছেন—আর্ত অনাথ আতুর মানুষকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করেছেন যেমন করে 'পুরুষসূক্ত' পাঠ করে মন্দিরে নারায়ণ শিলার পূজা করা হ'য়ে থাকে। হাফ্ প্যাণ্ট পরে বেলা ২টা পর্যন্ত কতদিন তিনি মাটি কুপিয়েছেন, তারপর হয়তো আহার পান্তাভাত! চাঁদার খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন, বাজার করে নিয়ে এসেছেন, আবার আশ্রমে এসে রান্না করে পরিবেশন করে আশ্রমবাসী অনাথ বালকদের মায়ের মত সেবা করেছেন। আশ্রমশুদ্ধ হয়তো অসুখ, তিনি একটিমাত্র বালকের সাহচর্যে মায়ের মত তরকারি কুটছেন, ভাঁড়ার দিচ্ছেন, সাবু-বালি খাওয়াচ্ছেন আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ করছেন। রাত্রে উঠে রোগীদের টেম্পারেচার নেওয়া, জ্বর ছাড়বামাত্র কুইনিন দেওয়া আরও কত প্রকারের সেবা করা—সব এক হাতে করেছেন। এর মধ্যে হয়তো এডিসাহেব (জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) এসেছেন বিজয়ার পর, অমনি তাঁকে নারকেল নাড়ু দিয়ে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। অর্থ যদি এলো,—সঞ্চয় না করে খরচ করে ফেলা।

এই ছিল তাঁর জীবন সারগাছিতে।

আশ্রমের কেউ তাঁর সেবা করতে পেত না, তিনিই সকলের সেবা করতেন। এই রকম কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়তেন। একবার তিনি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সাধনার স্থান আশ্রম ছেড়ে যাবেন না। শেষে পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন কলকাতা, সেখানে বিপিনবাবু তাঁর ডাক্তার—এক মাস জলসাবু খাইয়ে ফেলে রাখলেন। ছ'মাস লাগে সারতে। ভাল হতে না হতেই মহারাজ সারগাছি আসার জন্য ব্যাকুল, তাঁর জীবন্ত নারায়ণ, মানুষঠাকুরের পূজার জন্যে, সেবার জন্যে আশ্রমে ফিরে এলেন।

বাগানে কাজ করছেন, লাইব্রেরি সাজাচ্ছেন, ছেলেদের যত্ন নিচ্ছেন, চাষীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশছেন, মাসের পর মাস রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। ছুতোরের কারখানা চলছে, তাঁতের কাজ চলছে—অফিসের কাজও করছেন—সবই তাঁর রুটিনের মধ্যে। আবার সারা রাত জেগে জ্ঞানচর্চা,—বই পড়ছেন। এই ভাবে তিব্বতের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। একবার ন'দিন ন'রাত এতটুকু না ঘুমিয়ে কেটেছে। সারাদিন কাজের পর রাত্রে নির্জন অবসরে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে বসেছেন, লিখতে লিখতে ভোর হয়ে গেছে। আবার দিনের কাজ। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অদ্ভুত কর্মময় জীবন।

দেখতে সাধারণ মানুষের ন্যায়—কিন্তু মহা-কর্মযোগী। এত কাজ করছেন কেউ বুঝতে পারত না, এত বই পড়ছেন—কেউ জানতে পারত না। তারপর প্রতি পদে ভগবানের উপর নির্ভরতা, আকাশবৃত্তির দ্বারা আশ্রম চালানো, রিপোর্ট ছাপাছাপি নেই, টাকার জন্য আবেদন-নিবেদন নেই, কাজ চলছে।

একদিন আশ্রমে চাল বাড়ন্ত! বহরমপুরের উকীল গোরাবাজার নিবাসী প্রমথবাবু অপ্রত্যাশিত-ভাবে এসে দশ টাকার চাল কিনে আশ্রমে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছেন। এইরকম কতশত ঘটনা। আবার আর একটা দিক। এডিসাহেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পূজনীয় অখণ্ডানন্দ মহারাজকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। সাহেব বেশ পণ্ডিত—ব্যাংলার, অবিবাহিত। মহারাজকে বললেন, "স্বামীজী, আপনি কলেজের ছেলেদের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিন।" মহারাজ অবশ্য তাঁর কথামত কাজ করেন নি; তাঁকে চালাচ্ছেন ঠাকুর, তাঁর আদেশ না পেলে, তিনি কিছুই করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, "আমার মধ্যে রাম আছেন, রাম না বললে কিছু করবার জো নাই"। 'আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইলা গূঢ় মর্ম'—এই জন্যেই ত শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, নিজে আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন, আবার তাঁর সন্তানদের দিয়ে কেমন ভাবে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

ঠাকুরের এই সন্তান একাধারে ছিলেন ভক্তিযোগী ও কর্মযোগী। ঘুম ও চুপচাপ বসে থাকার মহাশত্রু ছিলেন তিনি! কর্ম, কর্ম—কেবল কর্ম। তবে নূতনভাবে কর্ম করতে হবে,—কর্ম মানে পূজা! সকামভাবে নয়—নিষ্কামভাবে, সেবার ভাবে, উপাসনার ভাবে। নিজের জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সন্তানের জীবনরূপ গ্রন্থের পৃষ্ঠা আমরা যত উল্টাব—ততই দেখতে পাব, তিনি ছিলেন—গীতার নিষ্কাম কর্ম-যোগের—অনাসক্তি-যোগের মূর্তিমান বিগ্রহ! তাঁর জীবন ছিল নবতম সেবাধর্মের বিশাল স্তম্ভস্বরূপ।

কাহার ?

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্‌-এ

কাহার লাগি নিশীথ জাগি গাঁথি গানের মালা ?
দুয়ার পরে কাহার তরে প্রদীপ রহে জ্বালা ?
হিয়ার কোণে সঙ্গোপনে কাহার করি আশা ?
কোন পিয়াসে পথের পানে বাঁধি আমার বাসা ?
জানতে প্রাণ ধায়—
কোন্ সে মনের গহন বনের নিবিড় ঘনচ্ছায় !

অনেক জনার আনাগোনার আভাস আনে কানে ;
শতেক আঁখি যায় যে ডাকি শত জনার পানে !
হৃদয়পটে দ্বন্দ্ব উঠে সংশয়েতে মরি—
ক্ষণের ভুলে কোন অকূলে ভাসাই পাছে তরী !
জানতে মোর হায়—
দিবস নিশা হারায় দিশা কাহার ইশারায় !

বন্ধু, জানি তোমার বাণী, চোখের তব ঠার—
সুদূর পানে আমায় টানে, —ঘরের করে বা'র !
কোন্ উষাতে তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি,
চিত্ততলে আজো জ্বলে বেদনদাহ তারি।
জানতে দিন যায়—
তাহার খোঁজে রয় আজো যে ধ্যানের কিনারায় !

বঞ্চনা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জীবনে যখন হেরি চারিদিকে
আনন্দ পারাবার,
নাহি দুখ তাপ নাহিক শঙ্কা
নাহি কোনো হাহাকার।
বলি বারবার —'জয় জয় তব জয়
করিলে পূর্ণ তুমি মোরে দয়াময়'—
তব জয়ধ্বনি নহে এ তো প্রিয়
এ যে জয়—কামনার !

রোগে শোকে আর দুঃখদহনে
অশ্রুসজল আঁখি ;
নিরাশাআঁধার-অন্ধ হৃদয়ে
তোমারে কতই ডাকি।
বলি বারবার —'জয় জয় তব জয়
শঙ্কাহরণ কর মোরে নির্ভয়'—
ভয়-ভাবনার হয় জয়গান
'তব জয়'—শুধু ফাঁকি !

অচেনার টানে

'বৈভব'

তোমারি উপর করিনু নির্ভর জানিনা তুমি গো কে !
হৃদয়ের মাঝে যে জন বিরাজে, তাহারে চিনি না যে !
সীমা হতে চলি অসীমের পথে, জীবন হইতে মরণের স্রোতে—
অমৃত খুঁজিয়া সেই দিকে চলি—যে-দিক টানিয়াছে !
সব দিক শেষে দিশেহারা হয়ে তোমাতে মিশিয়াছে।

বাঙলার মরমী সাধনা*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলন-প্রাঙ্গণে বাঙলার মরমী সাধনা সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্কৃতিক্ষেত্রে ধর্মসাধনার স্থান বিশেষভাবে নির্দেশ করার প্রয়োজন নাই। মানবপ্রকৃতির সঙ্গে ধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংপৃক্ত। সভ্যতার সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত আদিজাতির ভূত-প্রেত-পিতৃপুরুষের উপাসনা হতে আরম্ভ করে সভ্যতম জাতির দার্শনিক ও ধর্মচিন্তার উচ্চতম অভিব্যক্তি অদ্বৈতবেদান্ত পর্যন্ত সকলক্ষেত্রেই মানবমনের একই অভীপ্সার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। ইংরেজ কবি Thomsonএর স্বর্গীয় সারমেয়ের (Hound of Heaven) মত দিবসরজনী, যুগযুগান্তর সুদৃঢ় পদক্ষেপে, অতন্দ্রিত ধৈর্যে অদৃশ্য এক পদধ্বনি আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। এর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নাই। এমনকি লোকায়ত চার্বাক দর্শনে বা তারই আধুনিক এবং উন্নততর সংস্করণ মার্ক্সীয় জড়বাদে মানবের অন্তর্নিহিত ধর্মপিপাসারই ভিন্নরূপে প্রকাশমাত্র দেখতে পাই।

সংসারের যে নিষ্করুণ পরিবেশে মানব বাস করে তাতে করে তাকে অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতির অভিঘাতে নিরন্তর খিন্ন হতে হয়। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সাধনাই ধর্মসাধনা। প্রকৃতির অনমনীয় নিয়মকে অতিক্রম করে সুখ ও শান্তির এষণাই মানবকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। আদিমজাতিসমূহের বস্তুরতি (Fetish worship) বহিঃপ্রকৃতির নিষ্ঠুরতার বেদীমূলে আর্তমানবের পূজার্ঘ্য। অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বস্বরূপে স্থিতির প্রচেষ্টাই অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা। সুতরাং সকল ধর্মসাধনাই প্রকৃতিকে অতিবর্তনের সাধনা।

ধর্মের বিষয়-বস্তুর নির্দেশ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ—

"প্রত্যেক জীবাত্মাতেই ঈশ্বরত্বের সম্ভাব্যতা আছে।

বহিঃ ও অন্তঃ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা এই ঈশ্বরত্বের বিকাশই ধর্মের উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্যের রূপায়ণ সিদ্ধ হয় ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনকে অতিক্রম করে মুক্ত, ইন্দ্রিয়াতীত জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তাই সকল ধর্মই কোন না কোন ভাবে অতীন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙলার মরমী সাধনা। মরমী সাধনার সংজ্ঞা কি? মরমী কথাটি সংস্কৃত 'মর্ম' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যদিও সকল ধর্মের সাধ্য অতীন্দ্রিয় কিন্তু সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মধ্যগ আলম্বনকে অবলম্বন করেই মানুষের ধর্মসাধনার ধারা প্রবাহিত হয়। দেহ, মন ও বুদ্ধির সাধারণ প্রকাশকে সহায় করে যে সাধনা তা আমাদের প্রাকৃত জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এসকল হতে পৃথক্ এক প্রকারের সাধনা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায় যা অপ্রাকৃত বা অলৌকিককে আলম্বনরূপে গ্রহণ করে। এই সাধনাকেই বলা হয় মরমী সাধনা। কেননা, এ সাধনা বহিরঙ্গকে পরিত্যাগ করে মর্মগত আলম্বনকেই গ্রহণ করেছে।

'মরমী' কথাটির পূর্বোক্ত অর্থে ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। হয়তো রবীন্দ্রনাথই এই কথাটিকে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এই বিষয়ে চণ্ডীদাসের

* ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬১, কলিকাতায় বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলনে পঠিত

'মরম' কথার ব্যবহার তাঁকে হয়তো অনুপ্রেরণা দিয়েছে। চণ্ডীদাস লিখেছেন :

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥
বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী
আঁধার পেরিয়া আলা ॥

দেহ-মনের দৃষ্ট প্রকাশকে ত্যাগ করে অদৃষ্ট শক্তির উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করে যে সাধনা তাইই মরমী সাধনা। রূপ ও অরূপ উভয়কে পরিত্যাগ করে অপরূপকে গ্রহণ করে এই সাধনার গতি।

ইংরেজিতে মরমিয়া মতবাদের নাম Mysticism. এই Mysticismএর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিখ্যাত লেখিকা Evelyn Underhill বলেছেন "Broadly speaking, I understand it to be the expression of the innate tendency of the human spirit towards complete harmony with the transcendental order ; whatever be the theological formula under which that order is understood". অর্থাৎ "সাধারণভাবে বলতে গেলে মরমিয়া মতবাদের দ্বারা আমি বুঝি অতীন্দ্রিয় বিধির সহিত মানবাত্মার সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধনের সহজপ্রবণতার প্রকাশ—যে কোন ধর্মীয় মতবাদের উপরই সেই বিধি প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।"

কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই এই সহজপ্রবণতার সমান প্রকাশ থাকে না। মানুষের প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতিগত এই বিভিন্নতাকে সাধারণতঃ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ১। জ্ঞানাশ্রয়ী ২। কর্মাশ্রয়ী ৩। ভাবাশ্রয়ী ও ৪। মর্মাশ্রয়ী। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানবকে ধর্মের পথে পরিচালিত করবার জন্য বহু পুরাতন কাল থেকে ভারতে চারটি যোগমার্গ বিহিত হয়েছে— ১। জ্ঞানযোগ ২। কর্মযোগ ৩। ভক্তিযোগ ও ৪। রাজযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে বলেছেন "There are four general types of men—the rational, the emotional, mystical and the worker. For each of these we must provide suitable forms of worship" অর্থাৎ "চারটি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ আছে —(১) যুক্তিবাদী (২) ভাবপ্রবণ (৩) মরমী ও (৪) কর্মী। এদের প্রত্যেকের জন্য উপযোগী সাধন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে।"

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবতারণা করবার প্রসঙ্গ এ নয়। সুতরাং তা না করে আমরা এইটি ধারণা করতে পারি যে, মানুষের মাঝে এমন অনেকে আছে যারা অলৌকিকে একটা সহজ বিশ্বাস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তারা দেবতা, ভূত, প্রেতের দর্শন পায়, অশরীরী বাণী শোনে। এই শ্রেণীর মানুষই mystic বা মরমী মানুষ। এই রকম মানুষের অস্তিত্ব যে আছে তা Evelyn Underhillও স্বীকার করেছেন "The most highly developed branches of the human family have in common one peculiar characteristic they tend to produce—sporadically it is true and often in the teeth of adverse external circumstances—a curious and definite type of personality ; a type which refuses to be satisfied with that which other men call experience and is inclined, in the words of its enemies, to 'deny the world in order that it

may find reality'." মানব পরিবারের সর্বাপেক্ষা উন্নত শাখাগুলির মধ্যে সাধারণভাবে একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সত্য বটে কখনও কখনও এবং অনেক সময়েই প্রতিকূল বাহ্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এগুলি একটি অপূর্ব এবং বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে—এমন এক প্রকারের ব্যক্তি যারা, অপর মানুষ যাকে অনুভূতি বলে তার মাঝে সন্তোষ লাভ করে না এবং তারা তাদের বিরুদ্ধ-বাদীদের ভাষায় "সংসারকে পরিত্যাগ করে সত্যকে লাভ করবার জন্য।" মানুষের মধ্যে কারও কারও যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষমতা বিশেষভাবে থাকে তা—Dr. J. B. Rhineএর গবেষণা থেকে জানতে পারি। তিনি বহু সমীক্ষার পরে স্থির করেছেন যে, কেউ কেউ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতির নাম দেওয়া হয়েছে Extra-sensory perception.—সংক্ষেপে E. S. P. এই গবেষণা parapsychologyর অন্তর্গত।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এইপ্রকার মানুষের সাধনার ধারা নির্দিষ্ট রূপায়ণ পেয়েছে। এই সাধনার নাম রাজযোগ বা কেবলমাত্র যোগ-সাধনা। মহেঞ্জদারোর যোগী-মূর্তি থেকে অনেকে অনুমান করেন, যোগসাধনা বৈদিক চিন্তাধারায় আগন্তুক মাত্র। শুধু তাই নয়, ধর্মজীবনে অরণ্যের প্রভাব, নারী-দেবতার উপাসনা, সাংখ্যদর্শন, ভক্তি-বাদ প্রভৃতি অনেক কিছুই অবৈদিক এবং সংহিতোত্তর যুগে আরণ্যক-উপনিষদাদিতে প্রক্ষিপ্ত। পুরাতন যুগের সুদূর নীহারিকার যে রূপ আমাদের মন, বুদ্ধির উপাশ্রয়ে প্রতিভাত তাতে করে সত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে একথা স্বীকার করতে হবেই যে, দেশ ও কালের পরিচ্ছেদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও বর্তমান হিন্দুধর্মের সকল কিছুর মূলই বেদসংহিতায়। অবান্তর বিষয়ের আলোচনার স্থান এ নয়। তাই যোগসাধনার উদ্ভূতির আলোচনার মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখব। যোগসাধনার বীজ ঋগ্‌বেদ সংহিতাতেই বর্তমান। তপের উল্লেখ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০ম, ১২৭) দেখতে পাই—ইন্দ্র তপস্যার দ্বারা স্বর্গ জয় করছেন। উপবাস ও তপস্যার দ্বারা বিভূতিলাভের কথাও আছে। আর ভাবানুষঙ্গী আনন্দানুভূতির কথাও ঋগ্বেদে দেখা যায় (VII, 59. 6, X. 136, X. 114. 2) 'মুনি' শব্দের উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে (X. 136 4-5) শুধু তাই নয় বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্র ঋগ্বেদের (III. 3. 9-10) অন্তর্ভুক্ত। এই মন্ত্রে প্রসবিতার বরেণ্য তেজকে 'ধীমহি'—ধ্যান করি ইহাই বলা হয়েছে। সুতরাং যোগের উদ্ভব যে ঋগ্বেদকালে এ অনুমান অসঙ্গত নয়—যদিও পরের যুগের বিভিন্ন ভাবধারা এর পরিপুষ্টির সহায়ক হয়েছে।

যোগচিত্তবৃত্তির নিরোধ। এই চিত্ত সাংখ্যের মহত্তত্ত্বের সমার্থক। নিরোধ-প্রাপ্তির একটি উপায় প্রাণের আগম-নির্গমের বিধারণের দ্বারা। এই প্রাণ কেবলমাত্র বায়ু নয়—প্রাণ শক্তি যার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। যোগের এই বিভিন্ন উপায় ও উপেয় এবং নানাপ্রকার বিভূতি-লাভাদি—অতীন্দ্রিয় ভূমির কথা। সেই জন্যই যোগসাধনাকে মরমিয়া সাধনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ সকলপ্রকার মরমী সাধনার ভিত্তিতেই যোগসাধনা বর্তমান।

ভারতের ইতিহাসের গতি 'পতন-অভ্যুদয়—বন্ধুর পন্থা'র মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ভারত—মহাসাগর। ঊর্মিমুখরিত বহু জাতি, বহু সভ্যতা, বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্মমত এর মধ্যে এসে পড়েছে এবং এর মহিমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এই সমুদ্রের প্রধান উপাদান আর্য-সংস্কৃতি। যুগযুগান্তর ধরে এখানে আর্যায়নের সাধনা চলেছে। কিন্তু এই সাধনায় 'গ্রহণ' আছে বর্জন নাই।

তাই যোগসাধনার ক্রমবিবর্তনের ধারায়

অনুসরণে আমরা দেখতে পাই সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যোগাঙ্কুর যোগদর্শনের বিরাট মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের কোন দার্শনিক মতবাদই যোগের প্রচারকে অস্বীকার করতে পারেনি। পরমযুক্তিবাদী আচার্যপাদ শঙ্করও 'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ' এই সূত্রের ভাষ্যে যোগের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করলেও প্রায়োগিক অংশকে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ সাধনা, জৈন সাধনা প্রভৃতি বেদবহির্ভূত মার্গও এর প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি। ধ্যান ও বিভূতিলাভ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

যোগসাধনা ও সেই সঙ্গে মরমী সাধনার পরের অধ্যায় তন্ত্রাধ্যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয় প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের সৃষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই কথাই বলেছেন যে তন্ত্রের ব্যাপারে "বোধ হয় আমরাই ঋণী ও বৌদ্ধেরা মহাজন।" শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য Cultural Heritage of India গ্রন্থে বলেছেন "হিন্দুগণ বৌদ্ধতন্ত্র হতে উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বহু প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই ভাবেই তন্ত্রানুশীলন চরমাবস্থা লাভ করে।" আভ্যন্তরিক প্রমাণেও উপযুক্ত মত যুক্তিসহ বলে মনে হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মঞ্জুশ্রীমূলকল্প এবং তৃতীয় শতকের গুহ্য সমাজ বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ যাতে তন্ত্রের সকল লক্ষণই বর্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৭ম।৮ম শতকের পূর্বে কোন হিন্দুতন্ত্রগ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না। যাই হোক, তন্ত্রশাস্ত্র একটি বিরাট সমন্বয় প্রচেষ্টা। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন "The Karmakanda of the Vedas, the Mimamsa, the Vedanta, the Sankhya, the Yoga, the Vaisnavn, the Medical System of Charaka and Susruta can all be traced in the Tantras as forming different limbs of the body of its doctrines." "বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব মতবাদ, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান।"

এই সমীকরণের ফলে তন্ত্র, তা সে বৌদ্ধ তন্ত্রই হোক, শৈব তন্ত্রই হোক, বৈষ্ণব তন্ত্রই হোক বা শাক্ত তন্ত্রই হোক, যোগচর্যাকে গ্রহণ করলেও স্বকীয় মতবাদের পটভূমিকার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে গ্রহণ করেছে। তার ফলে যোগদর্শনের পুরুষ প্রকৃতি তন্ত্রে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। প্রকৃতি-সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত পুরুষের 'স্বরূপাবস্থান'কে যোগে চরমলক্ষ্য বলে স্বীকৃত হলেও তন্ত্রে 'সন্ধা' বা সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যমে প্রাকৃত-স্ত্রী-পুরুষের মিলনোদ্যোতক শব্দাদি ব্যবহারে পুরুষপ্রকৃতির মিলনকেই চরমাবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষার কুহেলিকার মধ্যে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি একটা অবাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে। যোগের সহজবোধ্য মরমী সাধনা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মাঝে আত্মগোপন করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাঙলা দেশের মরমী সাধনার দিকে দৃষ্টি দিব। বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন-কালে যে অনার্যজনাধ্যুষিত ছিল তা আমরা ঐতরেয় আরণ্যক থেকে জানতে পারি। বঙ্গদেশ ছিল পক্ষিজাতির অর্থাৎ যাযাবর জাতির বাসভূমি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনযুগেই বঙ্গদেশে ঐ ধর্মের প্রচার ঘটেছিল এবং সেই মাধ্যমেই আর্যসংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বঙ্গদেশে। ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও থাকে। তাই দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ মত বাঙলা দেশের মানুষকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনি তাদের সংস্কৃতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিল।

এইটিই স্বভাবধর্ম। দৈশিক ও কালিক

পরিচ্ছেদে সকল বস্তুর বিবর্তন ঘটে। তাই আমুগঙ্গ প্রদেশের পলিমাটির উর্বরতার প্রভাবে প্রাণ ও রসের প্রাচুর্য বৌদ্ধ মতবাদকেও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানে রূপান্তরিত করেছিল। হিন্দুধর্মের বৈরাগ্যপ্রতিষ্ঠিত সাংখ্যযোগাদি মতও হিন্দুতান্ত্রিকতায় পরিবর্তিত হয়েছিল।

হিন্দুতন্ত্রই হোক বা বৌদ্ধতন্ত্রই হোক বাঙলা দেশের মরমীয়া সাধনার ধারা এদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গসমাজের সর্বস্তরকে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, শাক্ততন্ত্র, নাথসম্প্রদায়, আউল, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এবং বাঙলার মরমী সাধনা বলতে প্রধানতঃ এইসব মতবাদকেই বুঝায়।

এই সকল মতবাদের দার্শনিক বা ধর্মীয় সিদ্ধান্তে বিভিন্নতা থাকলেও সকলের ভিত্তিতে একটা বিশ্বাসের ঐক্য আছে। সেটি হচ্ছে এই যে মানবের দেহ ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব আছে তেমনই প্রত্যেক মানুষের দেহভাণ্ডেও স্ত্রী পুংতত্ত্ব বিরাজমান। এই স্ত্রী-পুংতত্ত্বের মিলনসাধনই ধর্মের মর্মগত লক্ষ্য।

অবশ্য পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বের স্বরূপ বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন।

প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই চর্যাগীতিকাগুলিতে। এইগুলি বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, শবরপাদ, সরহপাদ প্রভৃতির রচনা। সিদ্ধাচার্যদিগের আবির্ভাবকাল দশম হতে দ্বাদশ শতক। সন্ধাভাষায় লিখিত এই পদগুলি মহাযান মতের দর্শনকে যোগসাধনার আঙ্গিকে পরিবর্তিত করে একপ্রকার অদ্ভুত ও গুহ্য সাধনার সৃষ্টি করেছে।

মহাযান মতে সেই মানসিক অবস্থাকে বোধিচিত্ত বলা হয় যাতে বোধিলাভের দৃঢ় বাসনা এবং বিপুল করুণা ছাড়া অন্য বিকল্প থাকে না। চিত্তে তখন তুইটি উপাদান থাকে—শূন্যতা ও করুণা। দশটি ভূমি অতিক্রম করে এই বোধিচিত্ত দশম ভূমি ধর্মমেঘে পরমা গতি লাভ করে। • সহজিয়া মতবাদে এই শূন্যতা ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায় নামে স্ত্রী-পুংতত্ত্বে বিবর্তন লাভ করে। এবং এই প্রজ্ঞা ও করুণা মানবের দেহভাণ্ডে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে বর্তমান—দক্ষিণে উপায়, বামে প্রজ্ঞা। যখন এই প্রজ্ঞা ও উপায়কে মেরুদণ্ডমধ্যস্থ অবধূতিকা নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয় তখনই বোধিচিত্তের সৃষ্টি হয়। প্রথমে এই প্রজ্ঞা ও উপায় নির্মাণচক্রের (নাভিচক্রের) মধ্য দিয়ে গমন করে, পরে উর্ধ্বগতিতে ধর্মচক্র (হৃদয়) এবং সম্ভোগচক্রের (কণ্ঠ) মধ্যে দিয়ে উষ্ণীষচক্রে (সহস্রার) উপনীত হয়ে সহজ অবস্থা লাভ করে—মহাসুখকে পায়। প্রজ্ঞা যখন উপায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন তার বিভিন্ন নাম হয়—চণ্ডালী, ডোম্বী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী প্রভৃতি। নির্মাণচক্রে প্রজ্ঞার নাম চণ্ডালী, সম্ভোগচক্রে নৈরামণি এবং মহাসুখচক্রে (উষ্ণীষচক্রে) সহজ-সুন্দরী।

কিভাবে বোধিচিত্তের উর্ধ্বগতি সিদ্ধ হবে? অপান বায়ুর গতি নিম্নমুখী এবং প্রাণবায়ু উর্ধ্বগ। সেইজন্য যোগী প্রাণাপানের গতিরোধ করে অবধূতিকা নাড়ীর মধ্যে দিয়ে তাদের প্রবাহ রচনা করবে। এই প্রবাহের সঙ্গে বোধচিত্তও উর্ধ্বগতি লাভ করে উষ্ণীষ কমলে উপনীত হবে এবং মহাসুখ লাভ করবে। এই পরমাগতিকে অদ্বয়, মৈথুন, যুগনদ্ধ, সমরস, সহজসমাধি বা শূন্যসমাধি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

চর্যাপদগুলির মধ্যে এই সব তত্ত্বকে রূপক উৎপ্রেক্ষার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। কুক্কুরী পাদের একটি চর্যাপদ উদ্ধৃত করে এই সম্বন্ধে উদাহরণ দিচ্ছি—

"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
অইসন চর্যা কুক্কুরী-পাএঁ গাইড়
কেড়ি মঝেঁ একুড়ি অহিঁ সনাইড় ॥"

দুইকে (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়কে) দোহন করে (অর্থাৎ একত্র করে) বোধচিত্তে রূপান্তরিত করে পীঠে (অর্থাৎ নির্মাণচক্রে) রাখা যায় না, (কেননা এই বোধচিত্ত স্বভাব-চঞ্চল ও নিম্নগামী) বৃক্ষের (দেহবৃক্ষের) তেঁতুল (ফল—বোধচিত্ত) কুম্ভীরে (কুম্ভক সমাধি) খায় (নিঃস্বভাব করে), অঙ্গন (বিহার ভূমি) ঘরের মধ্যে (দেহের মধ্যে) হে অবধূতি, শোন কর্ণাভরণ (প্রকৃতিদোষ) অর্ধ রাত্রিতে (চিত্তের বিলয়াবস্থায়) চোরে (সহজানন্দ) হরণ করল। শ্বশুর (শ্বাস) নিদ্রা গেল, বধূ (অবধূতিকা) জাগে। কর্ণাভরণ (প্রকৃতি দোষ) চোরে নিল, কোথায় কি মাগিব (অর্থাৎ যোগী কোন কিছু চায় না) দিবসেই (চিত্তের চঞ্চলাবস্থায়) বধূ কালের ভয় পায়, রাত্রি হইলে (চিত্তের বিলয়-অবস্থায়) কোথায় যায় (মহাসুখচক্র স্বস্থানে নির্বিকল্প অবস্থা পায়) এই চর্যাপদ কুক্কুরীপাদ গাইল —কোটি লোকের মাঝে একজনের চিত্তে তা প্রবেশ করল।

বৌদ্ধসহজিয়ার এই তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যতীত একটি প্রয়োগ-পদ্ধতি আছে। সেটি সকল তান্ত্রিকতারই সাধারণ পদ্ধতি। তা হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনকে এবং অন্যান্য ভোগকে ভিত্তি করে সাধন। শ্রীসমাজ তন্ত্রে বৌদ্ধ সহজিয়ার আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"পঞ্চ কামান্ পরিত্যজ্য তপোভিঃ নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ ॥"

দারিকপাদও বলেছেন : দুঃখেঁ সুখেঁ এক করিআ ভুঞ্জই ইন্দীআনী—দুঃখ সুখকে এক করে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ কর। এ সম্বন্ধেও এখানে আর বিশদ আলোচনা করব না।

এর পরের আলোচ্য মতবাদ—বৈষ্ণব সহজিয়া।

ভগবান শ্রীচৈতন্য যে সাধনাকে তাঁর জীবনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা হচ্ছে ভক্তির সাধন। এই ভক্তি অতুলনীয়—জগতের ইতিহাসে ভগবানে প্রেমের এতবড় উর্জস্বল চিত্র আর চোখে পড়ে না। এই প্রেমের স্বরূপ আমাদের ভাষায় বোঝানো কঠিন। এর আবেগকে ভাষার রূপ দেওয়ার জন্য প্রাকৃতপ্রেমের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পরকীয়ার প্রতি প্রেমই প্রাকৃতপ্রেমের সর্বাপেক্ষা উন্মাদনাময় প্রকাশ। সেইজন্য মহাভাগা গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে প্রেমের সর্বোচ্চ প্রতীক বলে কল্পনা করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে এই কথাই বলেছেন

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥"

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবর্গ সাম্যাংশের উপর জোর দিয়ে টানটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যযুগোত্তর বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই ভাবকে বাহ্যজীবনের উপর আস্তীর্ণ করে তার সহিত তন্ত্রের ও যোগের নানা উপকরণের সংমিশ্রণে তাদের মতবাদের সৃষ্টি করেছেন।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে সহজই পরম তত্ত্ব। এই সহজের দ্বিবিধ নিত্যরূপ—আস্বাদ্য ও আস্বাদক—রতি ও রস—প্রকৃতি ও পুরুষ—রাধা ও কৃষ্ণ। এই অপ্রাকৃত যুগলরূপই জগতের স্বরূপ এবং সংসারের সকল নরনারীর মধ্যে তারই প্রাকৃত লীলা চলেছে। প্রত্যেক নররূপের মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং প্রত্যেক নারীরূপে রাধার স্বরূপ। এই স্বরূপকে বিকশিত করাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। [প্রা]কৃতরূপকে অবলম্বন করেই স্বরূপকে পাওয়া

যাবে। তাই 'রূপে' 'স্বরূপে'র আরোপ করতে হবে। নর নিজকে কৃষ্ণরূপে এবং নারী নিজকে রাধারূপে আরোপ করে মিলিত হয়ে সাধন করলে সহজেই স্বরূপকে পাবে।

"স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদন-মোহন।"

আরোপ-সাধন প্রাকৃতকে অস্বীকার করে না তবে প্রাকৃতকে অবলম্বন করে অপ্রাকৃতে উপনীত হয়। সেইজন্যই সহজিয়া বলে,

"স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে।"

এই আরোপ-সাধনই সাধকের একমাত্র পথ সহজিয়াদের মতে।

"স্বরূপে আরোপ এই রসকূপ
সকল সাধন পার।
স্বরূপ ভজিয়া সাধন করিলে
সাধক হইতে পার॥"

এই আরোপ-সাধনের সঙ্গে যোগ-সাধনাও যুক্ত হয়েছে। স্ত্রী-পুংতত্ত্বের দেহের মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার সহজিয়ারা করে থাকে এবং সুষুম্নাদি নাড়ী, সহস্রারাদি চক্রের স্বীকৃতিও এই মতবাদে আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেহের মধ্যে নানারূপ সরোবরের কল্পনাও রয়েছে!—

"কাম-সরোবর আর মান-সরোবর।
বাম পার্শ্বে প্রকৃতি অঙ্গ মন মনোহর।
অক্ষয় সরোবর আর প্রেম-সরোবর
দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষ অঙ্গ শরীর ভিতর॥"

বামপার্শ্বের কাম ও মান (অহংকার) কে পরিত্যাগ করে দক্ষিণের প্রেমকে অবলম্বন করলেই অক্ষয় সরোবরে পৌছানো যাবে—যেখানে পরমাত্মা বাস করেন—"মস্তকেতে পরমাত্মা সহস্রদলেতে।—অক্ষয় সরোবর বলি কহিলা তাহাতে॥"

বৈষ্ণব সহজিয়ার সাধনে আরোপের জন্য পরকীয়া নিয়ে সাধনার ব্যবস্থা আছে। এইটি পূর্বেই বলেছি তান্ত্রিকমতের সাধারণ লক্ষণ।

শাক্ততন্ত্র অপর একটি মতবাদ যাকে মরমী বলা যেতে পারে। শাক্ততন্ত্রের উদ্ভব বাঙালাদেশে। বৌদ্ধধর্মের বোধির সাধনা, বৈষ্ণবদের ভক্তির সাধনা বাঙালা দেশের জলবায়ুর প্রভাবে সহজিয়া মতবাদে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছিল। তেমনি সাংখ্যযোগের প্রাণশক্তির সাধনাও বাঙালা দেশে শাক্ততন্ত্রে রূপায়ণ লাভ করেছে। পূর্বেই বলেছি হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব খ্রীষ্টীয় ৭।৮ম শতকের পরে। বৌদ্ধতন্ত্র, সাংখ্যযোগ দর্শন ও সাধনা এবং বাঙালার জলবায়ুর সংমিশ্রণের ফলই শাক্ততন্ত্র।

তন্ত্রমতে মানবের দেহে শিব-শক্তি আছেন। সহস্রারে পরমশিব—এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি! সুষুম্নামার্গে ষট্‌চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনীকে পরম-শিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই পরমা গতি লাভ হবে।

কুণ্ডলিনী মূলাধারে সুপ্তাবস্থায় আছেন। তাঁকে জাগরিত করে সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বগা করতে হবে। এর জন্য নানা উপায় তন্ত্রে নির্দিষ্ট—মন্ত্রজপ, পূজা, হোম, অভিষেক, প্রাণায়াম এবং তন্ত্রশাস্ত্রের যা সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য—বামমার্গে পঞ্চমকারের সাধন।

মধ্যযুগের নামধর্মও বাঙলার মরমী সাধনার অন্যতম। এই ধর্মের দ্বিতীয় গুরু মৎস্যেন্দ্র দশম শতাব্দীর লোক। নাথপন্থের মতে পরমতত্ত্বের দুইটি রূপ—সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য—কালাগ্নি—সৃষ্টির সংহার-তত্ত্ব—আর চন্দ্রই ব্রহ্মাণ্ডের অমৃত-তত্ত্ব। এই চন্দ্র দেহের মধ্যে তালুমূলে অবস্থিত আর নাভিদেশে দহনাত্মক সূর্য। চন্দ্রের ক্ষরিত অমৃতধারা দহনাত্মক সূর্যের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যোগের দ্বারা এই ক্ষরিতধারাকে রক্ষা করতে হবে। খেচরী মুদ্রা, সিদ্ধাসনাদি এবং প্রাণায়ামের দ্বারা তা করা

সম্ভব। নিম্নগা চন্দ্রধারা ঊর্ধ্বগা হবে এবং সূর্যের কবল থেকে রক্ষা পাবে। এইটি করতে পারলেই এই উভয়তত্ত্বকে বিধৃত করে—উভয়তত্ত্বে ঊর্ধ্বে যে বিন্দু বা মহেশ্বর তাঁকে পাওয়া যাবে।

নাথসম্প্রদায়ের যে সাধনা তা হঠযোগের সাধন—সেইজন্যই কায়াসাধনের উপরে এতে জোর দেওয়া হয়েছে। কায়াসাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারলে সিদ্ধতনু বা দিব্যতনু লাভ করা যায় তাতে করে সিদ্ধ যোগী স্বেচ্ছামত জগতে বিচরণ করেন—তাঁদের আর মৃত্যু হয় না।

এঁদের মধ্যে সহজোলী, বজ্রোলী প্রভৃতি মুদ্রার সাধনের কথা আছে যেগুলি তান্ত্রিক বামমার্গের কথা।

আউল, বাউল প্রভৃতি মতবাদ বৈষ্ণব সহজিয়ারই মুসলমান সূফীধর্মের প্রভাবে রূপান্তর মাত্র। এঁরা মানুষের মধ্যে যে মনের মানুষ আছে তার জন্যই সাধনা করেন। এঁদের সাধনাও যোগসাধনাকে ও রসসাধনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

বাউলের এই সাধনার ধারা নিম্নলিখিত গীতটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

"গুরুর হাতের প্রদীপ লৈয়া
দেখরে অথাই গুহায় বৈয়া।
আত্মযোগে সচেত হৈয়া
তবে পরম মরম পাবি।
(দেখবি) সরস দরশ হৃদ্‌মাঝারে
(আবার) অপার চৌদ্দ ভুবন-পারে।
যোগলীলা তোর সহস্রারে
আত্ম-নাত্ম ভেদ ঘুচাবি।"

কর্তাভজা দলের স্থাপয়িতা আউলচাঁদ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের লোক। এই সম্প্রদায়ের একটি চলিত গান আছে "এভাবের মানুষ কোথা হতে এলো। এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥ এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একমন, জয় কর্তা বলি, বাহু তুলি, কল্লে প্রেমে ঢল ঢল।" এই দলে খ্রীষ্টান মুসলমান ও হিন্দু আছে। নরনারীর অবাধ মিলনকে ভিত্তি করে এদের সাধনপদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

সময়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাঙলার মরমী সাধনার একটি রেখাচিত্র মাত্র দেওয়া সম্ভব হল। এই সাধনার ইতিহাসের অনুবর্তন করলে এই কথাই মনে হবে যে, উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও দর্শনকে মানুষের সাধারণ জীবনের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা এর মাঝে আছে। এবং এই প্রচেষ্টা যে কতক অংশে সফল হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাঙলার সমাজের সর্বস্তরে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুস্যূতি ঘটেছে এইসব মতবাদের মাধ্যমেই। সেইজন্য পথে, ঘাটে, ক্ষেতে, খামারে, সাধারণ লোককবিদের গীতির মধ্যে, নৌকার মাঝির মুখে স্বতঃনিসারিত যে গানের সুর বেজে উঠে তা এই মরমী সাধনার সুর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করতে হবে যে, যে পঙ্কিলতার আবর্ত আমাদের সমাজজীবনকে আচ্ছন্ন করেছে এই সব মরমী সাধনার অন্তরালে যে তান্ত্রিকতার প্রক্ষেপ আছে তাইই সেজন্য বহুলাংশে দায়ী।

বাঙলার সাধনধারার গতিবেগ এখনও শেষ হয়নি। উনবিংশশতকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর উপাশ্রয়ে সাধনার নূতন ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। এই সাধনাতেও মরমী সাধনার স্থান আছে—কিন্তু তা পূর্বোক্ত মরমী সাধনাগুলির মত গুহ্য (esoteric) সাধনা নয়। নীতিপূর্ণ জীবনের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-যোগের সমন্বয়ে এই সাধনার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বোক্ত সাধনাগুলির অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে ঔপনিষদিক ভিত্তির উপর আমাদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সহজিয়া ও তান্ত্রিক বামাচারকে পরিত্যাগ করবার উপদেশ

দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন "এই নোংরা বামাচার যা তোমাদের দেশকে ধ্বংস করছে তা সযত্নে পরিহার কর। বামাচারী সম্প্রদায় মৌচাকের মত বাঙলার সমাজকে ঘিরে ফেলেছে। যারা দিনের বেলা উচ্চকণ্ঠে আচারের কথা বলে রাত্রে তারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।"

সুতরাং বাঙলা দেশের বলেই প্রশংসা করতে হবে বা অনুসরণ করতে হবে তার কোন অর্থ নাই। যা ভাল তাই গ্রহণীয় এবং মন্দ যা তা সযত্নে পরিহার করতে হবে। সেইজন্য উপনিষদের বেদান্তের প্রাণদ, বলদ শিক্ষার উপরই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কিন্তু এই সমালোচনা সত্ত্বেও এটি অস্বীকার করা চলবে না যে পূর্বোক্ত মরমী সাধনা বাঙলার জীবনে অতি অন্তরঙ্গভাবে মিলে গিয়েছে। তার ফলে কেবলমাত্র ধর্মই নয়, শিল্পকলা, কাব্য গান প্রভৃতি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই প্রভাবকে অতিক্রম করা কঠিন। সুতরাং তন্ত্রাদি সাধনার অনৈতিক অংশকে পরিত্যাগ করে তার মধ্যে যা কিছু ভাল অংশ আছে তা গ্রহণ করতে হবে।

মানবের পরমায়ু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

মানুষ বিধাতারে কাঁদি জানাইল,
"হে নিষ্ঠুর প্রেমময়, এই মনে ছিল,—
জগতে সকলে কয়, আমি তব স্নেহজয়
করিয়াছি সব চেয়ে, সর্বশ্রেষ্ঠ তাই
আমি নাকি লভিয়াছি জীবকুলে ঠাঁই !

কিন্তু হায়, কে বুঝিবে তোমার মহিমা,—
বেধে দিলে যেই দিন জীব-আয়ু-সীমা,—
কত জনে এ নিখিলে কত দীর্ঘ আয়ু দিলে,
আমারি বেলায় শুধু হইলে কৃপণ,—
চল্লিশ বছর আয়ু—ললাট-লিখন।

রচিয়াছ এ বিশাল ভোগের সংসার,
কার তরে ?—কে করিবে সম্ভোগ ইহার ?
চল্লিশ বছর মাত্র ওষ্ঠে ধরি সুধাপাত্র
কতটুকু করি পান মিটিবে পিপাসা,—
দয়াময়, দীন প্রতি কেন এ তামাসা !"

হাসিয়া বিধাতা কন,—"কি তব প্রার্থনা
কহ মোরে, পুরাইব যা কিছু কামনা।
চল্লিশ বছর নর পাবে পূর্ণ অবসর,
ভোগের যা কিছু ভবে, সুখের জীবন।
যদি তায় একান্তই তৃপ্ত নয় মন—
কহ আর কত আয়ু তব আকিঞ্চন ?—
দিব আমি কেন কর অশ্রু বরিষণ !"

"গাধা সে নির্বোধ অতি"— নর কহে, "তার প্রতি
করুণায় বেঁধে দিলে কুড়িটি বছর !"
"ও কুড়ি তোমায় দিনু কহ অতঃপর।"—

চল্লিশ হইল ষাট, তবু তৃপ্ত নহে,
করযোড়ে বিধাতায় ধীরে ধীরে কহে,—
"ঘৃণিত কুকুর হায়, সেও বিশ বর্ষ পায়,—"
বিধাতা কহেন, "আচ্ছা বেশ তাই হোক্,
ওই বিশ বর্ষ আরো তব ভাগে রোক্।"

অতৃপ্ত মানব ভাবে,—"ষাট হ'ল আশী,
শতবর্ষ বিনা লাভ কিবা ভবে আসি !"
সবিনয়ে কহে ধীরে,— "অতি ঘৃণ্য শকুনিরে,
দিয়াছ যে শতবর্ষ, তার কিছু দাও !"—
হাসিয়া কহেন বিধি,—"আচ্ছা বিশ নাও।"

চতুর মানব জানি চরম বিজয়,
সংসার পাতিয়া বসে মহা মোহময়।
শৈশব-কৈশোর-কাল,— অন্তরায়, অন্তরাল,
কিছু নয়,—যাহা কিছু সকলি সুন্দর,
নিশ্চিন্ত জীবন যেন আনন্দ-বন্দর !

ধীরে ধীরে জীবনের যৌবন-জোয়ার,
কূলে কূলে উচ্ছলতা বিলায় তাহার ;
চল্লিশ বছর ধরি, পিয়ে পানপাত্র ভরি,
ভাবে হেন স্ফূর্তি সারা জীবন-সঞ্চয়,—
এ অক্ষয়-ভাণ্ড শূন্য হইবার নয় !

চল্লিশ বছর শেষ,—মানব-জীবন,
বিধিদত্ত অযাচিত অমূল্য যে ধন—
ফুরাইল।—সুরু তাহা, গর্দভ জীবন যাহা,—
অর্থাৎ চাকুরীজীবী 'ডেলী প্যাসেঞ্জার',
হন্ত-দন্ত ছুটে চলে স্কন্ধে ঝুলি ভার !

আফিসের ছুটি হ'লে সে ঝুলি বোঝাই
করিয়া নিয়ত রাতে গৃহে ফেরা চাই।
হাসিয়া গৃহিণী আসি, খুলেন ঝুলির ফাঁসি,
কি এল না এল তাহা দেখেন মিলায়ে,
যা এল তাহাতে দিন যাবে কি কুলায়ে ?

"কপি আর কই মাছ ভালবাসে হাবু,
আজ সে ঘুমায়, যাক্, কাল হবে বাবু ?",
বাবু কন "তাই হবে",— সকাল হইল যবে,
রোদ না উঠিতে তাড়া আফিসেতে যাওয়া,
হ'ল নাক কপি আর কই মাছ খাওয়া।

রাত্রিতে ভোজনে বসি, বাবু কন "কই,
আন দিকি একটুকু "কপি আর কই ?"
গৃহিণী বলেন, "হায়, সেকি আর রাখা যায় ?
হাবু, গাবু, সাবু, লাবু চার ভাই মিলে,
প্রায় তার ষোল-আনা শেষ করে দিলে !

অবশিষ্ট যাহা ছিল খেয়েছে তা খুকী,
টাক্না দিলাম শুধু আমি পোড়ামুখী !—
এমন শীতের দিনে, আবার আনিও কিে
ভাল করে রেঁধে দেবো—থাকিলে সময়,
ধীরে সুস্থে খেয়ো বসে।"—এই ভাবে হয়—

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মোট বওয়া সার,—
নিজের ভোগেতে কিছু লাগে নাক আর।
প্রতিবাদ সারা কানে রাসভ নিনাদ মা
হয়ত লগুড়াঘাত কভু ভাগ্যে জোটে।
তথাপি বাঁচিতে সাধ,—মিটে নাই মোটে।

ষষ্টিবর্ষ সমাতীত,—কুকুর-জীবন,—
কত যে সন্তান, কত কন্যাই সীবন !
পুত্রবধূ, জামাতায় পূর্ণ ঘর,—ঠাঁই তায়
নাহি তিল,—অগত্যা সে বারান্দায় বাসা,
সারা রাত দৌবারিক-বৃত্তি অতি খাসা !

ঝড়তি পড়্তি যাহা তাই পড়ে পেটে,
জীর্ণ ছেঁড়া ত্যক্ত কোটে শীত যায় কেটে।
শুধুই খবরদারি, ঘেউ ঘেউ লেজ নাড়ি,
নিজের যা কিছু সব বিলায়ে অপরে,
কি অপূর্ব চিদানন্দ অন্তরে বিহরে !

এই ভাবে বিশ বর্ষ করিয়া যাপন
হয় একাশীতি বর্ষে শুভ পদার্পণ।
শকুনি-জীবন যাহা, কি আর বর্ণিব তাহা ?
ভাগাড়েতে দৃষ্টি রয় নিবদ্ধ সতত,—
থাকে যথা তথাকার বৃক্ষশাখা যত—

পুরীষে পুরীষে শ্বেত, লুপ্ত শ্যাম-শোভা,
আর সে শকুন্ত-তনু যথা মনোলোভা,
আশী যবে হয় পার, তথা দেহকান্তি তার,
উত্থান-শকতি ক্ষীণ,—মূর্তিমতী জরা,
আসি উপহাসি কহে "মরা-মরা-মরা !"

দিবানিশি খিট খিট কোপন ভাষণ,
শাসায় সবারে, কেহ মানে না শাসন !
ভোজনে হাঁকাই ভারি, হজমে তাই-রে-নারি,
প্রতিদিন শয্যা নষ্ট, এ কি গো বালাই !
সেবা যারা করে বলে,—"মলে বেঁচে যাই।"

তবু বাঁচিবার সাধ,—ইন্দ্রিয় শিথিল,
স্বপ্ন সম জাগে ক্ষীণ অতীত নিখিল ;
যবে বড় ব্যথা পায় ডাকে ক্ষণে বিধাতায়,
বলে, "ওগো লও ডাকি, পারি নাক আর।"—
পরক্ষণে মায়াজালে জড়িত আবার !

সত্যই এই কি তবে মানব-জীবন ?—
ব্যর্থতার ইতিহাস, ক্লেদ-ক্লিন্ন মন,—
ইহাই বহন করি, যদি গো যাইবে মরি,
কেন এই আসা-যাওয়া, সংসার বন্ধন,
কেন নিত্য কটু তিক্ত ব্যঞ্জন রন্ধন ?

চল্লিশে জীবন-শেষ তবে বাঞ্ছনীয় ?
গর্দভ-কুক্কুর-আয়ু নহে তবে প্রিয় ?
শকুনি জীবনো তাই, নাহি চাই, নাহি চাই !
তবে কি বিধাতৃদত্ত কাঙ্ক্ষিত জীবন,
দীর্ঘতার প্রহসনে হয় সমাপন ?

তাহা নহে,—বিধি যাহা দিলেন স্বেচ্ছায়,
সে নহে সম্ভোগ তরে আপন সেবায়।
জীবনের এই ভুল সকল অনর্থ মূল,
সেই হতে, হতে হবে নির্লিপ্ত পাঁকাল
সংসার-কর্দমে,—তবে কে তারে নাকাল

করিবে চল্লিশ পরে ? হোক্ শত আয়ু,
ক্ষতি নাই,—আরো দীর্ঘ হোক্ প্রাণ-বায়ু।
পরমার্থ-চিন্তা-ধ্যান,— ত্যাগে আত্মবলিদান
ঘুচাইবে সে নরের যা কিছু জঞ্জাল,
কর-আমলক তার জরা-ব্যাধি-জাল।

চল্লিশ হইতে ষাট, ষাট হ'তে আশী,
আশী হ'তে শতবর্ষ, ধাপে ধাপে আসি
দিয়ে যায় অভিজ্ঞতা, মানবে পশুর কথা
কয়ে যায়,—হে মানব, হও সাবধান,
জীবন যা হোক কর সত্যের সন্ধান।

গর্দ্দভের সহশক্তি কর আকর্ষণ,
সারমেয়ে বিভুভক্তি লহ নিদর্শন,
শকুনির ঊর্ধ্বগতি, অনুসরি স্থির মতি
উড়িবারে যদি পার,—জীবন নশ্বর
হইবে অমৃতময় সুচির ভাস্বর।

সাধক

শ্রীমতী উষা দত্ত, বি-এ, কাব্যতীর্থ, ভারতী

মানুষের চিত্ত যখন তার জন্মজন্মান্তরের যুগ-যুগ-কল্পিত বহুব্যবহৃত প্রেয়ের প্রেয়ত্বে বিতৃষ্ণ হয়ে অনাস্বাদিত অদৃষ্ট অজ্ঞাত শ্রেয়োলাভে ধাবিত হয়, তখনই মানুষকে বলি 'সাধক'। আপাতরমণীয় বহু-দৃশ্যমান বিষয়কে পেছনে অনাদৃত রেখে তাঁকে হতে হয় অনির্দিষ্ট কণ্টকাকীর্ণ পথের যাত্রিক। জন-নেত্রের অন্তরালে আপন বিবিক্ত পথে বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কারনিচয় সাধকের মনকে বহ্নির তীব্র দাহন, বিদ্যুতের প্রবল আঘাত এবং প্রভঞ্জনের ভয়াবহ ঘূর্ণনের মতো কত যে দগ্ধ, বিদীর্ণ, আন্দোলিত-আলোড়িত করে সে বার্তা কে রাখে ?

বিরাট মহীরুহ তার বিশালত্ব নিয়ে শ্যামল শোভায় পৃথিবীর বুকে জনরঙ্গমঞ্চে প্রকটিত হয়, কিন্তু বৃক্ষের শুষ্ক ও সূক্ষ্ম বীজকে আপন বক্ষপুটের নিভৃত প্রকোষ্ঠে রেখে বারিসিঞ্চনে রবিকিরণে পুষ্ট, সংবর্ধিত ও কোমলায়িত করে আপন দেহ

বিদীর্ণ বিভক্ত করে অঙ্কুরিত বীজকে লোকচক্ষে প্রেরণ করতে ধরিত্রীজননীকে কত যত্ন ও প্রচেষ্টাই না করতে হয়!"

নবজাত শিশুর আগমনে আনন্দের মধুর হিল্লোলে পরিবার হয় উদ্বেল, কিন্তু দুঃসহ বেদনায় ক্লিষ্টা প্রপীড়িতা মাতার বার্তা কে স্মরণে রাখে!

সেইরূপই আমরা মানবকে যখন পাই সিদ্ধ সাধকরূপে তখন তিনি তাঁর সাধকোচিত সকল সুমহান্ সম্পদেই অলঙ্কৃত—তপোবিদগ্ধ নিরুদ্ধচিত্ত-বৃত্তি "বিগতরাগভয়ক্রোধ" আত্মবান্ যোগী সৌম্য-সুন্দর সাধক আমাদের নয়নাভিরামরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আমরা তাঁর পূতসঙ্গে হই পবিত্র, তাঁর দেবত্বে, তাঁর মহত্ত্বে হই বিস্মিত, আর তাঁর বাণীতে পাই অমৃতের সন্ধান।

কিন্তু তাঁর এই দেবত্বলাভের পেছনে তাঁকে কত দহন জ্বালা, কত মর্মযাতনাই না ভোগ করতে হয়েছে—তার সংবাদ ত আমরা রাখি না। মানবত্ব ও দেবত্বে টানাটানির দ্বন্দ্বে নিপীড়িত ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রিক সাধকের পথচলার প্রারম্ভের পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়!

বহু জন্মে—বহুযুগভোগ্য আপাতদৃশ্যমান জগতের মাধুর্য যেদিন মানবসাধকের হৃদয়ে আনন্দস্পর্শ বুলাতে বিমুখ হয় সেই দিনই মানবমনের দুয়ারে পড়ে প্রথম আঘাত! যা পায় তাতে আনন্দ নাই, যাতে আনন্দ আছে তাকে জানে না বা পায় না, আবার আনন্দ না পেলে বাঁচে না এমত অবস্থায় প'ড়ে মানবমন এক অননুভূত দুঃসহ যাতনায় প্রপীড়িত হয়। পথের সন্ধানে আকুল হয়ে সাধক যাঁকে সন্ধান করেন তিনিই হন মানবের পরম ও চরম পথের পথনির্দেশক—অর্থাৎ দীক্ষাগুরু।

গুরু তাঁর দিক্‌হারা শিষ্যকে পথের সন্ধান দিয়ে তাকে যাত্রাপথে চালিত করেন। গুরুপ্রদত্ত পাথেয় সম্বল করে এক ক্ষুরধার কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অজ্ঞাত পথের পথিক হয়ে সাধককে চলতে হয় অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে। এই চলার পথেই তাঁকে করতে হয় অপার সংগ্রাম, হতে হয় ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত, ক্লান্ত, শ্রান্ত, কিন্তু চলার গতি হয় না শ্লথ, পায় না কোন ছেদ।

বন্ধু-পরিবার-পরিজন করে আকর্ষণ—বাঞ্ছিত সুখায়তন বর্জনে, রম্য বস্তুর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণায় সকলে মূর্খাভিধায় করে তাঁকে অভিহিত, অতীত তার সকল সম্পদ বিস্তার করে পেছনে টানতে চায়, বর্তমান বজ্রমুষ্টিতে তাঁর দ্রুতগতিতে আনতে চায় পূর্ণচ্ছেদ, আর ভবিষ্যৎ কত না বিভীষিকার ভীতি দেখিয়ে তাঁর অগ্রগতিকে করতে চায় ব্যাহত। কিন্তু সাধককে চলতে হয়। ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত হয়েও তাঁকে চলতে হবে—প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে তাঁর পেতেই হবে! তাই সাধকের গতি হয় দ্রুততর! কিন্তু তাঁর গতিকে অবরুদ্ধ করতে ত্বরিতপদে যারা আসে কি করে সাধক তাদের আকর্ষণকে শিথিল করবেন? স্থূল জগতের স্পর্শ ও দর্শনলভ্য একজন্মের পরিচিত বন্ধু-পরিজনদের পরিহারে সমর্থ হয়েও সাধককে পড়তে হয় তাঁর জন্মজন্মান্তরের কল্পনা-মানসীদের হাতে। এরা যে তাঁর স্বহস্তনির্মিত বাসনা-সৌধ, স্বকররোপিত কামনা-বৃক্ষ। কেমন করে সাধক এদের চূর্ণ করবেন? কিরূপে এ বৃক্ষাবলি উৎপাটিত করবেন? এরা যে তাঁর অতি সন্নিকটে মনের প্রতি স্তরে দৃঢ়বিরাজিত। কেহ লীলায়িত ছন্দে শোনায় অলির মধুর গুঞ্জন, কেহ ধরে মুখে প্রেমের সুধাপাত্র, কেহ করে সুখ-বাসর রচনা। কেমন করে সাধক এদের পরিত্যাগ করবেন! তাঁর কত জন্মের কত চিন্তার্জিত বান্ধব তাঁর অতি আপন পরমপ্রিয় স্বজন! পার্থিব সুখের সকল উপচার নিয়ে যে এরা সাধককে আকর্ষণ করতে চায়। সাধক হন মুগ্ধ, বিহ্বল!

অবিরাম সংগ্রামাগ্নিতে সাধকের যজ্ঞ-সমিধ তখন জ্বলতে আরম্ভ করেছে—অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তপস্যার ক্ষীণালোকে দেবত্বের

আভাস ফুটে ওঠে, মুগ্ধ বিহ্বল পথিককে সতর্ক করে সাধক-মন শোনায় দেববাণী—এরা অলীক অসত্য ক্ষুদ্র! তুমি শাশ্বত সত্য পূর্ণের স্বরূপ—প্রেমিকের অন্তরের প্রেমনির্ঝর-প্রবাহের সহজ গতি সেই প্রেম-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীভগবানেই প্রবাহিত। হে প্রেমিক বন্ধু, তোমার প্রেমকে ক্ষুদ্রত্বে সীমায়িত কোরো না "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সাধকের পূর্ব সংস্কার হয় ক্ষীণবল। তাই সাধক আবার চলেন দ্রুততর বেগে।

এই বিজয়ী সৈনিক পথিককে পরাজিত করতে এবার তাঁর পূর্ব মনোহারিণী মানসীরা অতি ভয়ঙ্করারূপেই দেখা দিল, হতাশা-নিরাশার বীভৎস আলোড়নে সাধক হন প্রকম্পিত। অদৃষ্ট দীর্ঘ পথের শেষ কোথায়—সামনে গাঢ় অন্ধকার, সাধক পেছনে ফেরেন—মন চায় পরিত্যক্ত পরিজনে নিবর্তন। কিন্তু হায়, তারাও সব শূন্যে মিলায়—তাঁর অনাদৃত বন্ধু পরিজন মরুর মরীচিকার মত বিলীন হয় অতীতের অতলে। সম্মুখের তমসা সাধককে হতাশার গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত করতে চায়—কি তাঁর শ্রেয়! কোথায় তাঁর গতির ছেদ! কিছু নাই! কেহ নাই! এই অবসাদ—এই শূন্যতার পরিবেশে—স্বানুভূতির তীব্র প্রাবল্যে ভেসে যায় সকল যুক্তিবাদ, সকল শাস্ত্র-বাণী,—নৈরাশ্যের প্রবলতায় আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বুঝিবা পূর্ণ জড়ত্বে পরিণত হতে হয় সাধককে। কিন্তু দেখা যায় তাঁর তপস্যাগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত—প্রদীপ্ত; তাতে তাঁর অশুভ সংস্কার হয় ভস্মীভূত। তাঁর সাধক-মন উদাত্ত অভয়প্রদ কণ্ঠে শোনায় নব প্রেরণার বাণী—হে বীর, পথের সকল বিঘ্নকে পদদলিত করে অগ্রসর হও—জান না কি কবি গেয়েছেন—"দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!" মানব যা সহজে পায় তা অনায়াসে হারায়, তাই সেই পরম প্রাপ্তির জন্য কর সুকঠিন তপস্যা—চরম লাভের জন্য কর অবিরাম অকুণ্ঠ সংগ্রাম, প্রতিধ্বনিত হোক সদাই তোমাতে মহামানবের সেই বজ্রনির্ঘোষ "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক্ তোমা। চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান হৃদয় শ্মশান তাহাতে নাচুক শ্যামা॥" নব প্রেরণায় সাধকের গতি হয় দ্রুততর! কিন্তু আবার তাঁর যাত্রা পথে আসে এক অভিনব বাধা। গভীর বেদনা অবিশ্রান্ত বারি-ধারায় বিগলিত হয়ে সাধকের চলার পথকে করে দেয় পিচ্ছিল—ধূমায়িত! নাই তার ছলনার মনোহারী প্রভাব। হতাশার ভীতিপ্রদ শূন্যতা কেবল বাষ্পের অবিরল বর্ষণ। পথিকের চলার গতি হয় মন্দা। সাধক আকুল হন, উদ্বেলিত হন। কিন্তু তখন তাঁর মানব-মন অপার সংগ্রামে হয়েছে দৃঢ়তর, সংশয়হীন, নির্মল, শান্ত—তাই মধুর কণ্ঠে শোনায় তাঁকে দেববাণী—ভয় কি, এ বেদনা, এ অশ্রুধার তো তোমার পথের বিঘ্ন নয়, তোমার পথের সাথী, তোমার পথের সকল মলিনতাকে স্বচ্ছ নির্মল করতে যে এদের আগমন—শোন নাই কবির বাণী—

"দুঃখের বরষায় চোখের জল—যেই নামলো—
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো।"

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" তোমার পরম পিতমের সন্ধানে হও চিররত! সাধক তাই চলেন, কত যুগ, কত জন্মই না তাঁকে চলতে হবে অবিশ্রান্ত গতিতে তাঁর পরম লক্ষ্যের সন্ধানে। সর্বস্ব হারিয়ে সাধক করেন তাঁর সর্বস্বের সন্ধান। আকাশে বাতাসে মরুতে প্রান্তরে সর্বভূতে সর্বজীবে শুনতে চান সাধক তাঁর প্রিয়তমের হৃদয়ের স্পন্দন, নূপুরের মধুর ধ্বনি। কর্মের মধ্যে পেতে চান সর্বশক্তিমানের শক্তিকে, সেবায় চান দেখতে তাঁর পরমের মাতৃহৃদয়। প্রভঞ্জনের গর্জনে, মরুর উত্তাপে, অশনির বিদ্যুৎবর্ষণে সাধক তাঁর রুদ্রের ভীম ভীষণ রূপের দর্শন মাগেন। রবি-কিরণে, সুধাংশুকলায় যাচেন তাঁর প্রিয়ের কান্ত মধুর রূপের পরিচয়। বিশ্ব-সৃষ্টির সকল বৈচিত্র্যের

মধ্যেই আরাধক তাঁর "একমেবাদ্বিতীয়ম্", সেই একক সত্তার অন্বেষণ করেন—আজীবন আমরণ, বুঝিবা মরণের পরেও তাঁকে করতে হবে তাঁর পরমার্থের সন্ধান। আমরা জানি না, বুঝিবা সাধকও জানেন না কবে কতদিনে তাঁর অতিনিঠুর নিত্য-মধুর দয়িতের পবিত্র পরশে হবেন ধন্য পরিপূর্ণ! কবে তাঁর ব্যর্থতার কণ্টকবনে গড়ে উঠবে সফলতার স্বর্ণমন্দির তা আমরা জানি না—কিন্তু ওগো সাধক! ওগো সাধিকা! আমরা প্রণাম করি তোমার আলস্যহীন, বিরামহীন এই চলার গতিকে, নমস্কার করি বারংবার তোমার অপার সংগ্রামকে, প্রণতি জানাই তোমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠাকে।

এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান

স্বামী বাসুদেবানন্দ

সন্ত পলের (Saint Paul) দিব্যানুভূতি যাবতীয় এক-ব্রহ্মবাদীদের পক্ষেই খাটে,—"When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. (যাহা পূর্ণ তার আবির্ভাবে অংশের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়)। রাইসব্রোকও (John Ruysbroeck) সেই একই কথা বলেছেন,—"The fourth mode is a state of emptiness made one with God in bare love and in divine light ....so that a man forgeteth himself and knoweth neither himself nor God, nor any creature nor aught else but love alone." (চতুর্থ বা জ্ঞানসত্তা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম এবং দিব্য-আলোকে একীভূত একটি পরমশূন্যতা······মানুষ এই অবস্থায় আপন ব্যক্তিত্ব ভুলে যায়। তখন তার নিজের বা ঈশ্বরের বা অন্য কোন প্রাণীর অথবা বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তার বোধে ভাসে শুধু এক অব্যক্ত সমরস প্রেম)। বিবর্ত ও পরিণাম-বাদী, উভয় পক্ষই, উচ্চ অপরোক্ষানুভূতিতে 'এক রসের' অনুভব করেন। কিন্তু এই ঐক্যানুভূতিকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের সমষ্টিগত ঐক্য বলা চলে না। এই ঐক্যে "চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ", (কৈঃ উঃ ১।১৮) অর্থাৎ এখানে কোনও অংশাংশী ভাব নেই। এখান থেকে নেমে এসে বোঝা যায় অংশাংশী ভাব অব্যয় পরমাক্ষরে ভ্রান্তি-জনিত দুটো কল্পনা, যা ব্যবহারিক সত্তায় সত্য বলে বোধ হয়। ঐ ভ্রান্তি বা মায়ার উল্লেখ উপনিষদে একাধিক স্থানে আমরা দেখতে পাই। এই মায়াই অখণ্ড আলোকে ভগ্নাংশ-ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছে—এই মায়া ব্রহ্মনিষ্ঠা, চমৎকারিণী, আকস্মিকা, অনির্বচনীয়া। উপনিষদ্ বলেছেন, "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি", (প্রশ্ন উঃ ১।১৫), "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃ উঃ ২।৫।১৯; ঋ বে ৬।৫৭।১৩), "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥" (শ্বে উঃ ৪।১০), "অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতমস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ" (শ্বে উঃ ৪।৯), "ইন্দ্রজালমিব মায়াময় স্বপ্ন ইব মিথ্যা দর্শনম্" —(মৈত্রায়নী উঃ ৪।২), "নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাঃ" (ঋ বেঃ ৮।৩।১৭; শুঃ যজুঃ বেঃ ১৭।৩১), "তান্যজ্ঞস্য মায়য়া সর্বানবয়জামহে" (তৈত্তিঃ আঃ, মহানারা উঃ প্রপা ১০।৫৭ অনু)। "মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ" (ঋ বেঃ ১।১১।৭)—মায়ী শুষ্ণকে ইন্দ্রমায়ার দ্বারা হিংসা করেন। "স্বধয়া তদেকং

তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চ নাস"—(ঋ বে ১০।১২৯।২)—তিনি স্বধা—স্বাশ্রিতা মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের সৃষ্ট কোন বস্তুই ছিল না। কিন্তু যদি বলা যায় এই মায়া "residing in the very heart of reality propelling it to develop itself" (বস্তু-সত্তার অভ্যন্তরে ওতপ্রোত থেকে বস্তুসত্তার বিকাশে সহায়কারিণী) তা হলে মায়াকে ভাস্করাচার্যের সংকোচবিকাশশীলা অথবা কাশ্মীরী প্রত্যভিজ্ঞা-বাদের বিমর্ষিণীর তুল্যরূপ গ্রহণ করতে হয় এবং তখন অবশ্য বলা চলে, "Though the things of the world are imperfect representations of the real, they are not illusory semblances of it" (জগতের বস্তুনিচয় সত্যের অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হলেও উহারা তার ভ্রান্ত প্রতিভাস নয়)। কিন্তু উপনিষদ্ বলছেন যে "অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দ্বৈতবুদ্ধিং বিনাশয়েৎ"—(তেজঃ বিন্দু উঃ ৩।৬২), "সর্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃ উঃ ২।৪ ১৪), "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—(বৃ উঃ ৪।৪।১৯) এবং এই প্রতীয়মানতা অর্থেই জগৎ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের "ইব" শব্দটি (২।৪।১৪ ; ৪।৩।৭ ; ৪।৪।১৯) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেকাজেই ভেদাভেদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদের মায়ার অভিব্যক্তি, অনভিব্যক্তি বা সংকোচ-বিকাশ হেতু অবিকারী অখণ্ড অসীম ব্রহ্মে বাস্তব পরিণাম জন্য খণ্ড-বিখণ্ডতার অভ্যুপগম (স্বীকার) অসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

যে বস্তুর পরিণাম ঘটে, তদতিরিক্ত অবকাশ ভিন্ন তার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যদি বলা যায় ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিতে এরূপ অঘটনঘটন হয়, যেমন পরশপাথর স্পর্শে লোহা সোনা হয়, তাতে অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন, যদি ঐরূপ ঘটে তা হলে সেটা লৌহ পরমাণুর অবকাশে পরমাণুর নবসংস্থান (re-arrangement) হেতু; অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে "re-adjustment of atomic contents in space"। তবে পরিণাম এবং বিবর্ত উভয় মতেই বিশ্বের শক্তিক্রীড়ার প্রকারটাই শেষ কথা নয়। বিচারহীন দৃশ্য একলা স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে না, যদি না তার পেছনে এবং তাকে অতিক্রম করে কোন সম্বিৎ স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি বলা যায়, আমাদের সত্যিকার প্রগতি পূর্ণের একটা সসীমতার মধ্যেই ঘটে, তা হলেও সেই পূর্ণকে অতিক্রম ক'রে কোন "Creative Evolution" (সৃষ্টিধর্মী ক্রমবিকাশ) অসম্ভব; কাজেকাজেই যদি এই সৃজনশীলতাই জীবের আদর্শ হয়—যদি সাময়িক পদ্ধতিটিই বাস্তব পরিণাম-পদ্ধতি হয়, কারণ সত্য এর ভিতরে এবং বাহিরে আছেন, যদি হেগেল-সম্মত এই মতানুসরণ করা যায়, তা হলে, (১) বহুত্বপূর্ণ দ্বৈতকে আর অসত্য কি ক'রে বলা চলে? এবং (২) সীমার মূল্য অসীমের চাইতে বেশী হয়ে পড়ে, যেহেতু একটা দেশহীন, কালহীন মহাশূন্যে সত্যের অনু-সন্ধানের সফলতা কোথায়? ফলে দাঁড়ায়, উপনিষদের কালাতীত সত্তার কোন বোধিমূলক সাক্ষাৎকার আমাদের হতে পারে না, কারণ ঐ বোধি বা অপরোক্ষানুভূতিতে "আমি মানে তুমি হয়ে যায়"—"to know is to be", কারণ 'বিজ্ঞাতার-মরে কেন বিজানীয়াৎ'—(বৃ উঃ ৪।৫।১৫)। কাজে-কাজেই বলতে হয় কালাতীত, দেশাতীত, কারণাতীত ব্রহ্ম একটা আপেক্ষিক মনোবৃত্তিমাত্র—সসীম দেশকাল সম্বন্ধাবলম্বনে একটি অনুমিতিমাত্র।

কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপক লেখনীর গতি পরিবর্তিত করলেন,—এই পূর্ণতার আদর্শ যদি না থাকত তা হলে ক্রমবিকাশটা একটা অকারণ কার্যাবলীর প্রবাহ হয়ে পড়ত, কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ থাকত না। "Were it so, were there not an absolute, we should be landed in an endless process, which would have no plan or purpose underlying it......the

real is expressed at every moment of its history." কিন্তু এতে যে সাময়িক সত্তাটাই প্রধান হয়ে পড়ে; শুদ্ধ গুণাতীত অক্ষর পদার্থের যদি অনুভূতি না হয়, সেখানে জানা এবং সত্তা এক হয়ে যায়, তা হলে "Absolute"-টা একটা "Idea" মাত্র হয়ে যায়,—উপনিষদের ব্রহ্মের বস্তু-স্বরূপতা সিদ্ধ হয় না। —"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" (কঠ উ ১।১৫)—এই বস্তুটিকে যতক্ষণ না নেতি-মুখে তার যাবতীয় বিরুদ্ধগুলো হতে মুক্ত ক'রে অনুভব করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার বাস্তবরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণতা সাধন হয় না। কখ, কগ, কঘ-এর ভেতর দিয়ে 'ক'-কে উপলব্ধি করা এবং 'ক'কে নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করা এক জিনিস নয়।

উপনিষদ্ সম্বন্ধে হপ্‌কিন্সের মত—"Is there anything in the early Upanishads to show that the authors believed in the objective world being an illusion? Nothing at all." কিন্তু উপনিষদ্ বিচার করতে হলে সমগ্র উপনিষদ্ অর্থাৎ ঔপনিষদিক যুগ নিয়ে বিচার করতে হবে, কারণ উপনিষদ্ ত কোন ব্যক্তি-বিশেষের লেখা একখানি বই নয়। আর দেখাও যায় উপনিষদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন মত সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্তই যেন আদেশের মত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের মতানুকূল উপনিষদগুলিকে প্রাচীন ও মুখ্য বলে গেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ঋষির উপলব্ধির কথা গ্রথিত আছে। কাজে কাজেই এমন একটা দর্শন চাই যাতে ঔপনিষদিক সর্ববিধ অনুভূতিরই যুক্তিযুক্ত স্থান থাকে—যেন পূর্ব মীমাংসকদের মত জ্ঞান-কাণ্ডকে অর্থবাদ বলে, দ্বৈতদার্শনিকদের মত "নিগু'ণ ব্রহ্মের" "নিগু'ণ" পদটির অর্থ "নিরস্ত-সমস্ত-অকল্যাণ-গুণ" ক'রে উড়িয়ে দিতে না হয়। সমন্বয় করতে গিয়ে এ কথা যেন বলতে না হয় যে, স্বরূপ স্বয়ং জ্যোতিঃ অপেক্ষা তাঁর কোন সোপাধিক প্রকাশ শ্রেষ্ঠ। মায়াকে বাদ দিলে চলবে না, কারণ মায়া শব্দটি ও তার অর্থও বেদের নানাস্থানে প্রকাশিত অথবা আত্মগোপন ক'রে আছে, এ পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি।

সত্যের তরতম॥ ভারতীয় অদ্বয় ব্রহ্মবাদীদের কেহই ব্রহ্মের স্বরূপে তরতম স্বীকার করেন না। সসীম বুদ্ধিতেই সত্যের তরতম আছে, যার দ্বারা ব্রহ্ম বহুরূপে বিশেষিত হন। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ঐরূপ ঔপাধিক জ্ঞানের কোন চরম সার্থকতা নেই। এইজন্য ব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাঁকে পরিমাপ করবার কোন দাঁড়িপাল্লা নেই। বোদ্ধাত্মার কাছে কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। এই ব্যবহারিক জগতে এই পরিমাপের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করলে আমরা সত্য পথে যে প্রগতিশীল তা কি ক'রে বোঝা যাবে? ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" (১।১।১) সূত্রে শ্রীশংকরের শারীরক ভাষ্যে পূর্বপক্ষে একটা উভয় সঙ্কট (dilema) সৃষ্টি হয়েছে—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যদি আত্মা হয়, তা হলে এই আত্মা জ্ঞাত না অজ্ঞাত? আত্মা ত আমরা সকলেই জানি, (কারণ 'আমি আমাকে জানি না'—এ কথা তো হতে পারে না), তা হলে আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর যদি আত্মা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (unknown and un-knowable) পদার্থ হয়, তা হলে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রেই বা কি হবে? আর সে সম্বন্ধে প্রশ্নই বা কি উঠতে পারে? অর্থাৎ যা জীবের জ্ঞান-ভূমিতে নেই, তার সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাসা কি করে উঠতে পারে? তাতে শ্রীমদাচার্যপাদ উত্তর দিলেন,—একেবারে যা অজ্ঞাত বা যা সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞাত তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা সমাধান হয় না। যে বস্তু সম্বন্ধে সামান্যতঃ জ্ঞান আছে, পরন্তু বিশেষরূপে অজ্ঞান আছে, সেখানেই সংশয় ওঠে, সেখানেই জিজ্ঞাসা হয়। আত্মা সম্বন্ধে একটা

সাধারণ জ্ঞান সর্বপ্রাণীরই দেখা যায়, কিন্তু ঐ আত্মা স্বরূপতঃ যা তার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা তরতম মত ; অতএব তার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে জিজ্ঞাসা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলছেন, "The theory of the world-illusion is inconsistent with the conception of degrees of reality." অর্থাৎ পরিণমিত কার্যেই তরতম সম্ভব, পরন্তু ভ্রান্তিতে তরতমের কথাই ওঠে না। কিন্তু আমরা বলি, ভ্রান্তি বা অজ্ঞান হেতুই ত সর্বব্যাপী পূর্ণ সচ্চিদানন্দকে আমরা উপলব্ধি না করতে পেরে বহুরূপে তাঁকেই দেখছি, এই অজ্ঞানের তরতমতেই ত আপেক্ষিক জগতে যত রকম—সমষ্টি-ব্যষ্টি, অণু-পরমাণু, অপঞ্চীকৃত তন্মাত্র প্রভৃতি। ভ্রান্তি-দর্শনই ত জগতের যা যথার্থ স্বরূপ, যার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় তা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না ; অজ্ঞানের তরতমই ত জাগতিক আপেক্ষিক সত্যের উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ক্রমবিকাশ, ক্রমসংকোচ, কার্যকারণসম্বন্ধ-নির্ণয় প্রভৃতি সৃষ্টি করছে। ঘট, মৃত্তিকা, পরমাণু, তন্মাত্র এক চরম সত্যের উপরই অজ্ঞানের পরিণাম। দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ অজ্ঞান-চশমার স্বচ্ছতা যত বাড়ছে তত চরম সত্য যা কূটস্থ নির্বিকার ভূমা তার অধিকতর সামীপ্যের সহিত আমাদের বুদ্ধির তাদাত্ম্য ঘটছে। মেঘ চক্ষুকে আবৃত করে, বালক মনে করে মেঘ সমগ্র সূর্যকে ঢেকেছে ; মেঘের স্বচ্ছতার সহিত সূর্যও ক্রমে প্রকাশিত হন, চক্ষু মেঘমুক্ত হলে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য যেন প্রকাশিত হলেন বলে বোধ হয়—স্বরূপতঃ সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, অজ্ঞানেরই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অজ্ঞানই এক বস্তুকে বহুরূপে প্রকাশ করে ; যেমন একই অঙ্গারকে অজ্ঞানের বিভিন্ন পরিবেশে হীরক ও গ্রাফাইটিস্ বলে বোধ হয়, একই রজ্জুকে দণ্ড, সর্প, জলধারা, ভূ-ছিদ্র বা মাল্য বলে বোধ হয়, একই স্থাণুকে চোর, পুলিস, প্রণয়ী, প্রণয়িনী, গো ও গোপ বলে বোধ হয় ; এবং যখন সেটা বোধ হয়, তখন সেটা ভ্রান্তি বলে বোধ হয় না,—ভ্রান্ত বিল্বমঙ্গল সর্পকে দড়ি ভেবেই ধরে, শবকে ভেলা ভেবেই আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ একই অচঞ্চল সত্তাকে বিভিন্ন বিকার বলে গ্রহণ করে। এই অজ্ঞান-হেতুই, "The different kinds of being are higher and lower manifestations of the one Absolute Spirit." (বিভিন্ন সত্তাবিকাশ হচ্ছে এক নির্বিশেষ আত্মারই উচ্চাবচ অভিব্যক্তি)।

প্রত্যেক সসীম প্রতীয়মানতার অবষ্টম্ভ হচ্ছে সেই সর্বাতীত। স্বচ্ছতা বা ঘনতা ব্রহ্ম-মায়ারই পরিণাম, ব্রহ্মের নয়। এই ব্রহ্মশক্তির স্বচ্ছতা-ঘনতার উপরই উচ্চনীচ প্রাণের অভিব্যক্তি ঘটে। বিশিষ্ট অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে যখন বস্তুগ্রহ হয় তখন সেটি সত্য বলে বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞান নাশ হলে, "ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদম্ জগৎ।" (বিবেক চূঃ ৪৮৫)।

শুক্তির জ্ঞান হলে রজত-রূপ অজ্ঞানটি ক গতম্—রজতটি কি শুক্তির পাশে পড়ে থাকে? না একেবারে রজতরূপ অজ্ঞানটি বাধিত হয়—শুক্তি ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হয় না? অতএব ব্রহ্মে অজ্ঞান-হেতু দ্বৈতাপত্তির ভয় থাকে না। ব্রহ্মগ্রহ হলে অজ্ঞান পরিণাম—evolution, involution, transition, becoming, modes, mutation প্রভৃতি বিকার অশেষতঃ বাধিত হয়, সে সবের ফলগুলি আর অন্য দেশে অবস্থান করে না। ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর কিছুই নেই, তখন পূর্ণ জ্ঞানে দেশের সসীমতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, অনাদি অনন্ত জ্ঞানের যখন আবির্ভাব তিরোভাব নেই তখন তাতে তার কালিক দিকই বা থাকে কি করে? অতএব বেদ যে আত্মার অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তির কথা বলেছেন, সেটা অজ্ঞানী বা চিদাভাসের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি,—শুদ্ধাত্মার নয়। অজ্ঞানরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপ-

দর্পণটি অপসারিত হলেই এক চিৎসূর্যই বর্তমান থাকেন, কিন্তু যতদিন দর্পণের (অজ্ঞানের) ভেতর দিয়ে চিদাভাসই আত্মা বলে গৃহীত হয় ততদিন আত্মপ্রকাশের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। যতদিন আমরা এই চিদাভাসকে আত্মা বলে গ্রহণ করব ততদিন কার্ল মার্কসের কথাই ঠিক,—জড়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়া মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটছে। কারণ দর্পণরূপ অজ্ঞান বা জড় বা matter-এর স্থূলতা বা সূক্ষ্মতার উপরই প্রতিবিম্বের অর্থাৎ চিদাভাসের ঊর্ধ্ব-অধোগতি বা সঙ্কোচ-বিকাশ নির্ভর করে। তখন বলা চলে "There is a richer revelation of reality in organised life than in brute matter, more in human society than in organised life." তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে আনন্দের পরিমাপ (২।৮) সেটা ঐ চিদাভাসেরই, শুদ্ধাত্মার নয়। আবার ঐতরেয় আরণ্যকেও যে আত্মার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পড়া যায় (২।৩।১-৫) তাও চিদাভাসেরই। যথা,—"যারা নিজের ভেতর আত্মার ক্রমবৃদ্ধি জানতে পারে, তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবীতে ওষধি, বৃক্ষ ও পশু রয়েছে, সেই আত্মাই তাদের ভেতর দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন। ওষধি ও বৃক্ষে কেবল রসের ক্রিয়াই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু চিত্ত কেবল চিন্তাশীল প্রাণীতেই বুঝতে পারা যায়। আবার চিন্তাশীল প্রাণীতেও ঐ ভাবনার বিবৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় যাকে আমরা বলি জ্ঞান। সে যা জেনেছে তা বলতে পারে, যা জেনেছে তা আবার দেখে চিনতে পারে, কাল যা ঘটবে তা সে বলতে পারে, সে দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগৎ অনুভব করতে পারে। সে অনিত্য দেহের অবলম্বনে নিত্যকে পেতে চায়- এই হলো চিন্তাজগতের স্ফূর্তি। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষুৎপিপাসার জ্ঞান আছে। কিন্তু তারা যা জেনেছে তা বলতে পারে না; অথবা যা জেনেছে তা আবার সব চিন্তে পারে না, তারা এখন যা ঘটছে তাও বুঝতে পারে না, কাল কি ঘটবে তাও জানে না এবং দৃশ্য জগতের সর্ববিধ প্রত্যক্ষ এবং অদৃশ্য জগতের অনুমানও করতে পারে না। তাদের গতি এই পর্যন্ত।" ঐতরেয় উপনিষদে (৩।১।৩) চতুর্বিধ জঙ্গম (organic) প্রাণীর কথা আছে—"অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ।" এ কথা মনুতেও আছে (১।৪৩-৪৬)। ছান্দোগ্যে (৬।৩।১) মাত্র ত্রিবিধ প্রাণীর কথা বলেছেন, অণ্ডজ, জীবজ উদ্ভিজ্জ। অ্যারিষ্টটল ভাগ করেছেন তিন প্রকার—উদ্ভিজ্জ, পশু ও মানুষ। লাইবনিট্জের মতও তাই। কিন্তু এসবই চিদাভাসের বিভিন্ন ব্যবহারিক হ্রাসবৃদ্ধি—বিশুদ্ধাত্মার নয়।

সূক্ষ্মভূত বা দৃশ্যোপাদান॥ এইভাবে উপনিষদের ক্রমবিকাশের পথে মানবের আত্মপ্রকাশের জন্য সাতটি স্তর স্বীকার করা হয়েছে—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্। এর মধ্যে পৃথিবী ভূঃ সর্বনিম্নে। ঋগ্বেদে গ্রীক্ প্রাথমিক দার্শনিকদের মতো (Thales প্রভৃতির মতবাদ দ্রষ্টব্য) জগতের উপাদানকে জল বলা হয়েছে—(ঋ বে ১০।১২৯)। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে তেজঃ অপ্ অন্নের কথা বলেছেন (৬।৪) এবং প্রশ্ন উপনিষদে পঞ্চ স্থূল ভূত এবং তার উপাদান পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলেছেন—পৃথিবী এবং পৃথিবী-মাত্রা, অপঃ এবং অপোমাত্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, বায়ু এবং বায়ু-মাত্রা, আকাশ এবং আকাশমাত্রা। স্থূল ভূত দ্বারা বাহ্যদৃশ্য নির্মিত এবং তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত এবং পঞ্চপ্রাণ এই উনিশটি অবয়ববিশিষ্ট কর্তা ও করণরূপ অন্তর্জগৎ নির্মিত—(প্রশ্ন উ—৪।৮)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু হতে তেজ, তেজ হতে অপ, অপ হতে পৃথিবী, পৃথিবী হতে ওষধি, ওষধি হতে অন্ন এবং অন্ন হতে পুরুষ

শরীর (তৈঃ উঃ ২।১।৩)। কারণের ধর্ম কার্যে বর্তমান থাকে এবং কার্যে একটি বিশিষ্ট ধর্ম প্রকাশ পায়, এই নিয়মে আকাশের ধর্ম শব্দ, বায়ুর ধর্ম শব্দ ও স্পর্শ, তেজের ধর্ম শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের ধর্ম শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর ধর্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ।

[বিঃ দ্রঃ—এখানে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখা দরকার। বেদান্তের পঞ্চতন্মাত্র—সাধারণতঃ লোকে যাকে পঞ্চ স্থূলভূত বলে তা নয়,—পরন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্য জগৎ আমরা যে ভাবে প্রাপ্ত হই। এই জন্য কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিককে বেদান্তীদের ভয় করবার নেই। কারণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে যে আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাই তার অতিরিক্ত জ্ঞানে কোন বৈজ্ঞানিকই তাঁর যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিয়ে যেতে কোন কালেও পারবেন না। বিশ্বের নিরপেক্ষ স্বরূপ কখনও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ দ্বারা জানা যাবে না; এই বিশ্ব যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির গ্রাহ্য তাই হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত বা তান্মাত্রিক জগৎ—যেটা সাধারণ লোকে বলে দ্রষ্টা হতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পাঁচটি মিশ্র এবং দৃশ্য ভূত, যে ভাবে অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িকাদি ও গ্রীসদেশীয় প্রাথমিক দার্শনিকেরা প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের প্রকরণ-সাহিত্যে পঞ্চীকরণ-সম্বন্ধে বড় বড় গ্রন্থ আছে। সে সব তথ্য খাস্ উপনিষদ্ আলোচনা কালে নিষ্প্রয়োজন।]

কাঠির মেয়ে

(কাঠিয়াওয়াড়ের প্রাচীন উপাখ্যান)

স্বামী জপানন্দ

সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে, পথিকদের যেন বলছে—শীঘ্র সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নাও, আর আমি বেশীক্ষণ নাই। অজানা পথের যাত্রীরা উদ্বেগচিত্তে—কতদূর ওগো কতদূর গ্রাম?—বার বার জিজ্ঞাসা করছে গোপালদের আর কর্ষণে রত কৃষকদের এবং চলছে দ্রুত পদক্ষেপে। এমনি উদ্বিগ্নচিত্তে বারংবার জিজ্ঞাসা করছিল পথের কথা আর গ্রামের দূরত্ব কতকগুলি অশ্বারোহী পাঞ্চাল-দেশের এক পাহাড়ী অঞ্চলে, তাদের সঙ্গে গো-যানে ছিল কোন কাঠিদরবারের মেয়ে।

অনেকদিনের কথা এ, তখন সন্ধ্যার পর পথে চলা ছিল বিপজ্জনক। অস্ত্রশস্ত্র সদা কাছে রাখতে হতো এবং হুশিয়ার হয়ে চলাফেরা করতে হতো। তখন বাহন ছিল ঘোড়া, উট, গরুর গাড়ী বা ঐরূপ কিছু। রেলগাড়ী, মোটার গাড়ী ইত্যাদির জন্মও তখন হয় নাই। তখন লোকে মৃত্যুকে ভয় করতো না। কারণ বাহুতে ছিল বল আর হৃদয়ে ছিল সাহস। তখন চমৎকার অন্নচিন্তা ক্রূর রূপ ধারণ করে দিবারাত্র সন্ত্রাসিত করতো না, তাই অন্নাভাবে দেহ অপুষ্ট ছিল না। এবং অভাবের বোধ ছিল কম, তাই অভিযোগও বিরল ছিল; তখন মাতৃগণ বীরপ্রসবিণী ছিলেন। এখনকার মত কুক্কুরের ডাকে দরজা বন্ধ করতেন না। মেয়েরা তখন পরদার আড়ালে থাকলেও কেবল লজ্জাবতী লতার মত হয়ে যান নাই, আবশ্যক হ'লে রুদ্রাণী চণ্ডিকা হয়ে শত্রুর প্রাণসংহার করতে পারতেন দক্ষতার সহিত। এ কথা হচ্ছে সেই যুগের একদিনের।

পাঞ্চাল দেশের পাহাড়ী মুলুকের রাস্তা দিয়ে শকট-বাহনে বসে এক কাঠির মেয়ে বাপের বাড়ীর মমতা ত্যাগ ক'রে যাচ্ছিল স্বামিগৃহে। গাড়ীতে পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল—যাতে যুবতী মেয়ের রূপলাবণ্যে কোন পুরুষের কলুষ দৃষ্টি পতিত না হয়। এবং তার দেহরক্ষক হয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন শস্ত্রধারী অশ্বারোহী। তার স্বামী ছিল একটি

গণ্ডগ্রামের অধিপতি বা দরবার, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাই স্বভাবতঃ তেজস্বী ও নির্ভীক। চারিদিকে গভীর জঙ্গল ও পাহাড় তার গ্রামটিকে সুরক্ষিত রেখেছিল। বিশেষ সম্পত্তির মধ্যে ছিল—ভাল ভাল গরু, আর ঘড়াভরে দুধ দেয় এমন সব ছোট ছোট হাতীর মত মোষ। প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, দই আর বাজরার মোটা মোটা রুটি এবং কর্ম ছিল—গোচারণ, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর অস্ত্র চালনার অভ্যাস। লেখা পড়া জানতো না বটে, কিন্তু তা বলে নিতান্ত বোকা ছিল না। তার নিজ ইষ্ট অনিষ্ট বা স্বার্থের বিষয় বেশ বুঝতো। দিনরাতের অধিকাংশ সময় তার কাটত মাঠে ঘাটে, বনে জঙ্গলে, স্বল্প গৃহ ও গৃহিণীর সম্পর্ক থাকতো খুবই কম। দেহ ছিল বজ্রের ন্যায় কঠিন, কিন্তু স্বভাব ছিল উদার, প্রেমালু। সত্য তো অধিকাংশ কাঠির জীবন এর মতই ঘরের বাহিরে প্রকৃতির ধুপ-ছায়া, বর্ষাবাদলের ক্রীড়ার মধ্যে সমানভাবে অতিবাহিত হতো, এবং তাই ধনিকবর্গের মত কবিত্বময় "তুই কথা ক', মুই কথা কই"—প্রেমলীলার অভিনয় এদের জীবনে বিরল হতো। তা ব'লে জীবনের আনন্দ যে তাদের ছিল না, তা নয়, আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল সে আনন্দ!

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, বড় বড় গুর্জর-দেশীয় বলদ হলেও পাহাড়ী পাথরের রাস্তায় গাড়ীর গতি প্রায় কচ্ছপের মত টিমে হচ্ছিল। গন্তব্যস্থল তখনও দূরে শুনে আরোহিণী ও লোকেরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লো। ঐ চিন্তার কারণ,—তারা তখনও এক দুর্দান্ত মুসলীম সর্দারের এলাকার মধ্যে রয়েছে—যে কাঠিকুলের ছিল পরমশত্রু এবং যুবতী মেয়েদের ভয়ানক দুশমন্। ঐ চিন্তায় মৃত্যু-ভয় ছিল না,—ছিল মাত্র কাঠির মেয়ের ধর্মরক্ষার প্রশ্ন।···

ক্যাঁ কোঁচ্, ক্যাঁ কোঁচ্ করতে করতে চলছিল গাড়ী মন্থর গতিতে। যাত্রীর মনে ঐ শব্দ গন্তব্যের দূরত্ব সূচিত করে উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।··· ক্যাঁ কোঁচ, ক্যাঁ কোঁচ······জঙ্গল-পথ দিয়ে কতক-গুলি দৃঢ়কায় অশ্বারোহী এসে গাড়ী ঘিরে ফেল্লে—"এই গাড়ী রোকো, সর্দারের হুকুম!····· তাঁর আতিথ্য-গ্রহণ না করে তাঁর এলাকা দিয়ে কেহ যেতে পারে না। এ কথা কী জানা নেই? বিশেষ দরবারী লোক!···"

যে ভয় ক'রছিলো তাই সামনে উপস্থিত হয়েছে দেখে কাঠিরা জীবনান্ত যুঝে নেবার জন্য প্রস্তুত হলো। অবস্থা বড় সুবিধার নয় বুঝে বুদ্ধিমতী কাঠিকন্যা পর্দার আড়াল থেকে বললে—"বড় আপ্যায়িত হলাম সর্দারের সৌজন্যের কথা শুনে, কিন্তু আমি হচ্ছি দরবারের মেয়ে, তিনি স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ না-ক'রলে তাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রতে পারি না! ··এই চালাও"···"সর্দারের হুকুম আনতে লোক পাঠাচ্ছি, ততক্ষণ অনুগ্রহ করে গাড়ী রুকুন!···"

দুষ্টদের রক্তপান করবার জন্য কাঠিদের হাতের অস্ত্র নাচছিল, বিরোধ বুঝে ঘোড়াগুলো স্থির থাকতে পারছিল না—হ্রেষা-রবে দিগন্ত ধ্বনিত ক'রছিলো। অবিলম্বে দেখা গেল আরো কয়েকজন অশ্বারোহী আসছে সঙ্গে চোপদাড়ীওয়ালা সর্দার। এখন উপায়?···

"হে জগদম্বে লজ্জা রাখো!"

সর্দার আসতেই কাঠিকন্যা বল্লে,—'সর্দার, আপনার সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হলাম, তবে আজ আর এই সন্ধ্যা-বেলায় আপনার আতিথ্য স্বীকার ক'রতে পারবো না, তবে অন্য কোন দিন ঈশ্বরেচ্ছা হলে দেখবো। আজ যেতে দিন!···

"তাও কী হয় সুন্দরী! আমার ব্রত ভঙ্গ হবে যে!"—বললে সর্দার।

"আমিও বিশেষ ব্রত নিয়ে যাচ্ছি, তাই ত বলছি আজ নয়, অন্যদিন আসব!"···মনে মনে

ভাবছিল—কাঠিদের একত্র করে এই দুষ্টের দমন করবার কথা।

"এমন কী ব্রত নিয়েছ যে, আমার আতিথ্য গ্রহণ করবার একটুও সময় নাই? তোমাদের গ্রাম তো আর বেশীদূর নাই, অল্প সময়ের জন্যও চল না, আমি অতিথি-সৎকার করে ধন্য হই।"

এই মিষ্টি কথার আড়ালে কী ভয়ানক মতলব ছিল তার স্বভাব প্রকৃতি জানা থাকায় বুঝতে বিলম্ব হলো না। ভাবছিলো কি জবাব দিবে। এমন সময় দেখতে পেলে অন্য একদল কাঠি অশ্বারোহী সামনের দিক্ হতে আসছে। সঙ্গীকাঠিদের ঘোড়া-গুলো হ্রেষারব করে পরিচিতের আগমনের সংবাদ দিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় হলেও গ্রামে না পহুঁছানয় তার স্বামীই লোকজন নিয়ে আসছেন বুঝতে পেরে কাঠির মেয়ে সাহস অবলম্বন করে বললে—"হাঁ, নিশ্চয়ই! তবে আপনার লোকদের একটু সরিয়ে দিন্ আর অনুগ্রহ ক'রে আরো একটু নিকটে সরে আসুন, বলছি সে ব্রত কী?"—এই বলে গাড়ীর পর্দা একটু সরালে যাতে সর্দার তাকে দেখতে পায়। সর্দার তার রূপ দেখে হুঁশ হারিয়ে ঘোড়া নিয়ে গেল একেবারে কাছে। যেমন যাওয়া আর মূর্তচণ্ডিকা হ'য়ে তড়িৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠে অসির একঘায়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেল্লে মুণ্ড তার!...... সঙ্গে সঙ্গে সাথীরা প্রচণ্ড আক্রমণ করলে সর্দারের লোকদের উপর, ওদিক্ থেকে সেই কাঠির দলও এসে পড়লো, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে 'চাচা আপন বাঁচা' বলে প্রাণ নিয়ে পালাল তারা। তার স্বামী যখন শুনলে কেমন যুক্তি করে মেরেছে সে দুষ্ট সর্দারকে এবং নিজ ধর্মরক্ষা করেছে, খুব খুশী হলো এবং বল্লে—"ধন্য কাঠিয়ানী! সকল কাঠিকন্যাদের আশীর্বাদ তুমি পাবে। স্ত্রীজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের জন্য তাকে সমুচিত দণ্ড দিয়ে আজ অমর কীর্তি রাখলে।" ......

সবাই ধন্যধন্য বলতে লাগলো, আর মেয়েরা বললে—"ধন্য কাঠির মেয়ে।"

ভোগ ও ত্যাগ

(গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার আলোকে)

শ্রীদেবেন্দ্রদাস চৌধুরী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সনাতন ধর্মের মর্মবাণী। গীতা বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সকল দেশের মনীষিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইতেছে। যেই পরিমাণে গীতার নীতি মানবজীবনে প্রতিফলিত হইতেছে সেই পরিমাণেই উহার সার্থকতা, কারণ গীতার নীতি গীতাতে নিবদ্ধ থাকিলে সাধারণ মানব উহার মর্মার্থ বুঝিবে না। উহা কোন মহাপুরুষের জীবনে বাস্তব হইয়া উঠিলেই সাধারণ মানব ঐ নীতির সাধনা করিয়া নিজ জীবনে উহা বাস্তব করিতে চেষ্টা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে গীতার নীতিগুলি পূর্ণভাবে রূপায়িত হইয়াছে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণজীবন গীতার জীবন্ত ভাষ্য বলা যাইতে পারে।

ঠাকুর বলিয়াছেন—"গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার 'গীতা' 'গীতা' বল্লে যা হয় তাই গীতার সার, অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত)

তিনি নিজ জীবনে কিরূপে এই কথা সার্থক

করিয়াছিলেন আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখিব। গীতা বলিয়াছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

অর্থ:—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পরের সংযোগে যে ভোগ তাহারা দুঃখের কারণ। শুধু তাহা নহে তাহারা ক্ষণস্থায়ী: যেহেতু তাহাদের আদিও আছে, অন্তও আছে। তাই জ্ঞানী (বিবেকী) এই সমস্ত বিষয়ভোগে প্রীতিলাভ করেন না, কারণ তিনি ভোগের অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং নিত্যব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন।

সংস্পর্শজা ভোগা—অর্থাৎ বিষয়জনিত সুখ। সাধের পুত্রমুখ দর্শন হইল; খুব সুখ, খুব আনন্দ, খুব রোসনাই করিলে। পুত্র বড় হইল, কিন্তু গোঁয়ার-গোবিন্দ হইল। কথায় কথায় অবাধ্য, কিছু বলিলে ঘুঁষি দেখায়, মদ খায়, কুক্রিয়াসক্ত; পিতা-মাতার চোখের জলে বুক ভাসে, পুত্রলাভের আনন্দ কোথায় গেল? আর সৎপুত্র হইলেও, ধর, হঠাৎ তার মৃত্যু হইল। শোকের রোল উঠিল। এই যে পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দ—ইহার অন্ত কোথায়?—দুঃখে, (দুঃখযোনয়ঃ এব তে)। জিহ্বার লোভে মত্ত হইয়া ভূরিভোজন করিলে—ক্ষণিক সুখ পাইলে, দু'দণ্ড না যাইতে ভেদ বমন আরম্ভ হইল। চীৎকারে লোক জড় হইল। অজস্র অর্থব্যয়ে কোনপ্রকারে রক্ষা পাইলে—(দুঃখযোনয়ঃ এব তে); কত না সাধে সুন্দরী ভার্যা ঘরে আনিলে, সুখের সংসার পাতিলে—কিন্তু কর্মফলে অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী আসিল; কথায় কথায় বিবাদ, সে রাতদিন বলে—"কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে? এমন লোকের হাতে পড়েছি, একদিনের জন্য সুখ হলো না"—তাহার গঞ্জনায় সোনার সংসার বিষময় হইল, জ্বালায় জ্বলিয়া আত্মহত্যার কল্পনা করিলে,—এরই নাম বিষয়সুখ। এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। এই সুখ আপাততঃ মধুর হইলেও পরিণামে ভয়ানক দুঃখদায়ক। তাই জ্ঞানিগণ এই সুখে মজিয়া থাকেন না, বিচার করিয়া এই অসার সুখভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হন এবং ক্রমে পরমা শান্তির অধিকারী হন।

বিবেকিগণ কিরূপে বিচার করিয়া সংসারের অসার সুখভোগ ত্যাগ করেন তৎসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

"কামনা থাকৃতে, ভোগবাসনা থাকৃতে মুক্তি নাই,—সঙ্গে সঙ্গে বিচার খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। টাকায় কি হয়?—ডাল-ভাত হয়, কাপড় হয়, এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা এই জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার, বস্তু-বিচার। এই দেখ টাকাতেই কি আছে, আর সুন্দর দেহেতেই বা কি আছে! বিচার কর—সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বী, মল, মূত্র, এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?" (কথামৃত)

এইরূপে বিচার করিয়া ঠাকুর তাঁহার সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ভোগ যে দুঃখদায়ক এবং অসার তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন—শুধু তাহাই নয়, তাঁহার আদরিণী শ্যামা মা তাঁকে সাক্ষাৎ দেখাইয়াও দিয়াছিলেন। যথা:—

"আমি বেলতলায় ধ্যান করতে করতে প্রত্যক্ষ দেখলাম—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দু'জন মেয়েমানুষ—তাদের একজনের ফাঁদি নৎ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—মন তুই এই সব কিছু ভোগ করতে চাস? সন্দেশ দেখলাম গু, মেয়েদের ভিতর-বার সব দেখতে পাচ্ছি—যেমন কাঁচের ঘরে সব জিনিস বার থেকে দেখা যায়। নাড়ীভুঁড়ি, বিষ্ঠা, মূত্র, হাড়, মাংস, ক্রিমি, কফ, নাল, এই সব মন কিছুই চাইলে না। তাঁর পাদপদ্মে মন রইল।" (কথামৃত)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—সংসার ভোগের স্থান, এক একটি জিনিস ভোগ ক'রে ত্যাগ করতে হয়। ভোগলালসা থাকা ভাল নয়। "আমি ত্যাগ করবার জন্য রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম।"

"সাধ হয়েছিল খুব ভাল সাচ্চা জরির পোষাক পরবো। আঙটি আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজো বাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে। সাচ্চা জরির পোষাক পরলাম—খানিকক্ষণ পরে মনকে বল্লাম; মন,- এর নাম জরির পোষাক, এই সাজে রজোগুণ হয়। তখন ওগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম, পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম। আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম। মনকে বল্লাম এর নাম শাল, আর এরই নাম আঙটি। গুড়গুড়ি নানারকমে টানতে লাগলাম। একবার এ পাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, উঁচু থেকে, নীচু থেকে। তখন বল্লাম—মন এরই নাম নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হ'য়ে গেল। সেই যে সব ফেলে দিলাম, আর মনে উঠে নাই। বড়বাজারের রং করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিয়ে দিলে- খুব খেলাম,—তারপর অসুখ।"

এই ত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীমুখে বলেছেন—"আমি তিন ত্যাগ করেছিলুম—জমিন, জরু, টাকা। এই তিনটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না।"

মথুরনাথ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ ঠাকুরের সেবাযত্ন করিবে না—এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবর্তমানে ঠাকুরের সেবার জন্য কতক জমি ঠাকুরের নামে লেখাপড়া করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"দেখো, অমন বুদ্ধি করো না, ওতে আমার ভারি হানি হবে।" এই বলিয়া জমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী ভবিষ্যতে ঠাকুরের সেবার জন্য দশ হাজার টাকা লিখিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাব শুনিবামাত্র ঠাকুর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—তখন তিনি বলিলেন—"তুমি যদি ওরূপ কথা বল তা হ'লে এখানে আর এসো না।"

ঠাকুর ছিলেন কামজিৎ। মথুরনাথ তাঁহাকে বেশ্যা আনিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের দেহ লাগিলে তাঁহার শরীর ঝন্‌ঝন্ করিত। স্ত্রীমূর্তি-দর্শনে জগদম্বার উদ্দীপন হইত। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও যিনি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন—তাঁহার কামিনী-ত্যাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই জাগিতে পারে না।

(ক) ভোগ

ঠাকুর বলিয়াছেন:—"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্লে, যে দিকে চিল মাছ মুখে যায় সেদিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ প'ড়ে গেল তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না। মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু, কাকগুলো ভাবনা-চিন্তা। যেখানেই ভোগ সেখানেই ভাবনা-চিন্তা।" (কথামৃত)

"আবার দেখ—অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্‌সে নিয়ে বেশ গোল হয়। কুকুর গা চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব, কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দু'টো ফেলে দেয়—তা হ'লে পরস্পর কামড়া-কামড়ি করবে।" (কথামৃত)

এই ভোগের সমস্ত অনর্থের মূল কোথায়? ইহার মূল—বাসনা-কামনা। এই কামনা-বাসনাই

আমাদের শরীর ধারণের কারণ। শরীর ধারণ করলেই নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ। ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আবার শাপ হ'লো ত সাত জন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ। একটু বাসনা থাকলেই আসতে হয় ফিরে ফিরে আসতে হয়, সব বাসনা গেলে মুক্তি।"

(কথামৃত)

আমাদের দুর্বল মনে প্রতিক্ষণে কত বাসনার উদয় হয় সংখ্যা দেওয়া কঠিন এবং বাসনা জন্মিলেই উহা পূর্ণ হইবে। কারণ ভগবান কল্পতরু। আমরা যে বাসনাই করি তিনি তাহা পূর্ণ করেন। এজন্মে না হউক পর জন্মে, পরজন্মে না হউক তার পর জন্মে এবং এইরূপ এক একটি বাসনা পূর্ণ করিতে গিয়া বহু বাসনার সৃষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে' গল্পটি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ।

এক সাধুর আশ্রমে ইঁদুরের উৎপাত ছিল, তাঁর কৌপীনগুলি ইঁদুরে কাটিত ; এই ইঁদুরের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধুর বিড়াল পুষিবার বাসনা জন্মিল। বিড়াল আসিল। বিড়ালের জন্য দুধের প্রয়োজন। তাই গাভীর বাসনা আসিল। গাভী আসিল। এখন গাভী রক্ষা করে কে ? লোকের দরকার। এই ভাবে তিনি সংসারে জড়াইয়া পড়িলেন।

অপর একটি গল্প। এক পথিক শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। পথিক জানিত না যে উহা কল্পবৃক্ষ। ঐ বৃক্ষতলে বসিলে যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায়। তৃষ্ণার্ত পথিক ভাবিল, আহা যদি একটি ডাব পাইতাম। দেখিতে দেখিতে ডাব আসিল। কিন্তু খাই কি ক'রে ? যদি একটি দা পাইতাম ! দা আসিল। পথিক ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ভাবিল—যদি একটি বিছানা পাইতাম। বিছানা আসিল, পথিক শয়ন করিয়া ভাবিল—যদি একটি স্ত্রীলোক আসিয়া পদসেবা করিত। দেখিতে দেখিতে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া পদসেবা আরম্ভ করিল। তখন পথিক বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কি ভৌতিক ব্যাপার ? এই স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই ভূত। যেমন-ভাব তেমন লাভ। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অলীক বাসনাবশে আমরা যে নিত্য কত ভোগে জড়াইয়া পড়িতেছি, কত ভূতের বোঝা বহিতেছি নির্ণয় করা কঠিন।

ঠাকুর বলিয়াছেন—"সংসারী লোকের পূজা, জপ, তপ, দানাদি কর্ম প্রায় সকাম হ'য়ে থাকে। সে ভাল নয়। যে কার্যে কামনা আছে, সেই কার্য কল্লেই ফল পেতে হবে। একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না।"

(কথামৃত)

পরকালে স্বর্গ-কামনা করিয়া আমরা পূজাদি করিয়া থাকি। কিন্তু স্বর্গ-কামনাও কামনা। উহা সোনার শৃঙ্খল। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" ঐ পুণ্যের ফল শেষ হইলে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অতএব পূজা জপ, তপ, সমস্ত কিছুই ঈশ্বর প্রীত্যর্থ করা উচিত। উহাই নিষ্কাম কর্ম।

এখন বাসনা ত্যাগের উপায় কি ? ঠাকুর বলিয়াছেন—"তাঁকে যত চিন্তা করবে ততই সংসারে সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম পড়বে।" (কথামৃত)

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা বস্তু-বিচার করিতে করিতেও ক্রমে বাসনা কমিয়া আসে। যে বাসনা ঈশ্বরের পথে নেয় না, ভোগের পথে নেয় বিচার করিয়া সেই বাসনা ত্যাগ করিতে হয়। ঠাকুর কি ভাবে

বিচারের সাহায্যে সামান্য বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন উহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—ঠাকুর এক পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন—একটি পাখী জাহাজের মাস্তলে বসিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে। তথায় সে কূল ধরিবার জন্য চারিদিকে উড়িয়া দেখে কোথাও কূল-কিনারা নাই। অগত্যা নিরুপায় হইয়া সে নিশ্চিন্তে মাস্তলে বসিয়া পড়ে। এইরূপে মানুষ যখন কামিনীকাঞ্চন ভোগ করিতে করিতে রোগে, শোকে, অভাবে, অনটনে.—নানা জ্বালা ভুগিতে ভুগিতে কাতর ও নিরুপায় হয় তখন ভোগের উপর বিরক্তি আসে এবং ভোগান্তে ঈশ্বরের কৃপায় তার বৈরাগ্য আসে।

(খ) ত্যাগ

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ২।৫৯

অর্থাৎ—যিনি বিষয়-ভোগ হইতে বিরত তাঁহার বিষয়-ভোগ কমিয়া যায় কিন্তু রস অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয় না; ভগবানকে দেখিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পর ঐ ব্যক্তির বিষয়ানুরাগও নিবৃত্ত হয়।

কেহ কেহ হয়তো বিষয়-জ্বালায়.জ্বলিয়া, ঋণের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া, বিষয় ত্যাগ করিয়া গৈরিক লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি বাহিরে রঙিন কাপড় নিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে রং ধরে নাই, ফল হইবে কি? বিষয় ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়ায় বিষয়ভোগটা হয় না বটে, কিন্তু (রসবর্জং); তাঁহার বিষয়রস অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ যায় না; যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি বিষয় ভোগ করেন সমস্তই সবল থাকে, বিষয়-ভোগের বাসনা প্রখর থাকে, আবার যখন ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসেন—তখন পূর্ণভাবে বিষয়ভোগ করেন। ঠাকুর ইহার নাম মর্কট বৈরাগ্য বলিয়াছেন।

প্রশ্ন আসে—ঐ বিষয়-বাসনা যাইবে কি করিয়া? উত্তরে শ্রীভগবান গীতার এই মন্ত্রেই বলিয়াছেন—শুধু ঈশ্বরলাভের পর ঐ রসও অর্থাৎ—বিষয়বাসনাও চলিয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার বিন্দুমাত্র বিষয়-ভোগের বাসনা ছিল না। সর্বদাই তিনি ঈশ্বরানন্দে বিভোর থাকিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, এম্‌-এ

তোমার ধর্ম নহেতো জড়ের স্বপ্নবিলাস, কল্পনা,
যে দেবতা তুমি দেখনি কখনো আঁকনি তাহার আল্পনা!
জীবের মাঝারে শিবেরে দেখেছ, পেয়েছ সত্য পরিচয়,
বুঝেছিলে তাই মানুষের প্রাণ অক্ষয়—অব্যয়।
সেই মানুষেরে ঠেলিয়া যাহারা মিথ্যা কুহকে ভুলে,
বজ্রকণ্ঠে তুমি তাহাদের মুখোশ দিয়েছ খুলে।
প্রাণের ঠাকুরে দেখেছিলে তুমি শত বঞ্চিত মুখে,
তাহাদেরে তাই ভালবেসেছিলে, রেখেছিলে তুলি বুকে!

শাস্ত্র বলিতে শুষ্ক আচার যখন বুঝিত দেশ,
প্রাণধর্মের সবল আঘাতে তারে করি নিঃশেষ,—
সজীব মানুষ গ'ড়ে তুলেছিলে জ্ঞানে ও কর্মে বীর,—
ভোগে স্পৃহাহীন, ত্যাগেতে কঠিন আচরণে ধীর, স্থির!
নূতন যুগের হে মহামানব, জ্বলন্ত জ্যোতিশিখা
তোমার প্রাণের অগ্নিমন্ত্র দিকে দিকে হেরি লিখা।
সে মন্ত্রে আজ সংশয়-ভীরু জাতির চিত্তলোক,
জাগিয়া উঠুক—টুটে যাক্ তার মিথ্যার নির্মোক।

আন্দামান-ভ্রমণ

শ্রীসিতাংশুমোহন রায়

কলিকাতার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ছি, কর্মখালি কোলামে চোখে পড়তেই দেখলাম আন্দামানের শাসনকর্তা কয়েকজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর চেয়েছেন। বাড়ী এসেই একটি দরখাস্ত লিখে পোষ্টবক্সে ফেলে এলাম। তিন মাস পর চাকরি নেবার ডাক এলো। কলকাতা শহরে দুর্গাপূজার আনন্দে সকলেই আত্মহারা, মহা ধুমধাম। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস, দশমীর দিন টার্ণার মরিসন কোম্পানী থেকে একখানা টিকিট নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। বহু জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে—তারই মধ্যে জাহাজ সনাক্ত করে একখানা সেকেণ্ডক্লাস কেবিনের ভেতর আমার নির্দিষ্ট জায়গা অধিকার করে নিলাম। আমাদের জাহাজখানার নাম হল "এস্ এস্ মহারাজা।" যাত্রা শুরু হল—সারাদিন গঙ্গাবক্ষে দুপারের মনোহর দৃশ্য দেখছি আর নানান দেশের যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছি। জাহাজে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোহর দৃশ্য রোজই উপভোগ করি। এখন আমাদের উপভোগ্য জিনিস হল—রাতের চাঁদ, দিনের সূর্য, মেঘ, আকাশ ও সমুদ্রের বিচিত্র রূপ। তৃতীয় দিন সকালে বহুদূরে দিগন্তরেখার ন্যায় একটি দ্বীপ চোখে পড়ল। নাবিকের কাছে জানলাম, আন্দামান পথে প্রথমে ককোদ্বীপ পাওয়া যায়—উহাই ঐ দ্বীপ। প্রায় বেলা আড়াইটার সময় আন্দামানের পাহাড় 'স্যাড্‌ল পিক্' দেখতে পেলাম। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪ হাজার ফুট। বিকালবেলা আমাদের জাহাজ আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ার বন্দরে নঙ্গর ফেলে। এই বন্দরটি অনেকগুলি দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত। দূর হতে ঐ দ্বীপগুলির দৃশ্য অতি মনোহর। প্রত্যেক দ্বীপেই নারিকেল বৃক্ষরাজির উন্নতশিরগুলি এক একটি সাজানো বাগানের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে লাল টিনের ছাদযুক্ত বাড়ীও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

তিন দিন ক্রমাগত সমুদ্র-ভ্রমণ করার পর ৯ই অক্টোবর আবার মাটির দেশে পৌছাই। বহুলোক আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় জেটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রায় প্রতি বিশ দিন অন্তর ঐ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর ফেলে। দ্বীপবাসীদের আত্মীয়-স্বজনের বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্যে এই একমাত্র জাহাজ। সুতরাং প্রায় সকলেরই স্বার্থ জাহাজটির সঙ্গে জড়িত। জাহাজের আগমন-নির্গমনের দিন পোর্টব্লেয়ারবাসীদের সজীবতা ও

কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। কেউ নূতনকে আহ্বান করছে আবার কেউ ছুটিতে দেশে যাবার আনন্দে মত্ত। নবপরিচিত বাঙালী বন্ধুগণ আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত এক সরকারী বাড়ীতেই করে দিলেন। ভেবেছিলাম এই কুখ্যাত আন্দামানে এসে হয়তো খুব মুস্কিলেই পড়ব—কিন্তু মাটির দেশে পৌঁছেই মাটির মায়ায় পড়ে গেলাম। ভগবানের অশেষ দয়ায় সকলেই বন্ধু-ভাবাপন্ন—কোন অসুবিধা হল না আমাব। এখানে সবই কাঠের বাড়ী—অতি সাধারণভাবে তৈরী—দেখতে শিলংএর বাড়ীগুলির ন্যায় কিন্তু অত সুন্দর নয়। বর্তমানে স্বাধীন ভারত সরকার ভাল ভাল বাড়ী তৈরি করছেন। এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা আমাকে জানালেন যে, তাঁরা এই বৎসরই (১৯৪৬ সালে) প্রথম দুর্গাপূজা করেছেন বেশ ধূমধামের সঙ্গে আর এ রকম জাঁকজমকপূর্ণ পূজা তাঁরা কখনও দেখেন নি।

প্রকৃতির পরিচয়

২২৩টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের দ্বীপসংখ্যা ২০৪ আর নিকোবরের মাত্র ১৯। পরিধি (২২০০+৬৩৫) =২৮৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা বত্রিশ হাজার, তার মধ্যে নিকোবরেই ১২ হাজার। আদিম অধিবাসী যারা গভীর জঙ্গলে বাস করে তাদের সংখ্যা এই হিসাবের বহির্ভূত। ২০০টি দ্বীপেই লোকের বাস নেই—আছে কেবল ঘনবন। ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা দ্বীপগুলি—আর মাঝে মাঝে সমতল ক্ষেত্রও রয়েছে। এই সমতল-ক্ষেত্রগুলি বনবিভাগের সাহায্যে আবাদ করে সরকার উদ্বাস্তু-বসতির বন্দোবস্ত করছেন। জঙ্গলে অনেক রকম মূল্যবান্ কাঠ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোকো, পাদাউক, বম্বুই, পাইলাম্, চুগলাম্, যুঁই, গুরিয়ান্ ও মার্বেল প্রসিদ্ধ। ২২৩টি দ্বীপের কোনটিতেই হিংস্র জন্তু নেই। বনে কত সুন্দর ও বিচিত্র রঙের পাখী আছে। এখানে টিয়া পাখী প্রচুর, এরা পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে ধানের ক্ষেতে বসে ও ফসল নষ্ট করে। অনেক দ্বীপে হরিণ ও শূকর ভেড়ার পালের মতো বিচরণ করে। এই সব দ্বীপে হরিণ শিকার অতি সহজ, ফাঁদে অনেক হরিণ ও শূকর ধরা পড়ে। হরিণ শিকার এবং পিক্‌নিক্ এখানকার সৌখীনতা রক্ষার অঙ্গ। বর্ষাকালে জোঁক, সাপ ও বিছার প্রাদুর্ভাব হয়, আর গ্রীষ্মকালে এঁটুলির। সাপ ও এঁটুলির কামড় অতি ভয়ানক—ব্যথা অসহ্য, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাপের কামড়ে মৃত্যু খুব কমই শোনা যায়। অতি বৃহৎ আকারের সাপও দেখা যায়—তারা হাঁস, মুরগী, ছাগলছানা, ভেড়া প্রভৃতি আস্ত খেয়ে ফেলে। বিভিন্ন আকারের ও বিচিত্র রঙের মাছ এখানকার সমুদ্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লাল, কাল, হলদে, সবুজ, নীল কত রঙেরই যে মৎস্য! বড় বড় হাঙ্গরও বিস্তর। হাঙ্গর যদি মানুষের গন্ধ পায় তাহলে আর রক্ষা নেই তীব্রবেগে ছুটে এসে আক্রমণ করবে—প্রথম পা'টি কেটে নেবে, তারপরের অবস্থা তো বোঝাই যায়! আর একরকম মৎস্যের নাম 'সি-গাইড' (Sea-guide)—আগে আগে গিয়ে সমুদ্রে লঞ্চ প্রভৃতিকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাই এই নাম দেওয়া হয়েছে। সি-গাইডের মাথায় একটা বড় ফুটো থাকে—দেখতে এ্যারোপ্লেনের মাথার মত—অতি সুন্দর, দেখলেই ভগবানের সৃষ্টিমাহাত্ম্যের কথা মনে হয়। সি-গাইড নির্বাক প্রাণী হলেও কর্তব্যনিষ্ঠায় যেন আদর্শস্থানীয়!

আর্থিক অবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা

আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র চার হাজার এক শ' একর, এ অবশ্য ১৯৫১ সালের হিসাব। বর্তমানে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও উৎপন্ন ধান্যে মাত্র চার মাসেরই প্রয়োজন মেটে। বর্তমানে সরকারের আয় হয় ল্যাণ্ডরেভিনিউ ও রপ্তানি-শুল্ক হতে—এই আয়ের পরিমাণ আন্দামান

সরকারের ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম। অল্প আয়েই সরকার বিভিন্ন বিভাগ রক্ষা করছেন। মেরিন্, ডক, যান-বাহন, খাদ্য, বন, কৃষি, হর্টিকালচার, পুলিস, তড়িৎ, মজদুর, জেল, চিকিৎসা, মৎস্য—এই বিভাগগুলিই উল্লেখযোগ্য। সমস্ত বিভাগে সরকারের বৎসরে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্ট অফিস্, বেতার-কেন্দ্র তিনটি (সিভিল, পুলিস ও আন্তর্জাতিক), পাব্লিক ওয়ার্কস্, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে আরও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আন্দামানের ২০,০০০ লোকের শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে প্রায় দুই কোটি টাকার প্রয়োজন, সেই তুলনায় নিকোবরের জন্যে খরচা কিছুই নয়। মাত্র একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এর ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা। আন্দামানবাসীদের নানা সমস্যা অথচ ১২ হাজার নিকোরবাসীর বিশেষ কোন সমস্যাই নেই, কারণ এরা নারিকেল ও মাছ খায় আর গির্জায় ঘুমায়। ভারত-সরকার এদের জন্যে স্কুল হাসপাতাল ও নানাপ্রকার উন্নতধরণের খেলা ধূলারও ব্যবস্থা করেছেন।

ভারতীয় নির্বাসিত কয়েদী বর্তমানে আন্দামানে নেই। দণ্ডার্হ উপনিবেশ স্থাপন (পেনাল সেটেলমেণ্ট) উঠে যাওয়ায় অপরাধ, মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি অল্পই। রেভিনিউ আদায়ের পন্থা অতি সহজ। শাসন-প্রণালী জটিলতাপূর্ণ নয়—সহজ, সরল, নির্ঝঞ্ঝাট; তথাপি এখানে প্রায় ৪০ জন গেজেটেড্ অফিসার।

আদিম অধিবাসী

আন্দামানের আদিম অধিবাসী চার জাতিতে বিভক্ত। এই চার জাতির নাম জাঁড়োয়া, আন্দামানী, ওঙ্গি এবং সেন্টিনাল। তারা দেখতে খাটো, নিগ্রোর ন্যায় কালো। তাদের মাথায় কোঁক্ড়ানো পিংলা চুল—নাক চ্যাপ্টা। কেহ বলে তারা রাক্ষসরাজ রাবণের বংশধর। কিন্তু তাদের দিকে লক্ষ্য করলে কোন বিকট ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করার পর বহু রাক্ষস "সাম্পান" অর্থাৎ তাদের তৈরী নৌকার সাহায্যে সন্নিহিত বিভিন্ন দ্বীপে পলায়ন করে। এবং এখনও তারা আদিম অধিবাসী নামে গভীর জঙ্গলেই বাস করে। তাদের নির্দিষ্ট কোন বাড়ী-ঘর নেই। আন্দামানী এবং ওঙ্গিদের চেহারায় সরলতা এমনভাবে ফুটে উঠে যে দেখলে মায়া হয়। তারা সভ্যজাতির নিকট আসে—ভয় পায় না। তারা নিভয় এবং নিঃসঙ্কোচে উলঙ্গ অবস্থায় যে কোন বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাবে কিংবা যে কোন জায়গায় চলে যাবে। জাতি-ধর্মের কোন ভেদ নেই, উচ্চ-নীচ নেই। দুনিয়ার সভ্যতার ছোঁয়াচ নেই। কাহারও বাড়ীতে কিছু আশ্চর্যজনক বোধ হলে তাই স্পর্শ করবে, ঘ্রাণ নেবে, কখনও বা হয়তো বিছানা কিংবা চেয়ারে আপনমনে বসে যাবে এবং আশ্চয হয়ে ঘরের চতুর্দিকে রঙিন জিনিসের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে আবার কিছুক্ষণ পর আপনমনে বাড়ী হতে বাহিরে চলে আসবে। কেউ বিড়ি কিংবা সিগারেট দিলে খুব সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু অন্য কোন জিনিস নেবে না। সেন্টিনাল ও জাঁড়োয়া জাতি এখনও হিংস্র। সুযোগ-সুবিধা পেলেই তারা অব্যর্থ তীর দিয়ে মানুষকে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে। শুধু মানুষকে মারে—খায় না কিন্তু। তীর তাদের কাছে অতি মূল্যবান্ ও আদরের জিনিস। মৃতদেহে বিদ্ধ তীরও নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়। ইংরেজী ১৮৯৩ সালে এই আদিম চার জাতির মোট সংখ্যা অনুমান করা হয়েছিল ৩৫০০। গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা বলে এদের নির্ভুল সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে বেঁচে আছে আন্দামানী ২০, ওঙ্গি প্রায় ১০০, সেন্টিনাল ও জাঁড়োয়া ৫০০। আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সামাজিকতা রক্ষা করার এবং বিবাহ ইত্যাদিরও

নিয়মকানুন এদের মধ্যে আছে। নাচ ও সাম্পান চালানো এদের অতি প্রিয়। বিবাহ ও নাচের সময় এরা নানারকমের বল্কল পরিধান করে। এদের বল্কলের পোষাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহার্য অনেক রকম জিনিস কলিকাতা মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

নিকোবরবাসীরা মঙ্গোলিয়ান টাইপ্। তারা খাটো, শ্যামবর্ণ, সুস্থ, সবল ও আদিম অধিবাসীদের চেয়ে সভ্য। তাদের নাক চ্যাপ্টা। স্বাধীন ভারত এদের সভ্য করবার জন্যে বহু চেষ্টা করছেন। ভাত খাওয়া এদের আভিজাত্যের নিদর্শন। আকুজী কোম্পানী নিকোবরবাসীদের কাছ থেকে ১ গজ কাপড়ের বিনিময়ে একশত নারিকেল বাহিরে রপ্তানি করেছে বহুদিন। এখন এদের চোখ ফুটেছে—এখন আর ঠকানো চলে না। সের ছ পয়সায় শুকনো নারিকেল বিক্রি করে লক্ষ টাকার উপর জমিয়েছে এবং ঐ টাকা দিয়ে এরা এখন নিজস্ব বাণিজ্য করবার সুযোগ খুঁজছে। স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিকোবরের ছেলেরা নবম দশম শ্রেণীতেও পড়ছে ও জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন-অধিনায়ক" গান গাইতে শিখেছে। তারা স্কুলে মাষ্টারি করে. হাসপাতালে নার্সের কাজও ক'রে। অনেকেরই নারিকেলের ব্যবসা আছে। তারা ফুটবল খেলতে পারে। একবার মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা হয়, তাতে আট গোলে হেরে যায়, কিন্তু কলকাতার কাস্টম টিমকে তারা কয়েক গোলে পরাজিত করেছিল। বর্তমানে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের মধ্যে নিকোবরিয়ান টিমই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হয়।

কুখ্যাত সেলুলার জেল

ইংরেজ শাসনকর্তা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানের উত্তর দিকে কোন এক দ্বীপে প্রথম বন্দী-নিবাস স্থাপন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ঐ বন্দী-নিবাস পরিত্যাগ করে নূতনভাবে সেলুলার জেল তৈরী করা হয় ১৮৫৮ সালে পোর্টব্লেয়ার শহরে। ১৭৫৭ সালে যাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের বিতাড়িত করে ভারতকে স্বাধীন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন তাঁরাই ১৮৫৮ সালে প্রথম এই জেলে কারারুদ্ধ হন। এই কুখ্যাত জেলে যাঁরা বৎসরের পর বৎসর অতি নির্দয়ভাবে নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস কাননগু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী দাস, বীর সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, কৃপারাম, কাপুর সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, রাম শর্মা, আনন্দচন্দ্র গুপ্ত, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতি বীরের নাম উল্লেখযোগ্য। এই জেলটি ছিল সাতটি উইং-বিশিষ্ট তিনতালা পাকা বাড়ী, এখানে ছিল প্রায় এক হাজার সেল—প্রতিটি সেল একজন বন্দীর জন্য নির্দিষ্ট। খাওয়া-শোয়া যা-কিছু সবই ঐ সেলেই করতে হত। প্রায় ২৪ ঘণ্টাই সেলে দেশপ্রাণ বীরগণ বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করেছেন। এই জেলের বৈশিষ্ট্য হল একটি গোল টাওয়ারকে কেন্দ্র করে সাতটি উইং সাতদিকে বিস্তৃতিলাভ করেছে। ব্রিটিশ সরকার জেলটিকে এমন কৌশলে তৈরী করেছেন যে, এটি পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করতে পারে। রাজবন্দী ইন্দুভূষণ রায় এখানে আত্মহত্যা করেন। উল্লাস কর ও আর একজন কিছুদিন এখানে থাকার পর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বহু রাজবন্দী অনশন-ব্রত অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। দুটি উইং জাপান এবং ব্রিটিশ সরকার বোম ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্তমান সরকার বাকী পাঁচটি উইংএর মধ্যে একটিকে ভেঙ্গেগড়ে হাসপাতাল তৈরী করেছেন। অপর একটিতে অবিবাহিত সরকারী চাকুরীয়াদের বাসস্থান করা হয়েছে।

একটি এখনও জেলরূপেই আছে, অন্য দুটির কিছুটা সরকারী গুদামরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। জেলের উপরিউক্ত পরিবর্তন ভারত স্বাধীন হবার পরেই হয়েছে। আমাদের বাঙালী মেস প্রথম ঐ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় ১৯৫১ সালে। ভারত স্বাধীন হবার পর বাঙলার মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি একটি শহীদস্তম্ভ এখানে স্থাপন করে এসেছেন। মৃত শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর এই বেদিমূলে শহীদ-দিবস পালন করা হয়।

আন্দামানে নেতাজী সুভাষ বসু ও আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেন্ট গঠন

ইং ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ শাসন-কর্তা আন্দামানের উত্তরে কয়েকটি দ্বীপে Penal Settlement স্থাপন করেন। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার অসুবিধা হওয়াতে ঐ দ্বীপগুলি পরিত্যাগ করতে হয় এবং ১৮৫৮তে দক্ষিণ আন্দামানের পূর্ব উপকূলে ইহা পুনঃস্থাপিত হয়। ২৩ মার্চ, ১৯৪২ জাপান আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে ও Penal Settlement একেবারে তুলে দেয়। তাদের শাসনকালীন প্রায় ২½ বৎসর আন্দামান সামরিক শাসনাধীন ছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদহিন্দ গভর্ণরের হাতে সমর্পণ করেন।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী সি-প্লেনে পোর্টব্লেয়ারে আসেন। প্রথম প্রায় পাঁচ হাজার জাপানী সৈন্য নেতাজীকে নানান কুচ্-কাওয়াজ করে সম্মান জানায়। প্রায় তিন দিন এখানে ছিলেন তিনি। সব সময়ই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকতেন। আন্দামান ও নিকোবরবাসী জাপানের গ্রাসমুক্ত হয়ে স্বাধীন হল তাঁরই আগমনে। জয় ও হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতাজী প্রথম ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন বিশাল জনমণ্ডলীর সম্মুখে। জাতীয় পতাকার নীচে জাপানী সৈন্যগণ সামরিক কায়দায় আনুগত্য জানায়। এই পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল পাঞ্জাবী, শিখ, সিন্ধি, গুজরাটী, মারাঠী, বাঙালী, বিহারী, ব্রিটিশ ও প্রায় পাঁচ হাজার জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ এই দ্বীপপুঞ্জ (২২৩টি দ্বীপ) আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে আসে এবং ৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫ পর্যন্ত কর্ণেল লোকনাথন্ গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। জনমণ্ডলী ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে নেতাজীর আবেগময়ী বক্তৃতা শুনেছিল। ১৯৩৭ সালে ৪৫০ জন রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে অনশন-ব্রত অবলম্বন করে এবং বহু লোক প্রাণ হারায়। পৃথিবীর আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক লোক একই কারণে এবং একই উদ্দেশ্যে কখনও এরূপ অনশন করেনি। ঐ কারণে আন্দামানের নাম পরিবর্তন করে উহার নাম "শহীদ-দ্বীপ" ঘোষণা করা হয়। নিকোবর বরাবরই স্বরাষ্ট্রভাবাপন্ন ছিল বলে নেতাজী উহার নাম রাখেন "স্বরাজ-দ্বীপ"। এবং ঐ ঘোষণাগুলি সমবেত জনমণ্ডলী ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে সমর্থন করেন।

আন্দামানে আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে নেতাজী তিন দিন পর পুনরায় আজাদহিন্দ ফৌজ পরিচালনা করবার জন্যে বর্মা চলে আসেন। তারপর তিনি আজাদহিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ঐ দ্বীপদ্বয়ের নাম-পরিবর্তন করার আন্তরিক চেষ্টা এখনও পর্যন্ত হয়নি। নাম-পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, কারণ কুখ্যাত "আন্দামান" নামটি শুনলেই লোকের প্রাণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

মধ্য আন্দামানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

উদ্বাস্তু-পরিকল্পনায় সরকার আন্দামানে বহু অর্থ খরচ করছেন কিন্তু তথাপি তাদের পুনর্বসতি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। অনেক উদ্বাস্তু আছে যারা

জমি পাওয়া সত্ত্বেও চাষ করছে না আবার অনেকে জমির অভাবে পুরো চাষ করতে পারছে না।

আমি সরকারের পক্ষ থেকে চাষী উদ্বাস্তুদের নিকট হতে ধান-সংগ্রহ ও খাদ্য-সরবরাহ করার জন্যে বহুবার তাদের ঘরে ঘরে গিয়েছি। সুতরাং চাষীদের অবস্থা খুব ভালভাবেই আমার জানা। খুব অল্প উদ্বাস্তু চাষীর কাছ থেকেই ধান সংগ্রহ করতে পেরেছি। বেশির ভাগ চাষীই ১৯৫৪ সালে সরকারকে ধান দিতে অক্ষম হয়েছে। বহু উদ্বাস্তু বৎসরের খোরাক পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারেনি। তাদের সাহায্য করার জন্যে সরকার গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে চাল দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পরও জমি মহিষ প্রভৃতি বিনামূল্যে পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে খোরাকি ধান পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারল না কেন ভাববার বিষয়। তারা সরকারের কাছে দিনের পর দিন করুণমুখে রসদের জন্যে ধন্না দিয়েছে। সরকারও অক্ষম চাষাদের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন—গুদাম থেকে ধান দিয়ে তাদের বৎসরের পর বৎসর রক্ষা করেছেন। অনেকে আবার বেশ ভাল চাষআবাদ করছে—খুব ভাল ফসল ফলাচ্ছে। শুধু ধান নয়—ধান কাটা হয়ে গেলে. পর ধানের জমিতেই কুমড়া, লাউ, তরমুজ, অন্যান্য তরিতরকারি ও নানাপ্রকার শাকসব্জী প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করে ও বাজারে বিক্রি করে। এই কয়েক বৎসরে তাদের হাতে বেশ টাকা-পয়সাও হয়েছে। তারা বেশ আনন্দেই আছে। অনেকে আবার সমুদ্র থেকে মাছ ধরে। তাদেরও কোন কষ্ট নেই।

উত্তর আন্দামানে উদ্বাস্তু-বসতি

বর্তমান সরকার উত্তর আন্দামানে গভীর জঙ্গল এবং বহু প্রাচীন বৃক্ষ কাটিয়ে সমতলক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের জন্যে চাষের জমি তৈরি করছেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে রঙ্গত নামে একটি দ্বীপে কলকাতা হতে প্রথম ৩৩৪ জন উদ্বাস্তু আসে ১৯৫১-৫২ সালে। এই দ্বীপে কোন যুগে কেউ বাস করেছে বলে মনে হয় না—আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। দু'শ তিন'শ বছরের পুরানো গাছ কেটে চাষের জমি করা হয়েছে।

উৎপীড়িত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, দরিদ্র, শিক্ষাবিহীন, সরলস্বভাবাপন্ন বাংলার পল্লীবাসিগণ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে ৭৩২ মাইল সমুদ্র পার হয়ে এই দ্বীপে এসেছে সর্বহারার বসতি স্থাপন করতে কিন্তু তারা বাংলার কৃষ্টি হারায়নি। এই সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থেকে আবার তাদের বাঞ্ছিত সমাজ গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প—এবিষয়ে তাদের উৎসাহ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের সঙ্গে বাংলার মৃদঙ্গ, করতাল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি। এসবের মধ্যে অনেক উদ্বাস্তুকে মসগুল দেখে মুগ্ধ হয়েছি—মনে হয়েছে এই বুঝি আমার সেই সোনার বাংলার কৃষ্টি !

ধর্ম ও সামাজিক রীতি

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। নিকোবরে মোট ১২ হাজার লোকের মধ্যে দশ হাজারই খ্রীষ্টান আর বাকী সব হিন্দু এবং মুসলমান। নিকোবরে একটি গির্জা আছে। সেখানে একজন বিশপ আছেন। তাঁর নাম রিচার্ডসন। তিনিই ১০ হাজার খ্রীষ্টানের অভিভাবক এবং নেতা। তাঁকে খ্রীষ্টানরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। আকুজী কোম্পানী ৬।৭ বৎসরের মধ্যে নিকোবরের অনেক খ্রীষ্টানকে মুসলমান করেছে।

আদিম অধিবাসীরা সূর্যকে স্বামী, চন্দ্রকে স্ত্রী ও নক্ষত্ররাজিকে তাদের ছেলেমেয়ে রূপে সম্মান করে। তাদের কি ধর্ম সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে তারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী। কেউ মারা গেলে মৃতদেহের চারপাশে কান্না, চীৎকার, দাঁত ইত্যাদি প্রদর্শন করার রীতি আছে। মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়। দেহ মাটির নীচে সম্পূর্ণ নষ্ট

হয়ে গেলে পর পুনরায় কবরস্থান খনন করে মৃতের আত্মীয়বর্গ তার হাড়গুলি নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তি বিবাহিত হলে তার বিধবা স্ত্রী আমরণ তার করোটি নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখে। বহুদিন পর প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একজনের ক্রোড়ে অন্যজন বসে কিছুক্ষণ খুব কাঁদবে—কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গেলে পরে কথাবার্তা আরম্ভ হবে—প্রথম সাক্ষাতে এইরূপভাবে পরস্পরকে অভিবাদন করার প্রথার প্রথা। প্রণাম, ভক্তিশ্রদ্ধা, সহৃদয়তা প্রদর্শনের অন্য কোন রীতি তারা জানে না। এদের আগুন-সংরক্ষণপ্রণালী আর একটি অদ্ভুত জিনিস। বড় বড় গাছের মধ্যস্থলে বৃহৎ গর্ত করে তার ভেতর ছাই ও আগুন এমনভাবে রেখে দেয় যে বহুদিন পর্যন্ত আগুন থাকে। বাতাস কিংবা বৃষ্টি আগুন নিভাতে পারে না। ঐরূপভাবে আগুন রাখার একটি কারণ তারা আগুন জ্বালাবার অন্য কোন উপায় জানে না। রাত্রে মশার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে সর্বশরীরে একপ্রকার হলুদ রঙের মাটির প্রলেপ দেয়। গায়ে মাটি মেখে শরীর রক্ষার উপায়টি সত্যই অদ্ভুত!

উদ্বাস্তুদের এদেশে বেঁধে রাখার জন্যে দরকার বলিষ্ঠ ধর্মভাব সৃষ্টি করা। সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মোপদেশ দেওয়া ও বাঙলার পল্লী-গ্রামের আচারপদ্ধতি প্রচলিত করা প্রয়োজন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি প্রত্যেক উদ্বাস্তু শিবিরে সার্বজনীনভাবে অনুষ্ঠিত হলে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে সমবেতভাবে আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ হবে।

সমালোচনা

দেশে দেশে চলি উড়ে—শ্রীদিলীপ কুমার রায়-প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭; পৃষ্ঠা—(ডিমাই অক্টেভো) ৪২৬; মূল্য—৬৲ টাকা।

শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহার শিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সহ গত ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকায় একটি 'সাংস্কৃতিক ভ্রমণে' বাহির হন। যাইবার পথে তাঁহারা চীন জাপান ও হনোলুলু (হাওয়াই দ্বীপ) এবং আমেরিকা ঘুরিয়া দেশে ফিরিবার সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মণি, সুইজর্লণ্ড, ইতালি ও মিশর হইয়া আসেন। এই সকল বিভিন্ন দেশে লেখকের ৮ মাস ব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু দিলীপবাবুর এই বইটি শুধু 'ভ্রমণ কাহিনী' মনে করিলে ভুল হইবে। স্বচ্ছ, সরল ভাষা, সরস বর্ণনা ও লিখন-ভঙ্গীর দিক দিয়া যেমন ইহাকে একটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস বলা চলে তেমনি নানা দেশের ধর্ম, সমাজ, শিল্প ও সঙ্গীতের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনায় গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ মননশীল রচনার মর্যাদা দাবি করিতে পারে। 'দেশে দেশে' নানা চিন্তানায়ক এবং কুশলী শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ ও কথোপকথনগুলি বিশেষভাবে উপভোগ্য।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একজন গভীর মর্মবোদ্ধা, বহুশ্রুত গ্রন্থকার যে সন্ধানী, বিচারশীল দৃষ্টি লইয়া বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন উহার পরিচয় সমগ্র পুস্তকটিতে বিকীর্ণ। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তুলনা করিয়া ঐ সকল সংস্কৃতির মূল্যনির্ণায়ক সিদ্ধান্তগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। দু' একটি নমুনা দিতেছি। আমেরিকার প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলিতেছেন—

"আমেরিকা সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছিলাম! কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে, অনেক শোনা-কথা যেমন সত্য হলেও ঠিক

সে-ভাবে সত্য নয় যে-ভাবে আমেরিকান সভ্যতাকে কল্পনা করেছিলাম, ঠিক তেমনি ওদের দেশের সভ্যতার পাশাপাশি আমাদের দেশের সভ্যতাকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, আগে তেমন ক'রে দেখিনি। দেখলাম—আমাদের দেশ যদিও দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, নির্যাতন-প্রপীড়িত তবু সে এমন একটা মহিমায় মহিমাময় যে মহিমা অন্য কোন দেশে দেখতে পাইনি। সে-মহিমার পরম স্বরূপ—ধর্ম।"

জাপানের প্রসঙ্গে—

"জাপান ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করতে পারিনি ভারতের মতন, অথচ পূজার অভীপ্সা থাকেই প্রতি নরনারীর মর্মে উপ্ত। কোন গভীর আকাঙ্ক্ষাই নিজেকে নিরুদ্ধ রাখতে পারে না। এভাবে না হলে ওভাবে সে করেই করে আত্মপ্রকাশ। জাপানে এই ঐকান্তিক পূজাবৃত্তি ছাড়া পেয়েছে—খানিকটা অন্ততঃ—তার সামাজিক সদাচারের মঞ্জরণে।.........কোনো জাতির নরনারীর মনে যে রূপানুরক্তি এতটা ব্যাপকভাবে প্রায় দেবভক্তির স্থান অধিকার করতে পারে ভাবতে পারা শক্ত। ......ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরও এদের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের কাছে নিষ্প্রভ, যেমন আমেরিকান কুবেরদের ধনসম্পদের কাছে ভারতীয় ক্রোড়পতির বৈভবও পাণ্ডুর। বামন ও মহাকায় মানুষের মধ্যে যে তফাৎ এদের মন্দির-সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের কীর্তির সেই তফাৎ।... কিন্তু তারপর? দেখলাম কয়েকটি চৈনিক পুরোহিত করছে মন্ত্রপাঠ। শূন্যগর্ভ প্রাণহীন লাগল। ....সৌন্দর্যপূজা অতিজীবন্ত, তথা দেবপূজা মৃত না হোক জীবন্মৃত। ......মনে হ'ল শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দ নিছক দেশভক্তিবশেই এই ঘোষণা করেননি যে, ভারতের প্রাণপুরুষ আজও বিরাজ করছে তার শিল্পে নয়, কলকারখানায় নয়, বৈভবে নয়, এমনকি বুদ্ধিবাদী দর্শনের গবেষণায় নয়,—ভারতের প্রাণপুরুষ আজও ধুক ধুক করছে তার অন্তরাত্মানিহিত বৈরাগ্য ও ভক্তির মণিকোঠায়। য়ুরোপে মঠ-আদি প্রতিষ্ঠান জীবন্মৃত, জাপানে পূজারতি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত, কিন্তু ভারতে ধর্ম আজও জীবন্ত—ভক্তি জ্ঞাননিষ্ঠা তপস্যায় শ্রদ্ধা আজও দীপ্তিময়ী না হলেও প্রাণের উত্তাপে সমাদৃত, বিশ্বাসের নিকনে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।"

দিলীপবাবুর অপূর্ব মধুর কণ্ঠ এবং সঙ্গীত-প্রতিভা যে বিদেশে সমাদর লাভ করিবে ইহা স্বাভাবিকই। তিনি ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী নানা স্থানে সঙ্গীত ও নৃত্যের জলসা দ্বারা দেশে দেশে ভারতীয় সঙ্গীতকলার যে সার্থক প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহার বিবরণ পড়িয়াও আমরা প্রভূত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বইটিতে অনেকগুলি ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর।

মনের অগোচরে—শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত; প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা—৭৮; মূল্য—২৲ টাকা।

মানুষের জীবনের আশা নৈরাশ্য, তৃপ্তি অশান্তি, সার্থকতা বিফলতার জন্য মানুষ নিজেই যে অনেকটা দায়ী ইহা কিছু নূতন কথা নয়, কিন্তু নূতন কথা—যাহা আমরা অনেকেই জানি না বা জানিতে চেষ্টা করি না—হইল এই যে উক্ত দায়িত্বের বহুলাংশ মানুষের সজ্ঞান (conscious) মনের নয়, তাহার অনির্জ্ঞান (Sub-conscious) মনের। উপরকার পরিচিত মনের তলদেশে 'মনের অগোচরে' যে সকল অনুরাগ-বিরক্তি জমিয়া আছে তাহা কত বিচিত্র আকারে মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা বর্তমান মনোবিজ্ঞানের এক চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রদ্ধেয়া লেখিকার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি শুধু একটি মনোজ্ঞ কাহিনীই নয়, মনের অগোচরের উক্ত অদৃশ্য শক্তিগুলির একটি মূল্যবান্ দিগ্‌দর্শন। সত্য-সংযম-সন্তোষ-লক্ষিত স্বধর্মনিষ্ঠ অনাড়ম্বর প্রাচীন আদর্শের সহিত ভোগলুব্ধ স্বার্থপর অশান্ত বর্তমান জীবনরীতির সংঘর্ষের ফলে উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রে যে মর্মান্তিক ট্রাজেডি উপস্থিত হইয়াছিল উহার নিয়ামক ছিল ঐ ব্যক্তিগুলির মনের অগোচরের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিনিচয়। আবার, কয়েকজন যে বাঁচিয়াও গেলেন তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাঁহাদের আত্ম-সমীক্ষার জন্যই। আত্মসমীক্ষা থাকিলে অগোচরে লুকাইয়া আর কেহ শক্তি হানিতে পারে না।

বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং যাঁহারা কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং

আবেগ-বাহুল্য দিয়াই উপন্যাসের মান নির্ণয় করেন না, কল্যাণকর সামাজিক ও চারিত্রিক আদর্শের পরিস্ফুটনও ঔপন্যাসিকের নিকট দাবি করেন তাঁহাদিগকে 'মনের অগোচরে' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

—'অনিরুদ্ধ'

চার্বাক-দর্শন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ, পঞ্চতীর্থ (অধ্যাপক, মীমাংসা বিদ্যালয়, কুচবিহার) প্রণীত। সার্বজনীন গ্রন্থ-মালার ত্রয়োদশ পুষ্পরূপে ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪০+৬; মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকটি দর্শন-শাস্ত্রকে সর্বসাধারণের বোধোপ-যোগী করিবার উদ্দেশ্যে প্রভূত প্রয়াসে রচিত, কয়েকখণ্ডে বিভক্ত, গ্রন্থকারের 'ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক ক্রমপ্রকাশ্য বৃহৎ গ্রন্থের একটি অংশ মাত্র।

চার্বাকের সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রায় কাহারও নাই। কারণ এ বিষয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের আজ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে সমস্ত দর্শনেরই এক একজন ঋষি সূত্রাকারে তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনেরও প্রবর্তক বৃহস্পতি নামক একজন ঋষি সূত্রকার ছিলেন। কিন্তু এই বার্হস্পত্য-সূত্র-গ্রন্থের পূর্ণরূপ এখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কোনও কোনও পুস্তকে উদ্ধৃত ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। শাস্ত্রীজী বহুপ্রয়াসে এইরূপ কয়েকটি সূত্র এবং পুরাণ, কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া এই দার্শনিক মতবাদের যে একটা কাঠামো দাঁড় করাইয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়।

এই পুস্তকে ১। চার্বাক দর্শনের ইতিহাস, ২। চার্বাক দর্শনের পরিচয়, ৩। প্রমাণ, ৪। জগৎ, ৫। আত্মা, ৬। ঈশ্বর, ৭। মুক্তি এবং ৮। পুরুষার্থ এই আটটি বিষয়ে আটটি পরিচ্ছেদে উক্ত দর্শনের মত সূত্র, যুক্তি ও গ্রন্থ বিশেষ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃতি সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

মানব-সমাজের অনেকেই মুখে যাহাই বলুন না কেন কার্যতঃ এই মতবাদ সমর্থন ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই এই মতবাদের নাম "লোকায়তবাদ" (লোকে=জনসমাজে; আয়ত=বিস্তৃত) বা চার্বাকবাদ" (চারু=রমণীয়, বাক্=উক্তি)। অতীতকালে নানাগ্রন্থে যুক্তিসহায়ে ইহার খণ্ডনের প্রয়াস দেখা যায় বটে, তথাপি ইহা বাহ্যতঃ নিন্দিত হইয়াও সর্বত্র সর্বকালেই মানব সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ, তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

অতএব কোনও কোনও আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই মাত্র লোকায়তদৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ। বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যাঁহারা ইহা অতিক্রম করিতে চান তাঁহাদেরও এই মতবাদটিকে পূর্ণভাবে জানা ও আলোচনা আবশ্যক।

—স্বামী প্রশান্তানন্দ

স্বাধীনতার দায়িত্ব—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, বি প্রণীত; প্রকাশিকা—শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ পৃষ্ঠা—৪৭; মূল্য ৵৹ আনা।

পুস্তিকাখানিতে লেখক আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ দেশের জন-সাধারণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। কোন রাজনৈতিক দলের দলীয় মনোভাব লইয়া এ পুস্তক প্রণয়ন করা হয় নাই, সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটিও লেখক নিরপেক্ষভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

রত্নগর্ভা ভারতবর্ষের অতীতের গৌরবের কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া তিনি শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"হইতে পারে রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর সাময়িকভাবে ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহাদের ভুলত্রুটি অথবা অক্ষমতার দরুন জনসাধারণ কষ্ট পাইতেছে ; কিন্তু সংশোধন করিবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা তো জনসাধারণের হাতে। তাহার জন্য হল্লা হাঙ্গামা করিতে হইবে কেন ? তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করিবার হেতু কি ?"

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের লেখক যোগ্য মর্যাদা দিয়াছেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। দেশের সামগ্রিক কল্যাণই তাঁহার কাম্য এবং দলমতনির্বিশেষে দেশের জনসাধারণের উপরই তিনি ইহার ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমাদের দেশকে ধনরত্নে পরিপূর্ণ করিতে হইলে "ভারতের ছত্রিশ কোটি নরনারীকে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে।" (পৃঃ ১৯) কিন্তু ইহার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক যে অর্থনৈতিক অসাম্য তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় ভাল হইত।

ভারতের বিশ্বের দরবারে সম্মানের জন্য আত্মতুষ্টির ভাব ত্যাগ করিতে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, "কিন্তু আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে অপরকে উপদেশ দেওয়া যায় না, দিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না। সুতরাং নিজের ঘর আগে ঠিক করিতে হইবে।" (পৃঃ ২৯)

টাকা যেখানেই থাকুক না কেন উহা দেশবাসীর সম্পদ ইহা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নহে। (পৃঃ ৩৫) বাস্তবিক পক্ষে টাকা জমাই পড়িয়া থাকে, ঠিকভাবে ব্যয় না হওয়াই দেশের জনসাধারণের দুর্গতির অন্যতম কারণ। পুস্তকের প্রথম দিকটায় দেশ, জাতি, সভ্যতা এবং রাষ্ট্র ও ধর্মনেতাদের যে বহু নামের সন্নিবেশ হইয়াছে তাহা সুসংলগ্নভাবে দেওয়া হয় নাই বলিয়া পাঠকের মনে তেমন রেখাপাত করে না। এই প্রকার পুস্তকের আয়তন আরও বড় হওয়া উচিত। পুস্তকে বহু ছাপার ভুলও লক্ষিত হইল।

হিন্দুনারীর আবেদন—শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিমল বসু, কথা-সাহিত্য মন্দির—১৬।এ ডাফ্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—২৫ ; মূল্য চারি আনা।

'বিশ্বমানব কল্যাণার্থে হিন্দুধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধার প্রয়োজন।' 'বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণ,' প্রধানতঃ এই দুইটি রচনা সমন্বিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা-খানিতে লেখিকা ভারতের তথা বিশ্বের যে অবনতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকার কিভাবে হইতে পারে সে বিষয়ে আবেদন পেশ করিয়াছেন পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধর্মাচার্যগণের নিকট। ভারতের পতন হইতে উদ্ধারের উপায় হিসাবে বলিয়াছেন বেদবিধি অনুযায়ী সমাজসংস্কার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন,

"বহু দিন হইতেই অনেক ক্ষেত্রে সাধুতার ও কর্তব্য-পরায়ণতার প্রতি বিশেষ সম্মান বা উৎসাহ দেখানো হইত না। বরং স্বার্থপ্রবণ ও কূটকৌশলী ব্যক্তিদেরই নানাস্থানে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত, ফলে বহু লোকেই সুবিধাবাদীদের দৃষ্টান্ত ও কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইত। স্বাধীন ভারত আজ কালের গতির পরিবর্তনের শুভলক্ষণ প্রকাশের সুবিধা ও অধিকার লাভ করিয়াছে, সম্পূর্ণভাবে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সারা জগতে ভারতীয় ভাবধারার অপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব প্রদর্শন করিতে এবং প্রকৃত মানব ধর্ম পালন করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া নীতি-শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতে সক্ষম হউক, ইহাই আজ বিশ্বনিয়ন্তার অভয় চরণে আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।"

কঠোর নিয়ম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দুষ্কৃত-কারীদের শাস্তিদানের যে অনুমোদন করিয়াছেন বা প্রয়োজনমত তাহাদের 'এক ঘরে' করিতে বলিয়াছেন এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা সমাজের সব রোগ বোধ করি দূর করা সম্ভব

নহে। এই সকল রোগের কারণ অন্বেষণ করিয়া মূল গলদ চিকিৎসা করার প্রয়োজন। আবার দেখা যায় যে সর্ব সময়ে নেতিবাচক ঔষধে কাজ হয় না। দ্বেষ ঈর্ষা পরিত্যাগ কর বলার চেয়ে 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—ইহাতে বেশী কাজ হয়।

—শ্রীবিজনচন্দ্র গোস্বামী

The occult Training of the Hindus—মিঃ আর্নেষ্ট উড প্রণীত, মাদ্রাজের গণেশ এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২০; মূল্য ৪৲ (চারি টাকা)।

হিন্দুধর্মের যোগাদি বিষয়ক ভাবসকল ইংরেজী ভাষাভাষীদের মধ্যে সহজ ভাষায় প্রচার করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

বেদ পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ইত্যাদি অবতার বাক্যে হিন্দুধর্মের যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে সে সকল জানিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল সাতিশয় আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সেইজন্য গ্রন্থকারের ন্যায় অনেকে সেই আগ্রহ মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকার occultism লইয়া যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমর্থন করা দুষ্কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'Pure eternal life is the real occult' (পৃঃ ৬)।

'In the ninth chapter he (Lord krishna) says, "Now I will tell you the most occult of all things" (Geeta Ch IX, Vs. 1, 4, 6, 8, 9) (পৃঃ ৭)।

'Most occult (Guhyatama)' (Do XV, 20) (পৃঃ ৭)।

'My last word the most occult of all (Do XVII, V, 64-65) (পৃঃ ৭)।

'All over India there are people who practise meditation……for the purpose of reaching the most occult experience. These are not only the old style people of the country side but in thousands of cases modern men' (পৃঃ ৮)।

The Song of Praise to the Dancing Shiva—মিঃ আর্নেষ্ট উড প্রণীত, গণেশ এণ্ড কোং কর্তৃক মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৩২, মূল্য—২৷০ আনা।

ইহা রাবণকৃত শিবতাণ্ডব-স্তোত্র নামক স্তবের ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং ইংরেজীতে সাধারণ ব্যাখ্যা ও কতকগুলি কাহিনী দেওয়া হইয়াছে। এই গুলির দ্বারা শিব-মহিমা দেখান হইয়াছে। যে ছন্দে আবৃত্তি করিতে হইবে তাহারও পরিচয় মুখবন্ধে দেওয়া আছে।

শক্তি ও কল্যাণ এই দুইটি ভাব শিব-আরাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট। শক্তির দ্বারা যাবতীয় দুর্বলতার কারণ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অমঙ্গলনিচয় ধ্বংস হইয়া যায়। তখন বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মধ্যে যে মঙ্গল বর্তমান তাহা অনুভূত হয় ও অনন্ত শান্তিলাভ হয়। শিবরূপী পরমেশ্বর স্বয়ং এই দুইটি ক্রিয়া করিতেছেন। তাঁহার মধ্যে যে তথাকথিত রুদ্রমূর্তি তাহা নানাভাব-মণ্ডিত হইয়া সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবগুলি কথনও কথনও ভঙ্গীরূপে পাই। ইহাদের মধ্যে দুইটি সুপরিচিত। নৃত্য ও ধ্যান। নর্তকদের রাজা—নটরাজ—নৃত্য-ভঙ্গীতে যে শক্তির প্রকাশ করিতেছেন তাহার দ্বারা যাবতীয় অমঙ্গলের নাশ হইতেছে, এবং একই সঙ্গে মঙ্গলের প্রকাশ দ্বারা সংসারকে অনন্ত আনন্দে মগ্ন করিতেছেন।

ভাষায় সদাশিবের এই ভাবকে সরল জনসমাজে দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তিনি ভাব বজায় রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

— স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

The Earthen Vase.—শ্রীনীলমণি আচার্য প্রণীত; প্রকাশক—এ সি ব্যানার্জি, ৪৭-এইচ, দুর্গাপুর লেন, আলিপুর, কলিকাতা—২৭; পৃষ্ঠা—৩০; মূল্য ১।০ আনা।

গ্রন্থকার সুকবি। বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁহার সমান দক্ষতা। ইতঃপূর্বে 'ব্যথার পূজা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত লেখকের ছোট বড় ২২টি সুখপাঠ্য বাংলা কবিতার ও শ্রীশংকরাচার্যের সংস্কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'মোহমুদ্গর' স্তোত্রের ইংরেজী কবিতানুবাদ আলোচ্য পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। কবিতাবলীর ভাষার স্বচ্ছতা, সরলতা ও মাধুর্য আকর্ষণীয়। কোন কোনটিতে উচ্চ ভাবাদর্শেরও সন্ধান মেলে; সাধকপ্রাণের সন্ধানী দৃষ্টি যেন কবিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে:

"My mind is thrown into chaos;
I feel uneasy at home;
Am I to go mad!"

আরও দেখি কবিচিত্ত যেন আধ্যাত্মিক রসপিপাসু হইয়া দুনিয়ার দুঃখদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠিতে চায়:

"My athirst heart,
Appeased with Thy presence,
Will burst forth into
Throbbing songs of Thy praise."

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

A Dynamic view of God and man—by Sri Akshaya Kumar Banerjee, (Ex-Principal M. P. Degree College, Gorakhpur) Published by M. P. Degree College, Gorakhpur. pp, (103+X), Price Re 1/-.

ঈশ্বর ও মানবের গতিশীল দিকটি উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব দেবমানব-জীবনলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কর্মের ভিতরেও অকর্ম বা শান্ত নির্লিপ্ততা, আবার অকর্মের অর্থাৎ শান্ত সমাহিত ভাবের মধ্যেও কর্ম অর্থাৎ লোককল্যাণ প্রচেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই দ্বিমুখী ভাব অবলম্বন করিয়া লেখক ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে স্বাভাবিক এক মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়া নয়, জীবনের আদর্শ কর্মহীন সমাধি নয়; পরন্তু—মানবমনের শ্রেষ্ঠবিকাশ ঈশ্বরভাব। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে—লীলাচ্ছলে অবিরত কর্মসম্পাদনই জীবনের ধর্ম—যাহার লক্ষ্য মানবাত্মার ক্রমবিকাশ, অন্তর্বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব—মানবের ঈশ্বরানুভূতি।

পুস্তকখানির একটি বাংলা সংস্করণ হইলে বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। ইংরেজী পুস্তকটিতে অনেক ছাপার ভুল আছে।

—স্বামী নিরাময়ানন্দ

শ্রীশ্রীসারদামণি—(নাটিকা)—মন্মথ রায় প্রণীত; হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিঃ, ৬।১, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা—১২

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে যশস্বী নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় গ্রামোফোন রেকর্ডের উপযোগী ৩২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি লিখিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাতখানি রেকর্ডে নাটিকাখানি সম্পূর্ণ। মনোজ্ঞ সংলাপের মাধ্যমে অতি সুন্দররূপে মায়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রেকর্ডগুলিও আমরা আনন্দের সহিত শুনিয়াছি। নাটিকায় ৪ খানি গান গাহিয়াছেন বিখ্যাত গায়ক শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক। গদাধরের (শ্রীরামকৃষ্ণ) ভূমিকায়

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা দেবীর অভিনয় ভক্তবৃন্দের ভাল লাগিবে। নাটিকার ঘটনাপারম্পর্যে এবং কথোপকথনের রীতি ও সঙ্গতিতে আমরা কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি। পরবর্তী সংস্করণে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এগুলি সংশোধন করিবেন ইহাই অনুরোধ।

যুগ ও জীবন (মাসিকপত্র)—সম্পাদক: শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত; কার্যালয়—১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫

এই নূতন মাসিক পত্রিকাখানির (আরম্ভ বৈশাখ, ১৩৬২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা যত বাড়িতেছে, জীবনসংগ্রামে যতই সে হটিয়া যাইতেছে তাহার সাহিত্যের (এবং নৃত্য-গাতেরও) উদ্যম ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় এবং জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে নিত্য নূতন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ইহার একটি প্রমাণ নয় কি? আশ্চর্য বটে, কিন্তু সত্য। জানিনা ইহা বাঙালীর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য।

যাহা হউক, এই নূতন মাসিক পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপটের উচ্চ আদর্শদ্যোতক চিত্রটি দেখিয়া কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। পাতা উলটাইতে লাগিলাম এবং বুঝিলাম ইহা গাদায় রাখিবার জিনিস নয়। পরিচালকমণ্ডলী একটি কল্যাণকর আদর্শ লইয়া কাগজটি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলিতে মনন, দায়িত্ববোধ, নির্ভীকতা, সুরুচি ও লালিত্য লক্ষ্য করিলাম। নবজাতকের অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বিবেক-ভারতী (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—ইটাচুনা (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা—৩২; মূল্য চার আনা।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথিদিবসে প্রবুদ্ধ ভারতসঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত এই সংখ্যাটিকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামীজীর পুণ্য জীবনের বিভিন্নদিক অবলম্বনে রচিত মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ভাল লাগিল। শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সান্যালের "শ্রীশ্রীমা—দেবীভাব" পাঠকবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করিবে।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্ পত্রিকা (অষ্টাবিংশতি বর্ষ, পৌষ, ১৩৬১)—ছাত্র-সম্পাদক—শ্রীবিমান লাহিড়ী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-টি, বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্ পত্রিকার এই বার্ষিকী সংখ্যাখানি স্বীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার অধিকাংশ লেখা পঞ্চম হইতে নবমশ্রেণীর কিশোরবয়স্ক বালকদিগের হইলেও প্রত্যেকটিতেই যেন ভবিষ্যতে সাহিত্যিক হইবার আগ্রহ ও বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন-কাহিনী, ছোট গল্প, সমালোচনা, বিজ্ঞান ও ধর্মমূলক বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৈশাখ,' 'লোহা ও ইস্পাত,' 'শিল্প তাপস নন্দলাল,' 'দেওয়ালের ওপরের মুখ,' 'তাঁহার বাণীই তাঁহার জীবন'।

বাটানগর রিক্রেয়েশন্ ক্লাব ম্যাগাজিন—সম্পাদক ও প্রকাশক—শ্রীহিতেন্দ্রকিশোর রায়, বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব, বাটানগর (২৪ পরগণা)

ডবল ক্রাউন অক্টেভো (৪৮+৬৪)=১১২ পৃষ্ঠার বহু চিত্র এবং ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতে পুষ্ট এই শীতঋতু-সংখ্যাটি অভিনন্দনযোগ্য ও পরিচালকগণের কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'To Allahabad Kumbha Mela by Car' ভ্রমণ কাহিনীটি চমৎকার লাগিল। 'Personality and its development in Children'

প্রবন্ধটি বহুতথ্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর 'ঘঘুর বিলাপ' কবিতা ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'পুরীস্মৃতি' প্রবন্ধটি পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

পল্লীসেবক—শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত: ফুলিয়া কলোনী (নদীয়া) পৃষ্ঠা—৭৬; মূল্য—৷৶০ আনা।

বিশিষ্ট দেশসেবক ও সমাজকর্মী শ্রীসঞ্জীবপ্রসাদ সেনের নেতৃত্বে একটি শিক্ষার্থী দল (সংখ্যায় ৪৮ জন) গত ১৯৫৩ সালে ছয়মাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে ২নং গ্রামসেবক শিক্ষা-কেন্দ্রে পল্লী-সেবার নানা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সাময়িকীটি উহারই বিবরণী এবং পল্লীসেবা-সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন। পল্লীর সমস্যা ও সেবা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান দিগ্‌দর্শন লেখাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কামারপুকুরে গ্রামসেবা—হুগলী জেলার কল্যাণসম্প্রসারণ-পরিকল্পনা (Welfare Extension project) কামারপুকুরে গঠন করা হইয়াছে। একটি কার্যকরী কমিটি এই কাজ পরিচালনা করেন। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন প্রতিনিধি এই কমিটিতে আছেন। গত ১লা জানুয়ারী হইতে এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ১৫০০০ লোকের মধ্যে এই কাজ প্রসারিত। সমস্ত ব্লকটিকে ৫ ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া প্রতি ভাগে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রতি কেন্দ্রে দুইজন মহিলা-কর্মী কাজ করিতেছেন। এই সব কেন্দ্রে শিশুদের চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, নারীদের জন্য সন্তান-প্রসবের পূর্বে ও পরবর্তীকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বয়স্কাশিক্ষার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। ৫টি বয়স্কাশিক্ষা-কেন্দ্রে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১০০।

হনলুলুতে স্বামী বিবিদিষানন্দ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েট্‌ল্ (ওয়াশিংটন) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী গত আগষ্ট মাসে হাওয়াই দ্বীপস্থ হনলুলুতে গমন করেন। বেদান্তের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক বাণীতে আকৃষ্ট বহু নরনারী তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। সর্বসাধারণের জন্য তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পাঠচক্র পরিচালনা করেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহ স্বামীজীর আগমন-সংবাদ এবং কথোপকথন সাগ্রহে প্রচার করিয়াছিলেন। (সংবাদদাতা—হনলুলুর যশস্বী শিল্পী এলি, আর, মারোজি)।

বন্যা-সেবাকার্য—বিগত ৯ই আগষ্ট, '৫৫ উত্তর প্রদেশের বন্যাপীড়িতদিগের সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কাশী সেবাশ্রম আজমগড় জেলায় ১৫টি পল্লীর মধ্যে তিনটি কেন্দ্র খুলিয়া সেবাকার্য আরম্ভ করেন এবং এখনও চালাইতেছেন। এই সেবাকার্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্তঃ—

(১) সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত সেবকগণ প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০৴০ মন আটা ২৭২টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। প্রয়োজন-অনুসারে বস্ত্রাদিও দেওয়া হইতেছে।

(২) রোগিগণের নিয়মিতভাবে চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৮।৮।৫৫ তারিখ পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা ১৫০০ (পুনরাক্রান্তের সংখ্যাসহ।)

(৩) গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা। জৌনপুর জেলার পিলকিছা অঞ্চলে গত ২২শে

আগষ্ট যে সেবাকেন্দ্র খোলা হয় তাহাতে ৫৫/ মন খাদ্যসম্ভার ১৫টি গ্রামের ৩৬৭টি পরিবারকে প্রথম সপ্তাহেই দেওয়া হইয়াছে। যথারীতি চিকিৎসাদির সুযোগও দেওয়া হইতেছে।

বন্যা সেবাকার্যের জন্য উত্তর প্রদেশ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শিলং, মালদহ, পাটনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এই শাখাকেন্দ্রগুলি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রতিক বন্যায় দুঃস্থ নরনারীর জন্য সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং যথারীতি সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। কুচবিহারেও একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র হইতে অর্থ প্রেরিত হইতেছে। প্রতি সেবাকেন্দ্রে মিশনের সমর্থ কর্মী প্রেরিত হইয়াছেন।

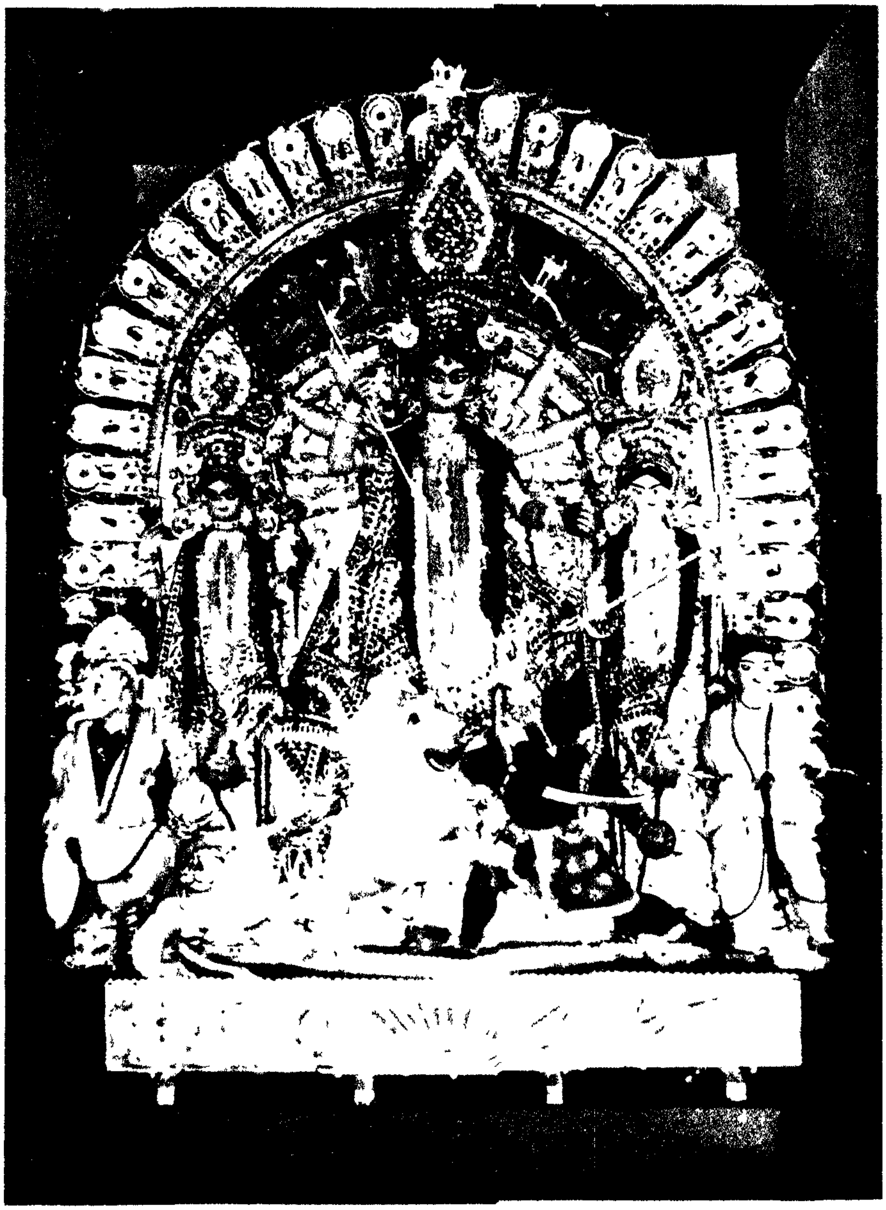
উদারহৃদয় বদান্য দেশবাসী বন্যার্ত ভ্রাতা-ভগিনীগণের সেবার জন্য অর্থ, খাদ্য বস্ত্রাদি (পুরাতন বা নূতন) যাহাই দান করুন না কেন সাদরে গৃহীত হইবে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া; অথবা উপরোক্ত শাখাকেন্দ্রসমূহের কর্মসচিবগণের নিকট।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ—নদীয়া শান্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের ৪৬তম বার্ষিক সমাবর্তনোৎসব অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে এবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সমাবর্তন-ভাষণে বলেন যে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, স্থানমাহাত্ম্য প্রভৃতি সর্ববিষয়ের আকরগ্রন্থ হিসাবে পুরাণসাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অনেক গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ-সাহিত্য লইয়া তেমন ব্যাপক আলোচনা হয় নাই। একটি মহাপুরাণ বা উপপুরাণও এ পর্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মধ্যযুগের প্রয়োগ, পদ্ধতি, স্মৃতিনিবন্ধ প্রভৃতিতে পুরাণ হইতে উদ্ধৃত বাক্য অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথবা সচরাচর দেখা যায় এক পুরাণের নামে উদ্ধৃত বাক্য অন্য পুরাণে রহিয়াছে। এই সমস্ত বিপর্যয়ের সুমীমাংসার জন্য অতি শীঘ্র পুরাণসমূহের বিশেষভাবে সংশোধিত সংস্করণ অত্যাবশ্যক। বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। তজ্জন্য দেশবাসীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সভানেত্রী ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী বলেন যে, পুরাণ যুগোপযোগী ভারতীয় সভ্যতার বাহক। এই শাস্ত্র বিশেষভাবে দেশপ্রেম, ও ধর্মপ্রাণতা শিক্ষা দেয়। ভাষার দিকে এই সাহিত্য বহুলাংশে অশেষ সৌন্দর্যপুষ্ট। এ শাস্ত্রের প্রচারে ব্রতী বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ্ সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছে।

পুণায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—পুণা (বোম্বাই) শহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জয়ন্তী-উৎসব বিগত ১৩ মার্চ, '৫৫ পুণা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী বিষয়ক বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রী এস্ পি শর্মা, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, অধ্যক্ষ এস্ ভি ডান্ডেকর। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের অতি সুন্দর ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হন।



উদ্বোধন

বিশ্বজননীর অহৈতুকী কৃপা

ক্বাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
ক্বায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ।
জানে ভবানি চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ ॥

ত্বং নাহপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাহসি দেবী সগুণা ননু নিগুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥

শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতম্—১।১২।৪৫, ৫১

কোথায় আমি অতি মন্দবুদ্ধি শক্তিহীন দুর্ভাগা, আর কোথায় জননি, তোমার অতি নিপুণ মহামহিমময় দাক্ষিণ্য! এই উভয়ের যে একত্র সমাবেশ ঘটিতে পারে তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু সেই স্বপ্নই তুমি সত্য করিয়া তুলিলে। তোমার অহৈতুকী কৃপা আমার উপর প্লাবিত হইল।

ভবানি, তোমার করুণামণ্ডিত চরিত্রের নিশ্চিত পরিচয় পাইয়াছি। এই অধমজনের প্রতিই যদি তোমার এত অনুকম্পা, তাহা হইলে তোমাতে যাঁহাদের ভক্তি অতি প্রগাঢ় সেই ভাগ্যবান সেবকগণের নিকট তুমি কত সুলভ!

দেবি, তুমি পুরুষ কি নারী তাহা তো বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তুমি সগুণ কি নির্গুণা তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল না। আর বিচারে কাজ নাই। তুমি যাহাই হও, তুমি যে সদাজা জীবন্ত জাগ্রত সত্য তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। তাই মা, সর্বদা হৃদয়ের সরল আবেগ সহ তোমাকে প্রণাম করি। আর এই প্রার্থনা, যেন অন্তিমসময়ে প্রাণের সকল ভালবাসা তোমাতেই অচঞ্চ রাখিতে পারি।

কথাপ্রসঙ্গে

জয় ও ক্ষয়

বৎসরান্তে আবার বাঙ্গলার অঙ্গনে শারদীয়া দুর্গাপূজা সমুপস্থিত।

দেবী দুর্গা জয়ের দেবতা—শুধু ব্যক্তির নয়, সমষ্টির আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক—ত্রিবিধ সঙ্কটকে দূর করিবার জন্য দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা। শক্তিস্বরূপিণীর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা আধিব্যাধি দারিদ্র্য শোক সন্তাপ অবিদ্যা অজ্ঞানকে জয় করিতে চাই—জয়লাভ করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করি, তাঁহাকে লইয়া আনন্দোৎসব করি। জয়ের আকাঙ্ক্ষা, আশা ও উদ্যম এবং জয়-সংপ্রাপ্তির উল্লাস ও পরিতৃপ্তি—এইগুলিই দুর্গাপূজার পরিবেশ।

আজ বাঙ্গালীর উচিত দুর্গাপূজার এই পরিবেশকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা। বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের আজিকার হিমালয়প্রমাণ সঙ্কট দূর করিবার সার্বজনীন চেষ্টা আনিতে হইবে। যে যাহার ঘর গুছাইতে ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ জাতির সমগ্র স্বার্থের অপেক্ষা যেন বড় হইয়া না দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের উদ্দাম সংগ্রামে জয়লাভের জন্য দৈবীশক্তির পূজা নিষ্প্রয়োজন—পূজার আয়োজন করিলেও তাহা মাটিরই পূজা হইবে, চিন্ময়ীর নহে। আমরা যখন চিন্ময়ী মায়ের নিকট যাইব তখন আমাদিগকে যাইতে হইবে বিভেদ, বিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া। তিনি যে বিশ্বজননী—সকলের মা। তাঁহার নিকট যদি সকলে এক হইতে না পারি তাহা হইলে আর কোথায় আমাদের সে সুযোগ আসিবে? সকলের প্রতি মমতাবোধ, সকলের উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা—ইহাই হউক আমাদের সাধনা—সর্বজনের সাধনা। এই সমগ্র সাধনার সিদ্ধির জন্য সর্বেশ্বরীর আরাধনা, তাঁহার নিকট শক্তিভিক্ষা। পূজার এই শুদ্ধ পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—তবেই আমরা জয়লাভ করিব। নতুবা জয় নয়, আমাদের ভাগ্যে লেখা থাকিবে ক্ষয়।

মাকে ডাকিয়া মায়ের সকল সন্তান সুখী হইয়াছে—শুধু একজন, দশজন বিশজনের জয় নয়—সমগ্র জাতির জয় ইহাই যেন আমরা দেখিতে উদ্‌গ্রীব হই। কে পাঁচ দশজন বড় চাকরি পাইল, মুষ্টিমেয় কাহাদের কারখানা, ব্যাবসা ফাঁপিয়া উঠিল তাহাতে বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য সূচিত হইবে না। সহস্রের গৃহে কয়টি জয়ের পতাকা উড্ডীন হইল তাহাই বিচার্য। কিন্তু গোলমাল করিয়া সেই জয় আসিবে না। আসিবে ধীর অধ্যবসায়ে, অকুণ্ঠিত উদ্যমে, আত্মত্যাগে, সততায়, সংযমে। মাতৃপূজায় এই উপচারগুলিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তবেই না বিজয়া আমাদের ললাটে জয়তিলক আঁকিয়া দিবেন? সমগ্র জাতি আবার উঠিতে পারিবে, দাঁড়াইতে পারিবে, হাসিতে পারিবে, উৎসবপ্রাঙ্গণে—উল্লাসে নাচিতে পারিবে। অন্যথা এ উৎসব উৎসব নয়, এ আনন্দ আনন্দ নয়। এ উৎসব শুধু কতিপয় মানুষের স্বার্থসিদ্ধি ও অহঙ্কার-দম্ভের আয়োজন, এ উল্লাস বিশৃঙ্খল অমিতাচারের কর্কশ কলরব।

একা একা ঘরের কোণে বসিয়া কেহ দুর্গাপূজা করে না। এই মহাপূজার সমগ্র পরিকল্পনাটিই বৃহৎকে লইয়া—বৃহৎ প্রকৃতির বহুবিকীর্ণ উপচার সম্ভার, বৃহৎ মানবসমাজের সকল স্তরের লোকের যথাযোগ্য সহযোগিতা, সুবৃহৎ মানব-মনের বিচিত্র আবেগসমূহের লীলায়িত উৎস্ফূর্তি। ব্যষ্টির খণ্ডিত দৃষ্টিকে বিশাল ভূমাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করাই যেন এই উৎসবের লক্ষ্য। বিশ্বময়ীর আবাহনে বিশ্বের কোন কিছুকেই বাদ দিব না, কাহাকেও দূরে রাখিব না—এই ভাবটিই যেন দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত প্রেরণা। দুর্গাপূজার পরিবেশ, লক্ষ্য ও প্রেরণা সমগ্র গণদেহে শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ সঞ্চারের

জন্য। তাই ইহাই বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয় উৎসব। পুরুষ-নারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, শ্রমজীবী-চিন্তাজীবী, বালক-বৃদ্ধ, অভিজাত-নিম্নবর্ণ সকলকেই এই উৎসবে ডাকিবার বিধি। সকলে না আসিলে পূজা সার্থক হয় না। কর্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, অনুভবশক্তি তিনটিই এই পূজায় জাগ্রত করিতে হয়। শুধু চোখের জলের পূজা নয়, ঘাম দিয়া, রক্ত দিয়াও পূজা। শুধু কোমলের পূজা নয়, ভীষণেরও পূজা।

বাঙ্গালীর চতুর্দিকে আজ ক্ষয়ের বিভীষিকা। এই ক্ষয়কে জয় করিতে হইলে জননীর নামে সকলকে এক হইতে হইবে। আমাদের কথা বন্ধ হউক, সারা দেহ-মনঃপ্রাণ অতন্দ্রিত নিঃস্বার্থ কর্মে যেন মাতিয়া উঠে; উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য শান্ত হউক, সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধতায় আমরা সকলে মিলিয়া যেন কল্যাণের অনুসরণ করি; বহু মত, বহু নীতির ব্যবধান দূর হউক, জননী জন্মভূমির বাস্তব সেবা-রূপ এক আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই। পরস্পর আমরা পরস্পরকে বুঝিতে শিখিব, জননী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া বীর্যবান হইব, শ্রদ্ধাবান, চরিত্রবান হইব, হীন স্বার্থপরতা, চপল বিলাস-ব্যসন বিসর্জন দিয়া মননশীল হইব, পরিশ্রমী হইব, আত্মত্যাগী হইব। সমগ্রের বিপদ ব্যথা বেদনা নিজের মানিয়া সমষ্টির জয়ের জন্য যথাসাধ্য নিজের পুরুষকার নিয়োগ করিব।

শিক্ষার পরিবেশ

নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনাটি কৌতুককর বটে, কিন্তু গভীর বেদনাদায়ক। সংবাদে প্রকাশ যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন একটি ঘরে মিটিং করিতেছিলেন তখন ছাত্রেরা তাহাদের কোন একটি বিষয়ের প্রতিবাদ জানাইয়াছে বাহির হইতে ঘরটির তালা বন্ধ করিয়া দিয়া। অবশেষে পুলিশ আসিয়া তালা ভাঙিয়া কর্তৃপক্ষকে ঘর হইতে বাহির করে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নামীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আচার্য এবং বিদ্যার্থীর পূত সম্পর্কের এই শোচনীয় পরিণতি প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীকে দেশের শিক্ষাধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত করিবে সন্দেহ নাই।

ছাত্রছাত্রীরা পিতৃস্থানীয় বিদ্যাদাতা গুরুর নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া লাফালাফি করিতেছে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগে কি ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম? এখন ইহা আমাদের চোখ-সওয়া হইয়া গিয়াছে, কেননা দেশের সমস্ত পরিবেশটাই এখন বিক্ষোভের পরিবেশ; কলে কারখানায়, আফিসে আদালতে, জাহাজে রেলগাড়ীতে, হাটে বাটে ঘাটে মাঠে, সর্বত্র দিনের পর দিন বিক্ষোভ—'মানবো না, শুনবো না, দিতে হবে, শুনতে হবে' রণ-নিনাদ। ছাত্রছাত্রী বেচারীদেরই বা দোষ কি? যাহা দেখিবে, তাহাই তো শিখিবে।

অনেকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী শিক্ষকগণ। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রী ইউ এন্ ধেবরও সেদিন কলিকাতায় কংগ্রেস-কর্মীদের একটি সভায় বলিয়া গেলেন—

"পূর্বে দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই দেশের নেতা সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আজ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক অন্যরূপ হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই শিক্ষার সমস্যাও আমাদের নিকট একটি বিরাট সমস্যা, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের আনুগত্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাহাতে মানসিক মত-বিরোধের অবসান ঘটে।"

আমাদের মনে হয় 'ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা'র জন্য দায়ী যতটা না শিক্ষকগণ, ততটা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষতঃ যাঁহারা রাজনীতির মাতব্বর। ঘরে বাহিরে সর্বত্র আজ রাজনৈতিক দলাদলি—এমনকি বিধান সভায় বিশিষ্ট নেতা, দেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ্গণের পারস্পরিক বিভেদ, সংঘর্ষ, সমালোচনা ও কটূক্তি। তরুণরা তো চোখ বন্ধ করিয়া রাখে না। তাহারাও সংবাদপত্র পড়ে

এবং শ্রদ্ধাস্পদ 'বড়'দের আচরণ বিশেষ মনোযোগের সহিতই লক্ষ্য করে। বড়দের ব্যবহারে, কথাবার্তায় চরিত্রে যদি শৃঙ্খলা, নম্রতা, সংযম না থাকে তো ছোটদের চরিত্রে ঐ গুণগুলি ফুটিয়া উঠিবে কি করিয়া? বড়রা আজকাল ছোটদের মানুষ করার ভার শুধু শিক্ষকদের উপর চাপাইয়া নিজেরা go as you like (যেদিকে খুশী চল) নীতি অনুসরণ করিতে চান। ইহা যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষিত হইবার প্রকাণ্ড অন্তরায়।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ একটি প্রধান কথা। কলিকাতায় এবং কলিকাতার অনুকরণকারী বাংলা-দেশের অপর শহরগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ কোথায়? কলিকাতাকে কিছুকাল পূর্বে আচার্য বিনোবা ভাবে 'নরক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। শুনিয়া কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর প্রাণে আঘাত কিছু লাগিয়াছিল, কিন্তু এই কটু সংজ্ঞাটির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নাই কি? যতলোক এই শহরে ধরিতে পারে তাহার চতুর্গুণ নরনারী যাহারা যেখানে পারে গিজ্ গিজ্ করিতেছে (শুধু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের জন্য নয়, কলিকাতা-রূপ কামধেনুকে দুহিবার জন্য ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম হইতে এবং ভারতের বাহির হইতেও কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষের জমায়েতের জন্যও), কি ছোট কি বড় প্রায় সকল রাস্তারই পাশে পাশে স্তূপীকৃত পচা দুর্গন্ধ আবর্জনা, গলিতে গলিতে এবং সদর রাজপথেরও কোন কোন পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে সুবিধা বুঝিয়া হিন্দুস্থানী ঘরওয়ালীরা ঘুঁটে দিয়া অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা পাইলেই চুকন্দর সিং এবং নন্দন পাঁড়েরা গো-মহিষের অস্থায়ী খাটাল বসাইয়া দিয়াছে! মানুষের পথ দিয়া নিঃসঙ্কোচ সহজতায় মানুষের গতিকে বাধা দিয়া মূলতানী গাভী এবং মালিকহীন ষাঁড়দের ঋজু-কুটিলগতি, ফুটপাথে সদর রাস্তার ধূলা এবং প্রস্রাবের কাদার মাঝখানে তেলেভাজা, কাটাফল এবং আরও কতরকম খাবারের দোকান, তথা দোকানের সামনে রাশি রাশি উচ্ছিষ্টলিপ্ত কাগজ ও শালপাতা। মানুষের বাসস্থানের মধ্যেই ছোট বড় নানা কলের চিমনি হইতে নির্গত ধোঁয়ায় বাড়ীঘরউঠান আচ্ছন্ন। গৃহবাসীদের একরূপ দমবন্ধ অবস্থা। বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই ঠেলাগাড়ী চলিতেছে, সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মালের লরী উন্মত্তবেগে দিকে দিকে ছুটিতেছে, 'জীবন্ত মাল' অর্থাৎ মানুষ গাদিয়া ট্রাম বাস দৌড়াইতেছে। মোড়ে মোড়ে প্রেক্ষাগৃহের সামনে দর্শক-দর্শিকাদের সারি। বালকবৃদ্ধ পুরুষ-নারী সকল লোককেই টানিয়া আনিবার জন্য প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের নিত্য নূতন বিজ্ঞাপন-কৌশল—চোখ ঝলসিয়া যায়, সারা প্রাণ—চিত্র-আরম্ভের সময়টির জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, গৃহিণী সংসারের অন্যান্য খরচ বাঁচাইয়া ছবি দেখিবার পয়সা আলাদা করিয়া রাখেন, ছেলেরা মেয়েরা নানা উপায়ে টিকিটের দাম সংগ্রহ করে। পাড়ায় পাড়ায় কোন না কোন একটা 'ফাংশনে' একাধিক মাইক বাজিয়া সমস্ত পাড়ার কর্ণরন্ধ্রকে বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে। যেদিকে চোখ ফিরাও দুঃসহ কদর্যতা, অন্তবিহীন উত্তেজনা, প্রচণ্ড ব্যস্ততা। প্রত্যূষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তুমুল কোলাহল। প্রধান রব হইল, টাকা, টাকা। এ-ই কলিকাতা। নরক বলিলে খুব অন্যায় হয় কি? এখানে ব্যাবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, যেমন করিয়া হউক, এক মুঠা চাউল বা 'চনা' যোগাড় করিয়া যেখানে হউক সেখানে ছাগল-গরুর মতো পড়িয়া থাকিয়া দেহ-যাত্রা নির্বাহও হয়তো সম্ভবপর, কিন্তু বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার পরিবেশ এখানে নাই, থাকিতে পারে না। অজস্র হুজুগ, অসংখ্য দলাদলি, বিপুল বহির্মুখ আকর্ষণ—ইহাদের মধ্যে থাকিয়া কিশোর মন কখনো বিদ্যায় মনোযোগ দিতে পারে, চরিত্রের শক্তিলাভ করিতে পারে?

কলিকাতার এই নরক-হাওয়া মফস্বলের শহর-গুলিতেও দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে যদি আমরা মানুষ করিতে চাই তবে শিক্ষার পরিবেশকে বদলাইতে হইবে। শিক্ষকগণের এ বিষয়ে ভাবিবার ও করিবার তো আছেই কিন্তু বেশী করিবার আছে অভিভাবকগণের, কল্যাণরাষ্ট্রের নায়কগণের।

শহর ভাল, কিন্তু শহরের নারকীয়তার আশু প্রতীকার প্রয়োজন। বাণিজ্য শিল্পসমৃদ্ধি ভাল, কিন্তু মানুষের মনকে মসীলিপ্ত করিয়া উহা যথেচ্ছ বাড়িতে থাকিলে দেশের আর্থিকসম্পদ্ হয়তো বাড়িবে তবে দেশকে ভবিষ্যতে যাহারা ধরিয়া রাখিবে সেই ভাবী মনুষ্যসম্পদ্‌কে আমরা বিনষ্ট করিব। শহরের জনারণ্যকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, শহরে যদি স্কুল কলেজ রাখিতেই হয় তো শুধু রোজগারের জন্য দিক দিক হইতে আগত শহরের মাটি, পরিচ্ছন্নতা ও মানব-কৃষ্টির উপর মমতাহীন অর্থগৃহ্নু লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, শহরের উত্তেজনা ব্যসন-ব্যস্ততা কমাইতে হইবে, শহরের রাজনৈতিক দলাদলি বন্ধ করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা যাঁহাদের মুখ চাহিয়া চলিবে দেশের ও সমাজের সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিজেদের চরিত্র ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে তপোবন-বিদ্যালয়ে আচার্য শিক্ষার্থিগণকে এই প্রার্থনা শিখাইতেন—

"আমরা কানে যেন মঙ্গলময় শব্দ শুনিতে পাই, যেখানেই যাই চোখে যেন পড়ে শোভন দৃশ্য, আমাদের দেহ মন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন জ্ঞানানুশীলনের কালে স্থির শান্ত সংযত থাকে, আমরা যেন সতত মনে রাখি আমাদের জীবন ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য নয়, উহা বৃহতের সেবার জন্য।" (ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥) বিদ্যার্জনের এই পটভূমি আবার তৈরি করিতে হইবে। বৈদেশিক শাসনকালে দেশে যেটুকু শিক্ষার পরিবেশ ছিল স্বাধীন ভারতে তাহা তো অদৃশ্য হইয়াছেই—আদর্শগত, নীতিগত, কর্মগত যে বিশৃঙ্খলা সকল ক্ষেত্রেই আজ ছাইয়া, তাহা শিক্ষাক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করিতেছে। ব্রিটিশ ভারতেই বাঙ্গলায় ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, অশ্বিনীকুমার, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র এবং আরও কত জ্ঞানী গুণী কর্মীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তরুণদের অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, সারা ভারতবর্ষে সম্মানিত হইয়াছেন। আজ স্বাধীন ভারতে বাঙ্গলায় এই ধরনের মানুষ উঠিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে কি? আজিকার যাহা শিক্ষার পরিবেশ তাহা হইতে বেশীর ভাগই বাহির হইতেছে তরলমতি, ব্যসনাসক্ত, কর্মকুণ্ঠ, বাকসর্বস্ব, স্বার্থপর, আদর্শহীন যুবক-যুবতীরা। ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ কি ইহাদেরই উপর?

"বাস্তবিক যদি কেহ একটি গ্রন্থাগারের সমুদয় পুস্তকাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, তাহার অপেক্ষাও তুমি বেশী শিক্ষিত হইতে পার, যদি মাত্র পাঁচটি ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন ও চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পার।"

"আচার্যের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শ ছাড়া শিক্ষা হয় না। ছেলেবেলা হইতেই এমন একজনের সহিত থাকা উচিত, যাঁহার চরিত্র প্রজ্বলিত অগ্নির মত ভাস্বর। ছাত্রের সম্মুখে থাকা চাই সর্বোচ্চ শিক্ষার এইরূপ একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিড়ম্বনা বর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অকারণে যারা লাঞ্ছনা পায়,—
নিন্দা ও অপবাদ
অজ্ঞাতে তাতে পুণ্যই আসে,
খণ্ডায় অপরাধ।
তাতেই ত্বরিৎ টলেন যে ভগবান,
পায় অমৃতময়ের পরশ প্রাণ,
দেহ মন হয় শুচি নির্মল—
কিছুই থাকে না খাদ।

যন্ত্রণা-ভোগ—এও তপস্যা,—
ইহাতেও আছে লাভ,
হয় দুঃসহ এই সাধনায়
দেবীর আবির্ভাব।
এই পঙ্কেই হেম-অম্ভোজ ফোটে—
রাঙা-পদ্ম এই অশ্রুতে ভিজে ওঠে,
গড়ে জ্বালামুখী তপ্ততোয়া—এ
অপাপ হিয়ার তাপ।

মর্মস্পৃক্ বটে ও বেদনা—
বটে ও দুবিষহ,
তবুও জেনেছি প্রেমামৃতের
তারাই বার্তাবহ।
যত তীব্রতা, তত বেশী তার দান,
দেয় জীবনের সঞ্চয় সুমহান,
স্থাপে যে দিব্য ভুবনের সাথে
সংযোগ অহরহ।

অলীক নিন্দা, অপকলঙ্ক,
নিরীহের নিপীড়ন,
নিরপরাধের অপরাধ ভার
ভগবান নিজে ব'ন।
সত্য এবং পুণ্য ছুটিয়া আসি,
সান্ত্বনা দেন হাসিমুখে ভালবাসি,
দেন দুর্লভ, সুধাসিঞ্চিত
নিবিড় আলিঙ্গন।

নবরাত্র উৎসব

স্বামী ক্ষমানন্দ

রূপ ও অরূপ

হিন্দুশাস্ত্রের দৃষ্টিতে অনাদি অনন্ত চিন্ময় পরমাত্মা লোককল্যাণের জন্য লীলায় বিগ্রহবান হইয়া যুগে যুগে পুরুষ বা নারী শরীর পরিগ্রহ করেন। উপাসকবৃন্দের আত্মতৃপ্তির জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতি মন্তব্য করিয়াছেন—"উপাসকানাং কার্যর্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" সমাজ-জীবনে মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগিনী বা স্বামী ও স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে সাধনার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত করিয়া মানুষ তাহার আরাধ্য দেবতার সহিত যুক্ত হইতে ইচ্ছা করে এবং ইহাতে সাবলীল গতি থাকায় উপাসনা অপূর্ব রসসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতীয় ধর্মসাধনায় এই সকল মানবীয় ভাবের আধ্যাত্মিক রূপান্তর কত

ভাবেই না হইয়াছে! যুগপ্রয়োজনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃশক্তিকেই বিশেষভাবে প্রবোধিত করিয়াছিলেন। আত্মত্যাগ ও সন্তানকল্যাণ-কামনার মাধ্যমে জননীর মহানুভবতা পরিদৃষ্ট হয়। সন্তান যেমন মাতার অতি আদরের তেমনই—মাতাও তাহার নিকট একমাত্র নির্ভরতার আশ্রয়। জগদম্বাকে বাৎসল্যভাবেও উপাসনার বিধান আমরা নানাশাস্ত্রে দেখিতে পাই। শিবগেহিনী উমার বৎসরান্তে পিতৃগৃহ হিমালয়ে আগমন এবং মাতা মেনকার খেদোক্তি প্রভৃতিতে এমন এক মর্মস্পর্শী বাৎসল্যবোধ রহিয়াছে, যাহাতে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বিদূরিত হইয়া উহা স্নেহপ্রাচুর্যে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাই কন্যারূপে দেবীর আরাধনা বাংলার শক্তিপূজার বৈশিষ্ট্য এবং নবরাত্র উৎসব এই শক্তিপূজারই নামান্তর।

বেদে দুর্গা

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।২১) এবং কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রাদি (৪।৩।১৪) গ্রন্থে যে নবরাত্রের বিধান দেখা যায় উহা নয় দিন বা রাত্র সাধ্য যজ্ঞবিশেষ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ "আশ্বিন-প্রতিপদাদি-নবমীপর্যন্ত-নবদিনকর্তব্য-দুর্গাব্রতবিশেষঃ" (শব্দ-কল্পদ্রুম)—আশ্বিন প্রতিপদ তিথি হইতে নয়দিন-ব্যাপী দুর্গাব্রতবিশেষ। এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে চণ্ডীতে উক্ত 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী' (চণ্ডী—১২।১২) শ্লোকের অর্থে 'শরৎ-কালে'র অর্থ শরৎ ও বসন্ত উভয় ঋতুকে বুঝাইতেছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (৪ সং, ৪০ সূ, ৫ ঋ) শরৎ কালে দেবীপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়[1] উক্ত বেদ হইতে নিম্নোক্ত 'হংসাবতী' ঋঙ্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার ভাবার্থ প্রদত্ত হইল।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথি
দুর্রোণসৎ
নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা
ঋতং মহৎ।

সূর্য জানিয়াছিলেন যে পার্বতী পরমব্রহ্ম, তিনি সিংহবাহিনী মহিষাসুরপৃষ্ঠনিহিতচরণা। দক্ষিণায়ন হইলেও আশ্বিন মাসে, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সূক্ষ্মহৃদয়াকাশে তাঁহার মানসপূজা করিয়া বাহ্যপূজা করিতে হয়। স্থূলরূপে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক তাঁহারই প্রকাশ। এই সকল কোন অনিত্য উপাদান হইতে আবির্ভূত হয় নাই, এই স্থূলরূপ তাঁহারই মহিমা।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গার গায়ত্রীমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ'—আচার্য সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন— 'হেমপ্রখ্যামিন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিমিত্যা-গমপ্রসিদ্ধমূর্তিধরীং দুর্গাং প্রার্থয়তে' সুতরাং মূলে উল্লিখিত 'দুর্গি' দুর্গা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। কাত্য অর্থে রুদ্র, রুদ্র হইতে তিনি অবির্ভূতা বলিয়া কাত্যায়নী। কুৎসিত বিনাশ করেন বলিয়া তিনি কুমারী, কন্যা অর্থে দীপ্যমানা এবং দুর্গি দুর্গারই অপভ্রংশ। নারায়ণ উপনিষদেও (১।৬) এই মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। দেব্যুপনিষৎ এবং বেদের অন্যান্য প্রসঙ্গেও আমরা দেবীপূজার নির্দেশ পাই।

পুরাণে দুর্গা

দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীগ্রন্থে (১১।৪৯-৫০) দেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন দুর্গমাসুরকে নিধন করিয়া তিনি 'দুর্গা' নামে লোকবিশ্রুতা হইবেন। এই নাম বেদের নানা স্থানে দৃষ্ট হইলেও লোককল্যাণে তাঁহার পুনঃ পুনরাবির্ভাব সর্বযুগের ঘটনা[2]। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিয়া তিনি শরীর পরিগ্রহ

১ 'ঋগ্বেদে শারদীয়া দুর্গাপূজা' : বসুমতী : আশ্বিন, ১৩৪৫।

২ ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৫৫

করিয়া শরণার্ত দীন সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দেবী ভাগবতে দেখিতে পাই,—দুর্গমাসুর স্বীয় অধ্যবসায় ও তপস্যার প্রভাবে দৈববলে বলীয়ান হইয়া সমস্ত বেদবিধি করায়ত্ত করিলে মহা অনর্থের সূত্রপাত হইল, কেননা, শ্রেষ্ঠবিদ্যা অযোগ্য ব্যক্তির করায়ত্ত হইলে কুফল প্রসব করে। দুর্গম সামগ্রিক ভাবে যাগযজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদি বন্ধ করিয়া দিল। হোমদ্রব্য অগ্নিতে আহুত হইলে উহারই প্রভাবে বৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী শ্যামলশ্রী ধারণ করে। বেদবিদ্যা অনুশীলনের ফলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দিয়া জীবধরিত্রী বসুন্ধরাকে মহাশ্মশানে পরিণত করিল। এই ঘোর বপৎপাতেও শান্তচিত্ত ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়াও ধৈর্য হারাইলেন না, বরং জগতের কল্যাণেচ্ছু হইয়া মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন—

"নমঃ কূটস্বরূপায়ৈ চিদ্রূপায়ৈ নমো নমঃ।
নমো বেদান্তবেদ্যায়ৈ ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ॥
নেতি নেতীতি বাক্যৈর্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ।
তাং সর্বাকারাণাং দেবীং সর্বভাবেন সন্নতা॥"

দেবী ভাগবত, ৭।২৮।৩১-৩২

"বেদান্তপ্রতিপাদিতা কূটস্বরূপিণী ত্রিভুবনবিধাত্রী চিচ্ছক্তিকে নমস্কার। সমস্ত বেদে নেতিপর বাক্যে যিনি বোধগম্যা হন সেই সর্বস্বরূপিণী দেবীকে সর্বপ্রকারে প্রণিপাত করি।

ঋষিগণের আকূতিতে দেবীর করুণার্দ্র হৃদয় ব্যথিত হইল। অপার সৌন্দর্যশালিনী সুনীলবর্ণা, ধনুর্বাণ-কমল-ফলমূলশাকশস্যাদিধারিণী জগন্মাতা অনন্তচক্ষুষ্মতী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। সন্তানবৃন্দের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা দর্শনে অনন্তনয়না জননী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে উহা বৃষ্টিধারায় পরিবর্তিত হইয়া নবরাত্রব্যাপী বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবিত করিল। বালক যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মাতৃসন্ধানে ধাবিত হয় তেমনই সেই মনুষ্যকুল মাতৃকরকমলস্থিত খাদ্যসম্ভার পাইবার জন্য তৎসন্নিধানে কোলাহল করিতে লাগিল। যাবৎ জীবধরিত্রী বসুধা শস্যশালিনী না হয় তাবৎ তিনি শাকশস্যাদির দ্বারা সকলকে ভরণপোষণ করিয়াছিলেন—তাই তিনি দেবী শাকম্ভরী এবং সহস্রচক্ষে ক্রন্দনপরা হইয়া প্রকৃতিকে শীতল করিয়া শতাক্ষী নামে বিশ্ববিশ্রুতা হইলেন। দুর্গমের সকলকে তিলে তিলে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে প্রাণপণ করিয়া ইহা নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইল এবং অগণিত সৈন্য সহায়ে দেবীসহ সকলকে অবরোধ করিলে সকলেই সন্ত্রস্ত হইল। দেবী স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকলকে রক্ষা করিলেন। দশদিনে সমস্ত রাক্ষসবাহিনী বিধ্বস্ত ও নির্মূল হইলে দানবরাজ একাদশ দিনে ভীষণ সংগ্রামে নিহত হইল (দেবী ভাগবত, ৭।২৮)। মানবসন্তানের প্রতি জননীর এই বিচিত্র নবরাত্রির কাহিনী স্মরণার্থই বার্ষিক নবরাত্রানুষ্ঠান।

দুর্গানামের নিরুক্তি

দেবী ভাগবতে শরৎ ও বসন্ত ঋতুদ্বয়কে যমদংষ্ট্রা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সময়ে সংসারে মহামারী জনিত লোকক্ষয় নিবারণের জন্যই দেবীপূজার বিধান। বেদে যিনি অশেষ সংসারসিন্ধুর ত্রাণকর্ত্রী কর্মফলাধিষ্ঠাত্রী সনাতনী বলিয়া কথিত হইয়াছেন, দুর্গমাসুর বধের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া তিনিই 'দুর্গা' নামে বিশ্ববিশ্রুতা হইয়াছেন। স্মরণমাত্রই তিনি দুর্গতি এবং রিপুসঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন (দেবীপুরাণ, ৩৭।১০); ভক্তবৃন্দের বিপদ বিনাশ করিয়া যিনি তাহাদের পরিত্রাণ করেন (দেবী ভাগবত, ৩।২৬।৬০); মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, শোক, দুঃখ, নরক, মৃত্যুদণ্ড, মহাভয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে যিনি সকলকে নিস্তার করেন বলিয়া তিনি দুর্গা। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও মহানিদ্রা (মহাভারত ভীষ্মপর্ব, ২৩শ অধ্যায়)।

ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্যই চিৎসদানন্দময়ী চণ্ডিকার আরাধনা।

'অকাল বোধন'

পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি বৈদিক যুগে শারদীয়া দুর্গার আরাধনা হইত। পরবর্তী যুগে সেই শারদীয়া-অর্চনাই অকালবোধন নামে খ্যাত হইয়াছে। অকালবোধন অর্থে—অসময়ে জাগরিত করণ। মূল বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ না থাকিলেও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণানুসারে শ্রীরামচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তক। কোন কোন পুরাণে দেবীর পূজার কাল এক হইলেও ঘটনা পরম্পরার কিছু পার্থক্য দেখা যায়।[৩] রামচন্দ্রের পূর্বেও স্বীয় জায়ার উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রহ্মা, মধুকৈটভ নাশের জন্য বিষ্ণু, ত্রিপুর সংহারার্থ শিব, বৃত্র বধেচ্ছু ইন্দ্র, পরবর্তীকালে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (দেবী ভাগবত ৩।৩০।২৫)। বহু অসংগতি সত্বেও বর্তমান পূজায় প্রচলিত অকাল বোধনের মন্ত্রের[৪] সহিত সংগতি রক্ষা করিতে হইলে রামচন্দ্রের যুদ্ধার্থ লঙ্কায় আগমনের পরে দেবীপূজার অনুষ্ঠান গ্রহণীয়। দক্ষিণায়নে (শ্রাবণ—পৌষ) দেবতার আরাধনা আশু ফলপ্রদ হয় না, সেইজন্যই দেবতাদের বোধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মন্তব্য করিয়াছেন।

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের শক্তিশেল, নাগপাশ বন্ধন প্রভৃতি বিপর্যয় দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে দেবীপূজায় ব্রতী হইতে বলিলেন এবং উহা দক্ষিণায়ন থাকায় তিনি নিজেই তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া পূজা করিতে সম্মত হইলেন এবং পিতৃপক্ষের (কৃষ্ণপক্ষ) নবমী তিথিতে বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করিলেন[৫]। ব্রহ্মা বোধনের পূর্বে বিল্বপত্রকৃতাশ্রয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী এক বালিকাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্বজগচ্চৈতয়িত্রী দেবী বলিয়া জানিতে পারিয়া বেদোক্ত দেবীসূক্তে তাঁহার স্তব করিয়া জাগাইয়া[৬] রাবণবধার্থ তাঁহার পূজাগ্রহণে স্বীকৃতা করাইলেন।

কল্পারম্ভ, বোধন ও অধিবাস

পূজার সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া আনুষ্ঠানিক-ভাবে পূজা আরম্ভ হইলে উহাকে কল্পারম্ভ বলা হয়। নবম্যাদি, প্রতিপদাদি, ষষ্ঠ্যাদি, সপ্তম্যাদি, অষ্টম্যাদি এবং কেবল অষ্টমী ও নবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত সাত প্রকারের কল্পারম্ভের বিধান দেখা যায়। রামচন্দ্রের পূজায় ব্রহ্মা পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে নবম্যাদি কল্পারম্ভ করিয়াছিলেন। কল্পারম্ভ দিবসে, মধ্যাহ্নের পূর্বে মহানবমী পর্যন্ত চণ্ডীপাঠের সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া পূজার সময় সূচিত হয়। কল্পারম্ভ যে তিথিতে হইবে সাধারণতঃ সেই দিন সন্ধ্যায়

৩ যথা—নারদের পরামর্শে রাম কিষ্কিন্ধ্যায় দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। পরম দেবীভক্ত নারদ (দুর্গাপূজায় নারদই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) আচার্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। দশমীর পূজা সমাপনান্তে সমুদ্রবন্ধনের জন্য উক্ত তিথিতে তিনি যাত্রা করেন।

৪ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতি-রাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥
(কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতি)

মহাষ্টমীর নিবিড় নিশিতে জগন্মাতা আবির্ভূতা হইয়া রামচন্দ্রকে রাবণনিধনের পর পুনরায় বসন্তে এই পূজার অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলেন। (দেবী ভাগবত, ৩।৩০।৪০)

৫ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া॥
(বৃহদ্ধর্মপুরাণ—১।২২।১৪)

৬ পৃথিবীতলমাগত্য ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ।
নির্জনে ক্বাপি দদৃশে বিল্ববৃক্ষং সুদুর্গমে॥
তত্রৈকপত্রে রুচিরে সুচারুনবমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্॥
(ঐ ১।২২।১-২)

দেবীর বোধন হইয়া থাকে। যাঁহারা সামগ্রিক শারদীয়া পূজায় ব্রতী হন তাঁহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণা নবমী, শুক্লা প্রতিপদ বা ষষ্ঠী তিথিতে মধ্যাহ্নের পূর্বে কল্পারম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় বোধন করেন। ব্রহ্মা সিংহবাহিনী দশভুজা দেবীর[৭] মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে অধিবাস[৮] করিলেন। মৃত্তিকা, গন্ধ মাল্য প্রভৃতি ২১।২২ প্রকারের মাঙ্গলিক দ্রব্য সংযোগে দেবমূর্তির যে সংস্কার করা হয় উহাকে অধিবাস বলা হয়। সপ্তমী পূজার পূর্ব সায়াহ্নে পূর্বোক্ত মাঙ্গল্যদ্রব্য স্পর্শে প্রতিমা ও নবপত্রিকার[৯] অধিবাসন হইয়া থাকে।

নবপত্রিকা

সপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে বোধনাঙ্গন হইতে নবপত্রিকাবাসিনী[৯] দুর্গাকে ধারণ করিয়া ব্রহ্মা পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।[১০] দেবীমূর্তির দক্ষিণে নবপত্রিকাকে স্থাপন করিয়া সপ্তমী বিহিত পূজা আরম্ভ হইলে দেবী রামচন্দ্রের ধনুতে অধিষ্ঠিতা হন। তদবধি নবপত্রিকা দেবীপূজার পূর্বে পূজা পাইতেছেন।

দেবীর শতাক্ষী এবং শাকম্ভরী নামে প্রখ্যাতা হইবার কাহিনী আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। 'শাক' অর্থে পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, কাণ্ড প্রভৃতি দশবিধ বস্তুকে বুঝায়। মহাঘোর দুর্দিনে জগজ্জননী শাকসম্ভারে বিভূষিতা হইয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয় নবপত্রিকরূপিণী দেবীকে এই মহাপূজায় পুরোবর্তিনী করিয়া ভারতবাসী তাহাদের অন্তরের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। ফল, পুষ্প, মূল, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শস্য প্রভৃতির দ্বারা কৃষি-সম্পদের প্রতীকরূপে[১১] নবপত্রিকাকে স্থাপিত করা হয়। ফলবৃক্ষের প্রতীক—কদলী, বিল্ব, ডালিম ও জয়ন্তী (জায়ফল)। কিন্তু মতান্তরে জয়ন্তী জ্বরনিবারক বৃক্ষ বিশেষ। মূলজাতীয় গুল্ম—হরিদ্রা, কচু ও মান, অশোক পুষ্পের প্রতীক এবং ধান্য শস্যের প্রতীকরূপে একত্র সন্নিবিষ্ট এবং শ্বেত অপরাজিতা লতায় বেষ্টিত হইয়া—উক্ত নামে অভিহিত হন। ইঁহাতে মাতৃত্ব কল্পনা করিবার জন্য বোধনকালীন বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বযুগ্ম লইয়া পত্রিকাগাত্রে সংলগ্ন করিয়া বস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করা হয়। কদলী বৃক্ষে ব্রহ্মাণী, কচু বৃক্ষে কালিকা, উমারূপে হরিদ্রা, কার্তিকী—জয়ন্তীবৃক্ষে, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবাণী, দাড়িম্বে রক্তদন্তিকা, অশোকবৃক্ষবাসিনী শোকরহিতা, মানবৃক্ষে চামুণ্ডা এবং ধান্যে লক্ষ্মী বিরাজিতা রহিয়াছেন। ইহা ছাড়া দেবীযন্ত্র নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ—পূর্ণ কলস অন্যতম প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

চতুরাবয়বী পূজা

এই পূজা চতুরাবয়বী—স্নপন, পূজন, হবন ও বলিদান। মহাষ্টমীর দিন কুলাচার অনুসারে কুমারী পূজারও বিধান দৃষ্ট হয়। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থোদক, নানা মাঙ্গল্যদ্রব্য, বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা মহাস্নানের উপকরণ। অকিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি পরিত্যক্ত স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া মৃত্তিকাস্নানে ব্যবহৃত হয়। 'সবার স্পর্শে পবিত্র করা' মায়ের পূজায় কেহই বাদ পড়ে না। পূজার পূর্বে পঞ্চ শুদ্ধি[১২] করা আবশ্যক। বিধি অনুসারে স্বীয় শরীর, পূজাস্থান, দেবীর বীজমন্ত্র, পূজা-দ্রব্য ও দেবী-

৭ পৌরাণিকী তু যা মূর্তির্দেবী দশভুজাপরা।
তস্যাং মূর্তিং বিনির্মায় মৃন্ময়ীং সিংহবাহিনীম্॥
(মহাভাগবত, ৪৩।৮৮)

৮ সায়ং কৃতাধিবাসান্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ঐ ৪৭।৫১

৯ কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥
(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

১০ পত্রীং প্রবেশ্য সপ্তম্যাং দেবীং তাং সমপূজয়েৎ।
পত্রীপ্রবেশমাত্রেণ সর্বসংহারকারিণী।
রাবণস্য বধার্থায় শ্রীরামধনুরাবিশৎ॥
(মহাভাগবত, ৪৭।৫২)

১১ 'দুর্গা' পুস্তকের অবতরণিকা (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী লিখিত)।

১২ আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ॥

প্রতিমা শোধন না করিলে পূজা সিদ্ধ হয় না এবং এই সব নৈমিত্তিক পূজা যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে হয়। সপ্তমীর পরদিবসে মহাষ্টমী পূজা। এই পূজা উপবাসপ্রধান। অসমর্থ হইলে অন্ততঃ মহাষ্টমীতেও লোকে উপবাস করে। স্থানে স্থানে এই তিথিকে দুর্গাষ্টমী বা বীরাষ্টমী বলা হয়। এই দিন দেবী নবঘটে আহূত হইয়া নবদুর্গা পূজিতা হন, সন্ধিপূজা পূজার বিশেষ অঙ্গ। অষ্টমী ও নবমীর সংযোগই সন্ধিক্ষণ, প্রতি তিথির ২৬ মিঃ সময় লইয়া ৫২ মিনিটে এই পূজা সম্পন্ন করিতে হয়। সন্ধিকালে রাবণের দশমুণ্ডই রামশরে নিপাতিত হইয়াও পুনঃসংযুক্ত হইল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলে যুদ্ধে এক অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইল। ক্রুদ্ধা দেবীর ললাটদেশ হইতে করালবদনা চামুণ্ডা নির্গত হইয়া চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিলেন। সন্ধিক্ষণে চামুণ্ডারই পূজা হইয়া থাকে। মহানবমীতে রাম দেবীকে বিবিধ উপচার এবং বলিদান সহকারে আরাধনা করিলেন। সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপ্রবেশের সঙ্গে দেবী রামচন্দ্রের ধনুতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, আজ রাবণনিধনের জন্য তাঁহার শরে অধিষ্ঠিতা হইলেন। অপরাহ্নে সেই শরাঘাতে রাবণ প্রাণত্যাগ করিলে পৃথিবী শান্ত হইল।

বলিদান পূজার অন্যতম উপাদান। উপহার অর্থে ইহা প্রযুক্ত হয়। অধিকারী ভেদে পশু, কুষ্মাণ্ড বা নৈবেদ্যাদি বলি নিবেদিত হয়। পরের উৎসাদনের জন্য যাহারা দেবীকে রুধিরাক্ত পশু বলি নিবেদন করে তাহারা তামসিক ভক্ত। রাজসিক উপাসকও উক্ত বলির সহিত নানাবিধ সামিষান্ন নৈবেদ্যও নিবেদন করিয়া জগন্মাতার আরাধনা করে। সাত্ত্বিক 'আত্মবিজ্ঞানশালী' সাধক'[১৩] পশুবলি প্রদান করেন না। তাঁহার পূজা আড়ম্বরবর্জিত। অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার কৃপায় তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মময়ী জগন্মাতাকে উপলব্ধি করিয়া সংশয়বিমুক্ত হন। 'মোক্ষদারকপাটপাটনকরী' সেই দেবী অর্গল না মুক্ত করিলে মানুষ সেই মার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

(চণ্ডী ১।৫৬-৫৭)

কুলাচার অনুসারে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিন দিনই হোম হইয়া থাকে, অন্যথায় মহানবমী-পূজার অন্তে। আহুত দ্রব্যাদি দেবতা বিশেষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া অগ্নির কার্য। এই পূজায় বৈদিক বা তান্ত্রিক হোম অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয়া

দশমী দিবসে ব্রহ্মা জলধিজলে সেই প্রতিমা বিসর্জন করিয়াছিলেন। সেই দিনই রামের বিজয়োত্তর অযোধ্যা যাত্রা আরম্ভ হইল, তাই ইহা বিজয়া দশমী। বিজয়াকৃত্য-সমাপন হইবার সময় যখন প্রদক্ষিণস্তুতি পঠিত হয় তখন সকলের মন করুণভাবে ভরিয়া উঠে। বিসর্জন অর্থে বহিঃপূজিতা দেবীকে স্বীয় অন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। প্রতিমাবিসর্জনের পরে সকলে দেবীর আশিস্‌স্বরূপ শান্তিবারি মস্তকে ধারণ করিয়া সেই অহেতুক মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিবার জন্য সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। বাংলার বিজয়ানুষ্ঠান এক অভিনব ব্যাপার!

এ পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গোৎসবের কথা আলোচিত হইয়াছে। 'শরৎকালে মহাপূজা'র ব্যাখ্যায় টীকা-কারগণ বসন্তঋতুকেও উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পূজার সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করিলে নবরাত্র উৎসব সম্পর্কে বক্তব্য থাকিয়া যায়। মেধসমুনির আশ্রম-তীর-বিধৌতা নদীতীরে সুরথ ও বৈশ্য এই বসন্তকালেই কঠোর তপস্যা করিয়া অভীপ্সিত বর লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বসন্তে দেবীর

১৩ সাত্ত্বিকং ভাবমাশ্রিত্য যেঽর্চয়ন্তি মাং জনাঃ।
ন তৈর্বলিঃ প্রদাতব্যো ন দেয়ং সামিষান্নকম্॥
(মহাভাগবত, ৫৭।৫)

পূর্ব আদেশ অনুসারে পুনরায় পূজা করিয়াছিলেন। বোধনানুষ্ঠান ব্যতিরেকে এই পূজার ক্রম সমস্তই শারদীয়া পূজার ন্যায়। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই বাসন্তী দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

স্মরণাতীত যুগ হইতে আমাদের দেশে চিন্ময়ী জগদম্বার উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। চিরকালই শ্রেয়-প্রেয়াভিলাষী ভক্তবৃন্দ তাঁহার চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া বাঞ্ছিত বস্তুলাভে ধন্য হইয়াছে। বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে সুর মিলাইয়া সেই পরম-পাবনী মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করি—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং
কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি
তরসে নমঃ॥
(তৈঃ আরণ্যক, ১।১।৫৭)

কবির ভারত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ধর্মক্ষেত্র এ ভারত কবিরই জগৎ
কবিই তাহারে বিশ্বে করিয়াছে এত সুমহৎ।
কবির ধেয়ান
শত শত মূর্তি মঠ স্তূপে স্তম্ভে হ'ল মূর্তিমান্।
উক্‌থ সূক্ত কবির রচিত
বন্দনার মন্ত্র হয়ে সন্ধ্যাপ্রাতে হয় উদীরিত
সারা দেশ করি মুখরিত।
গিরীন্দ্রে হেরিল কবি গৌরীগুরুরূপে
শঙ্করের অট্টহাসি হেরিল সে তুষারের স্তূপে
গঙ্গার নদীত্ব করি লোপ।
করিল সে অঙ্গে তার তরঙ্গিত দেবীত্ব আরোপ।
শত শত পুণ্যতীর্থ তপোবন করিয়া রচনা
অশ্বত্থে দেবত্ব-দান তাহারি কল্পনা।

কবি রচি বেদোপনিষৎ
রচি গীতা শ্রীমদ্‌ভাগবত
ধর্মের ভারত আজো করিছে শাসন
ভক্তের সম্বল শুধু কবিরই ভাষণ,
তার কণ্ঠে কবি করে শুভাধিবাসন।

কে দেখালো পরমেশ রাজে
চরাচরে বায়ু-ব্যোমে সূর্য্য-সোমে মেঘবহ্নি মাঝে।
শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরামে বুদ্ধে শ্রীশচীনন্দনে
ভগবান ছিলেন গোপনে
এই মর্ত্যলোকে
ধরা তা পড়িল বলো আর কার চোখে?

কবির কাব্যের প্রয়োজনে
নামেন শ্রীভগবান আজো নিত্য কবিদের মনে।
সহস্র সহস্র কবিচিত্ত-সিন্ধু-মথিত অমৃত
তাই দিয়া এ ভারতে ভগবান হলেন রচিত।

যদিও চিন্ময় ব্রহ্ম তবু তাই পেয়েছেন রূপ
অপূর্ব লাবণ্যঘন। যদিও ত্রিভুবনের ভূপ
হয়েছেন বংশীধর ব্রজের রাখাল,
যশোদার মাতৃ-অঙ্কে শ্রীনন্দদুলাল।
রসে তাই তাঁর প্রীতি গীতে তাই তাঁহার বোধন
গন্ধে তাঁর অধিবাস ছন্দে তাই তাঁহার মোদন।
যোগায় কেহবা পুষ্প কেহ ধূপ কেহ বা চন্দন
কেহ করে চামর ব্যজন।
কেহ আনে গঙ্গাজলে পূর্ণ করি ঝারি
কবি ছাড়া কেহ তাঁর নয়ক পূজারী।

বিবেকানন্দ ও আমেরিকা

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

অনেক কাল পরে কলকাতার মার্কিন বন্ধুরা নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের স্বাধীনতা উৎসবে ৪ঠা জুলাই। মনে পড়ে গেল ১৯০২ সালে ঐ দিনই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান বেলুড় গঙ্গাতীরে। কিন্তু স্বল্পায়ু জীবন ৩৯ বছরে শেষ হবার আগেই স্বামীজী যে সারা আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে এসেছেন তাই নয়, মার্কিন শিষ্যশিষ্যাদেরও এই গঙ্গাতীরে টেনে এনেছেন—হয়তো মার্কিন ভক্ত নির্মিত বেলুড় মন্দিরই তার নীরব সাক্ষী। আমি শুধু সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের দু'একটা পাতা উল্টে ৪ঠা জুলাই—স্বামীজীকে অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

১৮৮৫।৮৬ সাল সকলেরই মনে আছে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের ১ম ও ২য় অধিবেশন বোম্বাই ও কলকাতায় হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বর্গ আরোহণের পর তাঁরই নির্দেশমত শিষ্য নরেন্দ্র অন্য গুরুভাইদের নিয়ে এলেন বরানগরে; সেখানে

মঠ ছিল ১৮৮৬-৯২ (পরে সরে এল দক্ষিণেশ্বর উপকণ্ঠে আলমবাজারে ১৮৯৭ পর্যন্ত)। বাঙলার কোলে গরীব সর্বহারা সন্ন্যাসীদের মঠ থেকে বিশ্ব-ব্যাপী 'মিশন' কি করে হ'ল? সেকথা বাঙালীও ভুলতে বসেছে!

- বরানগরে তপস্তার ফলে আমরা পেলাম 'ভারত পথিক' নরেনকে; হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত অনুভব করেন, "শক-হূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" তাঁর বিশাল বক্ষে ঝাপটা দিল ভারতের জনসাধারণের বিরাট দুঃখবেদনা। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে যেন পরিব্রাজক নরেন খুঁজেছিলেন বিত্তশীল বস্তুবাদী পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহচর্য। শুধু ইংরেজী ভাষাটা নয় ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছেন যখন গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরে নরেনের পরিচয় হল দেওয়ান শংকর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে (তখন তিনি বেদের অনুবাদ করছেন)। সেই বেদজ্ঞ দেওয়ানই নরেনকে উপদেশ দেন পশ্চিমে যেতে। হয়ত তাঁর কাছেই নরেন খবর পান, আমেরিকা ভারতকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—Parliament of Religions···শিকাগো সভা থেকে। ১৮৯২ সালে ৪০০ বর্ষ পূর্তি কলম্বাস (Columbus) কর্তৃক আমেরিকা (তথা পশ্চিম-ইণ্ডিয়া) আবিষ্কারের।

কাথিয়াওয়াড় থেকে মধ্যভারতে এসে খাণ্ডোয়া শহরের ভক্তদের কাছে স্বামীজী প্রথম জানালেন তিনি প্রচারার্থে আমেরিকা যেতে ইচ্ছুক। তখনই বোম্বায়ে গুরুভাই কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা—তিনিও সাক্ষী। কত রাজা মহারাজ পাথের অর্থাদি দিতে চেয়েছেন কিন্তু নেন নি। শেষে নিলেন রাজস্থানের ক্ষেত্রীরাজের দান ও তাঁর দেওয়া মর্যাদা 'বিবেকানন্দ' নাম। সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ৩১শে মে ১৮৯৩ সালে স্বামীজী ভাসলেন: বোম্বাই থেকে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যান্টন্ (Sun Yat Sen-ও স্বামীজীর যুগ-ভ্রাতা), ইওকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও, ভান্‌কুভর পার হয়ে পরিশেষে শিকাগো। এই সব জায়গায় নিজেও যখন ঘুরেছি স্বামীজীকে মনে পড়েছে; আর অবাক হয়েছিলাম দেখে যে ঠিক ৬০ বছর পরে (১৯৫১) সেই শিকাগো শহরেই আতিথ্য লাভ হল—স্বামী বিশ্বানন্দের (শিকাগো বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ) তিনি তাঁর বেদান্ত-কেন্দ্র থেকে সপরিবারে আমাকে একটি বাড়ীতে তুললেন যে বাড়ী থেকে দেখা যায় বিবেকানন্দের ঘরের বারান্দা! তাঁর অনেক মূল্যবান চিঠিপত্র এই অঞ্চল থেকে লেখা (Dearborn Avenue); ১৯৫৩ বিবেকানন্দ প্রচারের হীরক-জয়ন্তী।

১৮৯৩ জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি শিকাগো পৌছান অথচ প্রায় দু'মাস পরে সেপ্টেম্বরে বসল ধর্মমহাসভা; কাল-সঙ্কটের চেয়ে ভয়াবহ হল অর্থ-সঙ্কট, সেটা কিভাবে মিটল ও নারী-হৃদয়ের দাক্ষিণ্যের কথা তিনি বহু স্থানে লিখেছেন আমরাও জেনেছি। কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ভুল্‌তে বসেছে বাঙলার এক সন্ন্যাসী এসে কেমন সহজে তাদের সম্পদ-বিপদের সাথী ও কল্যাণ-মিত্র বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে তিনি পেয়েছেন যতটুকু তার চেয়ে দিয়ে গেছেন অনেক—একথা হয়ত বিশ্বসঙ্কটে ধ্বংসোন্মুখী আমেরিকা একদিন বুঝতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর নব প্রকাশিত গ্রন্থে গবেষণার প্রভূত সাহায্য করেছেন বলে তাঁর সাধুবাদ করি।

মাকিন-আবর্তে পড়ে প্রথমটা বিবেকানন্দকেও হাবুডুবু খেতে হয়েছিল; কিন্তু কত শীঘ্র ও সহজে তিনি টাল সাম্‌লে নিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। তারাও প্রথমটা হয়ত ভুল বুঝে ক্রমশঃ তাঁকে হিতৈষী বন্ধু বলেই বরণ করেছিল: ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত একটানা আমেরিকায় সাধনার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হলে সেটি পরিস্ফুট হবে।

আমেরিকাও বিবেকানন্দ-বেদান্ত গ্রহণের জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হচ্ছিল, সে ইতিহাস প্রায় বিস্মৃতপ্রায় বলে কিছু ইসারা রেখে যাবো। ভারতের তরুণ দল আজ অতি সহজে Fulbright বৃত্তি পেয়ে উড়ো জাহাজে আমেরিকা যাচ্ছে কিন্তু কাউকেই এ সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে দেখছি না: বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা এগিয়ে আসুক। অধ্যক্ষ তেজসানন্দজীকে এই অনুরোধ জানিয়ে রাখি।

রামমোহন রায়ের বেদান্তসার বঙ্গানুবাদ বাঙলা দেশে আলোচিত হয়েছে কিন্তু তার ইংরেজী অনুবাদ (১৮১৮) লণ্ডন থেকে বোষ্টন পৌছেছিল তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন মনীষী এমার্সনের (Emerson) অভিভাবিকা; তিনি হার্ভার্ডের ছাত্র এমার্সনকে রামমোহনের বেদান্ত পড়তে আদেশ করেন। Brahma কবিতা ও Over-soul প্রবন্ধে এমার্সন তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এমার্সনের কাছ থেকে বেদান্তের ছোঁয়াচ লাগল থোরিও (Thoreau) (সাত্ত্বিক নন্-কোঅপারেশনের গান্ধী-গুরু) ও শেষে বিশ্বকবি হুইট্‌ম্যান (Whitman) কে (১৮১৯-১৮৯২)। ১৮৪০এ প্রতিষ্ঠিত হল অতীন্দ্রিয়বাদী ট্রানসেন্‌ডেন্টাল ক্লাব (Transcendental Club) ও ১৮৪২এ আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি (American Oriental Society) যাদের সাহায্যে মার্কিণ-চিন্তাধারা ও পাণ্ডিত্য ভারতমুখী হয়েছিল। ১৮৮২তেই দেখছি বাঙালী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম ও একেশ্বরবাদ প্রচার করে এলেন (তিনিও বিবেকানন্দের সঙ্গে চিকাগো সভায় ছিলেন), কর্নেল অলকট (Col. Olcolt) ব্লাভেস্কি (Blavatsky) ও অ্যান্নিবেসান্ট (Anne Besant) প্রমুখ থিয়োসফিষ্টগণও তাঁদের মতন করে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। শেষে খাঁটি সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মপাল ও চিকাগোতে এলেন এবং বিবেকানন্দকে দিয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমি অবাক্ হলাম বিবেকানন্দের নতুন চোখে আমেরিকা দেখায়; পরিশ্রমী গবেষক এ বিষয়ে "Discovery of America" (1893-1902) লিখে যশস্বী হতে পারেন।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকায় পদার্পণ করেন হুইট্‌ম্যানের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই; হুইট্‌ম্যানের বিশ্ববিশ্রুত কাব্য 'ঘাসের পাতা' (Leaves of Grass) ছাপা হয় ১৮৫৫ তে; তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ-বছর কালিফোর্নিয়ায় মার্কিণ ছাত্রদের সেদিন বলেছি যে কবির দেশে বাঙলার বিবেকানন্দ হুইট্‌ম্যানের কবিতা ভাল করেই পড়েছিলেন; তাঁর "ভারতে চলো!" (Passage to India) (১৮৬৯ গান্ধিজন্ম-বৎসরে রচিত) ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ইঙ্গিতে ভরা। পূর্ব ও পশ্চিমের উদ্বাহব্রত—উৎযাপিত হবে যদি আমেরিকার নিছক বস্তুতান্ত্রিক মন ছোটে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পানে, আর ভারতের বস্তুজ্ঞান-শূন্যতা আমেরিকার লোকহিতবাদী পদার্থবিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। অজ্ঞাতসারে শুধু কবি-প্রেরণার বলে—হুইট্‌ম্যান এই বাণীই প্রচার করেন; এবং বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে তাঁকে "The Sannyasi of America" (আমেরিকার সন্ন্যাসী) আখ্যা দেন—তখন হয়ত সারা ভারতে হুইট্‌ম্যান পাঠ করেছে কম লোকই। আমি পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হুইট্‌ম্যানের জীবনদীপ যে ঘরে নির্বাপিত হয় সেই ঘরে গেছি ও Camdon-এর বাড়ীর গ্রন্থাগারটি দেখেছি—হঠাৎ চোখে পড়েছিল দার্শনিক এমার্সনের উপহার কবি হুইট্‌ম্যানকে দেওয়া ভগবদ্‌-গীতা, তার পাতায় পাতায় হুইট্‌ম্যান নিজের হাতে নোট লিখেছেন! দেখে শরীর পুলকিত হয়েছিল—সে কথা হাওয়াই (Hawai) ও আমেরিকার বহু বক্তৃতায় বলেছি। বিবেকানন্দ ১৯ শতকের শেষ দশকে আমেরিকায় এসেছিলেন

শুধু ভারতের মিশনেই নয়—এক বিশ্বসমন্বয়ের মিশন নিয়ে—সেকথা আজ আমেরিকা ভুলতে বসলেও ভারতবাসী যেন না ভোলে। দলিলসংযোগে একথা প্রমাণ করে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই—শরীর ভেঙ্গেছে, কিন্তু আর একটু ইঙ্গিত এখানে দিয়ে যাই। মনীষী রম্যা রল্যার সঙ্গে যখন 'মহাত্মা গান্ধী' 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ'শীর্ষক গ্রন্থত্রয়ীতে সহযোগিতা করি তখন তাঁর কাছেই শুনেছি ও দেখেছি যে ঋষি টলষ্টয়ও শেষ জীবনে ভারতী প্রেরণা খানিকটা বিবেকানন্দের ছোঁয়ায় পান (তার বহু প্রমাণ সোভিয়েট গবেষকরা প্রকাশ করবেন) একথা আমার Tolstoy and Gandhi গ্রন্থে দেখিয়েছি। ভূতুড়ে 'যোগী'দের কবল থেকে মার্কিণদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ দুই বছর আমেরিকায় কাজ করার পর পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ইংরেজীতে প্রকাশ করেন (১৮৯৫); সেই ৩২ বছর বয়সের হিন্দু যোগীর 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি আশীতিপর ঋষি টলষ্টয় পাঠ করে মুগ্ধ হন। পতঞ্জলির বিবেকানন্দভাষ্য রুশ ভাষায় কী আকার নেবে সেটি ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র।

হাজার দ্বীপের (Thousand Island Park) বাগানে যে সাধন কুটীর স্বামীজী গড়ে তোলেন ও সেখানে যেসব গভীর আলোচনা হত তার বিবরণ স্বামী নিখিলানন্দ প্রকাশ করেছেন, তেমনি আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক—বিস্তৃত বিশাল আমেরিকার কত ছোট বড় বৈঠকে বিবেকানন্দ ভারতীয় সাধন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার কিছু রক্ষা পেলেও অনেক হারিয়ে গেছে পুনরুদ্ধার করতে সন্ধানীদের নামতে হবে। সারদানন্দ ও অভেদানন্দকে স্বামীজী যেদিন থেকে পশ্চিমে টেনেছেন তখন থেকে তাঁদের ও অন্যান্য কর্মীদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সব দলিল ভাল করে পড়লে তবেই এ বিরাট প্রচার কাহিনী বোঝা যাবে। ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপ হয়ে ভারতে ফেরবার আগে কেন দুটো বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া—প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক রূপে বিবেকানন্দকে বরণ করতে চেয়েছিল? যোশিয়া রয়েস্ (Josiah Royce) ও উইলিয়ম্ জেম্‌সের (William James) মত শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা কেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন? মাদাম কালভের (Madame Calve) মত উচ্চ কোটীর সুরশিল্পী বাঙালী ওস্তাদ বিবেকানন্দের মধ্যে কোন্ সুরের সন্ধান পান? নিরীশ্বরবাদী বাগ্মী রবার্ট ইঙ্গারসোল্ (Robert Ingersoll) কেন বিবেকানন্দমুখী হন? সর্বোপরি বিস্ময়কর এই যে ব্রজেন্দ্রশীল-সতীর্থ নরেন্দ্র-বিবেকানন্দ কেন নিউ ইয়র্কে লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) ও অধ্যাপক হেলমহোজ (Prof. Helmholz) এর মত দুর্জয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে যান? আবার বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে ওস্তাদ নিকোলা টেসলকে (Nekola Tesla) সাংখ্যদর্শনের বস্তু ও শক্তি-তত্ত্ব কেন বুঝিয়ে ছিলেন? আবার সেই বিবেকানন্দই ১৯০০ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক সভায় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথম জয়ধ্বনি করেন। এসব কথা অনেকে ভাবেননি যখন আচার্য ব্রজেন্দ্রশীল তাঁর Hindu Positive Science পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। জগদীশ-জীবনীতেও উল্লেখ আছে কিনা জানি না।

১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দু'বছর কঠিন পরিশ্রম করে বেলুড়ে মঠ ও মিশন, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকা স্থাপন করে কোন্ সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গেছেন ভারত-পথিক বিবেকানন্দ? আবার আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে এসে জার্মাণ পণ্ডিত বৈদান্তিক ডয়সন (Deussen) ও বেদজ্ঞ ম্যাক্সমূলর (Max Muller)এর সংযোগ কেন করেন? নারদের ভক্তিসূত্র অনুবাদ করে ইংলণ্ডে বিবেকানন্দ কি কাজ করে গেছেন? কেমন করে ভগ্নী নিবেদিতাকে

ভারতমাতার কোলে এনে দেন? এসবই নূতন করে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়বার আমেরিকা পরিক্রমার কাহিনী অলিখিত থাকায় নষ্টপ্রায়, উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। কালিফর্ণিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আজ বহু বেদান্ত-কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। স্বামী প্রভবানন্দ টেনে এনেছেন ইশারউড (Isherwood) জেরাল্ড হার্ড (Gerald Heard) ও অলডাস হাক্সলি (Aldous Huxley) কে। তারও সূচনা করেন কালিফর্ণিয়া 'বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ। কালিফর্ণিয়াব সন্নিকটে পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ কাজ করছে বিরাট বিশ্বের মানচিত্র গড়তে; আবার তারই কাছে নেভাডার (Nevada) মরু প্রান্তরে চলছে গোপনে এই ছোট্ট পৃথিবী তথা মানব জাতির চরম মারণাস্ত্র নির্মাণঃ অ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমা! বড় বৈজ্ঞানিকরা আজকার আমেরিকায় সাহস করে প্রতিবাদ করেছেন না তবু মৃত্যুশয্যা থেকে জার্মাণ মার্কিন মনীষী আইনষ্টাইন তাঁর শেষ প্রতিবাদ ও সংকল্পবাণী ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বারট্রাণ্ড রাসেলের Bertrand Russel) হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের শেষ স্বপ্নের শুধু কাগজেই লেখা থাকবে, আর শক্তির তামসিকতায় উন্মত্ত জগৎ চরম যুদ্ধে আত্মঘাতী হবে? এর জবাব দিয়েছে—বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-গান্ধী নেহরুর ভারত। আবার ডাক পড়েছে ভারতের জীবরক্ষার ব্রতে অগ্রসর হবার। তাই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে আজ বারবার মনে পড়েছে—উদ্বোধনের মারফতে সেটি জানিয়ে গেলাম। ১৮৯৮ সালে ভারতে বসে বিবেকানন্দ ৪ঠা জুলাই-এর মার্কিন তথা বিশ্ব স্বাধীনতা দিবস পালন ও কবিতা রচনা করেন। তার চার বছর পরেই ৪ঠা জুলাই বেলুড়ে দীপ-নির্বাণ।

মাটির প্রদীপ নেবে আবার জ্বলে যুগের গুরু সাধক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর গানে এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। মানব ইতিহাসের রক্ত সন্ধ্যায় নেবা-দীপ আবার জ্বলবে না কি?

একটি নবীন বিশ্বের কল্পনা*

ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্

যদি একজন ভাবী ঐতিহাসিককে বর্তমান যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করিতে বলা হয়, তবে তিনি আমাদের সংবাদপত্রগুলির বড় বড় শিরোনামার রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধের জনরবের কথা উল্লেখ করিবেন না, বলিবেন মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের কথাই। মানুষের যে একতা নবজন্ম লাভ করিতেছে উহাই হইল এই যুগের প্রধানতম চিহ্ন। এই ঐক্য-সাধনের অগ্রদূত-রূপেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কাজ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের কাজে ইহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমরা এখনও অতীতের উত্তরাধিকার অত্যুগ্র জাতীয়তা এবং ভবিষ্যতের আশা—ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব—এই দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছি। এই সম্মিলিত বিশ্বের প্রতিষ্ঠা-কার্যে যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে উহারা মানুষের মনেই বর্তমান। এখনও আমরা পরস্পরের

* লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র 'Vedanta for East and West' (July-August, 1955)-এ প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।　　অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ উপলব্ধি করিতেছি না। অতএব, মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের জন্য কাজ করা আমাদের সকলের, বিশেষতঃ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত নরনারীগণের অবশ্য কর্তব্য।

অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় পরিবর্তনসমূহ আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত এবং জগদ্বাসীকে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। বিশ্বের ঐক্য সম্ভবতঃ বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উপরও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের এবিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখিবেন, প্রকৃত বিশ্বমৈত্রীর জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক বুঝাপড়া ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রয়োজন তাহা বাহ্যিক কলাকৌশল দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। যদি তোমরা মানব-সমাজের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে চাও, তোমাদিগকে মন ও আত্মার ক্ষেত্রেই উহা গড়িতে হইবে।

সভ্যতার মূলনীতি

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ (Scientific Naturalism) অথবা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের (Scientific Humanism) সমর্থকগণ বলেন, পরমত-অসহিষ্ণুতাই ধর্মের প্রধান অনর্থ। যাহারা আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদের প্রতি আমরা সহানুভূতিসম্পন্ন, আর যাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে তাহাদিগের প্রতি আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। ধর্মজগতে আমাদিগকে এই যে মূলগত বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া চলিতেছে, প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বিভিন্ন মতবাদগুলি পরস্পরের অতি সান্নিধ্যে আনীত হইয়াছে, এবং যদি আত্মিক ভিত্তির উপর কোনপ্রকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহানুভূতির ভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। ধর্মসমূহের একীকরণের কথা আমরা বলিতেছি না; সকল ধর্মেরই কতকগুলি মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি আছে—যেগুলি এই জড়জগতের আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ;—আমরা সেগুলিকেই স্বীকার করিতে বলিতেছি।

সকল ধর্মই ঘোষণা করে—মানবসভ্যতার মূলতত্ত্ব হইতেছে ব্যক্তির মর্যাদা ও সৌভ্রাত্র-বোধ। আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালেই প্রচারিত হইয়াছে—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ নহে; সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বলেন—সুযোগ পাইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন করা সম্ভবপর। মানুষের আত্মা ঈশ্বরের জ্যোতি। "স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে" —খ্রীষ্টানগণ বলেন। সাধু পল বলিয়াছেন—"তুমি কি জান না যে, তুমি ভগবানের মন্দির এবং ঐশ্বরিক শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে?" মহম্মদ বলিয়াছেন—গ্রীবার ধমনী অপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদের নিকটতর। সংক্ষেপতঃ, সকল ধর্মই স্বীকার করে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা আছে এবং জাগতিক অভ্যুদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সত্তারই পূর্ণবিকাশের সহায়তা হয়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কেবল ইহাই নহে: সকল ধর্মের আরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—প্রেম। ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ-ভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মের একটি প্রমাণসিদ্ধ বাণী আছে—আর্ত মানবের প্রতি করুণা। আমরা ইহাকে অহিংসা বা ঈর্ষাহীনতা বলি। বুদ্ধ ইহাকে করুণা বা দয়া বলেন। খ্রীষ্টানগণ ইহাকে প্রেম বলেন—যে প্রেম সার্বজনীন, সক্রিয়, সর্বগ্রাহী, আনন্দময়, এবং জগতের পাপ দূর করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিণত করে। এই প্রেমের ভাবই আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি এই প্রে-

জাগ্রত হইলে আমাদের বর্তমান অবস্থা আরও উন্নততর হইবে।

ভারতের পুরাবৃত্তে আছে অসুর ও দেবগণ একই সাধারণ পিতার সন্তান। তোমার শত্রুর হৃদয়ের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলে তথায় তোমার ভ্রাতাকেই দেখিতে পাইবে। এই নিগূঢ় জগতে মুক্তি ও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন কোন দল নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। তোমরা দেখিবে, যদি এক পক্ষে দোষ থাকে তাহা হইলে কোনও বিবাদ থাকিবে না। কোনও বিবাদে উভয় পক্ষের দোষ-ত্রুটি আছে বলিয়াই বিঘ্ন ও সঙ্কট উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় বিশ্বে মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্ক-স্থাপনের জন্য আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুতা, সহানুভূতি ও বিবদমান মতবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থানের মনোবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই মনোবৃত্তির জন্য প্রয়োজন মানুষের মন ও হৃদয়ের বিপ্লব। কেবল বৃথা বাক্য-ব্যয়ে ইহা সাধিত হইবে না। যে-সকল বিষয় আমরা বাস্তবজীবনের আচরণে বিশ্বাস করি, সেগুলিই আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় ও ধর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া থাকি।

বোঝাপড়ার দৃষ্টিভঙ্গি

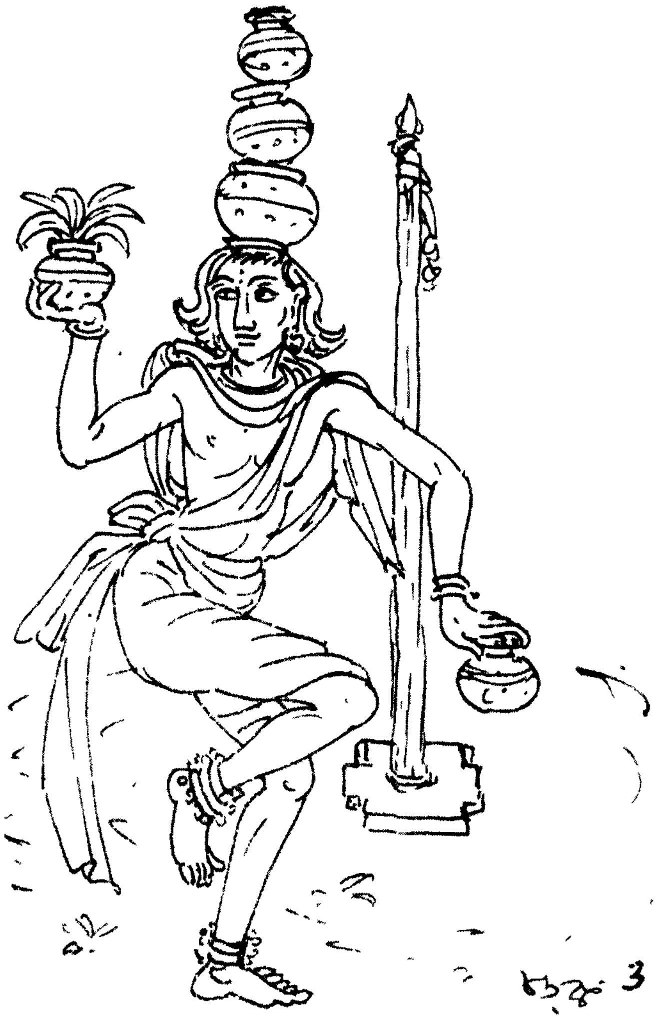
পরস্পরকে বুঝিবার মনোবৃত্তিই আমাদের প্রয়োজন। এই মনোবৃত্তি দ্বারা আমরা অপর পক্ষের ভাব বুঝিতে সমর্থ হই, অপরকে বুঝিতে—সে কি করিতেছে, কেন ইহা করিতেছে এবং বিবদমান মতামতগুলির বাহিরে কোন একটি ভাবাবলম্বনে পরস্পর মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না—ইহা বুঝিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই ইহা অবধারণ করা যায়। প্রগতি প্রকৃতির নিয়ম নহে। ইহা মানুষের চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উচ্চ উচ্চ ভাব-গুলিকে কার্যে পরিণত করিতে আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই প্রকৃত নরনারী—কবি, ধর্ম-যাজক, দার্শনিক, পুরোহিত, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, বিদ্যার্থী, গবেষক প্রভৃতি সৃজন করিবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে যদি নিরঙ্কুশ ও স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান করিতে দেওয়া হয় তবেই তাহারা এই মহৎকার্যে সফলকাম হইতে পারে। কতকগুলি শক্তি এমন প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছে যে, তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাহারা মানুষের মনকে ব্যূহবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিবার জন্য সচেষ্ট। রাষ্ট্রনৈতিক গোঁড়ামি এখনও অন্তর্হিত হয় নাই, একনিষ্ঠ ও অনন্যচিত্ত সত্যানুসন্ধানের কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে বাহিরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ হইতে বিমুক্ত থাকে, তদ্বিষয়ে তাহাদের সক্রিয় হইতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট যুবক যুবতীরা, তাহাদের স্বাভাবিক একগুয়েমি ও যৌবনসুলভ চিরন্তন চাঞ্চল্য সত্ত্বেও, বাহির হইতে তাহাদের উপর জোর করিয়া যে নিপীড়ন চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে প্রতিরোধ ও জয় করিতে সমর্থ হইবে। আমার প্রার্থনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক আশা—যে-সকল যুবক যুবতী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহারা ভাবী বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, সাম্য-মৈত্রী-সৌভ্রাত্র ও ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য এক শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য গভীর আত্মপ্রত্যয় ও সরলতার সহিত এমন এক আদর্শের কথা বলিবে, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সাম্প্রতিক কালেও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে।

চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা

আচার্য নন্দলাল বসু

মাথায় কলসী রাখিয়া নৃত্য



"আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা জপ ধ্যান এ সব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।" * * * "'যাত্রাতে'ও দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে।" "সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৫।১২।১

মাছধরা ও পথিক



"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে াত হতে লাগল; সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে েসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। * * * স ব্যক্তির হুঁস নাই; তার হাত কাঁপছে; কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি।" * * * "ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, ন্য কিছু দেখা যায় না,—শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না।" * * * "গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব াজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়— প, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—বাহিরে পড়ে থাকবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩।১৪।১

“কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়”



“এক মাঠে একটা ভযানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে আসতে না আসতে ব্রহ্মচারী একটি মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, ‘ওরে। তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস্, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তো তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা-প্রবৃত্তি থাকবে না।’ এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। * * * এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না! * * * একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। * * * ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। * * * প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এল।

* * * ব্রহ্মচারী বললে, 'তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন ?' তখন সে বললে, 'রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল।' ব্রহ্মচারী বললে, 'ছি। তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস্ না; আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নি কেন ?'

দুষ্টলোকের কাছে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই। অনিষ্ট করতে নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।১।৩

ব্যাধের শিকার-সন্ধান



"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোসনাই বাজনা গাড়ী ঘোড়া,—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই, সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল !"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩।১৪।১

মন্দিরের পথে শ্রীরামকৃষ্ণ



"শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দুই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ীর পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যাল্‌ফেলে—ডিমে যখন তা দেয়, পাখীর দৃষ্টি তখন যেরূপ হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২।১।২।১৭

সাধনা ও সিদ্ধি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগের বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন। অর্জুন বললেন,—"আমার মন চঞ্চল, অশান্তিতে ভরে গেছে। তুমি যে যোগের কথা বলছো তা কিছুই ধারণা করতে পারছি না। এই মন নিয়ে কি করে তোমার উপদেশ পালন করবো?" অর্জুনের যেমন অবস্থা, আমাদের সকলেরই অবস্থা সেই রকম (হাস্য)। অর্জুন বললেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

"হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, প্রমাথী (ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্ষোভকারক), বলবান এবং দৃঢ়। সেই মনকে সংযত করা বায়ুকে নিগ্রহ করার মতোই কঠিন বলে আমার বোধ হচ্ছে।" বলবান্—অর্থাৎ মন যেমন নাচাচ্ছে তেমনি নাচতে হচ্ছে আমাদের; যতই হোমরাচোমরা কিংবা বিদ্বান্ হোক না কেন, সকলেই মনের দাস। দৃঢ়—কঠিন, অর্থাৎ মনের এত গোঁ, যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না।

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' গ্রন্থে একটি ছোট দৃষ্টান্তে মনটাকে বানরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বানর স্বভাবতই চঞ্চল। তাতে একটা বানরকে কতকটা মদ খাইয়ে দিয়েছে, ফলে চঞ্চলতা বেড়েছে। তার লেজে আবার একটা বৃশ্চিক দংশন করেছে। তার উপর একটা ভূত চড়েছে বানরটার ঘাড়ে। ভূতাবিষ্ট সেই বানরের অবস্থা আর আমাদের মনের অবস্থা একই রকম। মনও প্রতিদিন বাসনা-মদিরা ঢুকু ঢুকু পান করছে। যেই একটা কামনা সিদ্ধ হলো, অমনি আরও হাজারটা প্রসব করলে। 'আমি বিদ্বান্' 'আমি পণ্ডিত' 'আমি উচ্চবংশজাত', এ সমস্ত ভাব হলো অভিমানরূপী পিশাচ। আর রাগদ্বেষরূপ বৃশ্চিক তো সর্বদাই আমাদের মনকে দংশন করছে। অর্জুন তাই বললেন,—'মনকে সংযত করা অতিশয় দুষ্কর।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন,

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

"হে কৌন্তেয়! তুমি যা বললে সবই ঠিক। মন যে দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তত্রাচ, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য—এই দুইটি উপায়ের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়, আয়ত্তে আনা যায়।"

ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে মনকে নিয়েই যত কাণ্ড। অবশ্য সাধন বিনা কিছু হয় না। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা যোগশাস্ত্র ও সাংখ্য-শাস্ত্রেও আছে। 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্য' কি? নিত্য একটি জিনিস সাধন করার নাম অভ্যাস। বৈরাগ্যের অর্থ ভোগবাসনায় বিতৃষ্ণা। সংসারসুখ এবং স্বর্গসুখ, দুয়েরই প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়ে সাধন করতে হয়। ঠাকুরের জীবনটা দেখো। পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে তিনি এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটী নিয়ে "টাকা মাটী, টাকা মাটী, মাটীই টাকা, টাকাই মাটী" বলে টাকা জলে ফেলে দিয়েছিলেন। টাকায় কি হয়,—কামনা-বাসনার তৃপ্তি। তৃপ্তি যে কত হয় তা যারা ভোগ

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ২-৪-৫৪ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের ভাষণ। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রুতলিখিত।

করছে তারাই জানে! ভোগবাসনা দূর করতে হলে সাধনা চাই। সব জিনিসেই তো সাধনা দরকার করে; এমনকি সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ভাল করে শিখতে গেলেও সাধনা ছাড়া হবে না। যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। সাধন করে, পুরুষকারের দ্বারায় সিদ্ধি পাওয়া যায়।

'পুরুষকার' কি,—অভ্যাস ও সাধন। 'কাল' —সময়। 'দৈব'—ঈশ্বরের কৃপা। পুরুষকার, কাল এবং দৈব—এই তিনটি একত্রে অনুকূল মূর্তিতে উপস্থিত হলেই সিদ্ধি। 'কাল' একটা বড় জিনিস। *হাজার চেষ্টা করো, অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা* করতে হবে। ভূমিকর্ষণ পুরষকারের প্রতীক; চাষের উপযুক্ত কাল হলো বর্ষা; বর্ষণ যেন দেবতার কৃপা। অনুকূল সময় ও দেবতার কৃপার জন্য লেগে থাকতে হয়; এরা দুটি আমাদের আয়ত্তাধীন নয়, কখন যে উপস্থিত হবে তা জানা নেই। 'কাল' অনেক সময় ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে প্রতিকূলতা করে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো কৃতবিদ্য এবং অনন্যসাধারণ পুরুষও (পূর্বাশ্রমে) দুঃসময়ে একটা চাকরি সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। পুরুষকার (সাধন) আমাদের আয়ত্তাধীন। সাধনে লেগে থাকার ইচ্ছা এবং মন সংযত করে নিত্য নিয়মিত সাধনই পুরুষকার। সাধারণ লোকে একটু দেখেই ছেড়ে দেয়। খুব চেষ্টা চাই, চাই নিত্য অভ্যাস। ঠাকুর খানদানি চাষার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঠাকুর বলেছেন,—"যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, 'ভাই, কত হবিষ্য করলুম,—কিন্তু কি হলো!' যারা নূতন চাষ করে তাদের যদি ফসল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে। তারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে।... ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজার শুকা বছরে ফসল না হলেও সে করে।"

ভক্তিশাস্ত্র গীতায় শ্রীভগবান বলছেন,—"তুমি এইটুকু করো, বাকিটা সব আমি করে দেবো।" এটি পাই একমাত্র পৌরাণিক যুগে। তবে পুরুষকার একেবারে বাদ দিলে কিছু হয় না। আবার সবটা শুধু পুরুষকারে হয় না। একটি ছোট গল্প বলছি।

সমুদ্রমধ্যস্থ পর্বতগহ্বরে এক পক্ষীদম্পতী বাস *করতো। তাদের বাসায় চারটি ডিম ছিল।* একটা বড় ঢেউ এসে একদিন ডিমগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তারা জানতে পারলে, সমুদ্র ডিমগুলিকে গ্রাস করেছে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বিনাশে ক্ষুব্ধ পক্ষীদম্পতী প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করতে লাগলো। শেষে স্থির করলে তারা সমুদ্র শোষণ করে ফেলবে। তারপর সেই দুঃসাধ্য কাজে লেগে গেল। তারা দুজনে ঠোঁটে করে জল তোলে আর আট হাত দূরে ফেলে আসে। অন্য পাখীরা তাদের এই কাণ্ড দেখে বললে,—"তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে।" তবু তারা নিরস্ত হলো না। তিনচার দিন এই ভাবে কেটে গেল। পরিশ্রমে ও অনাহারে পক্ষীদম্পতীর শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লো। দৈবক্রমে একদিন বিষ্ণু গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে আকাশপথে চলেছেন। সমুদ্রশোষণরত পক্ষীদম্পতীকে দেখতে পেয়ে বিষ্ণু গরুড়কে বললেন,—"এদের ব্যাপার কি?" পক্ষিরাজ গরুড় সব শুনে এসে তাঁকে জানালেন। বিষ্ণু তখন পক্ষীদম্পতীর কাজে সাহায্য করবার জন্য গরুড়কে আদেশ দিলেন। গতিক দেখে সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব সন্ত্রস্ত হয়ে ডিমগুলি পক্ষীদম্পতীকে প্রত্যর্পণ করলেন।

সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য তোমাদের মাথার

ঘাস পায়ে ফেলতে হয়। সংসার মানে তো উটের কাঁটা ঘাস[1] খাওয়া, আমড়ার আঁটি![2] শ্রীভগবান তাই বারবার এসে বলছেন,—"আমাকে ভুলিস না, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাক্।" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন,—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখময় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে আমার আরাধনা করো।"

* * *

কি করে ঈশ্বরে মন হয়? মাস্টার মশাই ঠাকুরকে যে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটি তাদের অন্যতম।

ভগবানের জন্য আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, সেটি আনতে হবে। যকৃত খারাপ হলে আহারে রুচি থাকে না; বৈদ্য ওষুধ দিলে তখন আবার ভোজনে তৃপ্তি। ভজনে রুচি হয় না কেন? এখানে বড় চিকিৎসক সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হয়। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি তো হবে। শ্রদ্ধা থেকে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হলে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কিছু শুনতে ইচ্ছা হয় না। নিষ্ঠা থেকে ভক্তি, নামে আস্বাদন। ভক্তি আসে না কেন? পিত্তাধিক্য হলে মিছরি তেতো লাগে, তবু ফেলতে নেই; মিছরি পিত্তাধিক্য নাশ করে।

যুগে যুগে ধর্ম একটু বদলে যায়। সত্যযুগে সকলেই সাত্ত্বিকপ্রকৃতি। ত্রেতায় ক্ষত্রিয়বল ধিকৃত এবং ব্রহ্মতেজই প্রকৃত শক্তি বলে গণ্য হতো—"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।" অর্জুন ও রাবণ typical ক্ষত্রিয়-সন্তান, রজোগুণে ঠাসা।

ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্র ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধনা করেছিলেন। অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন, কিন্তু ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তা স্বীকার করলেন না। ক্ষত্রিয়-সন্তানের মধ্যে থাকে ক্রোধ, হিংসা। আর ব্রাহ্মণের বড় গুণ দয়া, ক্ষমা। বিশ্বামিত্র ভাবলেন,—"দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাধনায় এই হলো, আমি কিনা ক্ষত্রিয়!" ক্রোধী বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে গোপনে হত্যার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এক অন্ধকার রাত্রে তরবারি হস্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করলেন তিনি। দেখলেন, বশিষ্ঠ সমাধিস্থ। সাধনার ফলে তখন বিশ্বামিত্রের এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সমাধিস্থকে বধ করতে নেই। তিনি অন্ধকার কোণে অপেক্ষা করে রইলেন। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত বশিষ্ঠ সহধর্মিণী অরুন্ধতীকে বললেন,—"ক্ষুধা পেয়েছে।" অরুন্ধতী ফল এনে দিলেন। খেতে খেতে বশিষ্ঠ বললেন, "একটু লবণ দিতে পার?" তদুত্তরে অরুন্ধতী বললেন,—"প্রভু, লবণ তো ঘরে নেই।" তারপর একটু নীরব থেকে চক্ষু মুদিত করে ঋষি বললেন—"পাশেই বিশ্বামিত্রের আশ্রম, সেখান থেকে একটু লবণ চেয়ে নিয়ে এসো।" অরুন্ধতী বললেন,—"যে আমার শতপুত্রকে বিনাশ করেছে তার কাছে আমি চাইতে যেতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করুন।" শান্ত ঋষি বললেন,—"অরুন্ধতি! বিশ্বামিত্র তপস্যা করে এখন তো রাজর্ষি হয়েছে, তার অতীতের কথা মনে রাখবার প্রয়োজন কি?"

১ শ্রীরামকৃষ্ণ। বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দরদর্ করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

২ শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো না। বিষয়ী লোক দেখলে, আস্তে আস্তে সরে যাবে। এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কাবাজী? ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই সত্য, আর সব দুদিনের জন্য! সংসারে আছে কি? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল হয়। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

এদিকে বশিষ্ঠের এই অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা দেখে বিশ্বামিত্র অনুতপ্ত হলেন। তিনি এগিয়ে এসে বশিষ্ঠের পা দুটি জড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বশিষ্ঠ বললেন,—"বিশ্বামিত্র! তুমি তো আমার কাছে অপরাধী নও, তুমি তোমার নিজের মনের কাছে অপরাধী।" সাধুসঙ্গে বিশ্বামিত্র বিজিত হলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন,—"তুমি উপদেশ-প্রার্থী হয়ে বাসুকির কাছে যাও।"

বিশ্বামিত্র বাসুকির কাছে গিয়ে বললেন,—"আপনি আমাকে উপদেশ করুন।" বাসুকি বললেন,—"তুমি কি পাগল হয়েছো! মাথার উপর পৃথিবীর ভার লয়ে কি করে আমি উপদেশ করবো?" তখন বিশ্বামিত্র তাঁর দশ বৎসরের তপস্যার ফল প্রদান করায় পৃথিবী ভেদ করে এক স্তম্ভ উত্থিত হলো। সেই স্তম্ভের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করে বাসুকি যেই উপদেশ আরম্ভ করলেন অমনি স্তম্ভটি বসে যেতে লাগলো, বাসুকিও তাড়াতাড়ি পৃথিবীকে আবার মস্তকে গ্রহণ করলেন। তখন বিশ্বামিত্র বিশ বৎসরের তপস্যার ফল এবং পরে তাঁর সমগ্র ত্রিশ বৎসরের সাধনার ফল প্রদান করলেন, তবুও স্তম্ভটি কিছুতেই পৃথিবীর ভার সহ্য করতে পারলো না।

প্রতিবারের ব্যর্থতায় বিশ্বামিত্রের তপস্যার অভিমান চূর্ণ হচ্ছিল। অবশেষে বাসুকি তাঁর পরিচয় গ্রহণ করে বললেন,—"বিশ্বামিত্র! মাত্র ত্রিশ বৎসরের সাধনায় তোমার এত অভিমান হয়েছে!" তিনি বিশ্বামিত্রকে আবার বশিষ্ঠের কাছে যেতে বললেন। এইবার বিশ্বামিত্র অতি দীনভাবে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং বশিষ্ঠদেবও তাঁকে "এসো ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র" বলে সাদর অভ্যর্থনা করলেন।

* * *

শ্রবণের পর মনন এবং নিদিধ্যাসন না থাকলে কোন ফল নেই। একটি ছোট দৃষ্টান্তে ঠাকুর বলেছেন,—"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না, একটু সরে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি।"

কত ভগবৎপ্রসঙ্গ তো শুনছি, কেন হয় না? উপদেশ ধারণা হয় না, ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা নেই বলে। মনের কাঁচে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-অনুরাগরূপ কালি মাখিয়ে নিতে হবে। অনুরাগ হলেই তখন পাকা ভক্তি।

আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

জন্মাবধি দীর্ঘকাল প্রবাসেই কেটেছে। রাজপুতানায় জয়পুর সে প্রবাস। সেকালে অর্থাৎ প্রায় ৬০ বছর আগে বিদেশে প্রবাসে এখনকার মত এমন দুর্গোৎসবের ঘটা হতে কেউ দেখেন নি। গৃহস্থ ঘরে তো নয়ই, বারোয়ারী পূজাও হ'ত না। হতে পারত না। কথা অনেক। ভক্ত নিষ্ঠাবান্ ধনী, সমৃদ্ধ হিন্দু যে কম ছিলেন সেকালে প্রবাসে তা নয়, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বহু ছিলেন। কিন্তু দুর্গোৎসব প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

প্রধানকথা প্রতিমা গড়ানোর। সেদেশে কুমোর কোথা, কুলপরম্পরায় গ্রামে বা দেশের বাড়ীতে যে মায়ের মূর্তি গড়ায়? কত তাল পরিমাণ দুর্গা

প্রতিমার মূর্তিটি হবে, লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিকের সেই মত অনুপাতে কত তাল মাপের আকার হবে। সে তো কুলপ্রথাগত নিয়ম অনুসারে গঠিত হবে। বংশানুক্রমে যে কুম্ভকার সেই প্রতিমা গড়ে, তাকে কোথায় সেদেশে পাওয়া যাবে? যদি বা পাওয়া যায়, মিলে না হয় গেলেন কেউ, তিন মাস ধরে যে থাকা কাঠামোতে মাটী দিয়ে শুভদিনে প্রতিমা গড়া শুরু করে—সাধারণতঃ রথের দিন থেকে দুর্গোৎসবের নবরাত্রির প্রতিপদ বা পঞ্চমী অবধি—প্রতিমার চক্ষুদান অবধি এত দিন সেই হিল্লী দিল্লী জয়পুরে কোন কুম্ভকারপুত্র থাকতে পারবে! তারপর তাও না হয় হ'ল, কুলগুরু কুল-পুরোহিত তন্ত্রধারক পণ্ডিত এঁদের কি করে পাওয়া যাবে। দেশ ছেড়ে ঐ গঙ্গাহীন দেশে গুরু পুরোহিতের যাবার ইচ্ছা স্বভাবতই কম, উপরন্তু সেদিনে বহু লোকের নিজ গ্রামে নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত, তাই ফেলেই বা যান কি করে। এইসব জন্য হয়ত এখনকার মত এত সহজে প্রবাসে দুর্গোৎসব হ'তে পারত না। এখন ট্রেনে যাতায়াতে সময় অনেক কম লাগে সে সময়ের চেয়ে। কর্মসূত্রে যাতায়াতও বহু লোক করেন, ভ্রমণও করেন। লোকের বিদেশভয় আর তত নেই। এছাড়া আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এখন সহজেই পাওয়া যায়। বারোয়ারী পূজাতে তো কুলগুরু পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তাই সুদূর লাহোরে কালী-বাড়ীতেও মায়ের পূজা দেখে এসেছি দেশভাগের আগে। দিল্লীতে আজকাল বারোয়ারীতেই ৫।৬ খানি প্রতিমা পূজা হয়। কলকাতার মত অনেক না হোক দুর্গাপূজা হয়। রাজপুতানায়ও হয়। জয়পুরেও একখানি প্রতিমা পূজা হয়।

এককথায় এখনকার ছেলেমেয়েরা এবিষয়ে ভাগ্যবান্ তারা জন্মেই দুর্গাপূজা জাতীয় ও সর্ব-ভারতীয় 'দশেরা' এবং দুর্গোৎসব দেখতে পায়। আমাদের কালে যা ছিল না।

এখন আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখার কথা বলি।

তখন বোধ হয় আমার বয়স হবে ৪।৫। শুনলাম আজ আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলের জয়পুরের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ দুর্গাপূজা উপলক্ষে। বাড়ীশুদ্ধ মেয়ে-ছেলে যার যা ছিল ভালো কাপড়জামা পরা হল। সেকালে এখনকার মত অনেক ভালো জামাকাপড় সকলের থাকত না। তাছাড়া বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে অত জামাকাপড় জোগানোও শক্ত ছিল। পূজায় ষষ্ঠীতে পরবার জন্য একটা নতুন জামা বা নতুন কাপড়ই সেকালের রীতি ছিল। প্রতিদিন বহু রকমের সাজপোষাকের বাহুল্য আমরা জানতুম না। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার ভাষায় বলা যায় 'আমাদের জামাকাপড়ের দারিদ্র্য দেখলে একালের ছেলে-মেয়েরা লজ্জিত হত।'

মা ঠাকুমারা কি পরলেন বড় মনে নেই। তবে তসর গরদ বেনারসী জাতীয় কিছু তো বটেই। কেন না মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন বোধ হয়। মেজখুড়ীমার নতুন বিয়ে হয়েছিল। তাঁর বাবা বড় জমিদার ছিলেন। তাঁকে তাঁর সব গহনাগুলি পরিয়ে দেওয়া হ'ল। গহনাগুলির নামও আর যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিধান করা হ'ত, তা এখনকার পক্ষে শুনতে বেশ কৌতুকপ্রদ। বছর চৌদ্দ বয়সের পাতলা রোগা খুড়িমাটীকে মাথায় মুকুট ও ঝাপটা, কানে সোনার কান, খোঁপায় ফুল চিরুণী কাঁটা, গলায় সাতনরী, মুক্তার কণ্ঠি, ও দেশের গহনা সোনার বলে 'ওড়া,' পিঠে পিঠ ঝাঁপা, মাঝখানে সোনার পদক, তা থেকে ঝোলানো অনেকগুলো ছোটবড় ঝুমকা কোমর অবধি, কোমরে চন্দ্রহার ও গোট, বাহুতে হাতে তাবিজ, বাজু, জশম, নিচে হাতে চওড়া চুড়, বালা চুড়ী, করতলে আঙুলে রতনচুড়, কশটা আংটী তেগাঁথা, পায়ে রূপার মল পাঁইজোড় পরিয়ে দামী শাড়ী পরিয়ে

সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেকালে সেমিজ সায়ার বিশেষ বাহুল্য ছিল না। একটি জামাই আব্রুর কাজ করত। তবে কলকাতায় মেয়ে খুড়িমার সেমিজ শায়া ছিল।

আমরা তো অবাক হয়ে খুড়িমার সাজসজ্জা দেখলাম। তারপর নিমন্ত্রণ খাওয়া। তখনকার একান্নবর্তী পরিবার। পিতামহ, তাঁর ভাই, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা, আমরা ভাই বোনেরা, কাকা পিসিরা মিলে প্রায় তিন গাড়ী লোক পুরুষরা বাদে। কি রকম করে গেলাম সকলে তা' এখন আর মনে পড়ে না। তবে অনেকে ছোট ছোট আমরা কাকা পিসীদের সঙ্গে পিতামহ সংসার চন্দ্র সেনের সঙ্গে বোধ হয় হেঁটেই গেলাম। কান্তিবাবুর বাড়ী কাছেই ছিল। বিবাহিতা মেয়েদের তো সেকালে বিষম পর্দা, বোধ হয়, ফেরী করে গাড়ী যাতায়াত করল। তখনকার দিনে ঠাকুর্দাদের দুখানা ঘোড়ার গাড়ী ছিল। বেলা প্রায় ১০টা আন্দাজ সময়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলে—সবান্ধবে বলতে পারা যায়—নিমন্ত্রণে যাওয়া হ'ল।

৺কান্তি মুখোপাধ্যায়—তখন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী। প্রকাণ্ড বাড়ী তাঁর। তার ভিতরে বাহিরে লোক আর ধরছে না, এত ভিড়। জয়পুরের প্রবাসী সমস্ত বাঙালীর পূজার কদিন নিমন্ত্রণ।

মহারাজাকেও নিমন্ত্রণ করা হ'ত। বহুসম্পন্ন মাড়োয়ারী রাজপুত সর্দাররা (জমিদার) নিমন্ত্রিত হতেন।

সেকালের প্রথামত বাঙালী নিমন্ত্রিতেরা নিঃসঙ্কোচে গিয়ে বাড়ীতে উঠতেন। শোওয়া খাওয়া থাকা বাড়ী ফেরার জন্য কিছুই ভাবনা করতেন না। সারাদিন নিমন্ত্রণবাড়ীর পূজাবাড়ীর কাজ-কর্ম করতেন নিমন্ত্রিতা গৃহিণীরা—বাড়ীর লোকদের সঙ্গে। পূজার ফল কাটা, নৈবেদ্য করা,—তরকারী কোটা থেকে—নিমন্ত্রিতদের জন্য তরকারী কোটা পরিবেশন করা সারাদিন ধরে চলত। বিরাম বিশ্রাম সবই ওখানে। রাত্রে কেউবা বাড়ী ফিরতেন, অনেকে ফিরতেনও না। কেননা কখনো সন্ধিপূজা বা মহাষ্টমী পূজা আরতি দেখতে থেকে যেতেন।

এই প্রথম পূজা বা প্রতিমা দেখলাম আমরা ছোটরা অনেকে। প্রতিমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে হয়েছিল কত বড় কত মস্ত—প্রতিমা। আগে কখনো দুর্গোৎসব দেখিনি। এবং রাধা-গোবিন্দ ছাড়া কোনোরকম প্রতিমাও দেখিনি। কলকাতায় আসা হত প্রায় বিবাহ উপলক্ষে। বিয়ের মাস আর পূজার মাস তো এক নয়, কাজেই মনে পড়ে না, কলকাতায় দুর্গাপূজা দেখেছি কিনা। তাছাড়া সেকালে যেমন পর্দা ছিল মেয়েরা গাড়ী পালকী ছাড়া কোনোখানে যেতে পেতেন না, তেমনি এত বারোয়ারী পূজাও ছিল না। লোকদের বাড়ী কুলক্রমাগত পূজাই বেশীর ভাগ হ'ত। আর দু চারটি পল্লীতে বারোয়ারী পূজা হ'ত সে আবার যাওয়ার প্রথাও ছিল না। সেকালে তখন বিয়ে হয়ে গেলেই পর্দা ও অন্তঃপুরবাস। আর বারোয়ারী তলায় মেয়েরা যাবেন সে কি? পিতামহের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য ও মুগ্ধভাবে আমরা ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতিমার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার চেয়ে বড় যাঁরা—দিদি কি অন্য কেউ তাঁরাই বোধ হয় লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের মূর্তি ও বাহনের নাম সব বলে দিলেন। লক্ষ্মী-পূজার কথা জানা ছিল। কেননা, বাড়ীতে চারবার পূজা হ'ত, ভাদ্র কার্তিক পৌষ ও চৈত্রে। সরস্বতী-পূজাও ভাল করেই জানতাম, বই পূজা হত। অঞ্জলি দেওয়া হত। গণেশ-পূজাও ওদেশে হয় গণেশ-চতুর্থীতে। বাড়ীর সদর দরজার মাথায় একটি গণেশ মূর্তি ছিলেন—তাঁর পূজা লাড্ডু ভোগ দিয়ে হ'ত, লাড্ডুলোভীর দল গিয়ে দাঁড়াতাম বছরে চার বার চারটি চতুর্থীতে। ওদেশে আবার তিনিই

বিষ্ণার দেবতা। 'দোয়াত পূজা' বলে গণেশ পূজাকে ওদেশে। কিন্তু কার্তিক ঠাকুর আর দশপ্রহরণধারিণী ঈষৎআনত-ভঙ্গীতে দাঁড়ানো উজ্জ্বল ডাকের গহনায় সজ্জিতা রক্তাম্বরা অসুর-দলনী প্রতিমা মূর্তি প্রদীপের আলোয় ঝলমল-রূপে বিভাসিত দশভুজা মা দুর্গার প্রতিমা সেই প্রথম দেখলাম। ব্রাহ্মণ বাড়ীর পূজা। সে সময়ে—ব্রাহ্মণ বাড়ীতে—অব্রাহ্মণদের গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ এখানে তাঁরা অন্ত্যজাতি ও বর্ণকে 'শূদ্দ্ুর'—বা শূদ্র বলতেন।

আমরা পিতামহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিমা দেখতে লাগলাম। এমন সময়ে প্রাঙ্গণে বলির বাজনা বেজে উঠল। সে সময়ে আমরা বলির ব্যাপার কিছুই জানি না।

আশপাশের সকলে এসে উঠানের চারদিকে জড় হতে লাগলেন। চকমিলানো প্রকাণ্ড দালানের এক দিকে সিঁড়িতে আমরাও অনেকের সঙ্গে দাঁড়ালাম।

উঠানের মাঝখানে সিঁদুরমাখানো হাড়িকাঠ। একজন না দুজন দুটি ছাগশিশু নিয়ে এলো। আর একজন একটি সিঁদুরমাখা খাঁড়া নিয়ে দাঁড়ালো তাদের পাশে। আশ্চর্য ও বিস্ফারিত চোখে দেখছি, বলির ছাগটির গলাটি হাড়িকাঠের মধ্যে দেওয়া। তারপর—'জয় মা' 'জয় মা' 'মাগো জয় দুর্গে' চিৎকার ও সজোরে বলির বাজনা বেজে উঠল। ঝকঝকে খাঁড়াটি একবার উঠে থেমে পড়ল হাড়িকাঠের ওপর।

কেউ কেউ ছোটরা কেঁদে ফেল্লে। আমরা চোখ বুজে পিতামহের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদেরও চোখে জল এসে গেল। দেখলাম দাদাও চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় বলিটির সময় আমরা আর সামনে দাঁড়ালাম না। দালানের এক পাশে এক থামের আড়ালে আশ্রয় নিলাম।

তারপরে—'মা' 'মা' চিৎকারে উঠানের মাঝে কাদা রক্ত নিয়ে কয়েকজন মাখামাখি করতে লাগল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ছাগমুণ্ডটি একটি মাটির সরায় করে পূজার দালানে নিয়ে গেল। প্রতিমার চমৎকার ঝলমলে মূর্তির সঙ্গে নানা উপচার ফুল ফল নৈবেদ্য মহানৈবেদ্য সম্ভারের মিষ্টান্নভরা থালা ইত্যাদির সঙ্গে বলির ব্যাপার যেন মনে খাপ খেল না। সেদিনের পর আমরা যথাসম্ভব দূরে দালানের কোণ খুঁজে কোনক্রমে বলির সময়টি সরে থাকতাম। বহুদিন অবধি সংশয় ছিল মনে, পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করেছি বলির কথা। ছাগমুণ্ডটি কি হয়? কেন হয় বলি? ইত্যাদি।

তারপর—আসত পুষ্পাঞ্জলি দেবার পালা। কিন্তু সেকালে এখনকার বাংলাদেশের মত ছোট বড় সকলকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখিনি। আমরা কখনো দিইনি। হয়ত ব্রাহ্মণবাড়ী বলে। কিংবা হয়ত আমরা উপবাসী থাকতাম না। (পরে জননীর কাছে শুনলাম ব্রাহ্মণেতর সকলকে শূদ্র বলে অঞ্জলি দিতে দেওয়ার প্রথা ছিল না)। অঞ্জলির অনেক পরে অনেক বেলায় প্রায় অপরাহ্ণ বেলায় খাবার ডাক আসত।

ব্রাহ্মণবাড়ীর যজ্ঞের নিমন্ত্রণ সবই মায়ের প্রসাদ—অন্নভোগ। সেকালের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও অন্য জাতির আহার-ব্যবহারে খুব কঠিন পঙ্‌ক্তি বিচার মেনে চলা হত। ব্রাহ্মণদের আবার বিশেষ বিশেষ দল ছিল। কারা বা বৈদিক, কারা বা গোঁসাই, জয়পুরের গোঁসাইরা মোটেই আমিষভোজী নন। তাছাড়াও ছোট ছোট পঙ্‌ক্তি কুলীন অকুলীনের বোধ হয় নানা ভাগে ছোট ছোট আঙিনায় দলে দলে সব খেতে বসানো 'হ'ত। গোঁসাই বাড়ীর লোক অনেক। গোবিন্দজী, গোপীনাথজী, মদনমোহন, ব্রজরাজ, রাধামাধবআদির মন্দিরের গোস্বামীদের পরিবারও নিমন্ত্রিত হ'তেন।

আবার ৺অম্বরেশ্বরীর পূজারীও আসতেন। আমাদের দুর্গোৎসব দেখার মতই প্রথম ঐভাবে নিমন্ত্রণ খাওয়া এবং খেতে দেখা ও পঙ্‌ক্তি মেনে বসতে দেখা। বৈদ্য পরিবারগুলির একটা প্রাঙ্গণে একধারে বসা হ'ল। কে একজন প্রথমে শালপাতা ও শালপাতার ঠোঙ্গা বা দোনা (ওখানে দোনা বলে) দিয়ে গেল। তারপর এলো ভাত শাক ডাল অম্ল তরকারি। বিশেষ মনে নেই। মনে আছে শুধু তরকারিকে 'বেন্নন' বলা ও (ব্যঞ্জন) 'ছ্যাঁচড়া' নামের তরকারিটির কথা। যে তরকারিটা আমরা ছোটরা নিলাম না। এবং নামটা নিয়ে কিছুটা হাসলাম 'বেন্নন' নেবে? ছ্যাঁচড়া? ছ্যাঁচড়া? শেষ অবধি যে কি কি আরও খেয়েছি কিছুই মনে পড়ে না। খালি গায়ে, মাথায় চুড়ো করে চুলবাঁধা, কানে চৌদানী, নাকে বড় নথ পরা, হাতে তাগা, গলায় মোটা সোনার হার, মুখে পানের টেঁপ ভরা কর্তার কন্যারা এসে খাওয়ানো তদারক করে যেতেন। বধূরাও এসে দাঁড়াতেন।

সেই উঠানের এক ধারে দুটি ঘেরা জায়গার মাঝে দুতিন জন ভীমদর্শনা দাসী বিরাট আকারের কড়া-হাঁড়ি ও বড় বড় বাসন মাজত, দেখতাম। খাওয়ার সময় তখন আমাদের উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। খাওয়ার চেয়ে লোকজন গোলমালটাই চোখে পড়ত। আর মনে পড়ে কাজের বাড়ীর অপরিচ্ছন্নতা। পাশের দিকে মাছির ভনভনানি, শিশুদের অপরিচ্ছন্নতা ও কান্না, দাসদাসীদের লোকজনের চেঁচামেচি। সমস্ত বাড়ী যেন একটা বিরাট নোংরামি কোলাহল ও হৈ চৈ-এ ভরা। আগেই বলেছি সে সময়ে কিন্তু পঙ্‌ক্তি-ভোজনের প্রথায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের খুব কড়াকড়ি প্রথা ছিল। আমরা শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতাম অব্রাহ্মণ মাত্রেই। বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ সব পৃথক প্রাঙ্গণে বসতেন। তারই মাঝে নিমন্ত্রিতা বা বাড়ীর লোকেরা সময় পেলেই এসে পিতামহীকে বলতেন, ওমা, এটি বুঝি তোমার রামের বৌ? নতুন বৌ? কই দেখি মুখ?

মুকুটের ওপর দিয়ে খুড়িমার আবক্ষ অবগুণ্ঠন। কোনো শাশুড়ী বা ননদ ঘোমটাটি তুলে ধরলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম খুড়িমা চোখ বুজে আছেন। খুড়িমার আগে কনেবৌর 'মুখ দেখা' কি রকম ব্যাপার আমরা দেখি নি। চোখ বুজে বৌ দেখানোর প্রথায় ভারি কৌতুক বোধ হয়েছিল। সমবেত দর্শিকারা বললেন, বেশ বৌ হয়েছে।

তারপর এলো গহনা দেখার পালা। এবং কি কি দিয়েছে তার জিজ্ঞাসাবাদ। যার যখন সময় হচ্ছে অথবা কৌতূহল হচ্ছে, তিনি ক্রমে বৌয়ের মুখ দেখে যাচ্ছেন ও গহনা দেখে যাচ্ছেন। এবং গল্পের আসর জমে উঠছে তুলনামূলকভাবে বধূর রূপের ও গহনার সমালোচনায়।

বেলা শেষ হয়ে এলো। অবশেষে সন্ধ্যারতির সময় এসে পড়ল। তারপর—ভোগারতি। বাড়ী ক্রমশঃ আরো লোকারণ্য হয়ে উঠল। কেননা তারপর যাত্রা।

যাত্রাও সেই আমাদের প্রথম দেখা। প্রায়ই বাড়ী আর ফেরা হত না। সারাদিনের সেই কাপড়-জামা-পরা ছেলেদের দল শিশুদের দল কারো বা গায়ে মখমলের সুট, কোট বা সিল্কের জামা পরা, বড় মেয়েদের গায়ে একটা জামা আর পরিধানে রেশমী শাড়ী। সবই প্রায় পুরুষানুক্রমিক বস্তু। অর্থাৎ সবুজ মখমলের সুটটি যা আমার ছোট ভাই পরল, সেটি আমার কাকার ছিল, কালো মখমলের সুটটি যেটা এখন ছোট কাকা পরলেন, সেটিও ক্রমে ভাইপোরা পরম্পরা পরবে। বেনারসী শাড়ীও সেকালে লোকের পাঁচ দশ খানা থাকত না। মাত্র বিয়ের সময়ের দু একখানি করে বেনারসী এই সেকালের প্রথা ছিল। একখানি বাপের বাড়ীর অন্যটি অধিবাসের শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া।

'আমার' জিনিস বলে বা 'ব্যক্তিগত'ভাবের সাজ-পোষাক ব্যবহার এবং নিজস্ব করে তুলে রাখার ভাব সেকালে এখনকার মত ছিল না। গহনা সবই পরার পরে নিমন্ত্রণের শেষে বাড়ী গিয়ে গৃহিণীর সিন্দুকে তুলে রাখার প্রথা ছিল। সকল বৌয়ের ও মেয়েদের পৌত্রপৌত্রীদের শিশুদের সকলেরই। কাপড় জামাও প্রায়ই ঐ ভাবেই বাক্সে রাখা হ'ত। বাক্স অবশ্য আলাদা থাকত। কিন্তু বড়র ছোট হয়ে গেলে কাপড় জামা জুতা পরম্পরা ছোটদের ঐভাবেই পরা হ'ত। কোনো কনিষ্ঠ তাতে সেকালে পুরানো জিনিস বলে ক্ষুণ্ন হ'ত না।

যাই হোক, কালো মখমলের ওপর জরীর কাজ করা জামা ও পাজামা পরে কাকা, লাল ও সবুজ মখমলের ঐ জ্যেষ্ঠ পরম্পরা ঐরকম স্যুট পরে আমার ভাইয়েরা, আমরা বোনেরা পূজার সময়ের জামাকাপড় সারাদিন যা পরেছিলাম তাই পরেই, বাকি সব পিতার খুড়তুতো বোনেরা ভাইয়েরাও নিজের মত সাজ-সজ্জিত হয়ে পূজার দালানের সিঁড়ির ওপর সারি দিয়ে বসলাম, যাত্রা দেখতে। পিছনের দালানে চিকের আড়ালে মহিলাবৃন্দ বসেছেন। তাঁদের মাঝে আমাদের পিতামহীরা মা পিসিমারা খুড়িমাও আছেন। একেবারে জমজমাট ভিড় ভিতরে বাইরে।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। সারাদিনের ক্লান্তি ও ঘুমে চোখ ভরে এলো। কেউ বা সেইখানেই শুয়ে পড়ল একটু জায়গায়।

সহসা ঘুম ভাঙিয়ে দিল কে—তখন যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আসর বসেছে বিরাট প্রাঙ্গণে। যাত্রার তো 'ষ্টেজ' নেই 'সিন'ও নেই। একটি দালানের একটা কোণের ঘর থেকে রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, অমাত্য, পারিষদরা সেজে সেজে একে একে বেরুতে লাগলেন। বেশীর ভাগই দাঁড়িয়েই সব কথাবার্তা। রাজার নিশ্চয় সিংহাসন একটি ছিল সেথায়, স্পষ্ট মনে নেই। ঘুমের মাঝে কখনো কাকা, কখনো দিদির ঠেলাঠেলিতে একটু দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ার মাঝে 'যাত্রা' তার নিজের মত খুশি ও সময় অনুসারে অগ্রসর হতে লাগল। তাড়া নেই কারো মনে, না দর্শক, না অভিনেতা। কেননা, সকাল ১০।১১টা অবধি সে যাত্রা চলবে। সেদিন শুধু রাবণবধের পালা। সীতার বনবাস অবধি আর হবে না।

যাই হোক, ধীরে সুস্থে অভিনেতারা অভিনয় করে চললেন। দশরথ রাজা। রাজার গায়ে মখমলের চক্কাদার জমকালো জরী-জরোয়ার কাজ করা লম্বা জামা বা চোগা, কোমরে জরীর বা রেশমের কোমরবন্ধ। সভাসদদের নিজেদের মত দামী-কমদামী পরিধেয়। প্রায় সবই চোগা বা লম্বা আস্তিনের জামা, তাতেও জরীর কাজ। জরীর পাড় দেওয়া পাজামা কিনা মনে পড়ে না। রাজার গলার মুক্তার (?) সোনার (?) গহনা, হাতে বালা পায়ে নাগরা—মাথায় মুকুট নয়, মখমলের শিরস্ত্রাণ তাতে জরী-জড়োয়ার কাজ। মোট কথা একটি বেশ ঝকমকে জমকালো ব্যাপার। রানীদের সাজ চেহারা কিন্তু মোটেই মনে পড়ে না। সত্যি 'রাজা' আমরা তার আগে দেখেছি। রাজার জাঁকজমকও দেখা অভ্যাস ছিল। কেননা জয়পুরের রাজাদের তখন নানা মেলায় উৎসবে নানা পোষাকে ও বাহনে বেরুনোর প্রথা ছিল। আমরা সব মেলাতেই যেতাম। কখনো ঘোড়া, কখনো হাতি, কখনো তাঞ্জামে, কখনো সোনার কারুকাজ করা গাড়ীতে (তখন মোটরের যুগ নয়।) মহারাজা 'সওয়ারী'তে (শোভাযাত্রায়) বেরুতেন। দূর গ্রামান্তরেরও জনতা রাজদর্শন করতে আসত। আর বিপুল কোলাহল—চিৎকারে "হুজুর সাহেব কী জয়" বলত। উৎসব মেলা সে সময়ে—বারো মাসে তের পার্বণের মত ছিল। সে সময়ে মহারাজ একটু পুরানো প্রথা মেনে চলতেনও।

যাই হোক এখন আমাদের—'যাত্রার' রাজা মুনি ঋষির কথায় আসি। তারপর এলেন বিশ্বামিত্র মুনি। তাড়কা রাক্ষসী বধ কিভাবে হল মনে পড়ে না।

কিন্তু হরধনুর্ভঙ্গ হ'ল। একটি বিকট শব্দে বালক-বালিকা ও শিশুর দল ঘুমচোখে চমকে উঠে বসল।

ঢিমে তালে চলল 'যাত্রা'। গান সে সময়ে ভাল লাগত না। গানের সময় এলেই আমরা প্রায়ই ঘুমতাম বা শুয়ে পড়তাম। রামের বনবাসের ব্যবস্থাই বা কখন হল, কৈকেয়ী মন্থরা কৌশল্যার আসা-যাওয়াও কখন হল জানি না। ঘুমের মাঝেই শেষ হয়ে গেল বোধ হয়।

এমন সময়ে এলো লঙ্কাদাহন। আগেই বলেছি ষ্টেজ তো নেই। শুধু রাবণের সভায়—হনুমানের বিশাল লাঙ্গুল দিয়ে খানিকটা লাফালাফি হ'ল। এ ছাড়া আর কি করা যেতে পারত। যাত্রার আসরে লঙ্কাদাহন তো সম্ভব ছিল না। লঙ্কাদাহনের দুর্ঘটনার পর রাবণের জননী নিকষা এলেন। দাঁত উঁচু, সাদা থান পরা এক বৃদ্ধা বিধবা সভার মাঝে লাঠি ধরে এলেন কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে। সামনের দাঁত দুটি তাঁর এত বড় করেছিল যে, আমরা ছোটরা—যখন বাড়ীতে রাম-যাত্রার নকল করে যাত্রা করতাম, নিকষা জননীর নকলটি ঠিক করার জন্য ঐ দাঁতের মাপের আখের খোসা কেটে মুখে পুরে সামনের বড় দাঁত দুটির ঠিক ঠিক নকল করার চেষ্টা করতাম। আর কোন দৃশ্যের নকল হোক বা না হোক।

বলতে ভুলেছি এর আগে বালিবধ কোন সময়ে হয়ে গেছে। তার একটা গান বহুদিন বাড়ীতে অনেকে গাইতেন। তারার রামকে অভিশাপ দেওয়া গান। সীতার বনবাসের সূচনা-সূচক।

"বিপদবারণ, তুমি নারায়ণ,
লোকে বলে তোমায় করুণানিধান।
তবে কেন হায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
স্বর্ণচূড়া স্বামী ভূতলে শয়ান।
কি দোষ পাইয়ে পতিরে আমার
কপট সমরে করিলে সংহার,
দয়াময় তব একি ব্যবহার,
কেমনে কাঁদালে অবলার প্রাণ।
যে অনলে প্রভু জ্বালালে আমায়,
সে অনলে তুমি জ্বলিবে নিশ্চয়,
জানকী পাইবে, পুনঃ হারাইবে,
কেঁদে কেঁদে হবে দিন অবসান।"

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। ছেলেমেয়ে বালক-বালিকাদের উৎসাহ ঘুমের আশ্রয়ে স্তিমিত হয়ে এলো। চোখ আর খুলতে চায় না। আর তখনি কিনা মেঘনাদবধ ও রাবণবধের দৃশ্য। যাই হোক, আবার কে বোধহয় ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। আবার সকলে উঠে বসলাম। মেঘনাদ এলেন জমকালো পোষাক পরে রাজপুত্রের মতই। বিরাট চেহারা। ঐ অবধিই মনে পড়ে। তারপর কখন রাবণ বধ হ'ল সেও অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে রয়ে গেছে। যখন আবার ঘুমের পর জাগলাম তখন সকাল হয়েছে। আসরে লোক হালকা হয়ে এসেছে। আবার নূতন লোকও আসছে, সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড সাজানো হয়েছে আসরের মাঝখানে। সত্যি আগুনে ঘেরা কুণ্ড, সীতা আগুনের মাঝখানে বসে। সহসা সীতাকে আর দেখা গেল না। খানিক বাদে—কয়েক মিনিট মাত্র বাদে লাল চেলী পরা অগ্নিদেব সীতাকে নিয়ে কুণ্ডের মাঝে উঠে দাঁড়ালেন গান গাইতে গাইতে। সে কি আশ্চর্য চমকপ্রদ ব্যাপার!

আমরা মুগ্ধ বালক-বালিকার দল উঠে বসলাম। আর ঘুম এলো না। ওদিকে প্রতিমার মণ্ডপে পূজার মঙ্গল আরতির আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেছে নবমী বা অষ্টমীর। ভোরের আলোতে যাত্রার আসর ম্লান। আর যাত্রার দলের সাজগোজে

তেমন চমক লাগছে না। গহনা পোষাক ঝলমল করছে না। তবু সবাই বসে আছেন, যাত্রা তখনো শেষ হয়নি। আমরাও বসে রইলাম। অন্তঃপুরে চিকের ভিতরে পিতামহীরা ও অন্য সকলে বাড়ী ফেরার জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন।

দেখতে দেখতে ৮টা ৯টা বেজে গেল। পুরুষরা বাড়ী ফিরে গেলেন। কর্মবাড়ীর গৃহিণী দর্শিকা নিমন্ত্রিতাদের বল্লেন, তোমরা সকলে এখানে খেয়ে দেয়ে থাকো। বাড়ী যাবার কি দরকার? আজো তো সারাদিন পূজার কাজ আছে। রাত্রে আবার যাত্রাও হবে।"

১০টা বাজল, ১১টা বাজল। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে কাতর ছেলেমেয়েদের তখনো কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর্মবাড়ীতে হয়ে ওঠেনি। তাঁরাও পূজার কাজে ব্যস্ত, অনেকে আপন আপন জন নিয়ে ব্যস্ত।

১১টার সময় পিতামহী বাড়ী ফিরে এলেন আমাদের সকলকে নিয়ে। তখন ভাত ঝোল রান্না চড়ল। খেয়ে যা ঘুম ঘুমোলাম সবাই।

এই প্রথম আমাদের প্রবাসে দুর্গোৎসব ও যাত্রা দেখা। তারপরেও আরো কয়েক বছর কান্তি বাবুর বাড়ী পূজা হয়েছে—তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন।

আমি ছায়াপথ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

এখনো যে ফিরে এল না'ক হায়,
আমার পথের পান্থ
মহাগগনের কোন্-সে অসীমে
কোথায় হোল সে শ্রান্ত!
দূর দিগন্তে যতদূরে চেয়ে রই,
আমার পথের পান্থের দেখা কই?
তারি পদধূলি জ্যোতি-কণাগুলি
ভরে' আছে নভোপ্রান্ত!

গাঁথে নীহারিকা মালিকা তাহার
রবি-তারা পূজে হর্ষে,
কতদূর হ'তে কিরণ-অর্ঘ্য
আসে যে আলোক-বর্ষে!
গ্রহে গ্রহে চলে আরতি-প্রদীপ জ্বালা,
কত ধূমকেতু সাজায় প্রণতি-ডালা,
ধূপ হয়ে জ্বলি' রাতের আকাশে,
উল্কা ধরণী 'পর্শে!

কত যুগ আসে, কত যুগ যায়
অনন্ত-কালবুকে,
অসীম শূন্যে ভাঙ্গাগড়া খেলা
সে কি খেলে কৌতুকে?
চির তৃষাতুর পড়ে' আছি তা'রি আশে,
যদি কোনদিন পান্থ ফিরিয়া আসে!
—নব জ্যোতিরূপ ধরিব আবার
চরণ-পরশ-সুখে!

ওগো মহাকাল, বলে' দাও মোরে
কোথা পাব সন্ধান?
ওগো মহাকাশ, রেখেছ কি বুকে
সে বর-তনুর ঘ্রাণ?
—উত্তরহীন মৌন সে মহাকাল,
স্তব্ধ আকাশ বোনে রহস্যজাল,
কে জানে কোথায় কোন্ পথে আজো
চলে তা'র অভিযান!

কবে পায়ে তা'র বেজেছে নূপুর
আজো বুকে জাগে ছন্দ,
কবে উত্তরী দুলেছে আকাশে
আজো বুকে কাঁদে গন্ধ !

বাঁশরীর ধ্বনি আছে নীলাকাশ ভরি',
সে সুরে ফুটিছে সৃজনের মঞ্জরী,
আমি ছায়াপথ তা'রে খুঁজে মরি,
—পথ চেয়ে আঁখি অন্ধ !

পুরাণের বিদুষী নারী

ডক্টর রমা চৌধুরী

পৌরাণিক সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একাধারে দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির এরূপ অপূর্ব সংগ্রহ সংস্কৃত-সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারেও বিরল। বেদোপনিষদের নিগূঢ় ও বিস্তৃত তথ্যসমূহকে সহজ সরলভাবে, সাধারণের উপযোগী করে, চিত্তাকর্ষক, আখ্যানাদির সাহায্যে উপস্থাপিত করাই হল পুরাণাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য। পুরাণকার সত্যই বলেছেন—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" ইতিহাস বা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদি বেদকেই দৃঢ়ীকৃত করে, অথবা বেদোপদিষ্ট তত্ত্বকেই পুনঃপ্রকাশ করে।

সেজন্য বেদোপনিষদের নারীশিক্ষার অত্যুজ্জ্বল আদর্শও পৌরাণিক-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণতম প্রভায়। নারীশিক্ষার যে বিভিন্ন রূপ আমরা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারক ও বাহক বেদোপনিষদে দেখতে পাই,—যথা, শিক্ষিতা, শিক্ষিকা ও রচয়িত্রী নারীর রূপ—তা সবই বিভিন্ন পুরাণেও একই ভাবে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুবিখ্যাত মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত বিদুষীশ্রেষ্ঠা মদালসার উল্লেখ করা চলে (২০—৩৬ অধ্যায়)।

রাজা ঋতধ্বজের মহিষীরূপে মদালসা পার্থিব ভোগসুখের শিখরদেশে আরূঢ়া ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর সমগ্র অন্তর ছিল বৈরাগ্যের শুভ্র সুষমায় অনুরঞ্জিত, যে শুভ্রতাকে সংসারের কলুষ-স্পর্শ মুহূর্তের জন্যও পরিম্লান করতে পারেনি। আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়সী এই নারী সেজন্য সাংসারিক ঐশ্বর্যকে চিরদিন মনে করতেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ; এবং সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন চিত্তের নির্মলতা ও নিষ্কামতা, সেই ধনই তিনি দান করেছিলেন সমুৎসুক চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলকে।

মদালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে রাজা পরম আদরে তার নাম রাখলেন "বিক্রান্ত"। যুবরাজের এই সুন্দর, উপযুক্ত নামে অন্যান্য সকলেই প্রীত হলেও, মদালসা হাস্য করতে লাগলেন। একদিন ক্রন্দনরত পুত্রকে মদালসা উচ্চতম মোক্ষবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বল্লেন—

"শুদ্ধোঽসি রে তাত ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈব।
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত-
ন্নৈবাস্য ত্বং রোদিষি কস্য হেতোঃ।"

(২৫ অধ্যায়)

"বৎস, তুমিই শুদ্ধ ব্রহ্ম, নামরূপবিহীন, সর্বোপাধিশূন্য। তোমাকে যে একটি বিশেষ নামে বিভূষিত করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাই মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই পঞ্চভূতবিনির্মিত জড়দেহও তোমার নয়, তুমিও এই দেহের নও। তাহলে, দেহগত দুঃখ-যন্ত্রণার জন্য তুমি—যে তুমি নির্মল, আনন্দরসঘন

পরমাত্মা, সেই তুমিই বৃথা রোদন করছ কেন? এ রোদন ত তোমার নিজের নয়, তোমার আত্মার নয়,—এই শব্দ কেবল দেহ থেকেই নির্গত হচ্ছে। একই ভাবে, কোনো ইন্দ্রিয়গত সুখদুঃখও তোমার নয়। দেহেন্দ্রিয়েরই কেবল জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মরণ আছে, তোমার আত্মার, নিজস্ব সত্তার কদাপি নয়। এই শরীর কেবল আবরণই মাত্র। কালক্রমে এ শীর্ণ, জরাগ্রস্ত নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সেজন্য তুমি মোহগ্রস্ত, শোকাচ্ছন্ন হবে কেন? তোমার স্বীয় পাপপুণ্যের ফলেই তুমি এ জন্মে এই দেহলাভ করেছ। কেবল যে এই দেহই তোমার নয়, তাই নয়, এই পৃথিবীর কিছুই তোমার নয়,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র কেহই তোমার নয়, সেজন্য তুমি তাদের কোনোদিনও বহুমাননা করো না। যারা মোহাচ্ছন্ন তারাই কেবল সুখকে দুঃখোপশম, এবং ভোগকে সুখের কারণরূপে গ্রহণ করে, অর্থাৎ পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধিকে মুক্তির সাধন বলে মনে করে। যারা অধিকতর বিমূঢ়চিত্ত তারা এই দুঃখকেই সুখ, অথবা সংসার বা বন্ধকেই মোক্ষরূপে গ্রহণ করে অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়।”

মদালসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের জন্ম হলে রাজা পূর্ববৎ সমাদরে তাদের নামকরণ করলেন—“সুবাহু” এবং “শত্রুমর্দন” এবং পূর্ববৎ অন্য সকলেই আনন্দিত হলেও, মদালসা কেবল হাস্য করলেন। পূর্বের মত মদালসা এই দুই পুত্রকেও আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। ফলে, এই তিন পুত্রই গার্হস্থ্য-ধর্মে বীতস্পৃহ হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বনে সমুৎসুক হলেন। সর্বশেষে, তাঁর চতুর্থ পুত্রের জন্মের পরে রাজা তাঁর নামকরণে উদ্যত হলে, অন্যান্য বারের মত এবারও মদালসা হাস্য করলেন। এখন ক্ষুব্ধ-চিত্ত রাজা তাঁকে বল্লেন—“আমি পুত্রদের নাম-করণ করলেই তুমি হাস্য কর কেন? ‘বিক্রান্ত’, ‘সুবাহু’ এবং ‘শত্রুমর্দন’ ত ক্ষত্রিয়গণের উপযোগী শৌর্যবীর্যমূলক নাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার যদি এই নামগুলি মনোমত না হয় ত, তুমি নিজেই চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর।”

মদালসা বললেন—“আপনার আজ্ঞানুসারে এই পুত্রের নাম রাখলাম ‘অলর্ক’ (বা উন্মত্ত কুকুর)”।

এবারে হাস্য করবার পালা রাজার। তিনি বিস্ময়াম্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“এ অতি কুৎসিত ও অসম্বদ্ধ নাম। এর অর্থ কি?”

মদালসা উত্তর দিলেন—“সত্যই এই নামটির অর্থ নেই। কিন্তু আপনার প্রদত্ত তিনটি নামও ত সমভাবে অর্থশূন্য। ‘বিক্রান্ত’ শব্দের অর্থঃ যিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করেছেন। কিন্তু সর্বগ, সর্বব্যাপী আত্মার গতি অসম্ভব। পুনরায়, ‘সুবাহু’ হলেন তিনিই যাঁর বাহু সুন্দর ও শক্তিশালী। কিন্তু আত্মার ত কোনো মূর্তি নেই। পরিশেষে ‘শত্রুমর্দন’ নামটিও সমভাবে অর্থহীন। কারণ শত্রু থাকলেই তবে তার মর্দনের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু প্রকৃতকল্পে, আত্মার শত্রু নেই, যেহেতু এক, অদ্বিতীয় আত্মাই সর্বত্র, সর্বশরীরে বিরাজমান। সুতরাং কেই বা কার শত্রু, আর কেই বা কার মিত্র? দ্বিতীয়তঃ, ভূতের দ্বারাই ভূতের লয় সাধিত হতে পারে, আত্মার দ্বারা আত্মার নয়। নিরবয়ব, নিত্য আত্মার বিনাশ বা দমন অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, অন্যের দমন বা হত্যা ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে জাত হয়। কিন্তু নির্বিকার, নির্দোষ আত্মা ক্রোধাদি সর্বদোষ বিবর্জিত। সেজন্য, আত্মার ক্ষেত্রে কোনোদিক থেকে শত্রুদমনের প্রশ্নই উঠে না।”

সহধর্মিণীর এরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে রাজা আনন্দে তাঁর মতেই মত দিলেন। কিন্তু রাজার বিশেষ অনুরোধে, মদালসা চতুর্থ পুত্রকে মোক্ষধর্ম উপদেশ না দিয়ে সংসারধর্ম উপদেশ দিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই, পৌরাণিক যুগের ললনাকুল-ললামভূতা মদালসার অতুলনীয়

বিদ্যাবত্তা ও শিক্ষকতা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হল, তত্ত্বের দিক্ থেকে, সর্বাত্মবাদ; এবং ব্যবহারের দিক্ থেকে, সর্বমৈত্রীবাদ। সেজন্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলছেন —"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা পরমাত্মাই বিশ্বজগৎ, বিশ্বজগৎই ব্রহ্ম। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; "ব্রহ্মেদং সর্বম্।" অতএব মানুষে মানুষে ভেদ নেই—সকলেই সেই একই পরমাত্মা, যিনি নিত্য, সত্য, দেহেন্দ্রিয়ভিন্ন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আত্মার নিত্যতা এবং দেহভিন্নতাও ভারতীয় দর্শনের একটি মূল তত্ত্ব। সেজন্য কঠোপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা সুর মিলিয়ে বলছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

অর্থাৎ, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই; আত্মা কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন হন না, কোনো কিছুর উৎপাদকও হন না; আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন; শরীর ধ্বংস হলেও, আত্মার ধ্বংস হয় না।

ব্রহ্মোপলব্ধি-ধন্যা মদালসা ভারতীয় দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্বই এই ভাবে অনুপম ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

ব্যবহারের দিক্ থেকে বলা চলে যে, যদি এক পরমাত্মাই সর্ব জীব হন, তবে মানুষে মানুষে হিংসা-বিবাদের কোনো হেতুই থাকে না। সেজন্য ঈশোপনিষদ্ স্থিরবিশ্বাসে ঘোষণা করছেন—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

অর্থাৎ, যিনি আত্মাতে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আত্মা দর্শন করেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

এই অপূর্ব উপনিষদ্ বাণীরই প্রতিধ্বনি করে মদালসাও বলেছেন—

"এক এব শরীরেষু সর্বেষু পুরুষো যদা।
তদাস্য রাজন্ কঃ শত্রুঃ কো বা মিত্রমিহেষ্যতে।"

এরূপে, ঋগ্বেদের নারীঋষিগণের মধ্যে অন্যতমা শ্রেষ্ঠা, সত্যদ্রষ্ট্রী বাকের পূর্ণ প্রতিচ্ছবিই যেন আমরা দেখতে পাই—মদালসার দেবাশিস্পূত জীবনে।

পরবর্তী যুগের সংস্কৃত নারীকবিগণের মধ্যে আরেকজন মদালসার সাক্ষাৎলাভ আমরা করেছি। তাঁর রচিত দুটি কবিতা বিভিন্ন কোষকাব্য-সংগ্রহে সঙ্কলিত করা আছে। এর মধ্যে একটি "মেঘ-গর্জন" সম্বন্ধীয় এবং "সুভাষিত-সার-সমুচ্চয়" নামক হস্তলিখিত পুঁথিতে সঙ্কলিত। অন্যটি ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং শার্ঙ্গধরকৃত "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" ও হরিকবিকৃত "সুভাষিত-হারাবলী" নামক হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত। এই দ্বিতীয় কবিতাটি পৌরাণিক মদালসার উক্তির ন্যায়ই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। সেটি এই—

"পরলোক-হিতং তাত প্রাতরুত্থায় চিন্তয়।
ইহ তে কর্মণামেব বিপাকশ্চিন্তয়িষ্যতি।"

অর্থাৎ, "বৎস, প্রাতে উত্থান করে পরলোক চিন্তা করো। ইহলোকচিন্তার আবশ্যকতা নেই, কারণ ইহলোকে তোমার কর্মের ফলই তোমার ভাগ্য স্থির করবে।"

আমাদের পৌরাণিক মদালসাও একই ভাবে বলছেন—

"ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মার্থৌ চাপি চিন্তয়েৎ।
কার্যক্লেশাংস্তু তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ।"
(৩৪ অধ্যায়)

অর্থাৎ, "ব্রাহ্ম মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে, ধর্ম ও অর্থ, ক্লেশাদি ও তার মূল, এবং বেদতত্ত্বের বিষয় চিন্তা করবে।"

ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর সাদৃশ্য সত্ত্বেও, এই দুই

মদালসা এক ও অভিন্ন কি না—তা' স্থিরনিশ্চয়ের উপায় নেই।

সে যাহোক, পৌরাণিক যুগের উজ্জ্বলতম দীপ্তি মদালসা কেবল তাঁর সন্তানগণের নয়, বিশ্ববাসিগণের অজ্ঞানান্ধকার বিদুরণের জন্যই উদিতা হয়েছিলেন পূর্ণতম গৌরবে। মোক্ষধর্মতত্ত্ব ও আশ্রমধর্মতত্ত্ব, সন্ন্যাস ও সংসার উভয় দিকেই পারদর্শিনী, এই সম্রাজ্ঞী-ঋষির পুণ্য আলেখ্য যুগে যুগে ভারতীয় নারীসমাজকে প্রোদ্বুদ্ধ করবে, নিঃসন্দেহ। ভারতীয় আদর্শ সংসারে ব্রহ্মদর্শনের আদর্শ সংসারকেই সন্ন্যাসক্ষেত্রে পরিণত করার আদর্শ, রাজর্ষি জনকের আদর্শ, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ত্যাগের দ্বারাই ভোগের, অনাসক্ত যোগের মহনীয় আদর্শ। মদালসা-চরিত্র এই শাশ্বত আদর্শেরই পূর্ণতম প্রতীক। ব্রহ্মানন্দ-বিহ্বলা, সার্থকনাম্নী মদালসা সেজন্য সত্যই চিরনমস্যা।

মা ব'লে ডাক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের উপর মাতৃত্বের আরোপ ক'রে রচনা করলেন তাঁর অমর উদ্বোধনঃ "বন্দে মাতরম্।" রবীন্দ্রনাথ যেন এরই বাংলায় আঁখর দিলেন সরল দোয়ারেঃ "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।" দ্বিজেন্দ্রলাল আরও এক পা এগিয়ে গাইলেন—শুধু স্বদেশ কেন ভগবান্‌ও তো মা, তাইঃ

একবার গালভরা মা ডাকে
মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে।

কান্ত কবি উচ্ছ্বসিত সুরে যেন আরো এক পা এগুলেন—জগন্মাতাকে শুধু মা ব'লে ডেকেই অন্তরাত্মার পূর্ণ তৃপ্তি নেই—তাঁর কাছে অনুতাপ জানিয়েও যেন আনন্দ (মা নাম এমনই মধুর !):

কোন ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায় ?
খেলায় মত্ত হ'য়ে কে আর পরশরতন হারায় হেলায় ?
আমার মতন কে অবাধ্য ? (যার) সংশোধনো তোর অসাধ্য ?
(তুই) 'আয়' ব'লে যাস্ কোলে নিতে, 'দূর হ' ব'লে ছুটে পালায়
(তোর) বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি, (আমি) কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
(আমি) এমন তো ছিলাম না আগে, বড় সরল ছিলাম ছেলেবেলায়।

* * *

আমাদের দেশে পূজাপদ্ধতির অন্ত নেই, নানা ধর্মের উদ্ভব-বিলয়ের অন্ত নেই, আচার-পার্থক্যের অবধি নেই। একজন চিন্তাশীল য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেছিলেনঃ ভারতবর্ষীয়েরা যেদিন তাদের স্বদেশের আন্তর সমস্যার সমাধানে পৌছবে—সেদিন সারা জগতের সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এ-সূত্রটির ভাষ্য এই যে, বিশ্বমানবের মধ্যে যত রকমের বৈচিত্র্য ও সংঘর্ষ দেখা যায় সে সবই ভারতবর্ষে বিরাজ ক'রে এসেছে পাশাপাশি, সভ্যতার অরুণোদয় থেকে। কিন্তু এহেন বিশাল ও বিচিত্র বৈষম্যের দেশেও খুব কম মানুষই আছে যে জগন্মাতাকে জন্মদাত্রী জননীর পদবীতে ডাকলে আর্দ্র হ'য়ে না ওঠে।

পরমহংসদেবের কাছে এসেছিলেন মহাজ্ঞানী তোতাপুরী—নির্বিকল্প সমাধির ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠ। এহেন মহাসিদ্ধ পুরুষও পরমহংসদেবের "মা মা" আবাহন-গানে চোখের জল রাখতে পারেন নি। গঙ্গা তো ভূগোলের দর্শনে স্রোতোময়ী জলধারা ছাড়া কিছুই না, অথচ গঙ্গাকে দেবী ও জননী ব'লে ডাকতে আচার্য শঙ্করের মতন বিরাট জ্ঞানীরও বাধে নি—কী শিশুর উচ্ছ্বাসেই না তিনি গেয়েছিলেন :

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে !
ত্রিভুবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে !
নাহং জানে তব মহিমানং।
ত্রাহি কৃপাময়ি ! মামজ্ঞানম্॥

এর চেয়েও আশ্চর্য—বিলাতফেরত বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদীর রূপান্তর : যে দ্বিজেন্দ্রলাল এক সময়ে হিন্দুধর্মের কোনো বিশ্বাসকেই ব্যঙ্গ করতে পিছপাও হন নি—তিনি পরিণত বয়সে রচনা করলেন তাঁর অপরূপ গঙ্গাস্তোত্র—যেটি শুনতে শুনতে আজো শত শত শ্রোতার চোখ জলে ভ'রে আসে :

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কলকল্লোলিনি গঙ্গে
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে !

কোথায় নদীয়ার বাঙালী দ্বিজেন্দ্রলাল, কোথায় কাশীর স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যিনি এ-গানটি শুনে সাশ্রুনেত্রে বলতেন : "প্রতি হিন্দুর এ-গানটি গাওয়া উচিত !" আর কোথায় জ্ঞানের তপস্যার অবতার শঙ্করাচার্য যিনি লিখলেন : "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।"

আরও পশ্চিমে দৃষ্টি দেওয়া যাক। হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করতে ছুটে আসে দলে দলে পাঞ্জাবদেশের নরনারী। গঙ্গাকে মা ব'লে গ্রহণ করতে অমন বলিষ্ঠ জাতিরো বাধে না—যারা মোটেই বাঙালীর মতন ভাবপ্রবণ নয়। তাদের একজন—আমার শিষ্যা ইন্দিরা দেবী আজন্ম বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা হ'য়ে কেন গঙ্গা দেখলেই যেন উচ্ছ্বসিতা হ'য়ে ওঠেন—কেমন ক'রে লেখেন হৃদয়ের ভক্তির রং লাগিয়ে অপরূপ ছন্দে ?—

জয় দুখহারিণী গঙ্গে মাতা ; জয় ভবতারিণী গঙ্গে !
জয় জয় নীল তরঙ্গে !
সাঁঝ ভয়ে ময় শরণ ছুঁ আঈ ব্যাকুল অঙ্গ অঙ্গ মেরা।
অংক লগা কর লোরী দেনা সুধামন্ত্র মা তেরা।
ধো দেনা সব শঙ্কা চিন্তা মা ভাগীরথি, গঙ্গে ! *

আমি পর পর পাঁচটি দৃষ্টান্ত দিলাম ইচ্ছা ক'রেই—শুধু দেখাতে যে ভগবানকে আমরা নানারূপে আরাধনা করা সত্ত্বেও তাঁকে মা ব'লে যখন আবাহন করি তখন ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা ভাবের কবি গুণী ভক্ত সাধক যুগে যুগে সাড়া দিয়ে এসেছেন—আজো দেন। তবু বলব এ-ভাবের

* প্রেমাঞ্জলি.........ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার প্রণীত।

সব চেয়ে বেশী বিকাশ হয়েছে বাংলাদেশে। তাই আমাদের জাতীয় পূজা দুর্গাপূজা, আমাদের ধ্যান চণ্ডীর:

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্॥
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং।
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ॥

বাংলাদেশে ভগবানের মা দুর্গা বা ভগবতীরূপের এত আদর কেন এ-প্রশ্ন মনে সহজেই উদিত হয়। কারণ হয়ত এই যে বাঙালী অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী ভাবপ্রবণ—যেজন্যে আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণ—গোপীবল্লভ রাধাসনাথ। কৃষ্ণের উপাসক ভারতের সর্বপ্রদেশেই মেলে কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পূজায় বাঙালির স্বভাব-উচ্ছ্বাসী প্রাণ যেমন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তেমন বোধ হয় অন্য কোনো দেশের সাধকের প্রাণ হয় না। হয়ত ঠিক সেই কারণেই বাঙালীর "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে জল আসে ভ'রে।"

স্বভাবে যাঁরা বলিষ্ঠ তাঁরা অনেকে এতে আপত্তি করেন, বলেন বেশী ভাবোচ্ছ্বাস কোনো কাজের কথা নয়। এ-কথার মধ্যে কিছু সত্যও যে নেই তা নয়। একটি উপমা আছে: শুধু ফুল দিয়ে ফুলধনুও হয় না—ফুলের নীচে শক্ত থাকা চাই। তেমনি শুধু ভাবোচ্ছ্বাসে জগন্মাতার করুণাও মেলে না, বিশ্বজননী তাঁর আদরের দুলালকেও তপস্যা করিয়ে তবে কোলে টেনে নেন—"তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাৎ" বলেছেন নারায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতে।

সবই সত্য। তবু বলব যে ভগবানকে মা ব'লে ডাকার তপস্যায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা ধন্য, যাঁরা সত্যি হ'তে পেরেছেন মায়ের শিশু তাঁরা বরেণ্য। কারণ জীবনে একটি কঠিনতম সাধনা হ'ল—শিশুর সুরে জগন্মাতাকে ডাকতে পারা। দ্বিজেন্দ্রলালের মতন অমন ওজস্বী কবিও তাই শেষ জীবনে বলিষ্ঠতার বাণী ছেড়ে ধরেছিলেন অসহায় শিশুর সুর, ডেকেছিলেন জগন্মাতাকে তাঁর নানান্ অপরূপ শ্যামাসঙ্গীতে—ঠিক যেমন শিশু ডাকে তার আপন মাকে। দৃষ্টান্ত দিতে তাঁর শেষ জীবনের একটি অপরূপ গান উদ্ধৃত করব যেটি গাইতেন তিনি সাশ্রুনেত্রে:

আর কেন মা ডাকছ আমায় এই যে এইছি তোমার কাছে!
(আমায়) নেও মা কোলে, দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধুলাখেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর তো তোমায় ছাড়ব না মা,
ঘরের ছেলে পরের কাছে মা-য়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে?

শ্রান্ত দেহে মানুষ চলে জীবনের পথে। আঘাত সইতে সইতে প্রাণ শুকিয়ে যায়, মন যায় মিইয়ে—সাধ্য কি বিনা সাধনায় সে (ঠাকুরের ভাষায়) বিড়ালছানার মতন মায়ের হাতে আত্মসমর্পণ করবে? এই যে আত্মসমর্পণ এ তো দুর্বলতার এজাহার নয়, এর উদ্ভব সেই পরম চেতনা

থেকে যে আমি-আমি ভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলে কখনো মা-র কোলের শিশু হওয়া যায় না, আমরা বলতে পারি না পরম বৈরাগ্যের সরল সুরে :

"এবার যদি পেইছি শ্যামা আর তো তোমায় ছাড়ব না মা!"

পারি না, কেন না আমরা তো মা-কেই একান্ত ক'রে চাই না, জীবনের মায়ার খেলায় তাঁকে ভুলে থাকি নিজের অহং-এর কুহকে, কীর্তির মোহে, মিথ্যে নেশায়। এই নেশা, মোহ, কুহক বিনাশ করতেই মাতৃবৎসল হিন্দু দুর্গাপূজা করে, প্রার্থনা করে :

দিয়েছ জীবন, অমৃত-স্বপন, দাও মা শরণ চরণকমলে।
জ্বালো অনিমিষা আঁখিমণিদিশা, শেষ হোক নিশা অরুণ অমলে।
সাধি তো তোমার বাঁশরী নূপুর,
তবু সুরে আজো বাজে মা বেসুর,
অন্তরে শুনি তব সুরধুনী—হারাতে সে-মিড় বাসনা-বাদলে।

তপন-বাহিনী মরণ-তারিণী! প্রতি হিয়া করো তব প্রেমবীথি।
ঘুমে জাগরণে বিরহে মিলনে পাই যেন বুকে তোমারে অতিথি।
বিনা তব আলো কে জ্বেলেছে আলো?
তুমি না বাসালে কে বেসেছে ভালো?
বিনা তব কূল কে পেয়েছে কূল? বিনা তব গতি কে কোথায় চলে?

শ্রীশ্রীমা ও জীবন-শিল্প*

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

আমার বিশ্বাস এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলেরই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকাহিনী বা জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানা আছে।

কাজেই সে দিক থেকে কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা আমি করছি না, তাঁর জীবনের অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়ও কিছু আলোচনার সাহস আমার নেই, কারণ জানি সে সাহস দুঃসাহসই হবে।

আমি শুধু এইটুকু আলোচনা করতে চেষ্টা করবো, সেই মহান জীবনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে লোকাতীত জীবনশিল্প, খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর অন্তরালে যে অবিচ্ছিন্ন একটি কাব্যময় ধারা প্রবহমান, এযুগে তার থেকে কিছু রূপ কিছু রস আহরণ করে নেবার শক্তি আমাদের আছে কি না।

এই বছরটিতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, হয়তো বা ভারতের বাইরেও কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীমা সারদামণির শতবর্ষ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই উৎসবে আমাদের উৎসাহের অভাব নেই।

কিন্তু এই উৎসাহ কি শুধুই পাঁচজনের দেখা-দেখি একটা প্রথাপালন করতে পারার গৌরবে? শুধুই উৎসবের আনন্দ উপভোগের উৎসাহ?

না এই ব্যাপক উৎসব পালনের মধ্য থেকে ভারত কিছু উপকৃত হচ্ছে? আমার তো মনে

* কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারে ৭।১১।৫৪ তারিখে পঠিত।

হয়—উপকার অবশ্যই হচ্ছে। বহু সমস্যায় দীর্ণ দেশ যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

একথা ঠিক যে কিছুকাল আগে পর্যন্তও আমরা শ্রীমাকে যেন ভুলেই বসেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের নিতান্ত নিকট শিষ্যরা বাদে, সারদামণির তপস্যা-সুন্দর মহিমান্বিত জীবনের আলোচনাও বড়ো কেউ করতো না।

সারদামণি যেন এযুগের একটি আবিষ্কার! এযুগের অনেক কল্যাণকর এবং অনেক অকল্যাণকর আবিষ্কারের অনেক ঊর্ধ্বে এক পরম কল্যাণকর চরম আবিষ্কার!

ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ আনন্দে বিস্ময়ে এই আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু কথা এই—যন্ত্র-সভ্যতার অভিশাপে আজতো আমরা কল্যাণের পথ থেকে সরে এসে অকল্যাণেরই দাসত্ব করছি, বস্তুর তুচ্ছতার মধ্যেই নিমগ্ন রয়েছি, সহিষ্ণুতাকে 'কাপুরুষতা,' সংযমকে 'ভীরুতা' আর ত্যাগকে 'বোকামী' ভেবে নিশ্চিন্ত আছি।

তবে—সংযম, সহিষ্ণুতা, আর ত্যাগের, মূর্তিমতী প্রতিমা সারদামণিকে আবিষ্কার করতে পেরে এমন আনন্দ কেন?

তাঁর অনবদ্য চরিত্রকথা শুনতে, এতো ভালো লাগে কেন?

এই 'কেন'র একটি উত্তর, মহানের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিত্তবৃত্তির সহজ প্রবণতা। মানুষ নিজে ক্ষুদ্র হোক, সংকীর্ণ হোক, অসম্পূর্ণ অসুন্দর হোক, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ তার স্বাভাবিক বৃত্তি, বিরাটের প্রতি আকর্ষণ তার হৃদয়ের ধর্ম।

তাই সে বহু ক্লেশ সহ্য করেও দেখতে ছোটে সমুদ্র, দেখতে ছোটে পাহাড়! অভিভূত বিস্ময়ে শুনতে আসে মহামানবের জীবনকথা।

ভাল রাজমিস্ত্রী ঘর গাঁথবার সময়, ঘরের দেওয়ালে যতোই জানালা দরজা বসাক দেওয়ালের উঁচু দিকে দু' একটি ভেন্টিলেটার রাখে!

যাতে জানালা দরজাগুলো কসে আঁটা থাকলেও একছিটে নির্মল বাতাস ঘরে ঢুকতে পায়! বদ্ধঘর একেবারে গুমোট হয়ে না ওঠে!··· বিষবাষ্পে ভরে না যায়।

যে মহা—রাজমিস্ত্রী মানুষরূপী এই তিনমহলা প্রাসাদটি গড়েছেন, তিনিও তাঁর মনের দেওয়ালে 'স্নেহ' 'প্রেম', 'সুরুচি' 'সভ্যতা' 'জ্ঞানস্পৃহা' 'কর্মস্পৃহা' প্রভৃতি যতোই বড়ো বড়ো জানালা দরজা রেখে থাকুন, দেওয়ালের উঁচুতে ছোট্ট একটি ভেন্টিলেটার রাখতেও ভোলেন নি।···

সেই ভেন্টিলেটারটি হচ্ছে—মানুষের মনের সহজাত 'শ্রেয়'বোধ। বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ যদি তার সেই মনের ঘরের আগাগোড়া সব জানালা দরজাগুলো ও নিজের লোভ আর হিংসা, সন্দেহ আর সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতা আর অহঙ্কারের কপাট এঁটে এঁটে বন্ধ করে রাখে, তবু তাকে অসত্যের বিষ-বাষ্প থেকে রক্ষা করে নাগালের ওপরের সেই ছোট্ট ভেন্টিলেটারটি।

সেই তার 'শ্রেয়' 'অশ্রেয়' বোধ।

ওকে আর কোনো কপাট দিয়েই বন্ধ করা যায় না······তাই মানুষ—প্রতিনিয়ত অন্যায় করে চললেও, বোঝে এ 'অন্যায়', এ 'ভুল'।

সেই ছোট্ট পথটুকু ধরেই আসে ঈশ্বরের প্রসাদ প্রসন্নতা আসে শুভবুদ্ধির নির্মল বাতাস।

সেই শ্রেয় অশ্রেয় বোধই প্রতিনিয়ত উন্মাদ মানুষের উন্মার্গগতিকে রাশটেনে ধরছে। রাশ-টেনে ধরে বলছে—"যা প্রেয়, তাই প্রার্থনীয় নয়"। ···নির্দেশ দিচ্ছে—"কোথায় তোমার কল্যাণ রয়েছে, তার সন্ধান করো"—প্রশ্ন করছে—

"যাতে তোমার অমৃতলাভ হবে না, সে বস্তু নিয়ে তুমি কী করবে"?

মানুষের সেই 'শ্রেয়'র প্রতি সহজাত প্রেরণাই

কাজ করে আসছে—গুহাবাসী আদিম মানবের বিবর্তনের মূলে, পৃথিবীতে সভ্যতা-বিস্তারের মূলে সমাজ-গঠনের অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূলে।

এই শ্রেয় অশ্রেয় বোধই জাতিকে পরাধীনতার নিশ্চিন্ত সুখশয্যা থেকে টেনে এনে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে নিয়ে চলে।

বিষয়-ভোগের মধুর আরাম থেকে ডাক দিয়ে বৈরাগ্যের রাস্তা চিনিয়ে দেয়।

আজকের দিনের দিগ্‌ভ্রষ্ট পৃথিবী, হৃদয়ের সমস্ত কপাট এঁটে বসে বসে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি করছে, বিশ্বধ্বংসের উপযুক্ত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি করছে, অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, লোভ আর হিংসার দাসত্ব করছে। তবু—

তবুও এ সবের মধ্যে থেকেও বিভ্রান্তচিত্তে শান্তির মন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, ভারতের নিভৃত তপোবনের শাশ্বত আদর্শের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে।

ভারতের নারীসমাজও অনেক সংগ্রামের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে, অনেক অগ্রগতির স্বপ্ন দেখছে, তবু— তার মনের মধ্যে কোথায় যেন বাজছে একটি অতৃপ্তির সুর।

কে যেন তার মনের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করছে— "জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানকে করায়ত্ত করতে পারলেই কি তোমার সমস্ত অভাব মিটবে?" বলছে— "যে সাম্য তোমার কাম্য সে কি শুধু বহির্জীবনে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ?" বলছে— "জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হ'তে পারাটাই কি নারীজীবনের শেষ কথা?"

এই আত্মজিজ্ঞাসাই আধুনিক নারীসমাজকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিচ্ছে না। অবিরত তাকে এই সন্দেহ পীড়ন করছে, যে পথে আমরা ছুটে চলেছি, সেই পথই কি শ্রেয়?

এই সংশয়ের উত্তর পাবার আশায় আজকে আমরা একশো বছর আগের বাঙলার একটি নিভৃত গ্রামের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। ব্যাকুল আগ্রহে উত্তর চাইছি এক অবগুণ্ঠনবতী পল্লীবালার কাছে।

তবে কি আধুনিক নারী-সমাজ দেবী সারদামণির আদর্শ গ্রহণ করতে, বর্তমান অগ্রগতির পথ থেকে সরে এসে একশো বছর পিছিয়ে যাবে?

...নিজেকে আবার অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঢাকবে? পাশ্চাত্যের ভোগবাদ থেকে মুক্ত হ'তে, সমস্ত আধুনিকতা পরিহার করবে, আর সমস্ত প্রাচীনতাকে বরণ করবে? জড় বিজ্ঞানের সাধনাকে নিরর্থক জ্ঞান ক'রে, কেবলমাত্র অধ্যাত্ম সাধনায় তৎপর হয়ে উঠবে?

এই প্রশ্ন নারীজাতির চিত্তকে অধীর করে তুলেছে।

এই ব্যাকুল প্রশ্নের এক আশ্চর্য উত্তর শ্রীশ্রীমা।

এই জটিল দ্বন্দ্বের সমাধান শ্রীশ্রীসারদামণি।

তিনি আলদা করে কোনো 'বাণী' আমাদের জন্যে রাখেন নি, রেখেছেন তাঁর দ্বন্দ্বহীন, জিজ্ঞাসা-হীন নীটোল মুক্তার মতো জীবনখানি। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী! তাঁর জীবনে ভোগে আর ত্যাগে দ্বন্দ্ব নেই, বাসনায় আর অপ্রাপ্তিতে দ্বন্দ্ব নেই, একাধারে জায়াত্বে আর জননীত্বে দ্বন্দ্ব নেই।

জগতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা!!

ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাস গ্রহণকালে, স্ত্রীকে 'মা' বলে ত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

কিন্তু স্ত্রীকে 'মা' বলে গ্রহণ করবার, 'মা' বলে পূজা করবার এমন সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টান্ত আর কখনো কোথাও দেখা গেছে?

অথচ দেবী সারদামণি এতো বড়ো বিপর্যয়ও কী স্থিরভাবেই না সহ্য করে নিয়েছেন! এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধানের মন্ত্র হচ্ছে—অবিচল স্থৈর্য।

তিনি দুঃখে অবিচল, সুখে অবিচল, দৈন্যে অবিচল, ঐশ্বর্যে অবিচল!

তিনি সেবিকারূপেও যেমন স্বাভাবিক শোভন, পূজার প্রতিমারূপেও তেমনি সহজ সুন্দর।

ভাবলে কী আশ্চর্যই না লাগে!

নিবেদিতা লেনের বাড়ীতে, দূর থেকে ভক্তরা আসে ফুল বিল্বপত্রের অঞ্জলি নিয়ে, শ্রীমা অকুণ্ঠ-হাস্যে সে অঞ্জলি চরণে নেন, সে পূজা গ্রহণ করেন। আবার তৎক্ষণাৎ ছোটেন ভক্তের জল-খাবারের থালা গোছাতে, তার জন্যে পান সাজতে!

দুটি মূর্তিতে এমনই সহজ সামঞ্জস্য, যে কারুর মনে পড়েনা—এ একটি পরম আশ্চর্য!

গৃহস্থ ব্যক্তি যেমন গঙ্গার অগাধ জলরাশি থেকে এক ঘড়া জল তুলে এনে ঘরে মজুত রেখে পূজার প্রয়োজন মেটায়, ভারতের নারীসমাজ যদি তেমনি সারদামণির গুণগঙ্গার অনন্ত বিস্তৃতি থেকে এই একটিমাত্র গুণের সামান্যতম অংশ সংগ্রহ করে আপন হৃদয়ঘট পূর্ণ করে নিতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট, তাতেই কাজ চলে যাবে। তাতেই সে পবিত্র হবে।

সেই নির্দ্বন্দ্ব স্থৈর্য দিয়েই আধুনিক জীবন যাত্রার ধারায়, প্রাচ্যের শাশ্বত ভাবধারাকে 'বহন' করা সহজ হয়ে উঠবে।

শ্রীমার আদর্শ—বুঝতে হলে, গ্রহণ করতে হলে, আমাদের একশো বছর আগের সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে, আহারে ব্যবহারে সাজে সজ্জায় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করতে হবে—এমন কথা যেন আমরা ভাবতে না বসি।

যে যুগের যে ধর্ম, তাকে অস্বীকার করতে চাওয়াটা অর্থহীন। এ যুগটা আড়ম্বরের যুগ। কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা এ যুগে অচল।

তবে সেই কথাটা তো বড়ো কথা নয়?

যুগধর্ম যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু নারীধর্ম অপরিবর্তনীয়।

যেমন অপরিবর্তনীয় বীরের ধর্ম।

'ধর্ম' কথাটার অর্থ এই,—যে 'ধারণ' করে।

কি ধারণ করছে? না—বিশেষ বিশেষ কতক গুলি সদ্গুণ।

নারীধর্ম ধারণ করে রেখেছে—'প্রেম', 'ক্ষমা', 'সংযম', 'শালীনতা', 'ত্যাগ তপস্যা।'

নারীর ধর্ম সৃষ্টিকে পালন করা, সৃষ্টিকে রক্ষা করা। এই রক্ষা মানে শুধুই জাগতিক নিয়মে জীব সৃষ্টি করে মানব গোষ্ঠির প্রবহমান ধারাকে রক্ষা করা নয়, রক্ষা করা অকল্যাণের পথ থেকে, বিনাশের পথ থেকে।

একটি নারীর জন্যে একটি রাজ্য ধ্বংস হতে পারে। একটি মেয়ের দোষে একখানি সংসার নষ্ট হতে পারে।

ভারতের হৃদয়ে নারীধর্মের যে একটি আদর্শ আছে।

শ্রীমা যেন সেই চিরন্তন নারীধর্মের একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

সেই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি এই—মৃদুতাই শক্তি, সহিষ্ণুতাই জয়ের মন্ত্র, অনাসক্তিই আনন্দ।

হয়তো—আজ আমাদের নানা কুয়াশায় আচ্ছন্ন বুদ্ধি দিয়ে, সে ব্যাখ্যাকে সম্যক বুঝতে পারি না, হয়তো বা—বস্তুময় বহির্বিশ্বের অসংখ্য ভোগসুখ, অহরহ লোভের হাতছানি দিচ্ছে বলে বুঝেও বুঝতে চাইছি না। তবু—এও সত্যি, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নারীধর্মের এই অনুপম ব্যাখ্যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বিশ্বের দরবারে নারীজাতির স্বার্থরক্ষার দাবী নিয়ে যতোই আস্ফালন করি, ভোগের উপকরণ সংগ্রহের জন্য যতোই লড়ালড়ি করি, প্রকৃত ত্যাগের মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেই আমাদের মন নম্র হয়ে আসে, মাথা নত হতে চায়।

তখন আর কোন দম্ভের বশেই বলতে পারি না—"মৃদুতা ভীরুতারই নামান্তর, সহিষ্ণুতা দুর্বলের ধর্ম, অনাসক্তি বঞ্চিতের আত্মবঞ্চনা।"

আমাদের ভিতরের সেই শ্রেয়োবোধ একথা বলতে দেয় না।

কিন্তু শুধু 'বোধ' থাকলেও তো হবে না, চেষ্টা থাকা চাই।—'বোধ'কে 'ভাবে' আনা চাই।

স্বভাবকে সুন্দর করতে হবে, জীবনকে রচনা করতে হবে, গতিতে সুষমা দিতে হবে।

নইলে বৃথাই আমাদের এই উৎসবের ঘটা। বৃথাই মা'র মহিমা কীর্তনের মুখরতা।

বিশ্বশিল্পী একান্তে বসে পৃথিবীর গায়ে ফুল কেটেছেন—নদী পাহাড় গাছ মাটি কতো কিছু উপকরণ দিয়েও রং ফলিয়েছেন ফুলে ফলে প্রজাপতির ডানায়।

পৃথিবীর শিল্পী তাঁর অনুকরণে পাথরের গায়ে ফুল কাটে, ক্যানভাসের ওপর রঙের তুলি বুলোয়, কাদামাটির মূর্তি গড়ে।—

কিন্তু মাটি আর পাথর, কাগজ আর কাপড়, তুলি আর বাটালী এই শুধু শিল্প সৃষ্টির উপকরণ?

প্রকৃত উপকরণ তো ধৈর্য আর চেষ্টা।

সেই উপকরণ দিয়ে, আমাদের আপন জীবনখানি সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি না?

সেই শিল্পীই তো শ্রেষ্ঠ শিল্পী, যে জীবনশিল্পী।

শ্রীমা ছিলেন সহজাত শিল্পী।

সুষমায় ভরা তাঁর জীবনকে তিনি নিজের অজান্তে নিখুঁৎভাবে গড়েছেন।

এই মূর্তিখানিকেই কি আমাদের মূর্তি রচনার—'মডেল' করে নিতে পারবো না?

এই প্রসঙ্গে একদিন একটি ঘরোয়া আলোচনায় একটি মহিলা আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"বুঝিতো সব, কিন্তু পারি কৈ? অতো বড়ো আদর্শের দিক ঘেঁসা কি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? মায়ের কথা—আলাদা, তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ মহাশক্তি! আমরা কি?"

এ কথাটি যে শুধু একা তিনিই বলেছিলেন তা' নয়, এমন মনোভাব আমাদের অনেকেরই আছে।

এ মনোভাব কিন্তু ঠিক নয়, এ কথার মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব আছে, একটা পলায়নী মনোবৃত্তি আছে।

মনে রাখতে হবে, নারী মহাশক্তিরই অংশ। যে শক্তি আমাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে রয়েছে তা'কে জাগাতে হবে।

'আমি অধম আমি অক্ষম, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না'—এ কথা বলা অপরাধ, ওতে অন্তরস্থিতা মহাশক্তি অপমানিতা হ'ন।

ভারতের নারীশক্তি আজ জেগে উঠেছে সত্যি—কিন্তু সে শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করতে একটি পরিচ্ছন্ন আদর্শের দরকার। সেই আদর্শের সম্পূর্ণ রূপ শ্রীশ্রীমা।

আমি আর কিছু বলবো না, শুধু এইটুকু বলে শেষ করছি—

তোমার কল্যাণ মন্ত্রখানি,
ঘরে ঘরে শান্তি দিক আনি।
সন্দেহ পরাস্ত হোক
স্তব্ধ হোক বাদ প্রতিবাদ।
রাত্রির তমসা পরে উষার
আলোক আশীর্বাদ।

উমা-মহেশ্বর

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

হিমকণা মাখা তার সকল গায়ে,
হিমকণা ঝ'রে পড়ে শুভ্র পায়ে।

হিমময় জটা তার উঠিলে দুলে
নিঝ্ঝুম নীলিমায় দেয় যে তুলে
হালকা আলোর ঢেউ, আকুল করা,
শান্ত-হৃদয়-প্রেম-বাষ্পগড়া।
দ্রব হ'য়ে নামে তার ভাবের ধারা,
তরতর বেয়ে ধায় পাগল-পারা!
নিম্নের তপ্ত ও তৃষিত দেশে
ঢালিতে শীতল প্রাণ চলে সে হেসে;
করুণা-ব্যাকুল হ'য়ে চলে সে ছুটে,
রাঙা ফুল পায় পায় পড়েরে লুটে;
ধ্যান-ধীর ঋষি সম দেওদার বন
চির-উন্নত শিরে চুম্বি গগন
বদ্ধ কৃতাঞ্জলি, পথের ধারে
বন্দনা-গানে তার আকাশ ভরে;
রাশি রাশি তরুলতা দুপাশ হ'তে
ব্যাকুল হইয়া তার চরণ ছুঁতে
চঞ্চল বাহু মেলি আলোতে, ছায়া
দিনরাত দুলে দুলে বারেবারে ধায়
ঊর্ধ্বে আসীন তার অজিনখানি,
প্রভাত সাজায় সেথা রক্তমণি।
গগন নিবিড়-নীল-নয়ন-নীরে—
নির্বাক, নতশিরে দাঁড়ায়ে ধীরে।

আঁধার প্রবাস হ'তে ফিরিয়া রবি
প্রতিদিন দেখে সেই একই ছবি—
পাষাণ-বেদীর 'পরে শুভ্র, অটল
পাগল যোগীশ ব'সে, চির-নিশ্চল।
নিম্নের কলরব পশে না সেথা,
স্তম্ভিত বনতল কহে না কথা;
চঞ্চল, কভু যদি ওঠে বা মেতে
নিশ্চুপ হয় পুনঃ নিমেষপাতে।
ধ্যানের নিবাত, থির সাগরকূলে
অপরূপ আঁখি যদি কভু বা খোলে,
অহেতুক করুণার নয়ন-পাতে
প্রেমের তুফান ওঠে সারা জগতে;
হরিতে সবার তাপ, কলুষ-হরা,
জটা হ'তে ঝ'রে পড়ে গঙ্গাধারা;
হৃদয়েতে বাসনার ভস্ম-রাশে
আনন্দময়ী মা নাচে হরষে।
পরক্ষণে সব ভোলে মৌন ভোলা,
চিত্তে মিলায় সব স্বপ্ন-দোলা।
মহেশের ইচ্ছার মূর্তি উমা
ভেঙে ফেলে খেলাঘর, সব খেলেনা;
শিব সনে মিশে যায় কোন সুদূরে,
যোগীশের হৃদয়ের গহন-পুরে।

জিগীষু ভারত

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-এইচ্‌-ডি

স্বাধীনতার জনক মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। সকলের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি স্থাপন করিবে। মহাত্মার এই অমর বাণী আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ। আশা করা যায় অনাগত কাল জাতির জনকের এই মহিমাময় প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করিবার উন্মাদনা

না থাকিলেও ভারতবর্ষকে আর এক অর্থে জিগীষু হইতে হইবে। রৌদ্রতাপদগ্ধ এই দেশে আমরা বহুদিন আলস্যের জয়গান করিয়াছি—শ্রমকুণ্ঠ মনোভাব আমাদিগকে একান্ত গৃহের আরামপ্রিয় করিয়াছে, কিন্তু স্বাধীন ভারত এই স্থিতির পথে চলিতে পারিবে না—কারণ ভারতের সংস্কৃতিও গতিরই জয়গান।

ভারতবর্ষ জিগীষু হইয়া আজ বাহির হইবে। তাহার জয়যাত্রা পৃথিবীর দেশে দেশে অব্যাহত গতিতে প্রসার লাভ করিবে। ভারতবর্ষের চিন্ময় আত্মা যে অমৃতবিদ্যা লাভ করিয়াছে, তাহা ত এককের ধন নহে—তাহা সর্বমানবের সর্বকালের। তাই তাহার প্রচার করিতে হইবে।

যজুর্বেদ এই কথাই বলিয়াছেন :—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্ শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ।

এই অতুলনীয়া ব্রহ্মবিদ্যা আমি সকলকে দিব—এই মহিমাময়ী শক্তি সকলেই লাভ করিবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি আপন, কি পর, পৃথিবীর যে যেখানে আছে তাহাদের সকলকেই এই অপূর্ব জ্ঞানরত্ন বিলাইব।

অভিযাত্রী ভারতবর্ষ তাই শতঘ্নী লইয়া অগ্রসর হইবে না, সে লইবে তার জ্ঞানের বর্ম—সে লইবে তার বিদ্যার ক্ষুরধার শক্তি—সে লইবে তার অধ্যাত্ম সাধনার অনন্ত সম্বল এবং ধর্ম-বিজয়ে বিজয়ী হইয়া বরমাল্য লাভ করিবে।

বৈদিক পিতামহেরা বৈরাগ্যসাধক ছিলেন না। তাঁহারা এই সুন্দরী পৃথিবীর ললাম লাবণ্যে চিরমুগ্ধ ছিলেন—তাঁহারা তাই সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনের কামনা করিতেন। তাই তাঁহাদের কণ্ঠে মন্ত্র জাগিত—

বাঙ্ম আসন্ নসো প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোনা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্॥
উর্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ প্রতিষ্ঠা
অরিষ্টানি মে সর্বাত্মানি ভৃষ্টঃ॥ অথর্ববেদ—১৯।৩০

আমার মুখে আসুক বাক্, নাসিকায় আসুক প্রাণ। কর্ণে জাগুক শ্রবণ শক্তি। আমার কেশ অপলিত হোক। অশোণ হোক দন্ত, বাহুতে জাগুক অসীম বল, উরুতে আসুক সহনশীলতা, জঙ্ঘায় আসুক গতি এবং পদতলে আসুক প্রতিষ্ঠা—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হোক রিষ্টহীন—আমার আত্মা হোক চিরজাগ্রত।

ঋষি এই দেহকে ভগবানের মন্দির রূপে দেখিয়াছেন, তিনি অমৃতের পুত্রগণকে বলিয়াছেন, "শোনো শোনো তোমরা সকলেই অমর, তোমরা যে ধামে বাস কর, সেই দেহধাম দিব্য।" দেবজীবন ও দিব্য জীবনের বার্তাই আমাদের প্রাচীন শিক্ষা। কিন্তু এই দেবজীবন মর্ত্যকে গ্রহণ করিয়া—তাহাকে ত্যাগ করিয়া নহে, মধুময় ধরণীর মধুময় জীবনের উত্তরাধিকার আমাদের। আত্মানন্দসমৃদ্ধ ঋষি তাই প্রার্থনা করেন :—

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণাম অরিষ্টিং তনূনাম্
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥ ২।২১।৬

হে জ্যোতির্ময় পরমেশ! তুমি আমাদের দাও অমোঘ সম্পৎ, দাও আমাদের শ্রেষ্ঠ ধন, দাও কর্মনিপুণ চিত্ত, দাও কুশলী মন, দাও আমাদের সুখ ও সৌভাগ্য। আমাদের যে সব সম্পৎ—ঐহিক ও পারত্রিক যা কিছু ধন, তাহা দিনে দিনে নব নব পুষ্টিলাভ করুক, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল হোক, বীর্যে দীপ্ত হোক, ব্যাধিহীন নিরাময় হোক, আমাদের বাক্য হোক সুন্দর, ভাষণ হোক মধুর—আমাদের প্রতিটি দিন আনন্দে ঝলমল করুক।

জীবনকে এই ভাবে যাঁহারা ভাল বাসিয়াছিলেন তাঁহারা ঘরে বসিয়া তর্কজাল সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই—তাহারা ছুটিতে চাহিয়াছেন। বায়ুবেগে দিকে দেশে তুরঙ্গমগতি নিয়া মর্ত্যের মাধুরী

আকণ্ঠ পান করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ যাত্রা আরব বেদুইনের মত নিরর্থক নহে, উদ্দেশ্যহীন নহে—প্রমোদ-ভবন নহে—আত্মসুখপিপাসার মোহে নহে। তাঁহারা বলদা দেবতাদের বলে বলিষ্ঠ হইয়া, তাঁহারা বিশ্বাসের দৃঢ়তায় দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া কাজ করিবেন—সমস্ত বিশ্বকে বেদবাণী দিয়া আর্য করিয়া তুলিবেন।

অনমনীয় মনোবল তাঁহাদের, সেই স্থির বীরগণ নম্র হইয়া পড়েন না, তাঁহারা বিজয় কামনা করেন। দৃপ্তকণ্ঠে তাঁহারা বলেন :—

সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম। ঋ ১০।১৩১।৬

আমরা হব বীর্যে দৃপ্ত—শক্তির ও সামর্থ্যের অধিপতি। আর সেই শক্তি মদমত্ত আমরা

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ।

আমরা জয় করিব এই বিশ্ব ভুবন। ইন্দ্র ও বিশ্ব দেবগণ আমাদের সহায় হবেন। বিশ্বজয়ের কামনা আজ আবার ফিরুক, গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ভারতবাসী পুনরায় তারস্বরে বলুক—আমরা বিশ্বজয় করব। এই মন্ত্রটি চারিটি বেদেই পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যাইবে এই জিগীষা বৈদিক পিতামহদের কতখানি আন্তরিক ছিল।

অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।

ঋ ১০।১০৩।১০

যখন আমাদের বিজয়কেতন উড়িবে—সেই রণ-ভূমে ইন্দ্র আমাদের সহায়—পথিকৃৎ নেতা তিনি আমাদের অভিযানকে জয়যুক্ত করিবেন।

এই অভিযাত্রী বিজয়ীর দল অতন্দ্র কর্মী, কারণ তাঁহারা জানেন

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।

যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।

দেবতারা যাজ্ঞিককে ভালবাসেন—যে দেবহিতে কর্ম করে বিশ্বহিতে আত্ম বিসর্জন করে, সেই দেবতার প্রিয়। তাঁহারা নিদ্রালুকে চান না, স্বপ্নালুকে স্নেহ করেন না, তাঁহারা নিজেরা অতন্দ্র তাই তাঁহারা বিরামবিহীন কর্মীকে আদর করেন—অনলস অতন্দ্র শ্রমেই দেবতার আশীর্বাদ জাগে।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতা ভারতবর্ষকে ক্লীব করিয়া তুলিয়াছে—আমরা আর নড়িতে চাহি না। স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকিতেই আমাদের আরাম। নব নব ব্যাখ্যাতে নব নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া যে লড়াই করে, সেই বীরকে আমরা অনুসরণ করি না—আমরা জীবন্মৃত জাতি। দুর্বলতা ও আলস্য ফাঁকিকে জানে—তাই ফাঁকি আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভারতবর্ষ আজ সাত বৎসর স্বাধীন, কিন্তু কর্মে কোথাও আমরা মাহাত্ম্য দেখাতে পারিনি—বাগাড়ম্বর করিয়াই আমরা কৃতার্থ—আজ এই কর্মবিমুখ দেশে শোনাব বেদের গান—

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।

দেবতারা শ্রান্ত ব্যক্তিরই সখা। যে ছুটিয়াছে—যে কর্মে তৎপর, যে শ্রমে কাতর হইয়াছে দেবতারা তাহারই রথে কাঁধ দিয়া চালাইয়া দেন—অতএব অতন্দ্র কর্ম চাই—বিরামহীন সাধনা—প্রত্যহের অধিকাংশ আর যেন ঘুমে না কাটে, জার্মানীর যুবকদের মত আমরাও যেন ১৬ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে শিখি—তবেই দেশের অভ্যুদয় ও বিবর্ধন হইবে। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রীরা অহিংস—তাঁহারা মৈত্রী করুণা ও মুদিতার আলোকেই বিশ্বজগৎ পুণ্য ও পবিত্র করিয়া তুলিবেন। একদিন, যেদিন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল, সেই দিন ভারত তাহার সাংস্কৃতিক দূত পাঠাইয়াছিল চীন ও জাপানে—পশ্চিম এশিয়ায়, গ্রীস ও রোমে, সেই জিগীষু যাত্রীরা মৃত্যুবাণ মারিতে যান নাই—তাঁহারা অমৃত আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহারা মনে মনে এই বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন :

ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্।

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ॥ ঋ ৯।৬৩।৫

যাঁহারা কর্মবীর, যাঁহারা অশ্রান্ত তপস্বী, তাঁহারা বিধাতার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাঁহারা বিশ্বজগৎকে ঋত ও সত্যের শাসনে আনয়ন করেন—যাহারা বিদ্রোহী, যাহারা বিধিহীন তাহাদিগকে দূর করিয়া তাহারা বিশ্বমানুষকে আর্য করিয়া তোলেন।

জিগীষু ভারতবাসীর সম্মুখে আজ এই মহৎ ব্রত। কল্যাণকৃৎ, ধৃতব্রত তরুণের দল আজ জয়যাত্রায় বাহির হউক—চীন হইতে মেরু—উত্তর-মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সর্বত্র তাহারা আজ ভারতের চিন্ময় আত্মার প্রকাশ করুক। ভারতের মধুবিদ্যাকে মধুরতায় পরিবেশন করিয়া বিশ্বজগৎকে অমৃতলোভী করিয়া তুলুক। বিশ্বকে দিতে হইবে আর্য কৃষ্টি—দিতে হইবে বরেণ্য আর্য সংস্কৃতি—বিশ্ব-মানবকে আজ আর্য করিতে হইবে।

কিন্তু এই আর্য করিবার অভিযানে আমাদের জয়াস্ত্র কি হইবে? আমি বলিব—একান্ত বিশ্বাসে—একান্ত শ্রদ্ধায়—বিশ্বচিত্ত জয়ে আমাদের সহায়—অমর বেদবিদ্যা। এই বেদবাণীর মূল যে মন্ত্র তাহাই বিলাইয়া আমরা মহাভারত গড়িয়া তুলিব।

সেই মহাভারতের মহা সৈনিকদের আজ নিবেদন করিব—তাঁহারা নিজেরা আগে সাধনায় সেই অধ্যাত্ম ধনকে জানিয়া ও চিনিয়া নিন। আমরা জগতের সমস্ত মানুষকে সংবনন ঋষির সমান মন্ত্রের কথা বলিব—আমরা বিস্ময়ে অনুভব করিব যে কতকাল পূর্বে World Parliament নামক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা ঋষিদের যোগদৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্র এই—সার মন্ত্রও বলিতে পারি। আপনারা বলেন যে সাধারণতঃ গ্রন্থকার পুস্তকের শেষ অনুচ্ছেদেই আপন বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করেন। ঠিক যেন তেমনই ভাবে বেদব্যাস বেদের এই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকে এমনই আসন দিয়াছেন।

আসুন সকলে সমবেতকণ্ঠে—শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে আবৃত্তি করি:—

সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ
সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা
জুহোমি॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

হে মনুসন্তানগণ, হে বিশ্ববাণী অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা একসাথে চল। জগতের সভ্যতার গতি একমুখী হোক। তোমরা একসাথে কথা বল। দেশে দেশে বিরোধের যে অগ্নিলীলা তার সমাপ্তি হোক, সমস্ত মানুষের কণ্ঠে একই মিলনধ্বনি জাগুক। তোমাদের মন এক হোক। জগতের সকল মানুষ পৃথিবীকে সুন্দরতর মধুরতর করিবার দুর্বার তপস্যায় অভিপ্রবৃত্ত হোক।

এই সম্প্রীতি, এই সহযোগিতা দেবতাদের জীবনে প্রকাশিত। তাঁহারা মধুর সম্মেলনে মিলিত হইয়া পরস্পরের মর্যাদা রাখিয়া যজ্ঞে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেই সম্মেলন ও সেই সম্প্রীতি তোমাদের হোক।

তোমাদের জীবনের মন্ত্র এক হোক—তোমাদের একই বিশ্বসমিতি হোক—রণদামামা আর যেন না বাজে—বিরাট এক মহা মিলন মণ্ডপে মানুষ সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের যত কিছু বাদ ও বিসংবাদ সমাধান করুক, সমস্ত কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের পরি-কল্পনা করুক।

তোমাদের মন এক হোক, তোমাদের চিত্ত এক হোক—তোমরা একই মন্ত্রে উপাসনা কর—একই যজ্ঞে আত্মবিসর্জনের আহুতি দিয়া প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে দীপ্ত ও দৃঢ় হইয়া ওঠো।

তোমাদের আকূতি এক হোক, তোমাদের

হৃদয় এক হোক—তোমাদের মন এক হোক—তাহা হইলে তোমরা শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণে সমৃদ্ধ হইয়া একমত হইতে পারিবে।

বিশ্বকল্যাণসংস্থান আজিও গড়িয়া ওঠে নাই—বিশ্বমৈত্রী আজিও স্বপ্ন—তথাপি বলিব "হে তরুণ ভারত! হে যুবক ভারত! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ওঠো, জাগো, ঈপ্সিত বর লাভ কর।"

আমাদের পিতামহেরা ধ্যান ও ধারণায় যে বিশ্বসম্মেলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—তাঁহাদের উত্তরাধিকারী আমাদের সেবায় ও প্রচেষ্টায় আজ তাহা সার্থক হোক। আজ আমরা দলে দলে বাহির হইব—জিগীষু ভারতের জিগীষু সৈনিক—কিন্তু আণবিক বোমা হাতে নয়—আণবিক প্রেমের কেতন হস্তে—আমাদের প্রসন্ন যাত্রা। বিশ্ব-দেবতার প্রসাদের পরমানন্দ আমাদের ভৃতি, যিনি যোগক্ষেম বহন করেন—তাহারই শরণাগতি আমাদের শাশ্বতী স্থিতি। জিগীষু ভারতের বীর্যবান্ সাহসী সৈনিকেরা চরিত্রবলে বলীয়ান্ হয়ে সাধু ও সৎ জীবনের মর্যাদায় মহিমান্বিত হোক।

তাহারা প্রার্থনা করুক :—

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
মা সুচরিতে ভজ।
উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতাঁ অনু॥ যজু ৪।২৮

হে পরমেশ! আমাকে পাপাচরণ হইতে পরিত্রাণ কর—দুশ্চরিত হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন সুচরিত ভজনা করি। আমি মধুর জীবনে জাগিয়াছি—সুন্দর সুস্থ ও স্বস্থ জীবনে উঠিয়াছি—আমি অমৃতের অনুসরণ করিয়া উত্তিষ্ঠিত ও জাগ্রত হইয়াছি।

সেই মহাজাগরণ ও সেই মহাবোধনের শঙ্খধ্বনি আজ ক্ষীণ কণ্ঠে করি। কিন্তু এই মহিমাময় উদ্বোধন আসিতেছে—কোনও শক্তিই তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। অজেয় ও অপরাজেয় সেই ভারতবাণী জিগীষু হইয়া যাত্রা করুক। সেই জয়যাত্রায় চারণের মত স্বস্তিবাচন করি :—

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ যজু ৩৬।১৮

জগতের সর্ব ভূত যেন মিত্রের চক্ষু দিয়া আমায় দেখে। সকল জীব যেন আমকে ভালবাসায় ব্যাপ্ত করে। আমিও বন্ধুর মত সমস্ত জগৎকে দেখিব। সকলেই আমার প্রিয় হইবে। এই ভাবে বন্ধু ভাবে পরস্পর অবলোকন করিয়া অদ্রোহ ও অহিংসায় আমরা শান্তি, কল্যাণ ও বিভূতি লাভ করিব।

অহিংসায় ও প্রেমের মন্ত্রেই নব ভারতবর্ষের জন্ম। সেই অহিংসা, প্রেম ও সত্যের অমোঘ বীর্যে ভারতবর্ষ জগজ্জয়ী হইয়া বিশ্বে এক মঙ্গলময় মহিমাময় বিশ্বরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে। তখন দ্যৌ শান্তি লাভ করিবে, অন্তরিক্ষ শান্ত হইবে, পৃথিবী, সলিলধারা, ওষধী ও বনস্পতি শান্ত হইবে।

সা মা শান্তিরেধি।

সেই শান্তির ছন্দ বাজুক—সেই শক্তির জ্যোতির্চ্ছটা জগৎ আলোকিত করুক।

"ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করা বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বগুলিরই প্রচার বুঝি—শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা যে অজস্র কুসংস্কার বুকে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছি, সেগুলির পরিবেশন নহে। সেগুলিকে দেশের মাটি হইতেও উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে যাহাতে চিরদিনের মত উহারা লোপ পায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জাগৃহি

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

খনির তলে মণির মত উপাখ্যানের রূপক-জালে
আড়ম্বরের রঙ্‌মাখা সব অনুষ্ঠানের অন্তরালে,
গুপ্ত হয়ে সুপ্ত হয়ে আর কতকাল থাকবে মাগো,—
সত্যময়ি, শুভঙ্করি, স্বরূপে আজ জাগো জাগো।

সৎস্বরূপে, চিৎস্বরূপে, সেই যে তোমার রূপের আলো
ধ্যানীর প্রাণে দীপ্তি আনে জ্ঞানীর চোখে লাগেই ভালো ,
যোগী ঋষি বিভোল হয়ে দেখেন চেয়ে রাত্রি-দিবা,
সর্বভূতে অধিষ্ঠিত প্রাণরূপে যেই রূপের বিভা।

পুণ্যরূপে, যেরূপ তোমার পাপ-কামনার গোষ্ঠীনাশে,
শম-রূপিণি, ইন্দ্রিয়াসুর নির্জিত যাঁর অষ্ট পাশে,
প্রজ্ঞাময়ি,'অজ্ঞানতার মহিষ যারে ডরায় মাগো,—
সর্বরূপে সর্বাণি, সেই সত্যরূপে জাগো জাগো।

যে রূপ নিয়ে অনাদিদেব মহাকালের মন হরেছ,
দিগন্তের ঐ দশটি হাতে সৃষ্টি ভরে দান করেছ
প্রেম-বরাভয়, জয়-সুষমা, সৃষ্টিময়ি, দিগম্বরি,
দেও দেখা সে বিরাট রূপে জীবন জনম ধন্য করি।

সার্বজনীন পূজা

শ্রীচুনীলাল মিত্র, এম্‌-এ

যে ব্যক্তি যে গ্রন্থে ভারতে হিন্দুর দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটী বলিয়াছিলেন সেদিন তিনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের জনসংখ্যাকেই নির্দেশ করিয়াছিলেন। উহা পরবর্তীকালে ৪০।৪২ কোটীতে দাঁড়াইয়াছিল। বর্তমানে খণ্ডিত ভারতেও দেবদেবীর সংখ্যা তাহা হইলে প্রায় ৩৭ কোটীই হইবে। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রতি জীবকেই শিব মনে করিতেন এবং প্রতি মানুষের মধ্যেই ভগবানকে স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল দেবদেবীর পূজার মধ্য দিয়াই একাধিক তন্ত্র, মন্ত্র ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল পূজাকেই কেন্দ্র করিয়া ভারতবাসী উৎসবানন্দকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে।

মনে হয়, সকল জাতি অপেক্ষা একমাত্র বাঙালীই

বেশী উৎসব প্রিয়। তাই বাঙালীর মধ্যে "বার মাসে তের পার্বণের" সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ এই উৎসব সংখ্যাতীত। নববর্ষের উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব, কোজাগরী লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসন্তী, দোলযাত্রা, রথ, জগদ্ধাত্রী, রাস, বিশ্বকর্মা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, নবান্ন, মনসা ও চড়ক-গাজোনৎসব কয়েকটি প্রধান। প্রাচীনকালে এই সকল উৎসবের একটা সার্বভৌম দিক ছিল। আপামর জনসাধারণকে আনন্দ দান, সামান্য পূজোপকরণ ও সাজসজ্জা গ্রহণের মধ্য দিয়া একরূপ অর্থবিতরণই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। তখন উৎসবে আপনপর ভেদ থাকিত না। পক্ষান্তরে যে উৎসব যত ব্যাপক ও সর্বজনীন আনন্দ বিধানে সমর্থ হইত সেই উৎসবই তত সার্থক বলিয়া গণ্য হইত। উৎসবের উৎসই ছিল তখন আনন্দাস্বাদন ও আনন্দ বিতরণ জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে।

উদ্ভব ও প্রসার

এই সকল প্রধান প্রধান পূজায় ও উৎসবে যে সার্বভৌম ও সার্বজনীন কল্যাণ নিহিত ছিল উহার একটা মনোরম চিত্র ও বিশদ বর্ণনা স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছেন। সেদিন পূজা-মণ্ডপে ও উৎসবানন্দে উচ্চনীচ শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সবারই অবাধ গতি ছিল। সাময়িকভাবে জমিদার নিজের আভিজাত্য ও প্রজার নিকট হইতে নিজের দূরত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া সকলের সমানাধিকার স্বীকার করিতেন। ক্রিয়াকর্মগুলি সেদিন ছিল নিঃস্বার্থ একান্ত পরার্থে। তারপর ব্রিটিশ শাসনের ও ইংরাজী সভ্যতার অন্যতম অভিসম্পাত হিসাবে এই সব পূজা ও উৎসবগুলি নিতান্ত প্রাণহীন, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্ধ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের সর্বজনীন আনন্দ, লোককল্যাণ ও লোকশিক্ষার দিক লোপ পাইতে থাকে। পূজা উৎসবে তখন আসে আভিজাত্যের ছাপ। উহা তখন একান্ত আনুষ্ঠানিক ও মামুলি হইয়া উঠে। ফলে হিন্দুসমাজে আবার দেখা দেয় শ্রেণীগত বিভাগ, বর্ণবৈষম্য। পূর্বে যে পূজামণ্ডপ গান, বাজনা, যাত্রা-থিয়েটার, তর্জা কবি পাঁচালী ও পুতুলনাচে—এক টানা একটা অনুষ্ঠানে দিবারাত্র মুখর থাকিত, পরবর্তী কালে সে সব অনুষ্ঠানে ভাটা পড়ে। এমনকি বিগ্রহও আপন ও পারি-বারিক হইয়া পড়ে। এক কথায়, পূজাপার্বণকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। কেবল মাত্র নিকট আত্মীয়দের ও নির্দিষ্টসংখ্যক নিমন্ত্রিতদের উহাতে অধিকার ও সান্নিধ্য লাভ হয়। পূজা-পার্বণে এই দূরত্ব স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে অস্পৃশ্যতা-অপরাধ সংক্রামক ভাবে সমাজে প্রবেশ করে ও সমাজের পতন সুরু হয়। সেকারণ মুষ্টিমেয় সমাজ নেতা ও চিন্তাবীর প্রাচীন প্রথাব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই সার্বজনীন পূজার প্রবর্তনে অগ্রণী হন।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাবে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় নবজাগরণের প্রকাশ পায় সাহিত্যে ধর্মে দর্শনে রাজনীতিতে ও কলাবিদ্যায়, সেই একই জাগরণের আংশিক অভিব্যক্তি হিসাবেই সার্বজনীন পূজার প্রবর্তন হয়।

সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

সে কারণ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রারম্ভে ও প্রথমাবস্থায় ইহার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। মাত্র পনরটি বৎসর পূর্বেও বাংলার সার্বজনীন পূজা ভারতীয় শাশ্বতী বাণী ও ঐতিহ্যকে "বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া" কে শতাংশে হইলেও সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। কিছু কালের জন্য সার্বজনীন পূজামণ্ডপে আপামর জনসাধারণের অবাধ গতি

ছিল। একান্ত দীন-দুঃখীদের মধ্যেও নিকটবর্তী কোনও পল্লীর পূজার জন্য আনন্দহিল্লোল বহিয়া যাইত। প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই সকল পূজার মাধ্যমে তরুণদের সংগঠন শক্তি, নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগরিত হইয়াছিল। সহর হইতে শুরু করিয়া ইহা সহরের উপকণ্ঠ ও পরে জেলা-সহরগুলিতে এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামেও বিস্তৃতিলাভ করে।

পরিচালনা ও নেতৃত্ব

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অত্যল্পকালের মধ্যেই সার্বজনীন পূজা উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দ্রুত অবাঞ্ছনীয় অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে একরূপ উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। এই ক্রমাবনতি একাধিক কারণে সম্ভব হইতেছে। প্রথমতঃ, এই পূজাগুলির মাধ্যমে প্রধানতঃ আর্থিক শক্তিরই অনুশীলন হইতেছে। ইহাতে বিত্ত সম্পত্তির প্রতিযোগিতা চলিতেছে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে। প্রায় সর্বত্রই সব লোককেই কর্তৃত্বের লালসা পাইয়া বসিয়াছে। অতি তুচ্ছ বিষয়ে মনোমালিন্য হইতেই দুই জনের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে উভয়েরই সমর্থকদের লইয়া পরস্পরে দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পরবৎসর প্রায় একই স্থানে দুইটি সার্বজনীন পূজা দেখা যায়। যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল ও ঔদ্ধত্য ও আরোও হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারে সেই-ই স্বতন্ত্র দল গঠন করে। স্থলে স্থলে দল ও সমর্থকদেরও প্রয়োজন হয় না। মাত্র মুষ্টিমেয় ২।৩ জন লইয়াই একটি সমিতি গঠিত হয় এবং চার পাঁচ শত চাঁদার পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইলেই একটা সার্বজনীন পূজা সম্ভব হয়। ফলে, একই অঞ্চলে বৎসরের পর বৎসর সার্বজনীন পূজার সংখ্যা ক্রমবর্ধিতই হইতেছে।

আদর্শ রক্ষা?

ইহাতে পূজার আদর্শ ত রক্ষিত হইতেছেই না, পক্ষান্তরে তরুণগণ বিপথগামী হইতেছে। কোনও সার্বজনীন পূজায় আর আন্তরিকতা অকৃত্রিমতার স্থান নাই। প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে মনে ও বাইরের কাজে কপটতা ও প্রতারণা দেখা দিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশে কেবলমাত্র একাধিক সার্বজনীন পূজায় যে কয়েক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়, মনে হয় কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার হিসাব রাখেন নাই। আবার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ঐ টাকারও শতকরা নব্বইটা মুদ্রা মহৎ উদ্দেশ্যে এবং পূজার মাঙ্গলিক ও সার্বজনীন আনন্দে ব্যয়িত হয় না। যে কোনও পূজায় যে কোনও সমিতির শতাধিক হইতে কয়েক সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অথচ উহার হিসাব মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা ব্যতীত সাধারণ ও প্রতিবেশী ত দূরের কথা ঐ সমিতির সভ্যেরাই সন্ধান রাখেন না। ইহা তাঁহাদের অলসতা, ঔদাসীন্য হইতে পারে, অক্ষমতাও হইতে পারে, অথবা, তাঁহাদের অত্যধিক সততার দরুন উক্ত কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের বঞ্চিত করেন। অথচ সাধারণ্যে সমিতি পূজান্তে বা বৎসরান্তে টাকাপয়সা কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া আয়ব্যয়ের একটা খসড়া ছাপাইয়া বাহির করেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাব দাখিল করার সৌজন্যটুকুও থাকে না। অথচ পরবর্তী বৎসরের অনুরূপ চাঁদা সাধারণের অবশ্য দেয় এবং তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই প্রাপ্য এইরূপ উদ্যোক্তাগণ মনে করেন। যথার্থ অক্ষম ব্যক্তিরও অব্যাহতি নাই। সহরে তিনি শ্লেষের পাত্র হন ও পল্লীগ্রামে একরূপ সমাজচ্যুত হন। এই বীভৎস ব্যভিচার ব্যক্তির বা সমাজের মঙ্গলের নয়। সর্বাপেক্ষা বিব্রত ও বিপন্ন হন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। এক পূজার চাঁদা দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্বেই তাঁহাকে অপর চাঁদার দায়ে পড়িতে হয়। বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই তাঁহাকে

চপলমতি কিশোরদলের বা অকর্মা তরুণদের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা কেবলমাত্র অস্বস্তিকর ও হাস্যকর ব্যাপার নয় এক অতি মর্মন্তুদ দৃশ্য। যে পরিবারের গৃহে পাঁচটি মুদ্রার অভাবে বৎসরে একটি সরস্বতী পূজা হয় না সেই পরিবারের কর্তাকেই অধুনা সার্বজনীনের যুগে এক একটি পূজাতেই পঁচিশ টাকা দেওয়াও বিচিত্র নয়। ইহা যে কতদূর জঘন্য ও দুঃখপূর্ণ তাহা প্রত্যেক অভিভাবকই মর্মে মর্মে অনুভব করেন, অথচ তাহা প্রকাশ্যে বলিবার সাহস নাই। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে যে কোনও বয়স্ক ব্যক্তি যে কোনও কিশোর বা তরুণের একটা অসঙ্গত কাজকে সহ্য করিতেন না। তিনি উহার প্রতিবাদ ত করিতেনই, প্রয়োজনবোধে প্রহারও দিতে দ্বিধা করিতেন না। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন প্রত্যেকটি বালককে নিজেদের পরিবারের মনে করিতেন, পল্লীর প্রতিটি বালকও যে কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে তেমনি নিজেদেরই অভিভাবক হিসাবে ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। আজ-কাল এই এক দিকের স্নেহ ও অপর দিকের শ্রদ্ধা দু'য়েরই অভাব হইয়াছে। ইহাও সমাজের নৈতিক অবনতির একটি দিক।

আবার বর্তমানে নৈতিক সাহসই যথেষ্ট নয়। দৈহিক মাংস-পেশীরও সাহস চাই। ইহাও সার্বজনীনের বীভৎসতার অপর একটি দিক।

পূজার আয়োজনে দেখা যায় সমগ্র আয়ের প্রায় বার আনাই প্রতিমার জন্য ব্যয় হইয়াছে। বাকী চারি আনার অর্ধেক প্যাণ্ডেল ও ডেক-রেসনে ব্যয় হইয়াছে, বাকী মোট দুই আনাতেই পূজোপকরন ফল মূল ফুল পুরোহিত-বিদায় সমাপ্ত। কাজেই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও আমরা মুখ্যকে গৌণ করিতেছি। পাঁচ সাত শত টাকার পূজায়ও নিরীহ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিকট উদারতা দাবী করিতেছি ও তাহার বাধ্যতামূলক বদান্যতায় সামান্য দক্ষিণায়ই কাজ সম্পন্ন করিতেছি। কোনও কোনও জেলা সহরে দেখি কোনও কোনও পূজায় শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থ ঢাক বাদ্য বাজনায় ব্যয় হইতেছে। কারণ সেখানে প্রচারের প্রতিযোগিতাই বেশী। উভয় ক্ষেত্রেই পূজার্চনা গৌণ, নিছক আনুষ্ঠানিক হইতে চলিয়াছে।

ইহারও কারণ রহিয়াছে। আন্তরিকতার যেখানে অভাব সেখানে কৃত্রিমতাই প্রধান স্থান গ্রহণ করে। শুচিতা না থাকিলে শুচিতার অভিনয়ই শুচিতার স্বীকৃতি পাইতে চেষ্টা করে ও প্রাধান্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—"যে অংশে পূজা নিজের সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে; যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে।" তাই অধিকাংশ সার্বজনীন পূজাকে আজ সঙ্গতি ও সংযমের সীমাকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন করিতেই দেখা যাইতেছে।

এই কৃত্রিমতা ও অভিনয়ের আরও একটি কারণ আছে। যে বস্তু নিজের তাহার অধিকার প্রকাশ্যে জানাইবার প্রয়োজন হয় না। যাহা অপরের তাহার উপর অধিকার দাবী করিলেই অলীক হইলেও ঘোষণা করিতে হয়। যুদ্ধকালীন স্বপক্ষের পরাজয়কে গোপন করিতে হইলে বিপক্ষের জয়কেই পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করিতে হয় এবং ঐ মিথ্যা প্রচারেই কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় হয়। পূর্বে যে পূজায় আপামর ইতর ভদ্রের অবাধ গতি ছিল সেখানে জনসাধারণ প্রতিনিয়তই স্মরণ করিত যে জমিদার বাবুদের 'সরকার' বা 'ভঞ্জ চৌধুরী' মহাশয়দের পূজা। সেখানে গৃহস্বামীর আর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বাড়ীর পূজা স্বীকার করারই প্রয়োজন ও অবসর হইত না। তিনি বিগ্রহের সেবার কোনও ত্রুটি হইল কিনা বা প্রতিমার পূজোপকরণের কোনও অভাব পড়িল কিনা এই সব দেখিতেই উদ্বিগ্ন। তিনি পুত্রকন্যা

সহ পরিবারস্থ সকলকেই লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্মক্লান্ত। আর বর্তমান সার্বজনীনে যিনি প্রতিমার বায়না করিয়াছেন অথবা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়াছেন অথবা ডেকরেটারদের ভাড়া করিয়াছেন, বা যিনি চাঁদা আদায় করিয়াছেন, পুরোহিত ঠিক করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজের কর্তৃত্বও সাধারণে একরূপ নিজের পূজা বলিয়াই জাহির করিতে ব্যস্ত। অথচ যাহা আদৌ নিজের নয় তাহাকে সম্পূর্ণ নিজের বলিয়া প্রচার ও প্রমাণ করা যে কী দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অপচেষ্টাই সার্বজনীন পূজার বার আনা ব্যর্থতা ও বীভৎসতার জন্য দায়ী।

উপসংহার

আমাদের মনে হয় স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এই ধরনের সার্বজনীন পূজার প্রয়োজনীয়তা আর নাই, কারণ এক দিকে সেই আদর্শের যেমন অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে তেমন অন্য দিকেও মূল অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সামাজিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতির জন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা সরল ও অকৃত্রিম আয়োজনে পূজা করুন। কিন্তু সেখানে ব্যাপকভাবে সাধারণের অর্থের প্রয়োজন থাকিবে না, চাঁদার খাতা বাহির হইবে না। 'মাইকে'র দ্বারা তথাকথিত 'সার্বজনীনের' প্রচার হইবে না—অথচ সেখানে আপামর জনসাধারণের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের গতি অবাধ থাকিবে ও দেবীপ্রতিমায় অর্ঘ্য অঞ্জলি দিবার সমানাধিকার স্বীকৃত হইবে। সকল দেবদেবীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন তাঁহারা বর্তমান সমাজকে আজকালকার সার্বজনীন পূজার কদর্যতা, জঘন্যতা ও ব্যভিচার হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দেন।

সহজিয়া

শান্তশীল দাশ

দুঃখবাদের জাল বুনিনা ঃ হইনি আমি শংকিত ;
আমার বীণা মধুর গানে আজো যে হয় ঝংকৃত।
ধ্যান করি না চক্ষু বুঁজে,
পাব নাকো যে ধন খুঁজে ;
অকারণে অসন্তোষের ক্ষোভ করি না সঞ্চিত।

দুঃখ, ব্যথা, আঁধার আছে এই ধরণীর বক্ষেতে,
এই দেখে ভয় করবো শুধু! দেখবো না সে চক্ষেতে
বিচিত্র রঙ, রূপের খেলা,
দিকে দিকে আলোর মেলা—
তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে বিচিত্রিতার অংকেতে।

চোখের জলে বুক ভরেছে,—শুনেছি যে তার মাঝে
বুকের বীণার একটি তারে কী প্রশান্ত সুর বাজে।
আঘাত পেয়ে তাই অকারণ
করি না কো মৃত্যু স্মরণ ;
দুঃখ-সুখের সহজ পথে চলতে না পাই শংকা যে।

শুভ্র শিবের আকর্ষণে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আচার্য শঙ্কর তাঁহার বিখ্যাত শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্রের অন্তিম শ্লোকে মহাদেবের সর্বশুক্ল মূর্তির চমৎকার বর্ণনা দিয়া সকল কালের সকল উপাসকের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—

সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা

"সেই এই সর্বশুভ্র মহাদেব সর্বদা আমাদের হৃদয় মনের সকল কালিমা দূর করিয়া দিন, স্বচ্ছ, শুদ্ধ, শুভ্র চিত্তরূপ পরম ঐশ্বর্য আমাদের অধিগত হউক।" কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব কোণের বরফাবৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্গম অমরনাথ গুহায় তুষার-লিঙ্গ অমরনাথ মহাদেবের দর্শনকালে ভাবুক-চিত্তে আচার্যের উক্ত বর্ণনাটি স্বতই যেন অনুরণিত হইতে থাকে —"সেই এই সর্বশুভ্র মহাদেব।" নিত্যপরিচিত পৃথিবীকে যেন কত দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি—পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণ, রস, বহুতর স্পর্শ, গন্ধ, প্রাত্যহিক সংসারের অজস্র কোলাহল, হৃদয়ের বিবিধ আশা আকাঙ্ক্ষা উল্লাস দুঃখ সবই যেন মূক হইয়া গিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বের বিরাট গম্ভীর হিমনিলয় শৈলমালার নিশ্চল মৌনতায় দেহ-মন প্রাণ আপনার সত্তা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। শুধু একটি চেতনা —"সেই এই সর্বশুভ্র মহাদেব।" শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা— "হে শিব, তোমার শুভ্রতা দ্বারা আমার জীবন ধন্য কর।'



তুষারদেহ শ্রীঅমরনাথজী

স্বামী বিবেকানন্দ ৺অমরনাথ দর্শন করিয়াছিলেন খ্রীঃ ১৮৯৮ সালের ২রা আগষ্ট—শ্রাবণী পূর্ণিমায়। শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই এই তীর্থদর্শনের যোগ। অবশ্য আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও কেহ কেহ (সাধারণতঃ সাধুসন্ন্যাসীরাই) দর্শন করিয়া থাকেন। স্বামীজীর পূতস্মৃতি-বিজড়িত কাশ্মীরের অমরনাথ-তীর্থের প্রতি

সেই হইতে বেলুড় মঠের ত্যাগী সেবকগণের হৃদয়ে একটি বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। তাই মাঝে মাঝে এক এক বৎসর আষাঢ়ী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায় কয়েকজন করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কর্মকেন্দ্র হইতে কিছুদিনের অবসর নেন এবং কাশ্মীরের এই প্রাচীন মহাতীর্থ দর্শন করিয়া আসেন। শুভ্র শিবের আকর্ষণে এবারও দু'টি দল অমরনাথ গিয়াছিলেন। প্রথম দলটি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় (২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই ১৯৫৫) শিবের দর্শন লাভ করেন। এই দলে ছিলেন কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দজী এবং চারজন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী। তখনও রাস্তার বহু স্থান তুষারাবৃত। এক জায়গায় একটানা নয় মাইল তাঁহাদিগকে বরফের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এবার যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় একশত। তখনও কাশ্মীর সরকার রাস্তার ব্যবস্থাদি আরম্ভ করেন নাই।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় তীর্থযাত্রী মঠের দ্বিতীয় দলে ছিলেন আটজন সন্ন্যাসী এবং তিনটি যুবক ভক্ত (একজন কলিকাতার, একজন কানপুর হইতে, তৃতীয় ব্যক্তি বোম্বাইএর)। লেখকও এই দলের একজন। আমাদের দলের মারাঠী ভক্তটি (তিনি ডাক্তার) বোম্বাই হইতে বিমানযোগে দিল্লী হইয়া শ্রীনগর আসিয়াছিলেন। বাকী আমরা সকলে দিল্লী হইতে কাশ্মীর মেলে পাঠানকোট এবং পাঠানকোট হইতে ২৬২½ মাইল শ্রীনগর পৌঁছিয়াছিলাম মোটর বাসে। উত্তর রেলওয়ে কোম্পানি অমরনাথ যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকদিন যাবৎ দিল্লী হইতে ডুপ্লিকেট কাশ্মীর মেলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মোটর পথের প্রথম ৬৩ মাইল (পাঠানকোট-জম্মু) প্রায় সমতল। ইহা মাত্র কয়েক বৎসর তৈরী হইয়াছে দেশবিভাগের পর, গত কাশ্মীর যুদ্ধের সময়। বিস্তীর্ণ জঙ্গল কাটিয়া, পার্বত্য তরাইয়ের বন্ধুর শিলা বিদীর্ণ করিয়া এবং সর্বোপরি ছোটবড় অনেকগুলি বেগবতী পাহাড়ী নদীর (ইহার মধ্যে ইরাবতীও (Ravi) আছে) উপর কোথাও কংক্রীট ও কোথাও বা লৌহসেতু তুলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ প্রশস্ত ও দৃঢ় রাস্তা নির্মাণে ভারতীয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ যে কৃতিত্ব ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে লখনপুর। এখানে পাঞ্জাবের সীমা শেষ এবং কাশ্মীর-জম্মু রাজ্যের আরম্ভ। লখনপুরে কাশ্মীরগামী প্রত্যেক যাত্রীকে পারমিট দেখাইতে হয়। পাঠানকোট-জম্মু রাস্তার কয়েক স্থানে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ছাউনি দেখা গেল। শত শত মোটর-ট্রাক কাঠ এবং অন্যান্য নানা সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উপর-নীচে যাতায়াত করিতেছে; শত শত সিপাহীর নিকটে ও দূরে, মাঠে ও জঙ্গলে সুশৃঙ্খল কর্মব্যাপৃতি। স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষী বীর সন্তান ইহারা—চোখে মুখে উৎসাহ ও আনন্দের দীপ্তি।

জম্মুর পর রাস্তা পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে। ইহা হিমালয়েরই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। বিচিত্র আরণ্য শোভা দেখিতে দেখিতে, একবার কয়েক হাজার ফুট উঠিয়া, আবার শত শত ফুট নামিয়া, কখনও বা কোন পাহাড়ী গ্রামকে পাশে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। মোটর-পথের বহু নিম্নে ভীমগর্জনা চন্দ্রভাগার (Chenub) দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছিল। উধমপুর, কুদ্, রামবন—তিনটি ছোট শহরে বাসগুলি কিছুক্ষণ করিয়া থামিল। যাত্রীরা জলযোগ বা পুরা আহারও করিয়া লইতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমাদের বাসটি বানিহাল পৌঁছিল। এখানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। বানিহাল অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা, উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। জনৈক পূর্বপরিচিত কাশ্মীরী ডাক্তার স্থানীয় টাউনহলে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এখানেই একটি পার্কে প্রথম দেখিলাম কাশ্মীরের বিখ্যাত চেনার গাছ—পেঁপের ডালের মত বড় বড়

পাতা, বিপুল-দেহ বহু-শাখান্বিত উন্নতশির মহীরুহ। পরে কাশ্মীরে গিয়া নানা স্থানে চেনারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছি, ইহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়াছি, সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার এই অন্যতম সৌন্দর্য-বিধায়ক বৃক্ষরাজটিকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছি। অবশ্য, ইহার সহিত সারাগায়ে পত্র-সম্ভারযুক্ত ঋজুদেহ অল্প-শাখ পপলার এবং ছোট ছোট পাতা ও লতানো ডালের উইলোকেও।

প্রত্যূষে যাত্রীদের লইয়া বাস্ তাহার ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা আরম্ভ করিল। ক্রমে ৮৯৮৫ ফুট উঁচুতে চড়িয়া বানিহাল পাস্। এই বিখ্যাত সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া মোটর পাহাড়ের অপর পার্শ্বে থামিল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের সব চোখগুলি নিম্নের কি দৃশ্য দেখিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। বিস্তীর্ণ কাশ্মীর উপত্যকা! যেন কয়েক হাজার বর্গ মাইলের একটি বিরাট রম্যোদ্যান বিশ্বকর্মা আলাদা করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন! শীঘ্রই আমরা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু সেই রম্যোদ্যানে নামিয়া আসিলাম। চেনার-পপলার-উইলো গাছের সারির মধ্য দিয়া, বহু জলধারা-প্রবাহিত বিস্তৃত শ্যামল ধান্যক্ষেত্র দু'পাশে রাখিয়া, সুন্দর সমতল পিচের রাস্তায় বাস ছুটিয়া চলিল। দূরে তুষারাবৃত পর্বতচূড়াগুলির শুভ্র শোভা। ঝিলাম বা বিতস্তা নদীকে অতিক্রম করিলাম। নদী বামপাশে সুদূরের শস্য ক্ষেত্রের ভিতর অদৃশ্য হইল। রাস্তার ছোট ছোট জনপদ—কাজিগুণ্ড, খানাবল, বিজবিহার, অবন্তীপুরকে ছাড়াইয়া, ক্রমে বিতস্তাকে আবার মাঝে মাঝে নিকটে পাইয়া পামপুর; অবশেষে আরও নয় মাইল দূরে যখন শ্রীনগর পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার কাশ্মীর গিয়া শ্রীনগর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (১৩।৯।১৮৯৭) লিখিয়াছিলেন—

"এক্ষণে কাশ্মীর। এদেশ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছ তাহা সত্য। এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না। কিন্তু এমন নরক কুণ্ডের মত ময়লা গ্রাম ও শহর আর কোথাও নাই।"

পরবর্তী আর একটি চিঠিতে শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অনুকূল। কিন্তু এদেশের যারা বর্তমান অধিবাসী তাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেও তারা অতীব অপরিষ্কার।"

পাশ্চাত্ত্য মহিলা শিষ্যাদের লইয়া দ্বিতীয়বার তিনি যখন কাশ্মীর যান সেই সময়কার তাঁহার একটি পত্রে (২৫।৮।১৮৯৮) দেখিতে পাই—

"ভগবানের দুনিয়ায় জমকাল সৌন্দর্যের যা পরাকাষ্ঠা হতে পারে তারই মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে—যেখানে পৃথিবী, বাতাস, ভূমি, ঘাস, গুল্মরাজি, পাদপশ্রেণী, পর্বতমালা, তুষার-রাশি এবং নরদেহের অন্তঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই যে সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে—তারই ভেতরে মনোরম ঝিলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি।"

সাতান্ন বৎসর পরে এখনও শ্রীনগর গিয়া এই চিত্রই দেখিতে পাওয়া গেল। প্রকৃতি সুন্দর, প্রকৃতির পরিবেশে ঝিলামের প্রথম সেতু 'আমিরা কদল' ও দ্বিতীয়—'হাওয়া কদলের' মাঝখানে, তথা বিস্তীর্ণ 'ডাল' লেকের তটে ধনী ও অভিজাত প্রচুর বিত্ত ঢালিয়া যাহা খাড়া করিয়াছে তাহাও সুন্দর; কিন্তু যেখানে বিত্ত নাই, নির্মম জীবনসংগ্রামে পরিশ্রান্ত বুভুক্ষু মানুষের প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার সামর্থ্য নাই সেই 'জনগণের কাশ্মীর' অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধ, কদর্য। দুই হাজার দুই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট অশোক যখন প্রথম শ্রীনগর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন তখনও কি নগরের শ্রী শুধু অভিজাতকেই ঘিরিয়া শোভমান ছিল, না জনগণও অনুভব করিত সেই শ্রী তাহাদেরও দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে?

একদিন বিকালে রাজধানী শ্রীনগর হইতে শত শত দর্শক দর্শিকার প্রণাম ও পূজা লইয়া 'ছড়িজী'র শোভাযাত্রা অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গেল। আচার্য শঙ্কর কাশ্মীরে অমরনাথ ও সারদাপীঠ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতীকস্বরূপ দুটি রৌপ্যনির্মিত লাঠিকে প্রতিবৎসর অমরনাথ যাত্রায় লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার সঙ্গে চলেন দশনামী মঠের মোহন্ত ও রক্ষিবৃন্দ, কাশ্মীর সরকারের 'ধর্মার্থবিভাগে'র সেবকগণ এবং অনেক সাধুসন্ন্যাসীও। জগদ্‌গুরুর অলক্ষ্য শক্তি যেন আজিও দুর্গম-যাত্রাপথে সহস্র সহস্র ভক্তকে সাহস ও উৎসাহ দিবার জন্য যাত্রার পুরোভাগে সক্রিয় আশীর্বাদরূপে চলিতেছে। শ্রীনগর হইতে 'ছড়ি' রওনা হইবার তিন দিন পরে আমরা বাসে পহলগাঁও পৌঁছিলাম—পথে থামিয়া থামিয়া আসায় ছড়ির পৌঁছিতে আরও দুই দিন দেরি হইল। আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম পহলগাঁও বা অমরনাথের পথের 'প্রথম গ্রামে' একটি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ জমা হইয়াছে।

তিন দিকে বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়া, নীচে ঘন পাইন গাছের বন বুকে লইয়া শৈলশ্রেণী, লিডার ও শেষনাগ নামক দুই খরস্রোতা শুভ্রতোয়া নদীর সংযোগস্থলে শষ্পাস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর—এই রমণীয় পরিবেষ্টনীর মধ্যে সাত হাজার ফুট উচ্চতার ছোট শহরটিতে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, তামিল, মালাবারী—কত রকমের নরনারীই না ৺অমরনাথের নামে সম্মিলিত। কাশ্মীরীরা তো আছেনই। নদীর ধারের মাঠে, আবার দূর পাহাড়ের ঢালে পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে



পহলগাঁও

ছোট বড় কত তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর শহর। প্রত্যেক তাঁবুতে কয়েক দিনের সংসারের বিবিধ ব্যস্ততা,—রান্না, বাসনমাজা, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামলাভ—আবার ভগবানের নামকীর্তন, শাস্ত্রপাঠ,

* মতান্তরে—ছড়িদুটি মহাদেবের শক্তির প্রতীক। প্রাচীনকালে দস্যু ও রাক্ষসের অত্যাচারে যাত্রীরা কিছুকাল অমরনাথ দর্শনে যাইতে না পারায় শিবের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দুইটি যষ্টি দিয়া বলেন, উহা সম্মুখে রাখিয়া গেলে আর কোনও বাধা থাকিবে না। তখন হইতেই নাকি ছড়ির শোভাযাত্রা প্রচলিত।

ধর্মপ্রসঙ্গ। বাজারে লোক থই থই করিতেছে। অমরনাথ-যাত্রার সকল সাজসরঞ্জাম এখান হইতেই গুছাইয়া লইতে হইবে—ঘোড়া, কুলী, ডাণ্ডি, চাল, আটা, ঘি, তাঁবু, বিছানার নীচেকার চাটাই, ওয়াটারপ্রুফ, উনুন, কয়লা, বাসনপত্র, লণ্ঠন—আবার বরফের উপর দিয়া চলিবার অপরিহার্য সহায় শক্ত লোহার-পা বসানো লাঠিটি পর্যন্ত। শহরের মাথায় একটি উঁচু জায়গায় 'ছড়ি-সাহেবে'র তাঁবু দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যায় ছড়িজীর আরতি, পূজা; পরে অমরনাথজীর মাহাত্ম্য পাঠ শত শত ভক্ত মেয়ে-পুরুষ স্থিরভাবে বসিয়া শুনিতেছেন। পহলগাঁয়ে অমরনাথযাত্রার প্রাক্‌কালীন পরিবেশ প্রাণে একটি অব্যক্ত অনুভূতি লইয়া আসে, অদ্ভুত মধুর অতি-লৌকিক একটি আনন্দ-সুর হৃদয়ের সকল তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া যায়, চিত্তের সকল মেঘ সরাইয়া শুভ্র শিবের স্মিতহাস্য চকিতে ফুটিয়া উঠে।

দ্বাদশীর ভোর বেলা; ১৪ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই, ১৯৫৫। পহলগাঁওয়ের ভারতবর্ষে সাজ সাজ রব। 'ছড়ি' শেষরাত্রে রওনা হইয়া গিয়াছে। উঠ, উঠ, বিছানাপত্র বাঁধো, তৈয়ার হইয়া লও। যত শীঘ্র পারা যায় যাত্রা শুরু করা দরকার, সূর্য উঠিয়া গেলে পথ চলিতে কষ্ট হইবে। বারো হাজার নর-নারী বালক-বৃদ্ধ-যুবার ভারতবর্ষ সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া নড়িতে আরম্ভ করিল, প্রতি মুখে 'জয় অমরনাথ স্বামী কী জয়' ধ্বনি শোনা যাইতেছে।

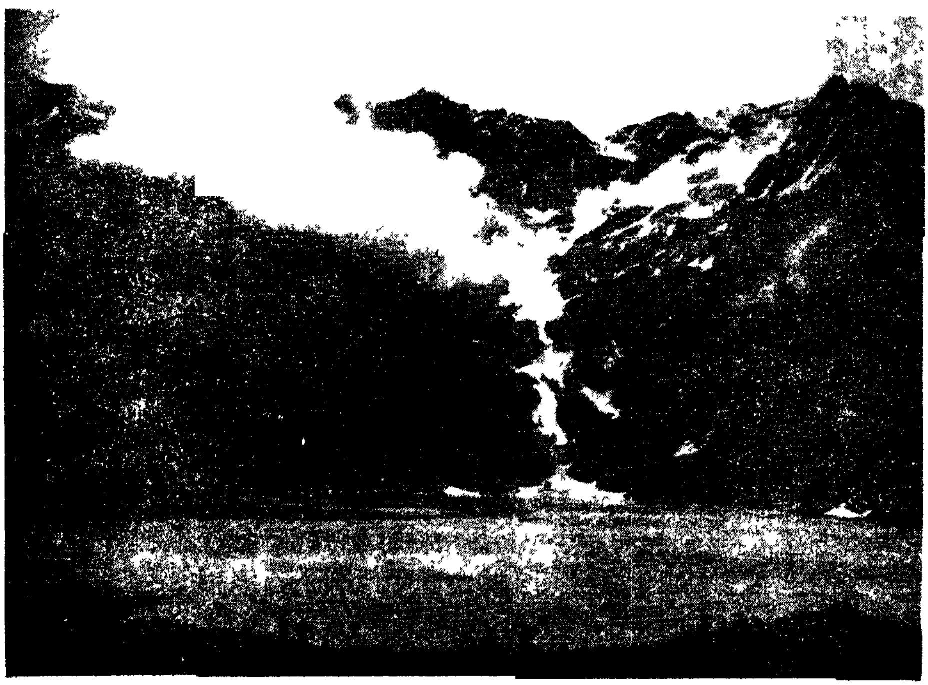
ডান পাশে শেষনাগ নদী নিম্নে লিডার-উপত্যকার মধ্য দিয়া ভীষণ গর্জনে ছুটিতেছে—বাম পাশের পাহাড়ের গা দিয়া অমরনাথের পথ। চড়াই উৎরাই আছে, তবে খুব বেশী নয়। ঘোড়াওয়ালারা শুনাইয়া দিতেছে,—"আজ তো কুছ্ নহীঁ, তকলীফ জো সো কল্" (আজ তো কিছুই নয়, কষ্ট যা তা কাল টের পাইবে)। আজ রাত্রে বিশ্রাম চন্দনবাড়ীতে। আট মাইল রাস্তা। প্রথম দিকে কয়েকটি ছোট গ্রাম, পাইন ও দেওদারে আচ্ছাদিত পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোরম। যাত্রীদের অগ্রগতি কিন্তু অতি মন্থর, কেননা দলে দলে সওয়ারী ঘোড়া, বোঝের ঘোড়া, ডাণ্ডী পদব্রজে গমনকারীদের সামনে আসিয়া বাধা জন্মাইতেছে। পথ এত বেশী চওড়া নয় যে দু লাইন পাশাপাশি চলিতে পারে। পরিষ্কার রৌদ্র। ঠাণ্ডা দেশেও রৌদ্রে বেশীক্ষণ চলিলে বিশেষতঃ পাহাড়ে, গরম লাগে, ঘাম বাহির হয়। পথচারীরা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া রাস্তার ধারে কোনও পাথরের উপর বসিয়া পড়িতেছেন। কোন মহিলা হয় তো তৃষ্ণার্ত, সঙ্গে জল নাই, নদী বহু নীচে, পৌঁছিবারও পথ নাই। কম্বল-কমণ্ডলুধারী কোন বৈরাগী চলিয়াছেন। তাঁহার নিকট সঙ্কোচ কি? মহিলা ডাকিয়া কহিতেছেন,—"বাবাজী, বহুত প্যাস্।" বাবাজী থামিয়া কমণ্ডলু হইতে জল দিতেছেন, মুখে তৃপ্তির হাসি। আহা, আর কিছু তো নাই, একটু জল দিয়া তৃষিতের সেবা হইল। তাহাই কি কম? সাত ঘণ্টা চলিয়া ক্রমে চন্দনবাড়ী। শেষনাগ নদী অর্ধ বৃত্তাকারে ৯১ হাজার ফুট উচ্চতার জায়গাটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ময়দান অসমতল—বারো হাজার যাত্রীর পক্ষে পর্যাপ্তও নহে। যাক্, সেদিকে লক্ষ্য করিবার সময় তো নাই। যেখানে হউক সেখানে তাঁবু দাঁড়াইয়া গিয়াছে। স্নানের, মধ্যাহ্ন আহারের, বিশ্রামের আয়োজন চলিতেছে। দোকানপাট বসিয়াছে, অস্থায়ী ডাকঘরও। সতের ঘণ্টার অস্থায়ী নগরী কর্ম-চঞ্চল, আশা-ব্যাকুল, আবার অজ্ঞাত আশঙ্কায় সন্ত্রস্তও। পৌঁছিতে পারিব তো? বৃষ্টি, ঝড়, যদি আসে সামনের আশ্রয়-বিহীন কঠিন পার্বত্যপথে? কত বার তো এই যাত্রার পথে লোক মারা গিয়াছে।

রাত্রিতে সত্যই ঘন মেঘে সমস্ত পাইন গাছের বন, দূরের পাহাড় আচ্ছন্ন। তাঁবুতে শুইয়া কাহারও চোখে ঘুম নাই—এই বুঝি আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। 'জয় শিব, জয় শিব, রক্ষা করো'—মৌন

প্রার্থনা বুকে বুকে গুঞ্জিত হয়। শিব শুনিয়াছেন। শেষ রাত্রে আকাশ পরিষ্কার। আর দেরি নয়। চলো মুসাফির, বাঁধো গাঁটরিয়া। হাঁ, আজ তকলীফের দিন—"রাস্তেমেঁ বহুত খত্‌রা"—পথে অনেক সঙ্কট।

কত যে 'খতরা' তাহা চন্দনবাড়ী ছাড়িয়া বরফের সেতু ডিঙ্গাইয়া 'পিস্সুঘাটি' চড়াই শুরু না করিলে অনুমান করা সুকঠিন। প্রায় দু মাইল রাস্তা সোজা খাড়া একটি পাহাড় বাহিয়া উঠিতে হইবে। যাহারা নীচে আছে তাহারা উপরে তাকাইয়া দেখিতেছে পিপীলিকার সারির ন্যায় মানুষ ঘোড়া ডাণ্ডী উঠিতেছে, উঠিতেছে—কোথায় থামিবে কিছুই যেন ঠিক নাই। দুই পা চলিয়া থামিতে হইতেছে, সমস্ত অঙ্গ যেন কনকন করিতেছে। বিষাক্ত পার্বত্য কীট 'পিস্সু'র ঝাঁক যেন অলক্ষ্যে সবশরীরে দংশন করিয়াছে। তবে, বাঁচোয়া—যে বৃষ্টি নাই।

পিস্সু ঘাটির নির্মম পরীক্ষা শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা। যাত্রীরা যে যেখানে পারেন বসিয়া বা শুইয়া পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলিও নিশ্বাস লইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চলা আরম্ভ হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় চড়াই। পরিবেশের পরিবর্তন হইতেছে। ক্রমশঃ বরফের এলাকা আসিয়া পড়িতেছে। রাস্তায় মাঝে মাঝে বরফ, দক্ষিণ পার্শ্বে উন্মত্তরভস শেষনাগের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ এপার ওপার জুড়িয়া সেতু নির্মাণ করিয়াছে, গাছপালাহীন উন্নত পাহাড়গুলির চূড়ায়



শেষনাগ

চূড়ায় বরফ রৌদ্রকিরণে ঝিকমিক করিতেছে। অকস্মাৎ ডানপাশে নিম্নের খাদে সমস্তপ্রাণ-স্তব্ধ-করা, সকলক্লান্তিহরা, চোখ-জুড়াইয়া-দেওয়া অপরূপ দৃশ্য! শেষনাগ হ্রদ। বরফাবৃত পাহাড়ের আবেষ্টনে বিরাট নীলাভ দুগ্ধ বর্ণের সরোবর। কী চাঞ্চল্যহীন তাহার জলরাশি! জুন মাস পর্যন্ত সমস্ত হ্রদটাই জমিয়া বরফ হইয়া ছিল। শেষনাগ নদ এই হ্রদেরই কোল হইতে বাহির হইয়াছে। এতক্ষণ উপরে

আসিতে আসিতে তাহার যে প্রচণ্ড গর্জন শুনিতেছিলাম সব এখানে নিস্তব্ধ। যেন নবজাত শিশু মাতৃঅঙ্কে চুপ করিয়া ঘুমাইতেছে!

অনেক যাত্রী রাস্তা হইতে পাহাড় বাহিয়া প্রায় আধ মাইল নীচে হ্রদের তটে উপস্থিত হইয়াছেন, কাহারাও স্নান করিতেছেন, কাহারাও বা তর্পণ। আমরা এখন ১২,৭০০ ফুট উঁচুতে। দক্ষিণে গ্লেসিয়ার শেষনাগ হ্রদে নামিয়া আসিয়াছে, আরও অনেক পাহাড় হইতে দুগ্ধধারা বহিয়া বহিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া মিশিতেছে। সর্বদক্ষিণে চিরতুষারাবৃত কোহিনূর পর্বতশ্রেণী। দেখিতে দেখিতে, মুগ্ধ হইতে হইতে আজিকার রাত্রির বিশ্রামস্থান বাব্‌ (বায়ু)-জানে উপস্থিত হইলাম। বেলা দ্বিপ্রহর। তাঁবু উঠিল, তাঁবুতে তাঁবুতে চুলা জ্বলিল, আহারের উদ্যোগ চলিল, সে পর্ব শেষ করিয়া ক্লান্ত দেহ শয্যায় লুটাইতে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আকাশে মেঘ সঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু বারো হাজার নরনারীর সমবেত সুকৃতিতে বৃষ্টি নামে নাই। তবে প্রচণ্ড হাওয়া বহিতেছে, দেহের প্রতিটি জীবকোষ শীতে অসাড় হইতে বসিয়াছে।

আবার শেষরাত্রিতে তাঁবু গুটাইয়া, তল্পি বাঁধিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে। পথের বহুস্থানে বরফ। প্রথমটা চড়াই। আজ অমরনাথের পথের সর্বোচ্চ স্থান অতিক্রম করিতে হইবে—১৪,৭০০ ফুট উঁচু 'মহাগুণ' গিরিবর্ত্ম। নীরবে সকলে চলিয়াছেন, একে অপরকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছেন। কত বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাও চলিতেছেন পদব্রজে, শিশুকে কোলে লইয়া কত পিতামাতাও মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিতে আগাইতেছেন, সামান্য কাপড়ে প্রায় অনাবৃত গাত্রে খালি পায়ে কোন কোন সাধুসন্ত শিবের নাম করিতে



"নীরবে সকলে চলিয়াছেন"

করিতে দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছেন। ক্রমে সেই উত্তুঙ্গ গিরিবর্ত্ম। অনুপম দৃশ্য। যে দিকে তাকাও তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া। ধ্যানমগ্ন পরিবেশ, গম্ভীর, নিশ্চল, প্রশান্ত।

এবার নীচে নামিয়া নামিয়া ৫ মাইল পরে পাঁচটি তটিনীর সম্মিলন-স্থল—পঞ্চতরণী। এখানকার

উচ্চতা ১১,০০০ ফুট। কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভে পাঁচটি তটিনী পর পর বহিয়া মিলিয়াছে। পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল শিলাস্তৃত প্রান্তর। এখানেই তাঁবুর শহর বসিয়া গিয়াছে। চতুর্দশীর রাত্রিতে চাঁদ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়াগুলি কী সুন্দর দেখায়! পৃথিবী ছাড়িয়া যেন অন্য কোন দেবলোকে আসিয়া পড়িয়াছি। ছড়িজীর আস্তানায় সন্ধ্যারতি, পাঠ, ভগবানের নামকীর্তন যথারীতি সম্পন্ন হইল। উদগ্র প্রতীক্ষা লইয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য সকলে তাঁবুতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। কাল—কাল প্রভাতে ৪½ মাইল হাঁটিয়া অমরনাথ। শুভ্র শিবের দর্শন। মর্ত্যের মানুষের অমরত্ব-স্পর্শ।

রাত বারোটার পর হইতেই তাঁবুতে তাঁবুতে অমরনাথ গুহায় যাইবার প্রস্তুতির সাড়া শোনা যাইতেছে। নিদ্রা তো চিরদিনই আছে, আজ বিনিদ্র ব্যাকুলতায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া লও। সেই ব্যাকুলতা যে মহেশ্বরের পায়ে কাল উজাড় করিয়া দিয়া আসিতে হইবে। শেষ রাত্রে লণ্ঠন জ্বালাইয়া স্নানের কাপড় গামছা, পূজোপকরণ এবং হাতের লাঠিটি লইয়া সকলে অগ্রসর হইতেছেন। প্রথমে অনেকটা চড়াই করিতে হইবে। স্থানে স্থানে রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ, অনেক জায়গায় বরফ। অতি সন্তর্পণে না চলিলে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। কাহারও কাহারও মুখে ধ্বনিত হইতেছে—'লে চলো মহাদেব'।



অমরনাথ গুহা

হে শিব, এত দূর আসিয়াছি—এখন যেন নিরাশ করিও না। বাকী পথে যেন কোন বাধা না উপস্থিত হয়। অনেক নীচে নামিয়া বরফ-ঢাকা নদী। তাহারই উপর দিয়া গুহায় যাইবার পথ। গুহা এখনও প্রায় দুই মাইল। যাঁহারা পিছনে পড়িয়াছেন, তাকাইয়া দেখিতেছেন ঐ দূরে যতদূর তাকাও যাত্রীর শ্রেণী চলিতেছে। ক্রমে কতকগুলি লোক বামপাশের পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। কত ছোট দেখাইতেছে এক একটি মানুষকে। ঐ পাহাড়ের গাত্রে গুহা।

যাঁহারা অনেক রাত্রে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ দর্শন শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। কপালে প্রসাদী বিভূতি, চন্দন—হাতে লাল ডুরি বাঁধা—রাখী। একটি বর্ষিয়সী পাঞ্জাবী মহিলা দ্রুত পদবিক্ষেপে আসিতেছেন, শূন্য দৃষ্টি, সমস্ত মুখখানিতে অপার্থিব প্রসন্নতা। আপনার মনে বলিতেছেন,—"প্রাণ ভরা গয়া।" প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, এতদিনকার প্রতীক্ষা সফল, সুদুস্তর পথের শেষে শিবের দর্শন পাইয়া জীবন ধন্য হইয়াছে।

যাত্রীদের অনেকেই অমরাবতী নদীতে স্নান করিতেছেন, অবশ্য কাক-স্নান, কেননা জল এত ঠাণ্ডা যে ডুব দিয়া উঠিতেই সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া যায়। উপরে গুহা হইতে একটু দূরে পাহাড়ের গাত্র দিয়া সুন্দর একটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে—অমরগঙ্গা। এখানে স্নান বা স্পর্শ করিবার বিধি।

বিরাট গুহা। মুখের কাছে দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ ফুট, গুহাটি চওড়াও প্রায় ঐরূপ। এই স্থানের উচ্চতা ১২,৭৯০ ফুট। গুহার ভিতর ঢুকিলে তিনটি ধাপ পাওয়া যায়। সমগ্র গুহায় অন্ততঃ ৫।৬ শত লোক দাঁড়াইতে পারে। উচ্চতম শেষ ধাপের কোণে বরফের গৌরীপটের উপর অমরনাথজী বিরাজিত। শুভ্রবর্ণ তুষারলিঙ্গ—৪।৫ ফুট উঁচু। মাথা প্রায় গুহার ছাদে ঠেকিয়াছে। কী নিখুঁত গড়ন—যেন কত যত্নে ও অধ্যবসায়ে কোন নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন ধরিয়া মূর্তিটি গড়িয়াছেন! অথচ গুহার শীর্ষ হইতে ক্ষরিত জল জমিয়া আপনা আপনিই এই শিবলিঙ্গ গঠিত হয় ধীরে ধীরে, তিথির পর তিথি ধরিয়া—আবার শ্রাবণী পূর্ণিমার পর ক্রমশঃ গলিয়া যায়।

সাতান্ন বৎসর আগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া ৺অমরনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ সেই ঘটনা স্বামীজীর জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী হইয়া আছে। অমরনাথ দর্শন করিয়া তাঁহার কি অনুভূতি হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি :—

"গুহা প্রবেশ করিয়া তাঁহার বোধ হইল, যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। * * * তিনি অলক্ষিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই তিনবার প্রণাম করিয়া লইলেন, তৎপরে পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে, উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই কয়টি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যুবর পাইয়াছিলেন।" (ভগিনী নিবেদিতা—'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,' পৃঃ ১২৭)

"তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। * * *

অর্ধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন,—'আমি কি আনন্দই না উপভোগ করিয়াছি! * * * আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।'

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন। উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।" (ভগিনী নিবেদিতা—'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে,' পৃঃ ১২০।১২১)

"অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল,—'৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা আমাকে বলিবেন না?' পাদস্পর্শে স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙ্গিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল। বলিলেন, 'অমরনাথ দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' শিষ্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।" (শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—'স্বামী-শিষ্য সংবাদ,' পূর্বকাণ্ড, ১৬শ বল্লী)

স্নান সারিয়া, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া একসঙ্গে প্রায় ৪০।৫০ জন মহাদেবের উদ্দেশ্যে আনী বিল্বপত্র, পাহাড়ী ফুল, গন্ধ, চন্দন, ধূপ, বস্ত্র, মেওয়া প্রভৃতি নিবেদন করিতেছেন, ভাববিহ্বল প্রা হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতেছেন। বাকীরা করজোড়ে পিছনে দাঁড়াইয়া। কেহ কেহ স্তোত্র পা করিতেছেন, কেহ ডমরু বাজাইয়া দেবদেবের অভিনন্দনে ব্যাপৃত, কেহ বা নিঃশব্দে, স্তব্ধ আবেগে শিবে চিন্তা করিতেছেন। শিবময় পরিবেশ। মেঝেতে বরফ-গলা জল, খালিপায়ে অনেকক্ষণ দাঁড়ানে অসম্ভব, তাই অনেকের পায়ে দড়ির জুতা। গুহায় বরফের পার্বতী ও গণেশও আছেন।

যাঁহাদের পূজা সমাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা শেষবারের মত শুভ্র শিবের দিকে অপলক নয়নে চাহি লইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছেন। এখানে থাকিবার জায়গা নাই, পঞ্চতরণীতে ফিরিতে হইবে তথা হইতে আবার বাবজান, চন্দনবাড়ী, পহলগাঁও। পরে যে যেখানে চলিয়া যাইবেন, অমরনাথে সদা শুভ্র সুপ্রশান্ত আলোক হইতে হয়তো দূর—বহুদূর, পুনরায় শত-বিক্ষিপ্ত সংসারের অজস্র মলিনতা মধ্যে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট যে অভয় আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারা ফিরিতেছেন তাহা নিশ্চিত জীবনের পরম শক্তি ও আনন্দ হইয়া থাকিবে।

অগ্নিবাহন

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে রুদ্র, তোমার আঁখি রক্ত-রাঙা উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির
ঝড়ের আশঙ্কা স্তব্ধ তোমার পিঙ্গল জটাজালে,
ধূসর আকাশে ব্যাপ্ত মরুমায়া রহস্য-গম্ভীর
দিবা দ্বিপ্রহরে তুমি কি মন্ত্র জপিছ অক্ষমালে।

রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের মাঝখানে বসিয়া একাকী
অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়া, তার তরে নাহি তব লোভ
আসন্ন মুহূর্তকাল,—ঘূর্ণি হাওয়া চলিতেছে ডাকি'
শুষ্ক পত্র মর্মরিত—শূন্যতায় প্রতপ্ত বিক্ষোভ।

অন্তরে বাহিরে মম পুঞ্জীভূত কদর্য জঞ্জাল
গীতরিক্ত বসন্তের ব্যর্থ যৌবনের আবাহন,
জীবনের স্বল্প আয়ু, তনুদেহ বিশীর্ণ কঙ্কাল
জ্বলে যাক পুড়ে যাক নমো নমো হে অগ্নিবাহন।

খুলে দাও জটাজাল হে ভৈরব, ধূসর আকাশে
উঠুক প্রমত্ত ঝড় ছিন্ন ভিন্ন খণ্ড মেঘে মেঘে
যেথা যত দৈন্য আছে অন্তরালে ইঙ্গিতে আভাসে
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক উদ্দাম ঝড়ের গতিবেগে।

"মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী"

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীদেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ে দেখতে পাই, প্রলয়কালে ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় পালনী শক্তি তিরোহিত করে যখন স্বাত্মরূপের আবরণকারিণী তামসী শক্তিরূপিণী যোগনিদ্রা পরিসেবনে রত, তখন তাঁর কর্ণমলোদ্ভূত উগ্র দুই দানব মধু আর কৈটভ আবির্ভূত হয়েই বিষ্ণুর নাভি পদ্মাধিষ্ঠিত কমলাসন ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। নিরুপায় ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখে শ্রীভগবানের জাগরণের আকাঙ্ক্ষায় এই যোগনিদ্রারূপিণী মহা-শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা···" ইত্যাদি গুণকীর্তনে স্তুতি আরম্ভ করে ব্রহ্মা একস্থানে বলেছেন—"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহামোগ চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥" এর মর্মার্থ হল, 'হে দেবি, তুমি মহাবিদ্যা ও মহামায়া, তুমিই মহামেধা ও মহাস্মৃতি, তুমি মহামোহরূপিণী এবং সমস্ত দেবশক্তি আর সমস্ত অসুরশক্তিও তুমিই।' অর্থাৎ 'দেবি, তুমিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারয়িত্রী মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, আবার তুমিই জগৎসংসারকারিণী মূলাবিদ্যা। তুমি সর্ববিধ-জ্ঞানবিধারণশক্তি মেধা এবং সংস্কারজন্য পুনর্জ্ঞানোদয়-রূপা স্মৃতি, আবার সকলজ্ঞানাবরকরূপিণী মোহরূপা। তুমিই পরিপূজ্যা দেবশক্তি আবার তুমিই সর্বাশুভ-সূচনী আসুরী শক্তি।' মহাপুষ্পাঞ্জলির এই স্তুতি পুষ্পটিই আমাদের আলোচ্য স্থল।

এখানে প্রথমতঃ আপত্তি আসতে পারে, ব্রহ্মা এমন ভীত হয়ে সম্মুখে নারায়ণকে দেখেছেন, অথচ তাঁর স্তুতি না করে যোগনিদ্রা বা সে শক্তির আরাধনা করতে গেলেন আবার প্রার্থনা হ'ল—নারায়ণের জাগরণ এবং অসুরনিধনে তাঁর চিত্তের উন্মুখীকরণ। সর্বগুণাধার ভগবান্ কি কারো অনুরোধে স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথায়ও প্রবৃত্ত হতে পারেন? মায়ের সুপারিশ এক্ষেত্রে তাঁকে বাধ্য করতে পারে—এই কি ব্রহ্মার আশা? আর মহামায়ার যে গুণবর্ণনা ব্রহ্মা করলেন, স্তুতিতে যে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে নারায়ণের জাগরণের প্রয়োজনই বা কি? জননীকে এ কথা জানালেই ত তিনিই এদের নিধনকার্য করে দিতে পারেন। নিদ্রার স্বরূপেও পূর্বে বলা হ'য়েছে—"বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহারকারিণীম্"। সুতরাং সংহার ত তাঁর কার্য! এতদ্ব্যতীত আলোচ্য স্তুতি-কুসুমটি যে নিবেদন করেছেন ব্রহ্মা 'মহাবিদ্যা মহামায়া' ইত্যাদি গুণকীর্তনে, তা'তে যথার্থতঃ সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে কি না? কারণ কোন স্থানে দেখা যায় বিরুদ্ধার্থক শব্দ দু'টিতে তাঁর স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে, আর কোথাও বা একার্থক দু'টি তিনটি শব্দই প্রযুক্ত হয়েছে। এ দুটি প্রণালীই ত অসাধু। একার্থক বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে, আর একেতে বিরুদ্ধার্থক বস্তুদ্বয়ের সমাবেশ অনুভববিরুদ্ধ হয়ে উঠে। যেমন 'মহাবিদ্যা মহা-মায়া'—যিনি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানরূপিণী—সেই মহাজ্ঞানরূপিণী কি করে আবার জ্ঞানবিরোধিনী মায়ারূপিণী হ'তে পারেন! কারণ অজ্ঞানাত্মিকা মায়া আর জ্ঞান দু'টি আলোকান্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ বস্তু। তারপর "মহামায়া মহামোহা" এ দু'টি ভিন্নার্থক শব্দ বলা চলে না। এবং 'ভবতী' স্থলে 'ভগবতী' পাঠে—'ভগবতী মহাদেবী' এরাও ভিন্নার্থক হ'তে পারে না। অধিকন্তু 'মহাসুরী' পদে 'মহতী সুরশক্তি' ব্যাখ্যাত হলে মহাদেবী পদের সঙ্গেও কোন প্রভেদ প্রতীয়মান হয় না। এ ভাবে দেখা যাচ্ছে একই তত্ত্বকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাশব্দের বৈচিত্র্যে পর্যায় শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে দোষাকুল করে তুলেছে। আর এক কথা, দেবী ত দেখা

যাচ্ছে যোগনিদ্রা, নিদ্রা তমোগুণময়ী তামসী, তামসীর প্রসাদে তদ্‌বিরুদ্ধ শুভজ্ঞানের উদয় কি করে সম্ভব? দেবী তুষ্ট হলেও নারায়ণের অসুর-বিনাশ বা জগৎপরিরক্ষণবুদ্ধিটি তাঁর দ্বারা কি করে উদ্রিক্ত হ'তে পারে? সুতরাং স্তুতির মূল উদ্দেশ্যটিও এখানে ব্যাহত হয়ে পড়েছে। আরও এখানে জিজ্ঞাস্য এসে পড়েছে—ব্রহ্মা যাদের ভয়ে ভীত হয়ে যোগনিদ্রারূপিণী তামসীশক্তির আরাধনা করতে গেলেন তাদের জন্মবিবরণী যা দেওয়া হয়েছে, তা আদৌ সম্ভব কি না! অবশ্য মল বা 'কর্ণমল' যদি কিছু থাকে, তা' থেকে জন্ম একটা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু যিনি সনাতন, সদানন্দময় পুরুষ, তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ অসম্ভব বলে কর্ণরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ও সম্ভব নয়। তা' থেকে মলও উদ্ভূত হ'তে পারে না। সুতরাং তা' থেকে এই অসুর-দ্বয়ের জন্ম হ'ল এ তথ্যটিও যুক্তিসহ হয়ে উঠে না।

এইরূপ নানাবিধ আপত্তি দৃষ্টিগোচর হলেও ব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই দেখা যায় এই বিরুদ্ধার্থ প্রকাশ করেই শ্লোকের বিশ্লেষণ করে গেছেন। অর্থাৎ এতে এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবই হ'তে পারে না তাই প্রমাণিত হ'ল। চতুর্ধরীটীকাকার প্রথমে বলেছেন—"মহাবিদ্যা মহা-বাক্যলক্ষণা বিদ্যা।" নাগোজীভট্টও বলেন—"মহাবিদ্যা মহাবাক্যলক্ষণা।" দংশোদ্ধার টীকাকারও বলেছেন—"মহাবিদ্যা-'তত্ত্বমসি' ইতি মহাবাক্যজন্যা বিদ্যা।" শান্তনবী-টীকাকারও বললেন—"মহতী-বিদ্যা পরব্রহ্মগোচরজ্ঞানরূপাসি।" অর্থাৎ মহাবিদ্যা পদে একবাক্যে সকলেই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদ্‌বাক্যজন্য ব্রহ্মবিদ্যাকেই অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারগোচর ব্রহ্ম-জ্ঞানকেই বুঝিয়েছেন। শান্তনবী টীকা তাই স্পষ্টতই বলেছেন—পরব্রহ্মগোচরজ্ঞানরূপাসি। মহামায়া পদেও চতুর্ধরী-টীকাকার বললেন—"মহতী সর্ববিষয়া মায়া, 'অন্তঃভ্রান্ত্যাকারাবভাসিনী শক্তির্মহা-মায়া' মূলাবিদ্যেতি যাবৎ", নাগোজীভট্ট ব্যাখ্যা দিলেন—"মহামায়া সচ্চিদানন্দে আত্মনি সংসারিত্ব-রূপানর্থাবভাসহেতুমূলাবিদ্যা"। দংশোদ্ধারে বলা হ'ল —"মহতী ব্রহ্মাদিমোহাত্মিকা মায়া অবিদ্যাশক্তিঃ।" শান্তনবীটীকাকার বললেন—"মহতী মায়া অনাত্মন্যা-ত্মেতি বুদ্ধিরাত্মন্যনাত্মেতি বুদ্ধির্মায়া।" অর্থাৎ সিদ্ধান্তে সকলেই একমত হয়েছেন যে—পরমার্থবস্তু সচ্চিদানন্দ পুরুষকে যথার্থরূপে না দেখে তাতেই মিথ্যা এই অনির্বচনীয় জগৎ স্ফুরিত হচ্ছে, এই মায়াবশে। পরমাত্মস্বরূপটি আবৃত হয়ে রয়েছে—আবরণশক্তির প্রভাবে, আর বিক্ষেপশক্তির বিক্ষোভে এ মায়ার জগৎ ভেসে উঠেছে। এই অঘটনঘটনপটীয়সী অনিরূপ্যমাণা মহাশক্তিই হলেন এই মায়া। যতক্ষণ ইনি রয়েছেন—ব্রহ্মবিদ্যা কাছে আসতে পাচ্ছেন না, যেন নিত্যবিরোধ। বেদান্তের এই অনন্য-সাধারণ তত্ত্বটিই সকল ব্যাখ্যাতার নিপুণ বিশ্লেষণ ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এভাবে মূল বস্তুটির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে অবান্তররূপগুলিরও তদন্তর্বর্তিত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্যই অথবা সে বিষয়ে সংশয় নিরসনের অভিপ্রায়ে বলেছেন—"মহামেধা মহা-স্মৃতি" ইত্যাদি। এই মহামেধা এবং মহাস্মৃতি পদের ব্যাখ্যায় এঁদের কিঞ্চিৎ রুচিবৈচিত্র্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ সর্বত্র সকলে অনুরূপ পন্থায় অগ্রসর না হয়ে চিন্তাশক্তির বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন। যেমন চতুর্ধরীটীকাকার বললেন 'মহামেধা—সকলা-র্থাবধারণক্ষমা ধীশক্তিরিত্যর্থঃ, স্মৃতিঃ ধর্মশাস্ত্রং ততো মহতী মহাস্মৃতিঃ বেদবিদ্যেতি যাবৎ। অর্থাৎ প্রাণী অপ্রাণী যাবদ্‌বিষয়ক অবধারণাবতী জ্ঞান-শক্তি মহামেধা, আর স্মৃতি হ'ল ঋষি প্রভৃতির দ্বারা প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, সুতরাং মহাস্মৃতিপদে ধর্মশাস্ত্রের মূল বেদবিদ্যা। নাগোজীভট্ট সহজভাবেই বলছেন—"মহামেধা ভগবতঃ সর্বজ্ঞত্বশক্তিঃ। মহাস্মৃতিঃ বিধেঃ স্বষ্ট্যনুকূলাতীতকল্পগতসকলবস্তুস্মৃতিরূপা — বেদরূপা চ।" অর্থাৎ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে সব কিছু

জানতে হবে, তবে ত সৃষ্টির সম্ভাবনা, না জেনে তৎ সৃষ্টিই অসম্ভব, সুতরাং যেহেতু সর্বকর্তৃত্ব স্বীকৃত সেজন্য অর্থবশাৎ সর্বজ্ঞত্ব অবশ্যম্ভাবী—ঐ সর্বজ্ঞত্ব অর্থাৎ সকলবিষয়ক জ্ঞানশক্তিই মহামেধা। আর প্রতিকল্পে ভগবান্ পূর্বানুরূপই সৃষ্টি করে থাকেন—এই হ'ল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত,—শ্রুতি বলছেন—"সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ"। ব্রহ্মার দিবা-অবসানে পুনর্জাগরণকালে যখন সৃষ্টি কার্যটি আরব্ধ হয়, সেই সৃষ্টিটি পূর্বকল্পীয় সৃষ্টির অনুরূপই করে থাকেন—শ্রুতি তাই বললেন। পূর্বকল্পের যাবতীয় তথ্য অক্ষুণ্ণরূপে স্মৃতিপথে সমারূঢ় থাকা প্রয়োজন, অন্যথা সৃষ্টিটি পূর্বকল্পাপেক্ষায় বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে। এই বিরাট তথ্য স্মরণ রাখবার যে মহতী শক্তি তাই হ'ল মহাস্মৃতি। 'মহামোহা' পদেও টীকাকারগণ প্রায় একমত। চতুধরীতে বলা হ'ল—'মহামোহা মহান্ রাগস্তদাস্পদত্বাৎ মহামোহা সংসারশক্তিঃ।' নাগোজীভট্ট বলেছেন—"মহামোহেতি সংসারস্য মূলকারণরাগরূপমোহস্বরূপা।" দংশোদ্ধারে বলা হয়েছে—"মহামোহস্য সংসারস্য জনকত্বাৎ মহামোহা।" শান্তনবীতেও বলা হয়েছে—'মহামোহা মহামমতা' ইত্যাদি। সুতরাং সংসারের মূল কারণ যে অজ্ঞানশক্তিই এখানে সর্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয়েছে এ'তে কারো দ্বৈমত্য দেখা গেল না। এ'তে 'মহামেধা আর মহাস্মৃতি' এ দু'টি তত্ত্বের সঙ্গে পূর্ণ বিরোধই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে জ্ঞানশক্তির আর অজ্ঞানশক্তির নিকর্ষ-বিশ্লেষণে। তেমনি দেখা যায়, মহাদেবী আর মহাসুরী পদেও রয়েছে বিরোধতত্ত্ব। যেমন মহাদেবীপদে চতুর্ধরীতে বলা হ'ল—'মহাদেবী ইন্দ্রাদিলোকপাল-কর্মস্বরূপা, মহাসুরীহিরণ্যাক্ষাদিস্বরূপা।" নাগোজীভট্ট বলেছেন—'মহাদেবী সকলদেবশক্তিরূপা, মহাসুরী হিরণ্যাক্ষাদিশক্তিরূপা।" দংশোদ্ধারেও বলা হয়েছে—"মহতী পালনরূপা দেবশক্তিশ্চ, মহতী দেবপরাজয়কারিণী আসুরী শক্তিশ্চ" ইত্যাদি। এখানে 'মহাসুরী' পদে মহেশ্বরী পাঠও দৃষ্ট হয়। শান্তনবী টীকাকার তদনুযায়ী ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছেন, যেমন—"হে দেবি, ত্বং মহেশ্বরী মহত্যীশ্বরী—ব্যাপন-স্বভাবা" অর্থাৎ সর্বতো ব্যাপ্তা ঈশ্বরী। এই অর্থে মহাদেবী আর মহেশ্বরী পদ দুটি একার্থক হয়ে পড়ে, এবং মহাসুরী পদে 'মহতী সুরশক্তি' অর্থ গ্রহণ করে ও সমানার্থতার আশঙ্কা থেকে যায়। বস্তুতঃ দংশোদ্ধারে এই ব্যাখ্যাভেদের ইঙ্গিতও প্রতীত হয়—যেমন "যদ্বা মহতী সুরশক্তিঃ।" ইত্যাদি। এই আশঙ্কা পরিহারের অভিপ্রায়ে মহাদেবী পদে ব্যক্তিপরতা অভিপ্রায়ে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে "মহাদেবস্য স্ত্রী মহাদেবী" এইরূপ ব্যক্তিরূপে ব্যাখ্যা মেনে নিতে হয়। শান্তনবী টীকাকার এজন্য স্পষ্টই বলেছেন—"হে দেবি ত্বং মহাদেবী মহেশ্বরস্য স্ত্রী।" দংশোদ্ধারে একথাটি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেখানে বলা হয়েছে,—"তদা মহাদেবীত্যস্য মহাদেবস্য স্ত্রীত্যর্থঃ। মহেশ্বরীতি বা পাঠঃ।"

সুতরাং সমস্ত টীকাকার ব্যাখ্যাতৃগণের বিশ্লেষণ ভঙ্গী আলোচনা করে দেখা গেল—তাঁরা সম্পূর্ণ শ্লোকটির অপরূপ বিরোধার্থ উজ্জ্বল করে প্রকাশ করে দিয়েছেন—যেমন—মহাবিদ্যা আর মহামায়াতে, মহামেধা মহাস্মৃতি এই দ্বিবিধ জ্ঞানশক্তির সঙ্গে মহামোহরূপিণী অজ্ঞানশক্তিতে আর মহাদেবী এবং মহাসুরীরূপা আসুরীশক্তিতে। বিশেষতঃ শান্তনবী টীকাকার এই বিরোধ-প্রসঙ্গটিকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেবার অভিপ্রায়ে প্রায় প্রতিপদে একটি অকার প্রশ্লেষ দেখিয়ে তা' অধিকতর ব্যক্ত করে বিশ্লেষণ-ভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এঁর মতে মহা-বিদ্যাপদে মহতী বিদ্যাও বটে মহতী অবিদ্যাও বটে। এইরূপ মহামেধা মহাস্মৃতি পদেও মেধা অমেধা স্মৃতি অস্মৃতি দ্বিবিধই অর্থ। কিন্তু অসঙ্গতি আসে বলে ইনি কৌশলে মহামায়া আর মহামোহা পদদ্বয়ে দ্বিবিধ অর্থ-বৈচিত্র্য পরিহার করেই ব্যাখ্যা

দেখিয়েছেন। তথাপি মহতী অবিদ্যা আর মহামায়াপদে সমানার্থতার আশঙ্কা থেকে যায়। এজন্য মায়া আর অবিদ্যার মূলতঃ ঐক্য প্রমাণসিদ্ধ হলেও অবস্থাভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়েছেন। বলেছেন—"মহতী অবিদ্যা, অনির্বচনীয়া অবিদ্যা প্রপঞ্চপরিজ্ঞানরূপাসি। মহতী মায়া অনাত্মন্যাত্মেতি বুদ্ধিরাত্মন্যনাত্মেতি বুদ্ধির্মায়া।" অর্থাৎ স্বভাবতঃ যাবতীয় অনাত্মবস্তুতে আত্মবিভ্রম বা আত্মস্বরূপে অনাত্মবিভ্রমই মায়া। আর বিভিন্নাকারে প্রতিভাসমান জগৎপ্রপঞ্চের পরিজ্ঞানই অবিদ্যা, এই মায়া এবং অবিদ্যা মূলতঃ অভিন্নতত্ত্ব হলেও এদের অবস্থাভেদে পার্থক্যটি পঞ্চদশীকারও সুন্দর প্রকাশ করে বলেছেন—"তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধ্যশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে॥" ইত্যাদি। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করবার মত যে, অন্যান্য টীকাকারগণ যা পাঠভেদ বলে স্বীকার করে গেছেন শান্তনবী-টীকাকার কিন্তু সেস্থলে পাঠভেদের উল্লেখমাত্র না করে 'ভবতী' পদস্থলে 'ভগবতী' এবং 'মহাসুরী' স্থলে 'মহেশ্বরী' পদের অনুকূল ব্যাখ্যা করে গেছেন। এবং এই কারণেই মহাদেবী পদের সমানার্থতার আশঙ্কা করে মহাদেবীপদে 'মহাদেবস্য স্ত্রী' এরূপ ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই ব্যাখ্যাবিস্তার অনুধাবন করেও দেখা গেল এখানে অসঙ্গতি আপাততঃ যত বড় হয়েই প্রতিভাত হোক না, বিরুদ্ধার্থের প্রসঙ্গটি অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। সুতরাং আমরা সেই পুরাতন সমস্যাতেই এসে উপনীত হলাম। বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় একেতে কি করে সম্ভব হ'তে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্নও এসে গেল—এই মহামায়াটি তবে কে? ব্রহ্মা ভীত হয়ে নারায়ণের পরিবর্তে এঁর শরণ গ্রহণ করলেন কেন? এঁর প্রতি কেনই বা এ আকূতি!

রহস্যটি এঁর আবিষ্কার করতে হ'লে দৃষ্টিশক্তিটি সম্পূর্ণ প্রসারিত করে এঁর সামগ্রিক রূপটির প্রতি অন্তর খুলে ধরতে হবে, বহিরাবরণ ভেদ করে একটু গভীরে প্রবেশের চেষ্টা দেখতে হবে। সর্বাধার ভগবান্ গুণাতীত অবস্থায় নিষ্ক্রিয়রূপে কিছু করতে পারেন না। করতে গেলেই তাঁকে সক্রিয় হ'য়ে উঠতে হবে, লৌকিক জগতেও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে—কোন একটা কিছুতে প্রবৃত্ত হ'তে গেলেই যথোচিত শক্তি প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আর এটি এমনই কর্ম যে সাক্ষাৎ মূর্তিমতী শক্তিরূপে প্রকটিত না হ'লে অথবা পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ শক্তি অবলম্বন না করলে এ দুরূহ কর্মটি সাধন করা অসম্ভব। এই ভেবেই ব্রহ্মা শ্রীভগবানের শক্তিরূপের আরাধনায় অগ্রসর হলেন। তাই এ মহাশক্তির পরিচয়েও বলা হয়েছে—

"বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥"
ইত্যাদি।

অন্যথা এই শক্তি যদি পরম পুরুষের শক্তিরূপে না হ'য়ে তদধীন বা তন্ন্যূন কেহ হয়ে থাকেন তবে নারায়ণকে স্তুতি না করে তাঁর স্তুতি ব্রহ্মার পক্ষে কখনো সঙ্গত হ'তে পারে না। আর ব্রহ্মা তন্নিম্নস্থানাপন্নকে কেনই বা এত মিনতি জানাতে যাবেন? অপরের স্তুতিতে নারায়ণের তুষ্টিরই বা কি হেতু আছে? সুতরাং এ মহাশক্তি নারায়ণেরই প্রকটিত শক্তিরূপায়ণ। এই একতত্ত্বের রহস্য মাধুরীটি শাস্ত্রান্তরেও কি সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে. কর্পূরাদি স্তোত্র মধ্যে তার পরম প্রকাশ দেখতে পাই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর মহেশ্বর—এই ত্রিরূপে সেই জননী আদ্যাশক্তিরই রূপবিবর্তন-বর্ণনায় পরব্রহ্মতত্ত্বটিই যেখানে রূপায়িত করা হয়েছে—

"প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥"
ইত্যাদি।

সুতরাং যে মহামায়াকে নারায়ণেরই শক্তিরূপাবতরণরূপে পরিচিত করা হ'ল, সেই পরমতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্বরূপের কোন পাঞ্চভৌতিক দেহালম্বী শ্রবণেন্দ্রিয়াদিই সম্ভব নয়, তৎসঞ্চিত মল আর কোথায়? সুতরাং শ্লোকস্থ কর্ণমলোদ্ভূত অসুরদ্বয়ের বর্ণনাচিত্রের কর্ণশব্দটি বাস্তব কর্ণাভিপ্রায়ক হ'তেই পারে না। অর্থাৎ এই কর্ণমল মায়িক, আগন্তুক—তাঁর ইচ্ছাদ্যোতক মাত্র—সত্য নয়। সুতরাং তাঁরই ইচ্ছাপ্রসূত এরা, ইনি ইচ্ছা করেই এই বেদবিরোধী অসুরের উদ্ভব ঘটিয়েছেন স্বকীয় অলোকিক তত্ত্বের রহস্যটি জগতে জানাবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃত পথের কৌশলরূপে। অবশ্য কর্ণমল শব্দটির গ্রহণে এক উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, কর্ণমলের আকস্মিকতার ন্যায় আকস্মিকরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে এরা, এবং মলপ্রসূত বলে এদের গতিবিধিই হয়েছে ক্রূরভাবানুসারী। কর্ণমলের দ্বারা শব্দশক্তি ব্যাহত হয়, মধুকৈটভও শব্দব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিরোধী—তাই তো এদের উভয়কে 'কর্ণমলোদ্ভূত' বলা হয়েছে। ভগবানের অপ্রতিহত ইচ্ছার বাইরে কিছু সম্ভব নয় বলেই পূর্বে উক্ত হয়েছে—"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি। এই যোগনিদ্রা পদের এইখানেই সার্থকতা, অন্যথা নিদ্রামাত্র কথনে কি ন্যূনতা ছিল? অর্থাৎ স্বেচ্ছাপাদিতা নিদ্রা যখন তিনি পরিসেবন করেন। চতুর্ধরী টীকায় তাই প্রকাশ করেছেন—"যোগনিদ্রাং স্বেচ্ছোপাত্তাং নিদ্রাম্।" তাই শাস্ত্রেও বলা হয়েছে—"অস্তীয়ং তামসী শক্তিরদৃশ্যা পশ্যতো হরেঃ। যয়াচ্ছাদিতনেত্রোঽয়ং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥" ইত্যাদি।

যদিও এখানে একতত্ত্ব প্রতিপাদিত হ'য়েছে তথাপি পূর্বাপর শ্লোকাবলীতে এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার পরিচয়ে যেমন "ত্বয়ৈতৎ ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা" ইত্যাদি দ্বারা এবং "প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী। কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা"॥—ইত্যাদি শ্লোকাবতরণে সৃষ্ট্যাদি সংহারতত্ত্ব প্রতিপাদন করে ব্রহ্মলিঙ্গত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সে পন্থা অবলম্বন না করে, কেবল বিভূতিময় মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে ভঙ্গ্যন্তরে স্ব-রূপের অন্তহীনতা চিত্রায়িত করা হ'য়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে সংহার পর্যন্ত যাবতীয় লীলাবিলাসের মধ্যে, যে সমুদায় মহিমার উদ্ভেদ বা বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব মাধুর্যময় বিভিন্ন তত্ত্বের বিকাশ, সুর বা অসুর বৈভব, আলোক আর অন্ধকারের দ্বৈতক্রীড়া—যাবতীয় তত্ত্বই তাঁর অচিন্ত্য লীলাভিনয়ের প্রয়োজনীয় বিভিন্নমুখী সঙ্কেত। কেবলই শুভসূচনী ইঙ্গিত কলাতে তাঁর পদন্যাস চিত্রিত হ'লে অকল্যাণের কালিমা দৌরাত্ম্যে কার আধিপত্য-গৌরব চিহ্নিত হবে? সেখানে জগজ্জননীর স্পর্শরাহিত্য অঙ্গীকার করে নিলে তাঁর সর্বাত্মতাময় ব্রহ্মলিঙ্গত্ব ব্যাহত হয়ে পড়ে। তবে কথা উঠবে যিনি ক্ষেমঙ্করী, বরাভয়দায়িনী, চিরকল্যাণময়ী জননী, তাঁর এ কঠোর তত্ত্বটি জানাবার আপেক্ষিকতা এল কোথায়? মায়ের যেরূপ চির-আকাঙ্ক্ষিত, শান্তস্নিগ্ধ সুধাসঞ্জীবন—সে রূপের সঙ্গে এ বীভৎস কুৎসিত রূপায়ণ সমতায় দাঁড়াতে পারবে কেন? বিশেষ করে সন্তান ত কল্যাণের প্রার্থনাই জানিয়ে থাকে; যোগী, ধ্যানী, জ্ঞানী যে-ই হোক্ তাঁদের পক্ষেও নিজের বা বিশ্বের কল্যাণই বাঞ্ছনীয়। শ্রুতিও বলেছেন তাই—"তত্তে কল্যাণতমং রূপং পশ্যামি"। অকল্যাণ বিনষ্ট করবার জন্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই চিরকাম্য। তবে কেন অনাকাঙ্ক্ষিতের আবির্ভাব? অথচ তিনি মূর্তিমান্ অকল্যাণরূপেও প্রকটিত হ'য়ে থাকেন,—এক তত্ত্বের সিদ্ধান্তমূল এই ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা কোথায়?

এ সকল আপত্তি আপাততঃ শ্রুতিমধুর এবং যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও দার্শনিক বিশ্লেষণে বা তত্ত্বৈষণার সমীক্ষণে সমস্ত যুক্তিই যে অসার প্রতিপন্ন হয়ে

যায়—এ তত্ত্বটিই এখানে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব সমবায়ে সুবিন্যস্ত করে পরিস্ফুট করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত যখন আর কোন কিছুই সত্য নয়, তখন কি বিরুদ্ধ আর কি অবিরুদ্ধ, কোন রূপান্তরই সত্য নয়। যা কিছু সৃষ্টি, সবই তাঁর সঙ্কল্প-প্রসূত। মদগর্বী লোকের যেমন তামসিক মোহ-গ্রস্ততায় অহঙ্কার মত্ততা আসে, ঠিক তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক গুণপরায়ণ তপোনিষ্ঠ ধার্মিক যোগীদেরও সত্ত্বগুণানুকূল সাফল্যের বিজয় যাত্রায় আত্মশ্লাঘার উদ্ভব হ'য়ে থাকে, সেই পরিতৃপ্তি বা কৃতকার্যতার আনন্দে অন্তরে গর্বভাবময় অঙ্কুর-কণিকা দেখা দেয়, তাতে আত্মশ্লাঘার শাখা বিস্তার হয়, অসতর্ক মুহূর্তে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন লোককেও অধঃপাতের সোপানে নামিয়ে দেয়। এরই নাম সাত্ত্বিক অহঙ্কার। এই সাত্ত্বিক অহঙ্কারও মদগর্বী, কাপুরুষের ঘৃণিত মত্ততার তুল্য মৃত্যুস্থানাপন্ন শত্রু। এই জন্যই সত্ত্বগুণাশ্রয় দেবতাদেরও দৈন্য বুঝিয়ে দেবার জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরভাবের বিকাশ—তাদের হস্তে দেবতাদেরও লাঞ্ছনা, পরাজয়; সত্ত্বাহঙ্কারী দেববৃন্দের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার জন্যে। ঠিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এই শিক্ষাই আমাদের জন্যে তিনি বিস্তার করে থাকেন। যেমন সুখ অর্জন করতে হ'লে অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে তা' আয়ত্ত করতে হয় এবং পরিশেষে সেই দুঃখার্জিত সুখের প্রত্যয়ে দুঃখকে বাস্তবিক দুঃখ বলে মনে না ভেবে তারই অবলম্বনীয় কৌশল বলা হয়ে থাকে, এবং বিশ্লেষণ সহকারে বলা যায় জগতে বাস্তবিক দুঃখ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। ঠিক তেমনি বলা যায়, মহামায়ার মহাক্ষেমঙ্করী মূর্তির কল্যাণকারিণী কৃতির স্বচ্ছ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য এই আসুরিক বা বিরুদ্ধ শক্তির খেলাও তাঁরই অবলম্বিত কৌশল মাত্র, এদের বাস্তবতা কিছু নেই। অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ যাবতীয় ভাবময় রূপ পরিগ্রহ করে জগতে যে শিক্ষারহস্য উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন—এসব হ'ল তারই প্রয়োজনীয় এক একটি অধ্যায়। তাই দেখা যায় ব্যাখ্যাতৃ-গণও এই শুভাশুভ উভয়রূপতা সম্মুখে রেখেই বিশ্লেষণ ভঙ্গী বিস্তার করেছেন। যেমন মহাবিদ্যা মহতী বিদ্যা—মহতী অবিদ্যা চ। এবং অন্তিম পদে পাঠভেদ সত্ত্বেও অধিকাংশ মনীষীই মহাসুরী পাঠ স্বীকার করে ব্যাখ্যাবৈচিত্র্য দেখিয়েছেন "মহতী সুরশক্তিঃ অথবা মহতী আসুরী শক্তি অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষাদিরূপা।" উপনিষদের অসঙ্কুচিত উক্তিও তাই দেখতে পাই—'অহমানন্দানানন্দাঃ, বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানেঽহং, ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে। বেদোঽহম-বেদোঽহম্। বিদ্যাহমবিদ্যাহম্। অজাঽহমনজাঽহম্, অধশ্চোর্ধ্বং চ তির্যক্ চাহম্" ইত্যাদি। এবার মূল প্রশ্ন তা'হলে এসে গেল—ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ার তা'হলে বাস্তব স্বরূপ কি দাঁড়ায়? পুণ্যাপুণ্য, কমনীয় আর কদর্য—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মভাব আলোকান্ধকারের ন্যায় একেতে কখনো সত্য হ'তে পারে না। অথচ উপনিষদের উক্তিতেও ত এই বিরুদ্ধ তত্ত্বের প্রকাশ রয়েছে।

এখানে সিদ্ধান্তনির্ণয়ে একটু যুক্তিনীতির শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য। যেহেতু অনুভব করা যায়, জগতে শোকদুঃখ প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হ'লেও কেবলই শোকদুঃখময় জগৎ একথা যুক্তিসহ হতে পারে না, কারণ দেখা যায় শোকদুঃখের অন্তরালে ক্ষণিক বা বিন্দুতুল্য হলেও আনন্দের স্ফুরণ রয়েছে। এবং পরিণামে আনন্দানুভূতির সাক্ষাৎকারে দুঃখটির অস্তিত্বও আনন্দমূল হয়ে উঠে। তাই এই অন্তর্নিহিত আনন্দতত্ত্বটির প্রেরণা অনুভব করেই মানুষ স্বাভাবিকভাবে ঐ দিকেই উন্মুখী হয়ে উঠে, অস্তিত্ব অনুভবে না পেলে কখনো তা সম্ভব হ'ত না। এ সব থেকে প্রমাণ করে দেওয়া যায় আনন্দতত্ত্বটি কখনো মিথ্যা নয়। আর বিরুদ্ধ দু'টির একত্র সমাবেশ অসম্ভব বলে স্থির হয়ে

যাবে যে অপরটি মিথ্যা বা আগন্তুক অর্থাৎ কল্পিত, হয়ত প্রয়োজনীয়—কিন্তু কল্পনা। এ কল্পনা ত তাঁরই কল্পনা—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বহুধা প্রকাশ। সুতরাং একমাত্র মূল শাশ্বত তৎস্বরূপানন্দতত্ত্ব অপেক্ষা, জাগতিক সুখ-আহ্লাদ, তৃপ্তি-সন্তোষের যতটুকু মূল্য; তদ্বিপরীত শোক-দুঃখাদিরও ঠিক ততটুকুই মূল্য, কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নয়। কারণ প্রকৃত তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে সুধাকরের ন্যায় হলাহলও অপেক্ষিত বা কল্পিত হয়েছে মহামায়ারই ইচ্ছায়। অর্থাৎ কল্যাণকর জাগতিক যাবদ্ বস্তুর স্বচ্ছতার ন্যায় অকল্যাণের আকর সর্বাবরক তমোরাশিও তাঁরই বিবর্তন। উভয়ই জীবের তত্ত্বান্বেষণের পক্ষে, পূর্ণতাসংপ্রাপ্তির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, দুঃখী জীবের শ্রেয়স্কর পন্থাটি প্রশস্ততর করে তুলবার জন্যেই জগজ্জননীর বিভূতিবিস্তার মূলে বিভিন্নরূপ বিভাবের মাধ্যমে মহাবির্ভাব বা পরব্রহ্মের ব্রহ্মরূপিণী রূপ পরিগ্রহে স্বরূপশক্তিরূপে মহাবতরণ। এই তত্ত্বটিকেই অপরূপ মহিমার সমুজ্জ্বল ভঙ্গীতে রূপায়িত করে বিন্যস্ত করা হ'য়েছে, বিরুদ্ধভাবদ্বয়ের অপূর্ব সমন্বয় সঙ্গীতের স্তুতিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

এস প্রসন্নবদনা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

স্নেহের প্রতিমা এস মা দুর্গা,
এস জটাজূটধারিণি,
এস মা অর্ধচন্দ্রশেখরা,
পূর্ণচন্দ্রহাসিনি!
এস মহাদেবী, এস ত্রিনয়না,
অতসী বর্ণা, নবযৌবনা,
সর্বাভরণভূষিতা এস মা,
সুচারু-দন্ত-শোভিনি!

পীনউন্নতপয়োধরা এস
স্নেহের পীযূষ বহিয়া,
ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াও জননি,
মহিষ-অসুরে বধিয়া!
দশভুজে ধর' দশপ্রহরণ,
দশদিকে তেজ কর' বিকিরণ,
মৃণালকোমল বাহুগুলি তব
উঠুক্ শক্তি ভরিয়া!

ত্রিশূল খড়্গ চক্র ও গদা
ধর' দক্ষিণ পাণিতে,
বামে ধর' দেবি, পাশ অঙ্কুশ,
অসুর-শক্তি হানিতে!
ধর' নাগপাশ ধনু আর বাণ,
পরশু-আয়ুধে হও শোভমান,
ঘণ্টা-আরাবে আনো আলোড়ন
বিরাট আকাশখানিতে!

অধোভাগে তব পড়ুক মহিষ
ছিন্নশীর্ষশরীরে,
সকল দন্ত শেষ হ'ক মাগো,
তাহার তপ্ত রুধিরে!
ছিন্ন স্কন্ধ হ'তে উত্থিত,
কর' মা অসুরে শূলে বিদারিত,
নাগপাশে তা'রে কর' বেষ্টিত,
দাও মা, অভয় মহীরে!

অসুর-মুখের ভয়াল ভ্রূকুটি
আজি নিঃশেষ করিয়া,
এস মা দুর্গা, সিংহবাহনে,
সন্তানে লহ বরিয়া !
তব দক্ষিণ অভয় চরণ,
সিংহপৃষ্ঠে কর' রক্ষণ,
স্থাপি' তব বাম পদাঙ্গুষ্ঠ
অসুরে রাখ' মা দমিয়া !

আশিস্-হস্তে এস অম্বিকে,
এস প্রসন্নবদনা,
ধর্ম অর্থ মোক্ষ দাও মা,
পুরাও সর্বকামনা !
চারিদিক ঘিরি' দেবদেবী যত,
হ'ক্ মা তোমার বন্দনারত,
ধরণীর বুকে হও জাগ্রত,
ভীত ও আর্তশরণা !

কালিদাস সাহিত্যে "শিশু"

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বসু, এম্-এ

চরিত্র অঙ্কনে মহাকবি কালিদাস ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর অঙ্কিত নায়ক-নায়িকা এবং অপরাপর চরিত্রের মত শিশুর চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। যদিও কবির ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস রহস্যাবৃত তথাপি তাঁর রচনা পাঠ করে মনে হয়, বিবাহিত জীবন এবং শিশুচরিত্র রূপায়ণে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করেছেন নানা ভাবে। শিশুকে তিনি নিজের আন্তরিক অপত্যস্নেহে অভিষিক্ত করে চিত্রিত করেছেন এবং স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে। কবি কালিদাস বিশ্বাস করতেন যে দাম্পত্যপ্রণয় কখনো সার্থক ও পরার্থপর হতে পারে না, যদি তা' সন্তানরূপ আশীর্বাদে ধন্য না হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"‥নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" মাতৃত্বই নারীজীবনের সার্থকতার চরম লক্ষণ—এ অভিমত মহাকবি পোষণ করিতেন। এরই উপর ভিত্তি করে কালিদাস তাঁর নাটক এবং কাব্যের নায়ক-নায়িকার প্রণয়কে সন্তানের জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলেছেন। তাই আমরাও পেয়েছি কবির অমর লেখনীপ্রসূত সর্বদমন, আয়ুস্, রঘু ও কুমার প্রভৃতি শিশু-চরিত্র।

প্রত্যেকটি শিশুচরিত্র-চিত্রণে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রে অল্পবিস্তর শিশুসুলভ চপলতা, নির্ভয়তা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ও তন্ময়তা প্রকাশিত হয়েছে। রঘুবংশমহাকাব্যে শিশু রঘুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো,
যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রাণিপাতশিক্ষয়া,
পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ॥"

ধাত্রীর উচ্চারিত বাক্য উচ্চারণ করে, তার আঙ্গুল অবলম্বনে চলাফেরা করে এবং প্রণাম করবার রীতি-শিক্ষার দ্বারা বিনত হয়ে সে বালক (রঘু) পিতার আনন্দ উৎপাদন করতে লাগল। শিশু স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়, বয়স্ক ব্যক্তিরা যেভাবে কথা বলে,

চলাফেরা করে, আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, সে সব দেখেশুনে শিশুও তদ্রূপ অনুকরণ করে। রঘুর চিত্র অঙ্কনকালে মহাকবি কালিদাস তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। সত্যিকার পিতৃহৃদয় না থাকলে শিশুর এহেন আচরণে আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব নহে। কবি সুদক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের মত শিশু ও পিতা দুয়েরই মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। নৃপতি দিলীপ শিশুপুত্র রঘুকে স্বীয় অঙ্কোপরি স্থাপন করে যে অবর্ণনীয় পুলক অনুভব করেছেন তাও কবি পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

মহাকবির বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে আমরা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার শিশুপুত্র সর্বদমনের সাক্ষাৎ লাভ করি। ঋষির আশ্রমের প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও সর্বদমন শিশুসুলভ চপলতার পরিচয় দিচ্ছে। মহাকবির অঙ্কিত প্রত্যেকটি শিশু যুবজনোচিত বলে বলীয়ান্। অপর ক্রীড়নকের অভাবে সর্বদমন স্তন্যপানরত সিংহশাবককে সিংহীর বক্ষ থেকে বলপ্রয়োগে ক্রীড়ার জন্য আকর্ষণ করছে।

"অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেশরম্।"
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি॥"

শিশু সর্বদমনের কাছে হিংস্র আর নিরীহ প্রাণীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কৌতূহলবশে সে সিংহ-শিশুকেও মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেও ভয় পায় না। কুমারসম্ভব মহাকাব্যেও কবি কুমার কার্তিকেয়র শিশুসুলভ চপলতা ও নির্ভয়তার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"গৃহ্নন্ বিষাণে হরবাহনস্য, স্পৃশন্ উমাকেশরিণং
সলীলম্।
স ভৃঙ্গিণঃ সূক্ষ্মতরং শিখাগ্রং কর্ষন্ বভূব প্রমদায়
পিত্রোঃ॥"

মহেশের বাহন বৃষের শৃঙ্গ ধারণ করে, উমার বাহন সিংহের কেশর আকর্ষণ করে, এবং ভৃঙ্গীর শিখার অগ্রভাগ গ্রহণ করে কুমার হরপার্বতীর আনন্দ উৎপাদন করছে। আরো দেখতে পাই সিংহীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে সিংহশিশুর দশন গননা করবার জন্যে চেষ্টা করছে সর্বদমন।—"জৃম্ভস্ব, রে সিংহশাবক জৃম্ভস্ব, দন্তান্ তে—গণয়িষ্যামি।" অনুরূপ নির্ভয়তা ও শিশুসুলভ কৌতূহলের পরিচয় আমরা মহাকবির চিত্রিত কুমার কার্তিকেয়র মধ্যেও খুঁজে পাই।

"একো নবো বা দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্ত ইতি অক্ষীগণং
আত্মমুখং প্রসার্য্য।
মহেশকণ্ঠোরগদন্তপঙ্‌ক্তিং তদঙ্কগঃ
শৈশবমৌগ্ধ্যমৈশিঃ॥
কপর্দিকণ্ঠান্তকপালদাম্নোঽঙ্গুলিং
প্রবেশ্যাননকোটরেষু।
দন্তানুপাত্তুং রভসী বভূব মুক্তাকলভ্রান্তিযুতঃ
কুমারঃ॥"

মহেশ্বরের কণ্ঠস্থিত সর্পের মুখব্যাদন করিয়ে এবং নরকপালনির্মিত মালার আননসমূহে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে মুক্তাফলভ্রমে দন্তপঙ্‌ক্তি গণনা করতে সচেষ্ট কুমার কার্তিকেয়। শিশু সর্বদমনকে অবলোকন করে রাজর্ষি দুষ্মন্তের হৃদয় যে অপত্য-স্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি আপন হৃদয়ের পুত্রবৎসলতার প্রকাশ করছেন।

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈঃ
অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি॥"

"রদ ঈষৎ-মুকুলিত অকারণহাসে,
আধ আধ কথাগুলি মনোহরভাষে।
অঙ্ক আরোহিতে শিশু প্রণয় জানায়,
ধন্য পিতা বাল-রজঃ লাগে যার গায়॥"

কুমারসম্ভবেও কুমারকে অঙ্কোপরি স্থাপন করে

পার্বতীপরমেশ্বরও অনুরূপ অনুভূতির আস্বাদলাভ করেছেন—

"অহেতুহাসচ্ছুরিতাননেন্দুঃ গৃহাঙ্গনক্রীড়ন্ ধূলিনম্রঃ।
মুহুর্বদন্ কিঞ্চিদলক্ষিতার্থং মুদং
তয়োরঙ্কগতস্ততান॥"

অকারণ হাসিতে উৎফুল্ল মুখচন্দ্র এবং গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত ধূলিমলিনদেহ কুমার বারংবার অলক্ষিতার্থ বাক্য উচ্চারণ করে পার্বতী এবং মহেশ্বরের হর্ষ-উৎপাদন করছে। বিক্রমোর্বশী নাটকে চিত্রিত উর্বশী ও পুরুরবার পুত্র আয়ুসকে ঠিক শিশুর পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে সে কৈশোরে পা দিয়েছে। তাই তার আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। এবার উপসংহারে মহাকবি কালিদাসের শিশুচরিত্র অঙ্কন করবার ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের বিচার করে জনৈক সমালোচক যে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার উল্লেখ করে প্রবন্ধ সমাপ্ত করলাম। তিনি বলেছেন—"Incomparable strophe which no father or rather no mother will be able to read without beating of heart to such a degree has the poet succeeded in putt·ng in it, with all its delicate shades, the livivng expression of maternal love."

—একথা যে ভুলে যাই!

নরেন্দ্র দেব

তোমার দয়ার সীমা নাই প্রভু,
করুণা-সাগর তুমি;
সঁপিয়া যে দেয় আপনারে তব
চরণের ধূলা চুমি,
দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাভিমান,
নিঃশেষে যায় ভুলি,
তুমি সে ভক্তে টেনে লও প্রভু!
ভালবেসে কোলে তুলি।

সেদিন সে বোঝে এ ভুবন মাঝে
নির্ভর শুধু তুমি;
অহংকারের কণাটুকু আর
খুঁজিয়া না পায় ভূমি!
জাগে জীবনের রহস্যঘন
গূঢ়তম অনুভূতি,
মনের আঁধার করে নিরাকার
প্রেমের পরম দ্যুতি!

যশ, বৈভব, খ্যাতি, মান তার
মনে হয় যেন বোঝা,
মায়া-মোহে ডুবে সুখ অর্জন
বর্জন হয় সোজা!
প্রিয় পরিজন, আত্মীয় যারা
সবা হ'তে রহি দূরে,
মন চাহে তার চিত্তে নিয়ত
তোমারি চিন্তা স্ফুরে!

বাসনা, কামনা, আরাধনা যার
ফিরিছে তোমারে ঘিরে
সদা ব্যাকুলতা দেখো যেথা—তারে
দর্শন দাও ধীরে!
এ নহে কেবল কোটীকে গুটিক,
সুকৃতি, ভাগ্যফল,
তোমারে যে পারে ভালবাসিবারে—
সে যে তার তপোবল!

সত্য যাহার জীবনে সহজ,
কপটতা নাহি জানে,
প্রতিদিন তার সকল কর্মে
তোমারে যে জন মানে ;
মধুর বচনে প্রীতি ঝরে যার,
সবারে যে ভালবাসে,
আসন তাহার সযতনে রাখো
সাজায়ে আপন পাশে !

মনে যার কোন অসৎ চিন্তা
দেয়না কখনো উঁকি,
ধর্মের নামে নেই কপটতা,
গোঁড়ামির বুজরুকি,
সোজা কথা বলে, সোজা পথে চলে,
আঁকা বাঁকা নেই কিছু,
জানি প্রভু তুমি সদাই ফের সে
ভাগ্যবানের পিছু।

দিয়ে রকমারি খেলনা, পুতুল,
রাঙা চুষি, ঝুম্‌ঝুমি,
সারা সংসারে তোমার শিশুরে
ভুলায়ে রেখেছ তুমি !
আমরা তোমার আত্মজ, তাই
বিপথে যখন চলি —
তোমার বুকের বীণার তন্ত্রী
কেঁদে ওঠে ছলছলি !

তোমার সমান হেন লোভাতুর
বিশ্বভুবনে নাই,
আমরা তোমারই সন্তান পিতা—
একথা যে ভুলে যাই !
তোমারে যে চায় সহজেই পায়,
চাওয়া যদি হয় খাঁটি,
প্রেমরসে গলে কঠিন পাষাণ—
তুমি তো নরম মাটি !

সমাজ-সংস্কৃতির সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্ব

অধ্যাপিকা শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্‌-এ

আধুনিককালে ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয়ে যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের মতে বিচ্ছিন্ন জাতীয় ইতিহাস বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বিশ্ব-ইতিহাসের গতিক্রমের একটি সামগ্রিক ধারা আছে এবং কোনও এক সময়ে একটি জাতি অপরাপর জাতির সভ্যতাসংস্কৃতির অবদানে বহুল পরিমাণে পুষ্ট ও প্রভাবিত। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবীর মতে এ পর্যন্ত জগতে উনিশটি বিশিষ্ট সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে এবং এদের মধ্যে পাঁচটি আজও জীবিত। জগতের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এই পাঁচটি হল ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা, প্রাচ্য মহাযান বৌদ্ধ সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা, পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও বর্তমান রুশ সভ্যতা। এই পাঁচটি জীবিত সভ্যতার প্রত্যেকটি পরস্পরের দ্বারা এবং মৃত চৌদ্দটি সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত। যুগ হইতে যুগান্তরের বিবর্তন বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘাত ও মিলনের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে। অতএব, জগতের যে কোনও একটি বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী তার সভ্যতা-সম্পদের জন্য, তার সমাজ-সংস্কৃতি সাধনার জন্য বিশ্বের সকল জাতির কাছে ঋণী, এ সকল সে পেয়েছে সমস্ত মানবজাতির সমগ্র সাধনার ফলস্বরূপ। বস্তুতঃ তার যা কিছু মানস-সম্পদ তা বিশ্বের সকল মানুষের তার উপর বর্ষিত আশিসধারা।[১] বর্তমানে এই ঋণ সকলেরই স্বীকার করে নেবার দিন সমাগত।

১ Toyenbee—Civilisation on Trial

এ মতানুযায়ী আমরা দেখি যে ভারতীয় সভ্যতা সংগঠনে প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা, আদিম অধিবাসীদের সভ্যতা, ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা, সিরিয়ান সভ্যতা, গ্রীক্-রোমান সভ্যতা—বিস্মৃত ও স্মরণীয় কালের সকল বিশিষ্ট সভ্যতা সহায়তা করেছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আর্য জাতি সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া হতে একদা একটি বিশিষ্ট ধর্ম ও আচার-আচরণ নিয়ে এ দেশে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে সঙ্ঘাত ও মিলন ঘটে তদানীন্তন প্রাগৈতিহাসিক দ্রাবিড় সভ্যতা ও আদিম-অধিবাসীদের ধর্ম, আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর। প্রধানতঃ এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের ফলে ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতার উৎপত্তি। এই সভ্যতার একটি অতুলনীয় বিশিষ্ট জীবন-মূল্য-নিরীক্ষণ বা জীবন-দর্শন আছে এবং দেখা যায় যে, এই জীবন-দর্শনই এই সভ্যতাকে জগতের চক্ষে প্রাধান্য দিয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক। বেদ ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে আত্মার সনাতনত্ব ও অমৃতত্বের কথা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। জীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান লাভ—সমস্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ঘোষণা। এই তত্ত্বের যুক্তি অনুসারে মানবাত্মা অসীম শক্তি-সম্পন্ন, বিশ্ববিজয়ী,—আনন্দ হতে জাত এবং অমৃতের পুত্র। একটি অতি বলিষ্ঠ আশাবাদের পরিচয় আমরা এই কয়টি কথার মধ্যে নিঃসন্দেহে পাই। এই অতি বলিষ্ঠ আশাবাদ এই জীবন-দর্শনের বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই জীবন-দর্শনের অন্য আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য—বহুর মধ্যে একত্বের সাধনা। যুগে যুগে ভারতীয় সাধকেরা এই কথাই বারে বারে নূতন নূতন ভাবে বলেছেন যে এই আপাত বিচিত্র জীবজগতের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে, তাকে তাঁরা সৃষ্টির মূল-কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই "বহুর মধ্যে একত্বের সাধনা" ভারতীয় সমাজজীবনকেও বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। নানা ধর্ম, নানা গোষ্ঠী, নানা বিচিত্র ভাষা ও আচরণ-বিশিষ্ট মানুষ তাদের সকল বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা নিয়েই সমাজের বুকে চিরকাল স্থান পেয়েছে। যুগে যুগে ভারতের সমন্বয়সাধনা সেইজন্য মূর্ত হয়ে উঠেছে যুগনেতাদের মুক্তিমন্ত্রের মধ্যে—ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এইরূপ ঘটেছে। বিরুদ্ধ ও বিপরীত যা কিছু এদেশে নবাগত মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সমন্বয়সাধনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ সে সকলকে আত্মসাৎ করে নিয়ে বিবাদের পথ ও সংগ্রামের অবকাশ রুদ্ধ করেছে। এই সমন্বয়সাধনার প্রয়োজনেই অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্য, সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে উচ্চতম আদর্শ বলে ভারতবর্ষে পরিগণিত হয়ে এসেছে, যদিও সাম্যের আদর্শ সকল সময় সমাজ হয়ত কাজে পরিণত করতে পারে নি। এই জীবনদর্শনের অপর মূল্যবান বৈশিষ্ট্য চির-অগ্রগতির বাণী। এই জীবনদর্শনের মত চলাই পুণ্য, চলার মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব—অচল যা কিছু, স্থিতিশীল যা কিছু তাই পাপ, নীচ ও অকাম্য[৩]। এর চেয়ে দীপ্ততর চলার মন্ত্র পৃথিবীর অন্য কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ।

এই অতি বলিষ্ঠ জীবনদর্শনই ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রশক্তি। কিন্তু যুগে যুগে এই সভ্যতাকে বহু নূতন জাতি, সভ্যতা ও সমাজসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নব নব রূপে রূপায়িত হতে হয়েছে যার ফলে সে অর্জন করেছে নূতন মানস-সম্পদ, নূতন শক্তি। আর্য, অনার্য, গ্রীক্, শক, হুন, পাঠান, মোগল পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ—এই বিচিত্র মানবজাতির সম্মিলিত প্রাণধারার প্রবাহে ভারতীয় সভ্যতা নিজের প্রাণের রসদ সংগ্রহ করেছে। গ্রীসের শিল্পসৌন্দর্য-চর্চা, ইস্লামের

২ ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতীয় সংস্কৃতি
রবীন্দ্রনাথ—ইতিহাস।

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি" ইত্যাদি

ভ্রাতৃত্ববোধ, পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথনির্দেশ—এ সকলই ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতিতে অমূল্য অবদান বলে চিরদিন গণ্য হবে।

আমাদের নিকটতম কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতার সংযোগ ঘটেছে এবং তার ফলে যে বিপুল আলোড়ন ভারতীয় সমাজসংস্কৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে—তার ফলেই নবীন ভারত বা বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শ-কাল হতেই আমাদের ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান ও নূতন যুগের অভ্যুদয়-কাল বলে গননা করে থাকেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক কালে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—তাকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অবদান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই মধ্যযুগের অবসান-মুহূর্তে ভারতবর্ষের সমাজসংস্কৃতির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে আমরা দেখি যে, এই কালের ভারতীয় সমাজসংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম। জাতিভেদ প্রথা ছিল এই সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য। আর্থিক জীবন ছিল কৃষি ও কুটীরশিল্পে নির্ভরশীল এবং গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল আর্থিক সংগঠনের মূল ভিত্তি। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে গ্রামকেন্দ্রিক মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল তার ফলে রাজনৈতিক ঐক্যবোধের অভাব ঘটেছিল। পূর্বে আর্য-অনার্য-দ্রাবিড় সাধনা-সম্ভূত যে জীবন-দর্শনের কথা আলোচনা করেছি তা সমগ্রভাবে গ্রামগোষ্ঠী-গুলিকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। ফলে তাদের মানসিকতায় একটি ঐক্যসূত্রও গড়ে উঠেছিল, এবং আসমুদ্রহিমাচল বিশাল এই ভূখণ্ডে দৃঢ়বদ্ধ একটি আধ্যাত্মিক ঐক্য (Spiritual unity) গড়ে উঠেছিল। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও বহু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও গঙ্গাসিন্ধুবিধৌত এই দেশ এক দেশ বলে জগতের চক্ষে পরিচিত হয়েছিল এবং বহু বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র মানবগোষ্ঠী, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, নানা আচার-আচরণ-সত্ত্বেও একই জাতি ব'লে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু, মধ্যযুগের অবসান মুহূর্তে পরপদানত এই দেশে রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও সামাজিক বৈষম্য জনসাধারণকে নিদারুণ আর্থিক দুর্গতি, শিক্ষার ও চারিত্রিক অবনতির কবলিত করেছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতবাসী তাদের চিরাচরিত জ্ঞান-সাধনার ঐতিহ্য হতে চ্যুত হয়ে পড়ে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তখন জনকতক মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মানসিক বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হল। এ কাল জাতির নিদারুণ অবসাদের কাল, ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। ঠিক এই সময় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য জাতির আগমন হল ও তার বিজয়-ধ্বজা উড়ল। এইকালে পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টীয় সভ্যতা বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতির ফলে ঐহিকতা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু, এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাই ভারতবর্ষকে ক্রমে পুনরুজ্জীবিত ও আত্মস্থ হতে সহায়তা করল। প্রথম দিকে এই সভ্যতার বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার, চরম ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান ও আর্থিক উন্নতির নব নব উপায় নির্দেশ এ দেশের নিরন্ন, অত্যাচারিত কেন্দ্রচ্যুত নরনারীর চিত্ত বিমোহিত করে তুলেছিল। আর্থিক উন্নতির বাসনা, সামাজিক অত্যাচার হতে মুক্তি কামনাই এদের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বরণ করতে প্রবৃত্ত করল। সেদিন ঐহিকতা-কেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক অত্যাচারের হাত হতে মুক্তিদাতারূপেই অধিবাসীদের চিত্ত জয় করে নিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদ, গণতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ বুদ্ধিজীবীদেরও চমক লাগিয়ে দিল, কারণ গণতন্ত্র তখন সম্প্রসারণশীল, জাতীয়তা-বাদেরও তখন জয়যাত্রার কাল।

এই অভিনব সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে পরিবর্তন আরম্ভ

হল তার প্রক্রিয়া আজও সম্পূর্ণ হয় নি। প্রথমতঃ আমাদের গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে গেল পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রশিল্পের আঘাতে। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীরশিল্পগুলি দাঁড়াতেই পারল না। ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তের গ্রাম শহর জনপদকে নির্ভরশীল হতে হল সুদূর লাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, জাপানের উপর। তারা শুধু দ্রব্যসম্ভার পাঠাল না। পাঠাল নানা ধারণা, চিন্তা, আদর্শ। ভারতে গ্রামজীবন ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় যে শহরগুলি গড়ে উঠল শিল্প-কেন্দ্ররূপে, তারাই হল এই সকল বৈদেশিক ধ্যান ধারণার ধারক, বাহক ও প্রচারক। ফলে এক প্রকার শহুরে সংস্কৃতি ও মানসিকতার সৃষ্টি হল যার আলোক ঠিক গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছল না। ঠিক সেই সময় হতেই আমাদের শহর এবং গ্রামের মধ্যে মানসিক পার্থক্য বেড়েই চলেছে। ভারতের এত কালের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বন্ধন এবার শিথিল হয়ে পড়ল, শিথিল হয়ে এল জাতিভেদের শক্ত নিগড়, কিন্তু দৃঢ় হয়ে উঠল আর্থিক বৈষম্য। ক্রমে একটি সংস্কৃতি-সঙ্কট ঘনিয়ে এল এ দেশে, ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিদারুণ সঙ্ঘাত ঘটল শহুরে বাবু ও পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ঐহিকতা-সর্বস্ব সংস্কৃতির। শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় ধর্ম ও আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অবশ্য একটি প্রতিক্রিয়া আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতজনেরা একটা প্রচেষ্টা করলেন প্রাচ্য আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মধ্যে একটি আপস রফা করতে। তারই পরিচয় আমরা পেয়েছি ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে। দেশের ঠিক এই সংস্কৃতি-সঙ্কটের মুখে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রাচীন যে সংস্কৃতি-ধারা পূর্বোক্ত শিক্ষিত জনের চিত্ত হতে লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, যা জনকতক গ্রাম্য মানসিকতা-সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মানসিক বিলাসিতার উপকরণে মাত্র পরিণত হয়েছিল, সেই সংস্কৃতি তার সমস্ত প্রাণ-শক্তি, লুপ্ত ঐশ্বর্য ও বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে জাগ্রত হয়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। ভারতের সংস্কৃতি-মানস যে এমন আত্মসচেতন, সদাক্রিয়াশীল, আঘাতে সঙ্ঘাতে এমনি জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে এ ধারণা তৎকালীন কারও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য আধ্যাত্মিক সাধনা আধুনিক জগতের এক বিপুল বিস্ময়। সেই সাধনার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির যা পরম সম্পদ তার তিনি পুনরুদ্ধার সাধন করলেন। আত্মার অবিনশ্বরত্ব, অমৃতত্ব, ও অসীম শক্তিমত্তা, বহুর মধ্যে একের সাধনা, সাম্য-শান্তি-মৈত্রী—এ সকলই তাঁর সাধনায় ও শিক্ষায় নবতর শক্তি অর্জন করে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেছেন সাধারণের ভাষায়, অতি পরিচিত উপমায়। সে ভাষা সে উপমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা অভিজাত শিক্ষিত মানুষের নয়—সে ভাষা ও উপমা অশিক্ষিত চাষী-মজুরের ও তাদের জীবনের, তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষের। স্পষ্টই এ হতে দেখা যায়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ভদ্রলোক বাবু ও শ্রমিক কৃষক এবং গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি-মানসে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা নিবারণের একটি প্রয়াসও তিনি করে গিয়েছেন। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম-তত্ত্ব, জীবন-মূল্য-বিচার প্রকাশিত হয়েছে কোটী কোটী লোক যে ভাষা বোঝে, কথা বলে, সেই ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ও শিক্ষার পটভূমিকায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ সহায়ে ভারতের আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক সভ্যতার মূল্য বিচার করে গেলেন। তাঁর এই প্রয়াসের ফলে আমরা সে জীবন-দর্শন পেলাম তার ভিত্তি এক দিকে বিজ্ঞান অপরদিকে ধর্ম। ধর্ম ও বিজ্ঞানের

দ্বন্দ্ব তিনি চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে নূতন ভারতের যে সংস্কৃতি-মানস গড়ে উঠেছে, যার ধারক ও বাহক গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র আরও বহু মনীষী সাধক ও কর্মবীর—তার ভিত্তি ধর্ম ও বিজ্ঞান।

এই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন সমস্ত দেশে এক প্রবল জাতীয়ভাব জাগিয়ে তোলে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ আমাদের সহায়তাসাধন করেছে প্রচুর। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধ জাগরণে মাৎসিনি, গারিবল্ডীর আদর্শ যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল ও প্রেরণা দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে আজ প্রমাণিত সে যুগের নেতাদের স্বীকৃতিতে। সে সকলের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তার ফলে যে রাজনৈতিক আন্দোলন বন্যার মত জেগে উঠল দেশে তারই প্রবাহের শক্তিতে বিদেশী শাসনের নিগড় একদিন ভেঙ্গে পড়ল।

আধুনিক ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি সংগঠনে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও ক্রিয়া যে অংশ গ্রহণ করেছে তা আমাদের ইতিহাসের পশ্চাক্রম অনুভব করতে সহায়তা করে। পূর্বেই বলা হয়েছে ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্ঘাত-মিলনের কাহিনী। বর্তমান কালে শুধু ভারতবর্ষই নয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অন্যান্য জীবিত সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই প্রভাব অনুভব করেছে। মুস্তাফা কামাল পাশার সংস্কার-সাধন ইস্‌লামীয় জগতে পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রকট করছে। নবীন জাপানের শিল্পোন্নতির সার্থক প্রয়াস প্রাচ্য মহাযানবৌদ্ধ সভ্যতার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করছে, রাশিয়া ও চীনের সাম্যবাদ (Communism) গ্রহণও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব—বলে অনুমান করেছেন টয়েনবী।[৪] পাশ্চাত্য ঐহিকতাবাদের একটি ফল এই সাম্যবাদ। অতএব, এই আধুনিক কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে একটি সক্রিয় প্রভাবশীল সভ্যতা হিসাবে কাজ করেছে এ সিদ্ধান্ত আমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু, বর্তমানে ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়যাত্রার কাল অধুনা গত হয়েছে, এখন তাকে সঙ্কোচন প্রক্রিয়ার বশবর্তী হতে হবে। এ বিষয়ে স্পেংগ্লার, সোরোকিন ও টয়েনবী এই তিনজন প্রসিদ্ধ সমাজশাস্ত্রবিৎ একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫] টয়েনবীর মতে এবার কোনও প্রাচ্য সভ্যতা জয়যুক্ত ও প্রসারশীল হয়ে উঠবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ, আজ বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার আমাদের এক আণবিক যুদ্ধের সম্মুখীন করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় তা হলে আণবিক অস্ত্রসমূহের প্রয়োগফলে সমগ্র মানব-সমাজ ও সভ্যতা বিনষ্ট হবে। অতএব, আজ আমরা এক মহা সভ্যতা-সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। এর থেকে পরিত্রাণের পন্থা কি—আজ জগতের মানবের মনে এই প্রশ্ন ব্যাকুল হয়ে জেগেছে।

আমরা দেখি পাশ্চাত্য ঐহিকতাসর্বস্ব জীবন-দর্শন জীবনের পরমার্থ ঐহিক ধনসম্পদ অর্জনেই—এই নির্দেশ দিয়ে থাকে। ফলে আজ যে সমাজ-ব্যবস্থা, ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এসেছে তা দেশের মানুষকে যেমন শোষণ করেছে, অপর দেশকে করেছে তেমনি পরাধীন। শান্তি ও সাম্য বজায় রাখবার জন্য যে কর্মের উপর প্রেমের, ঐশ্বর্যের উপর জ্ঞানের, রাজকর্তৃত্বের উপর নীতির এবং জাতীয়তাবাদের উপর মানবতাবোধের প্রভাব প্রয়োজনীয় তার স্বীকৃতি বা পরিকল্পনা পাওয়া যায় না খুব বেশী এই জীবন-দর্শনের মধ্যে। ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঘটেছে বিষম সঙ্ঘাত, মানুষ তার সমস্ত শক্তি আজ নিয়োজিত করেছে অস্ত্র-তৈরীর আয়োজনে।

৪ Toynbee—Civilisation on Trial

৫ Cowell—History, Civilisation & Culture
Toynbee - The world and the rest.

এই অবস্থার শেষ পরিণাম সম্পর্কে আজ সকলেই শঙ্কিত। সেইজন্য যুদ্ধকামনায় যারা অস্ত্র-নির্মাণে রত তারাও আজ শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার বাণী না স্মরণ করে পারছে না। বস্তুতঃ জগতের সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষ এখন ঐক্য, মৈত্রী, অহিংসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই নেহরু-প্রচারিত অনাক্রমণ, সহ-অস্তিত্ব প্রভৃতি পঞ্চশীল-নীতি বর্তমানে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অতএব নিঃসন্দেহ আজ মানুষ যা প্রার্থনা করছে তা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তার ঐহিকতা-সর্বস্ব জীবন-দর্শনে খুব বিশেষ স্থান দেয় নি এতকাল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সমগ্র জগতের দূরত্ব ঘুচিয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু সেই রকম দেহ-জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি—জগতের সকল মানুষের আত্মিক-ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় নি। আজ সমগ্র জগতে যে ধরনের জীবনমূল্য নিরীক্ষার প্রয়োজন, তা আছে ভারতের আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক সভ্যতারই মধ্যে। বস্তুতঃ অধ্যাপক সোরোকিনের মতে বর্তমান সভ্যতা-সঙ্কটের পরিত্রাণ মুহূর্তে সমগ্র জগতে একটি প্রবল আধ্যাত্মিক আন্দোলন দেখা দেবে।[৬] সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অবসান নিঃসন্দেহে আসন্ন—এ সভ্যতার দ্বারা মানুষ আজ পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আজ যে আদর্শ জগৎ অনুসন্ধান করছে, যে আদর্শ সক্রিয় হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ঐতিহাসিকেরা দেখছেন, তা নিহিত আছে ভারতীয় সভ্যতায়, প্রাচ্য বৌদ্ধ সভ্যতায়। এই আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ যদি গৃহীত হয়, তবে নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর ও প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতাই আজ জগতে প্রসারশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। ভারতবর্ষ অবশ্য—প্রাচ্য বৌদ্ধ সভ্যতারও জন্মভূমি। বুদ্ধের জয়-পতাকা একদিন ভারতবর্ষ হতেই সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে উড্ডীয়মান হয়েছিল। যে মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিজয় একদা এ সকল দেশে ঘটেছিল, সেই সাম্য মৈত্রী অহিংসার মন্ত্রবলেই আজ সমগ্র জগতে ভারতের সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। এছাড়া, এই ভারতবর্ষে আধুনিক জগতের প্রায় সকল জীবিত সভ্যতা সম্মিলিত হয়েছে দেখা যায়। ইসলামীয় সভ্যতা ভারতকে মধ্যযুগে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে—ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় মধ্যযুগের সাধকেরা ও বর্তমানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামকে গ্রহণ করেছেন। ভারতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাবও বহু শতাব্দী পূর্বে প্রথম অনুভূত হয়। তারপরে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য ঐহিকতা-কেন্দ্রিক সভ্যতার সম্মুখীন হয়ে বিজ্ঞান ধর্ম কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে এক নূতন জীবন-দর্শন গ্রহণ করেছে। এর থেকে মনে হয় ভারতবর্ষ যেন যুগ যুগ ধরে বিশ্ব-সভ্যতার মিলন-ভূমি হয়ে বিরাজ করেছে। এই সমন্বয়-ভূমির ঐক্য-মন্ত্র আজ একদেহ জগতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে এ যেন ইতিহাসের নির্দেশ।

টয়েনবী প্রভৃতি মনীষীদের মতে বর্তমান রুশ সভ্যতা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা হতে ভিন্নগোত্রীয়। তার জন্ম বিগত বাইজাইণ্টাইন সভ্যতা হতে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকর্তৃক জাত ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত সাম্যবাদের (Communism) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এই সভ্যতা।[৭] এরও একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে যার মূলকথা রাষ্ট্রের সর্বকর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক সাম্য ও ঐহিকতা। আমরা একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব যে আজ অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ প্রকারান্তরে সমগ্র জগৎ গ্রহণ করেছে। সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) আজ পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দেশের সমাজ-সংগঠনে প্রভূত ক্রিয়াশীল শক্তি। ভারতবর্ষও তার

৬ Cowell—History, Civilisation & Culture.

৭ Toynbee—Civilisation on Trial.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতিতে সমাজ-তান্ত্রিক (Soci list) সমাজ-সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ স্বীকৃত হলেও সে সাম্য প্রতিষ্ঠায় রুশীয় পন্থা জগতের সকল দেশ গ্রহণ করেনি। সর্বকর্তৃত্বময় রাষ্ট্রাদর্শ সম্বন্ধেও আজ মতভেদ বর্তমান। ঐহিকতার আদর্শ সম্বন্ধে আমরা এ আলোচনায় পূর্বেই দেখেছি এই আদর্শ আজ জগতে খুব সমাদরণীয় বলে পরিগণিত নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম মিলন-মুহূর্তে এর যে প্রভাব অনুভূত হয়েছিল, ভারতবর্ষ তা পরিশেষে পরিত্যাগ করেছে। ভারতের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এমনকি নেহরু পর্যন্ত—সকল পাঠক চিন্তানায়ক ও কর্মিগণ উপনিষদ, বুদ্ধ ও অশোকের রাষ্ট্রাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। ভারত আজ জগৎকে রাষ্ট্রীয় শান্তির যে পথনির্দেশ পঞ্চশীলের মাধ্যমে দিয়েছে, তার প্রেরণাও যুগিয়েছেন বুদ্ধশিষ্য অশোক। বুদ্ধ বলেছেন "মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও আপনার পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূপই সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণে প্রেমভাব জন্মাইবে, সর্বলোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব জন্মাইবে, উধ্বর্দিকে, অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে তাবৎ এই মৈত্রীভাব অধিষ্ঠিত থাকিবে, ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মবিহার।"[৮] আজকের যুধ্যমান পৃথিবীর কাছে এর চাইতে দীপ্ততর মৈত্রীর বাণী আর কোথায় মিলবে?

সেই জন্যই, মনে হয় আমরা যদি আজ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে বর্তমান জগতে আগামী কালে উপনিষদের জ্ঞান, ধর্ম, বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী, ও রামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনা জয়যুক্ত হবে তাহলে বোধ হয় খুব ভুল করা হবে না। ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্য, তার ঐতিহাসিক প্রেরণাও জগতের ঐতিহাসিক প্রয়োজন—এ সকলই যেন সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের পথে আগামী কালে ভারতীয় সভ্যতার জয়যাত্রা ঘোষণা করছে। অসামান্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ কি এই জন্যই বলেছিলেন "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ?" কিন্তু এই ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আজ আমাদের কোন্ চিন্তায় নিযুক্ত করবে? একদিন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, আগামী কালে সমগ্র জগৎ ভারতীয় সভ্যতার অবদানে এক মহা-সঙ্কটের হাত হতে হয়ত উদ্ধার পাবে। বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সকল জাতি অপর জাতির সহায়তায় অগ্রগতির পথে চলতে পারছে—মানুষ যদি এই বোধ লাভ করে তাহলে বোধহয় তা তাকে বৈরীভাব দূর করে মৈত্রী ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ঐতিহাসিকদের এই মৈত্রী সাধনায় সেইজন্য বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করতে হবে।

৮ মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে—ইত্যাদি। —সুত্তনিকায়, ১।৮।৭

"ইয়োরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি-জয় আর ভারতের কাছ থেকে ইয়োরোপের শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়। তা'হলে আর হিন্দু, ইয়োরোপীয় বলে কিছু থাকবে না, উভয়প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ ('কথোপকথন'—৬ষ্ঠ অধ্যায়)

মুণ্ডক উপনিষৎ

'বনফুল'

(প্রথম মুণ্ডক, ১ম খণ্ড)

প্রথম উৎপন্ন দেব ব্রহ্মা পিতামহ
বিশ্বকর্তা বিশ্ব-পাতা যিনি
জ্যৈষ্ঠ পুত্র অথর্বেরে সর্ব-বিদ্যাধার
ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখালেন তিনি ॥ ১ ॥

অথর্বকে পিতামহ কহিলেন যাহা
অথর্ব তা করিলেন অঙ্গিরাকে দান
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবহ তাহা
অঙ্গিরার নিকটেতে পান।
অঙ্গিরা তা পাইলেন সত্যবহ হ'তে
পরম্পরা স্রোতে ॥ ২ ॥

গৃহীশ্রেষ্ঠ শৌনক অঙ্গিরা-সকাশে আসি
যথাবিধি জিজ্ঞাসেন তাঁয়
কি জানিলে সব জানা যায় ? ৩ ॥

অঙ্গিরা কহেন তাঁরে—
ছুটি মাত্র বিদ্যা শুধু আছে জানিবার
ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ
পরা ও অপরা নাম দিয়াছেন তার ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম ও অথর্ব বেদ
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ
এসব অপরা বিদ্যা নানা
পরা-বিদ্যা দিয়া যায় অক্ষরকে জানা ॥ ৫ ॥

অদৃশ্য, অগ্রাহ্য যাহা বর্ণহীন গোত্রহীন
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ নাহি কিছু যার
সর্বব্যাপী, সর্বস্রষ্টা, অতিসূক্ষ্ম বহুরূপী
অব্যয় সে নিত্য বিধাতার
ধীরগণ রূপ দেখে বলে যে বিস্তার ॥ ৬ ॥

ঊর্ণনাভ করে যথা সৃজন গ্রহণ
ধরার বক্ষেতে যথা জন্মে তরুগণ
সজীব পুরুষ-দেহে কেশ-লোম যথা
অক্ষর সম্ভব করে এই বিশ্ব তথা ॥ ৭ ॥

জ্ঞান-স্ফীত ব্রহ্ম হ'তে অন্নের জনম
অন্ন হ'তে তারপর প্রাণমন হয়
তারপর জন্মে সত্য জন্মে সর্ব লোক
কর্ম হ'তে অবিনাশী কর্মফলচয় ॥ ৮ ॥

সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ যিনি জ্ঞানময় তপস্যা যাঁহার
তিনি ব্রহ্ম তিনিই জনক নাম রূপ অন্ন
সবাকার ॥ ৯ ॥

ক্রমশঃ

মহামায়ার মহাপূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামায়া কে ? কেন আমরা তাঁহার পূজা করি ? এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। সুতরাং ইহার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পরমেশ্বরী শক্তিই মহামায়া। ইনি অঘটনঘটনপটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। এই মহাশক্তির দ্বারা জগদীশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার এবং জন্মলীলাদি কার্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তির ইনিই কর্ত্রী। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইনি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী

প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। এই মহামায়াই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবতী নামে অভিহিতা। ইনিই পার্বতী, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। ইনিই ভক্তগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। আবার ইনিই জীব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে মোহ ও মমত্ব দ্বারা জ্ঞানরহিত ও ব্যসনাসক্ত করেন। এই হেতু এই জগদীশ্বরীই মহামায়া নামে অভিহিতা। তাঁহার শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার উপায় নাই।

আমরা সকলেই জানি—এই দেবীর আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি, যথাক্রমে অপহৃত রাজ্য এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট, এবং বৈশ্য সমাধি স্বজনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মেধামুনির আশ্রমে মিলিত হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই জন্য উভয়ে মিলিত হইয়া মুনিবরের চরণপ্রান্তে নিবেদনপূর্বক, তাঁহাদের এই মোহ ও মূঢ়তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর বলিলেন —"সংসারস্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। দেবী ভগবতী মহামায়া, বিবেকবিহীন ব্যক্তির নহে,—বিবেকী ব্যক্তিগণেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। এই মহামায়া চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার প্রসন্না হইলে জীবকে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তিনি সংসার মুক্তির হেতুভূতা পরম ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণ-স্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।"

বলা হইয়াছে, মহামায়া অঘটনঘটন-পটীয়সী। এই শক্তির প্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। সে নিত্য বস্তুর প্রতি প্রীত না হইয়া, অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া রাজা সুরথ মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে?" মুনি বলিলেন,—"সেই মহামায়া নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিতা, আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপিনী এবং নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুপ্রকার আবির্ভাব ঘটে। তিনি দেবগণের ও ভক্তগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহাকে তিনি পৃথিবীতে 'উৎপন্না' বলি।" রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে মুনিবর মেধা তখন অসুরগণ কর্তৃক বার বার স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত দেবগণকে পুনর্বার স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, দেবী কিরূপে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভনিশুম্ভ নামক দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানগুলি তিনটি চরিত্রে বর্ণিত। ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য বা দুর্গা সপ্তশতী "চণ্ডী" নামে বিখ্যাত। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদস্বরূপা, দ্বিতীয় চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপা, এবং উত্তর চরিত্র সামবেদস্বরূপা। এই তিনটি চরিত্র সকামভাবে পাঠ করিলে, যথাক্রমে ধর্ম অর্থ ও কাম অর্থাৎ কামনানুযায়ী উন্নতি লাভ হয়। প্রথম চরিত্রের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং উত্তর চরিত্রের দেবতা মহা-সরস্বতী। যে ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হইয়াও এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন,—সেই মহামায়া দেবী মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, এই তিনরূপে প্রকাশিতা। মহামায়ার আরও অনেক রূপ। তিনিই দশমহাবিদ্যা, তিনিই নবদুর্গা, তিনিই অষ্টমাতৃকা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁহাকে চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, সরস্বতী, মহাদেবী, জগদ্ধাত্রী, ভগবতী, পার্বতী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত করা হইয়াছে।

কঠোর তপস্যানিরত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দুর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিতে মহর্ষি কাত্যায়ন দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সেইজন্য দেবীর অন্যতম নাম কাত্যায়নী। দেবী দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। এই সচ্চিদানন্দ দেবী গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত। মূলতঃ তিনি এক এবং ব্রহ্ম হইতে অভেদ। মহাকালী দশভুজা আনন্দরূপা; মহালক্ষ্মী সদ্রূপা ও অষ্টাদশভুজা এবং মহাসরস্বতী অষ্টভুজা এবং চিদ্রূপা। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—শ্রীশ্রীচণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবী, এই তিন শক্তির সমষ্টিভূতা। মহাসরস্বতী জ্ঞানশক্তি, মহাকালী ইচ্ছাশক্তি এবং মহালক্ষ্মী ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই পরমসত্তা চণ্ডী দেবাই বিশ্বব্যাপিনী, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের শক্তিরূপিণী। বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া, মহামায়া—তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বঙ্গদেশে দেবীর দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তিরই পূজা হয়। দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া দেবী আমাদের দশদিক রক্ষা করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমরা দশভুজারূপে তাঁহাকে পূজা করি। একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যত্র মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। সর্বত্র দশবাহুও কল্পিত হয় না। দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তর নির্মিত মূর্তিই পূজিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। বঙ্গদেশে শারদীয়া দুর্গোৎসবই মহামায়ার মহাপূজা। বঙ্গদেশে সহস্রাধিক বৎসর এই পূজা চলিয়া আসিতেছে।

পূজা আমরা কেন করি? ধর্ম, অর্থ, কাম (অভ্যুদয়) এবং মোক্ষ,—এই চতুর্বর্গ লাভ করিবার নিমিত্ত। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি গৃহীর অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং মোক্ষ যতি সন্ন্যাসীর কাম্য। যতির ধর্ম এক হিসাবে সহজ, কারণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কামনা বাসনা নাই। কিন্তু গৃহীর ধর্ম অতীব কঠিন। গৃহীর ধর্ম সৃষ্টির লালন ও সংসার-পালন। গৃহস্থ আমরা পুত্রকলত্র, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া সংসার করি। গৃহস্থ ধর্মানুযায়ী আমাদিগকে দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়, এবং দেবতা, অতিথি, যতি, সন্ন্যাসী, দীন দুঃখী, আর্ত দরিদ্র সেবা এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে হয়। সুতরাং আমাদের অসংখ্য অভাব, এবং তদনুযায়ী কামনা বাসনাও অনন্ত। আমরা মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করি—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুনাশ কর। আমরা যাচ্ঞা করি—"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।" আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও, আমাকে পরম সুখ দাও। আমরা কামনা করি—"বিধেহি দেবি কল্যাণং, বেধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।" আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্রী, অর্থাৎ ঐশ্বর্য দাও। আমরা আরও আকাঙ্ক্ষা করি,—"বিধেহি দ্বিষতাং নাশং, বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।" আমার শত্রু নাশ কর এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল দাও। আমাদের শত্রু অবশ্য দ্বিবিধ,—অন্তঃশত্রু যথা কাম, ক্রোধ, লোভমোহাদি ষড়রিপু এবং বহিঃ-শত্রু। আমরা আরও চাই,—"ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।" আমাকে আমার মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী চিত্ততোষিণী পত্নী দাও।

সংসার ধর্ম পালন করিতে আমাদের পিতামাতা, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ী, যান-বাহন, ধন জন, স্বাস্থ্য সুখ সকলই চাই। আবার এসকল চাহিলে এবং পাইলেও তৃপ্তি নাই। এসকল রক্ষা করিবার প্রয়োজন। শিশু যেমন সর্ববিষয়ে জননীর প্রতি নির্ভরশীল, আমরাও তেমনি জগজ্জননী মহামায়ার প্রতি সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল।

জন্মকালে তিনি আমাদিগকে ষষ্ঠীরূপে রক্ষা করেন; রোগে তিনি শীতলারূপে রক্ষা করেন, কৈশোরে তিনি সরস্বতীরূপে বিদ্যাদান করেন। যৌবনে তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের ঐশ্বর্য দান করেন। প্রৌঢ়ে তিনি আমাদিগকে গুরু ও ইষ্টরূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। বার্ধক্যে তিনি আমাদের মুক্তি-দায়িনী মহাদেবী। সর্ব অবস্থায় তিনি আমাদিগকে জগদ্ধাত্রীরূপে, অন্নপূর্ণারূপে, ভগবতীরূপে পরিপালন করেন। রোগে শোকে তিনি আমাদের শান্তি-দায়িনী মহাবিদ্যা, বিপদে তিনি বিপত্তারিণী তারা। তিনি দুর্গতিহারিণী দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা। সঙ্কটকালে তিনি সঙ্কটনাশিনী সঙ্কটা। এবং দশভুজারূপে দশপ্রহরণ ধারণপূর্বক তিনি দশদিক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদলাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের চাই—শরণাগতি, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ। সর্বদা তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাস।

জননী যেমন শিশুর সকল হিতকর প্রার্থনা অকুণ্ঠিতভাবে পূরণ করেন, জগজ্জননীও তেমনি আমাদের সর্বপ্রকার সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধচিত্তে, পবিত্রভাবে, কায়মনোবাক্যে, অন্যের ইষ্টানিষ্টের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার নিকট আমরা যাহা কিছু প্রার্থনা করি, আমাদের সুকৃতি অনুযায়ী তাহার উপযুক্ত হইলেই তিনি আমাদিগকে তাহা প্রদান করেন। আবার আমাদের দুষ্কৃতি অনুযায়ী তাঁহারই অলঙ্ঘ্যবিধানানুযায়ী আমরা শাস্তিলাভ করি। প্রাক্তনের প্রভাব হইতে মুক্তি নাই, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে আমরা দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারি। এইহেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে যে, দেবী আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিরাজিতা, এবং জগতের সর্বস্থানে এবং সর্ববস্তুতে অধিষ্ঠিতা হইয়া তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন। মুহূর্তমাত্রও দেবীর স্মরণ বিরত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি সর্বদা আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, গমনকালে ও বিশ্রামসময়ে দেবীর স্মরণমনন করেন, তিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। স্বোপার্জিত বিত্ত-সম্পত্তি, মহামায়ার মনে করিয়া, সমস্ত দেবীর শ্রীচরণে সমর্পণপূর্বক, বিধি ও ধর্মানুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিয়া, যিনি সাংসারিক জীবন যাপন করিতে পারেন তাঁহার সর্বাভীষ্ট লাভ ঘটে। তাঁহাকে জানাও অবশ্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বে আস্থাবান হইয়া তাঁহাকে মানা অর্থাৎ মান্য করা এবং নীতিধর্ম পরিপালন করা, আগ্রহ থাকিলে সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারেন,—শ্রুতি বলেন তিনি পাপমুক্ত হন এবং মৃত্যুঞ্জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

মেধা মুনির উপদেশ শুনিয়া রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। দেবীর কৃপায় তাঁহারা যেমন অভীষ্টলাভ করিয়াছিলেন, মদালসা (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) তেমনি তাঁহার পুত্রকে, চূড়ালা (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ) তাঁহার পতিকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রাণী তাঁহার অজ্ঞাত সরোবরে পদ্মমৃণাল মধ্যে লুক্কায়িত পতির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। মহামায়ার মহাপূজা কখনও নিষ্ফল হয় না। কারণ দেবী মন্ত্রময়ী ও ভক্তহৃদয়বাসিনী। দেবীর পূজা করিলে প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব হয়।

"মা!—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন; আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন।"

—**শ্রীরামকৃষ্ণ** (কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি)

ডাক

শ্রীরবি গুপ্ত

অন্ধকারের ওপার হ'তে
কোন্ সে উষার হাতছানি,
শোন্ রে কানে সে গান তাহার
শোন্ রে প্রাণে তার বাণী।

মান্‌বি শুধুই জীবন-পথের
অন্তবিহীন অতল-রাত,
জান্‌বি না তার মর্মে সে কোন
স্বর্ণ-সুধার অমল চাঁদ!

আপনাকে তুই রাখবি ঘিরে—
রইবি পাষাণ প্রাচীর-মাঝ্,
টোট্‌রে শেকল ভাঙ্‌রে কারা
সকল বাধায় হান্‌রে বাজ।

কান্নাহাসির পান্নাহীরায়
জীবন গাঁথা নয় রে নয়।
আনন্দ তার চিরন্তনী—
নাইরে কভু নাইরে লয়।

পাথর-চাপা স্রোতের মত
রইবি ভুলে গতির গান?
জানবি না নীল সিন্ধুরে তোর—
শশী-তারায় কিসের তান?

ছুটিয়ে দে তোর সকলজয়ী
দুরন্ত ওই ঢেউ বিপুল,
সংঘাতে তার উঠবে দুলে
মিলায় যদি মিলাক কূল।

রুদ্ধ-ঘরে রচ্‌বি কেন
অশ্রুমালার আল্পনা,
কোন ছলনার অলীক আশায়
মিছেই হবে কালগোনা!

দুয়ার খুলে আয় বেরিয়ে
পন্থে যে তোর সূর্য রে,
শুনিস নাকি দিগন্তে ওই
বাজে কিরণ-তূর্য রে!

একটু ছোঁয়া একটু বা রঙ্
ক্ষণিক যে তার বসন্ত,
জানবি নাকি পাবক-প্রাণে
ফাগুন যে তোর অনন্ত!

জীবন ভ'বে বইবি বোঝা
গাঁথবি মিছে বেদন-হার,
জানবি না তোর মণিকোঠায়—
আছে সেথা কি সম্ভার?

অসীম আজি সীমার মাঝেই
সাধে যে তার বাঁশির সুর
সেই ডাকে আজ ওঠ না জেগে
দেখনা চেয়ে মিলায় দূর!

যুগান্তে আজ জীবন-প্রিয়
গাঁথল বসি' মিলন-ডোর,
পায়ের ধ্বনি হৃদয়-দ্বারে—
রাত্রি হবে হবেই ভোর।

'আধুনিক'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

আধুনিক শব্দটি লইয়া বড় গোল বাধিল। নূতন চকচকে তাম্রখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল তার রং, তীব্র তার টং-কার। শব্দটির উপর একদলের যতখানি মোহ, অন্যদলের ততখানি দ্বেষ। মোহ বা দ্বেষ -কোনটাই সুস্থ মনের লক্ষণ নহে। তাই শব্দটি লইয়া একটু বিচার করিয়া দেখিতে হইল। শেক্‌সপীয়ার বলিয়াছিলেন গোলাপকে যে নামেই ডাকি না কেন, গোলাপ গোলাপ, নামে কিবা আসে যায়? কিন্তু নামে আসে যায়। নতুবা 'আধুনিক'কে লইয়া এত টানাটানি কেন? কেবলই কি ঐ 'আধুনিক'? 'নবীন' বা 'নূতনে'রও নিষ্কৃতি নাই। সাহিত্যের কথাই আগে বলি।

কবিগুরু 'আধুনিক কাব্য' বিচারে বসিয়া এক শ্রেণীর কাব্য আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাদের নাম দিলেন 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'। উহারই পূর্বে আধুনিক কাব্যের কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, —বিশ্বের প্রতি একটা উদ্ধত অবিশ্বাস, ও কুৎসার দৃষ্টি, একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার—সেও একটা মোহ, উহাই তাঁহার কালের আধুনিকের লক্ষণ। কিন্তু আপন মনের মাধুরী না মিশাইয়া নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে তদ্‌গতভাবে দেখা, সেইটিই 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'। নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ, তাহা কোন বিশেষ কালের নয়, তাহা সর্বকালের; অতএব তাহা সর্বকালেই আধুনিক।

সহজ করিয়া বলিলে বলা যায়,—একটা আধুনিক—চলমান আধুনিক, আর একটা আধুনিক—চিরন্তন আধুনিক। আধুনিক অর্থে সাধারণতঃ চলমান আধুনিকই বুঝায়। উহা যুগে যুগে বিবর্তনশীল, বিভিন্ন যুগ-পরিবেশে উহার মূল্য বদলায়, যুগানুগত্যই উহার মূল লক্ষণ। উহা সাহিত্যের বা সমাজের গতিশীল রূপ। যাহা যুগাতীত ধর্মে সমুজ্জ্বল, অথচ প্রতিযুগেই যুগোচিত বলিয়া আমাদের আদর লাভ করে, কাব্যের ক্ষেত্রে যেখানে 'স্বভাবোক্তি' বিধিবিহিত ব্যক্তি বা বস্তুধর্মের মহিমা-ঘোষণা, তাহাই চিরন্তন আধুনিক। তাহাই হয়তো সমাজের বা সাহিত্যের স্থিতিশীল রূপ। তাহাই স্থির, ধ্রুব, শাশ্বত। আমরা উহাকে আধুনিক বলিয়া উহার নিত্য নবীন শ্রীর উপরই জোর দিয়া থাকি। 'চিরন্তন' ও 'আধুনিক'—দুইটি বিপরীতার্থক শব্দ। অতএব 'চিরন্তন আধুনিক' শব্দে বিরোধাভাস অলঙ্কারের খেলা। এ বিরোধ ভঞ্জন করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক অদ্যতন মুহূর্তই বা যুগেই যাহার অভিনব প্রকাশ, তাহাই চিরন্তন আধুনিক।

কবিগুরুর মনের গভীরে এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার আরও কয়েক জোড়া শব্দ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছিল। তুল্যরূপ বলিয়া 'নূতন' ও 'নবীন' শব্দ দুইটির কবি-কল্পিত ভিন্ন ব্যঞ্জনার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ দিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—

> "নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। ....
>
> নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
> যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
> তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
> নবীনের নিত্য সুধা তৃপ্তি করে পুরা॥"

নূতন হইতেছে আধুনিক—চলমান আধুনিক। নবীনও হইতেছে আধুনিক—চিরন্তন আধুনিক। নূতন ও নবীনের পার্থক্যের নয়, আধুনিকেরও দুই পার্থক্য। চিরন্তনকে আধুনিক বলায় তাহার আধুনিক ধর্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠে মাত্র।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে যখন পড়ি,"মধু বাতা ঋতায়তে—মধু আহা বহে সদা বায়ু", কিংবা "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—মধু হোক্ পৃথিবীর ধূলিকণা!", তখন কি মনে হয় না আধুনিক সুর অথবা নিত্যকালের সুর বাজিতেছে?

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অপূর্ব কাব্যের ভাষায় সেই যে পুরুষবেশী ইন্দ্রের উক্তি রোহিতের প্রতি—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্ বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি॥
—ইত্যাদি

—হে রোহিত! চিরকাল আমরা শুনিয়া আসিতেছি, চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হয়, তাহার নানা শ্রী আবির্ভূত হয়। শ্রেষ্ঠগণও যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। পথে যে চলে, ইন্দ্র তাহারই সখা। পথে চল চল!—ইত্যাদি।

সে উক্তি কি আধুনিক কালের বা নিত্যকালের শ্রী-মণ্ডিত নয়? বেদ ছাড়িয়া মহাভারতে এবং কাব্য ছাড়িয়া নীতিকথার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। স্মরণ করুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের বাণী—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥

—তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ রহস্য আজ বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

অথবা স্মরণ করুন পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সেই সুমহান্ উপদেশ—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

—কুলের জন্য একজনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের জন্য কুলকে ত্যাগ করিবে, জনপদের নিমিত্ত গ্রামকে ত্যাগ করিবে, কিন্তু পরমাত্মার জন্য পৃথিবীকেও ত্যাগ করিবে।

প্রাচীন কাব্যে ও অনুশাসনে এইরূপ আরও অনেক শোভন উক্তি আছে, যাহা চিরকাল স্মরণীয়, আধুনিক কালেও বরণীয়।

কেবল কি উক্তি? চরিত্র লইয়াও বিচার করা যাইতে পারে। সাহিত্যের ন্যায় ধর্ম লইয়াও বিচার করা যাইতে পারে।

পুনরায় তত্ত্বালোচনার পূর্বে কতিপয় উদাহরণ আগেই পরিবেশন করা হইতেছে।

রামায়ণের সীতা। অদ্ভুত অপূর্ব চরিত্র, অথচ মানুষী শ্রীতে মণ্ডিত। পাতালে প্রবেশের দৃশ্য ধ্যান করুন। সকলের আকাঙ্ক্ষিত একটি কথা বলিলেই সীতা পতির সহিত চিরতরে মিলিত হইতে পারেন, পুত্রযুগলকে রাজ্যশ্রী দান করিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন, নারীর বা নরের যাহা কাম্য হইতে পারে, সকলই পাইতে পারেন। সেই পরীক্ষাই দিলেন, কিন্তু আহত অপমানিত নারীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পতি-পুত্র, সংসার-*সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া* লইয়া মাতা ধরণীর অঙ্কে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত কবি কালিদাস বলিতেছেন, সীতা ছিলেন 'ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণা—নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত,' এ দৃশ্য, এ চরিত্র কি আধুনিক নয়, একি নিত্যকালের নয়? একজন পণ্ডিত সমালোচক একটি শব্দ বলিয়াছেন 'অনন্ত মুহূর্ত'। অনন্ত মুহূর্তই তো চিরন্তন আধুনিক।

ধর্মদর্শিনী গান্ধারী বাগ্‌দত্তা হইয়াই অন্ধ পতির প্রতি সহধর্মিতা দেখাইবার জন্য বহু ভাজ করা পট্টবস্ত্র দ্বারা নিজের দুই চক্ষু বাঁধিয়াছিলেন। এ ঘটনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে, ক্লাসিকালও হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোনও অর্থেই আধুনিক নয়। অথচ যেখানে গান্ধারী রাজসভায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পুনঃপুনঃ আবেদন জানাইতেছেন—

"তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।"
—"ত্যাগ করো, ত্যাগ করো পুত্র দুর্যোধনে।"

তাহাকে আধুনিক বলিতে কোথাও বাধে না।

মরণাহত দুর্যোধন উরুভঙ্গের পর দলিত ফণীর ন্যায় ফণা উদ্যত করিয়া ব্যঙ্গবিমিশ্র বাক্যে ভীমসেনকে উপহাস করিতেছেন,—আমি রাজা দুর্যোধন, আত্মীয় বান্ধব-পরিবৃত হইয়া রাজ্য-ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া গেলাম, যজ্ঞ করিলাম, দান করিলাম,

অনুগ্রহ বিতরণ করিলাম, কি না করিলাম! আর তুমি? মহাশ্মশানের সহচর, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, স্বজন বলিতে কেহ নাই, শূন্য সকল শূন্য, মৃত্যুর ভৈরব সঙ্গীতের মধ্যে রুধির-প্রদিগ্ধ ভোগের প্রতি লোলুপ রসনা বিস্তার করিতেছ।·· পরাজয় আমার না তোমার? মৃত্যুর পূর্বক্ষণে দুর্যোধনের অট্টহাসি, ভয়ঙ্কর কিন্তু কি সুন্দর!

ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ কি না জানি না, কিন্তু তিনি বিরাট পুরুষ। তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও পরিণত বয়সের তিনটি ঘটনা স্মরণ করুন।

শৈশবে ইন্দ্রপূজা নিষেধ করিলেন। ইন্দ্র বৈদিক শ্রেষ্ঠ দেবতা, যজ্ঞের প্রধান ভাগ তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। সেই দেবরাজ-সম্বন্ধে বালক কৃষ্ণ সংশয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

> রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ,
> প্রজাস্তৈরিব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি?

—রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া মেঘগণ সকল স্থানে বারি বর্ষণ করে, তাহারই ফলে প্রজাগণ সেই বারিদ্বারা জীবন ধারণ করে। মহেন্দ্র কি করিবেন?

ইন্দ্রপূজা বন্ধ হইয়া গেল। ঋগ্বেদের ইন্দ্র যুদ্ধবিগ্রহ করেন, উপনিষদের ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গসুখ ভোগ করেন, আর ঋষিদের তপস্যা বিঘ্নিত করেন। ভাগবতে ইন্দ্রযজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পরবর্তী কালে বিশেষতঃ বর্তমান ভারতবর্ষে ইন্দ্রের সে অর্চনা আর নাই। ইহাই ধর্মের গতিশীল রূপ। ধর্মের ক্ষেত্রেও নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ঘটে। ধ্রুব কেবল পরম ব্রহ্ম। বালক কৃষ্ণের সেই উক্তি—'মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি' একটি আধুনিকতা-মণ্ডিত উক্তি।

কিশোর কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামকে সঙ্গে করিয়া কংসের রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। দ্বারদেশে হস্তী কুবলয়াপীড় নিহত হইয়াছে। তাহার বিশাল দন্ত উৎপাটিত করিয়া স্কন্ধে ধারণ পূর্বক গজরুধিরাপ্লুত দেহে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণ সঙ্গে রঙ্গ-মধ্যে উদিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রঙ্গস্থ বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একইকালে বিভিন্ন ভাবের স্ফুরণ হইতে লাগিল। ভাগবতের কবি একটি শ্লোকে একটি মহাকাব্য লিখিয়াছেন,—

> মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ,
> স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান,
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
> শাস্তা, স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
> মৃত্যু র্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং,
> তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
> বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো,
> রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ১০।৪৩।১৭

—অগ্রজ বলরামের সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলে মল্লগণ চাহিয়া দেখিল এক বজ্র, সাধারণ মনুষ্যগণ নরসমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নারীরা মূর্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণ তাঁহাদের আপনজন, দুষ্ট রাজগণ তাহাদের শাস্তা, বসুদেব ও দেবকী আপনাদের শিশু, ভোজপতি কংস দেখিলেন সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বান্ মূর্খগণের মনে হইল এক বিকল জড়, যোগিগণ অনুভব করিলেন তাঁহাদের ধ্যেয় পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিগণ বুঝিলেন তাহাদের পরম দেবতা সমাগত।

একই সঙ্গে একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন সম্পর্কান্বিত নরনারী ভয়ানক-শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসে আপ্লুত হইলেন। প্রায় সর্বগুণ ও সর্বশক্তির সামঞ্জস্যময় পূর্ণতা একমাত্র লোকোত্তর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়ই অনুভূত হইতে পারে। কবির এই সৃষ্টি নিত্যকালের এবং সর্বকালের।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধোদ্যত কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে পার্থ-সারথি কৃষ্ণ পার্থকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যোগস্থ হইয়া গীতা উচ্চারণ করিতেছেন। সে বাণীর ব্যাপ্তি ও গভীরতা নয়, তাহার অম্লান আধুনিক দীপ্তির কথাই বলিতে চাই। বেদের জটিল যাগযজ্ঞের পরিবর্তে সরল আত্মযজ্ঞ ও জপযজ্ঞ, নিষ্কাম কর্মযোগ, সাম্য-দৃষ্টি, তুল্য আধ্যাত্মিক অধিকার—কত আধুনিক সত্যই সেখানে প্রচারিত হইয়াছে। আবরণমুক্ত সহজ মানুষটি আবিষ্কার

করিয়া তাহারই কথা নানা ভূমিকায় বলা হইয়াছে। এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব গঠন অর্থাৎ আধুনিক গঠন হইতে থাকে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সরল পথেই সাধক-সমাজ বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম-সাধনায় আধুনিকতা আবার উজ্জ্বল হইয়া ফুটিতে থাকে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় শুভ আধুনিকতার প্রথম প্রবর্তন করেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। মানবতার মর্যাদাদান, জাতি-নিরপেক্ষ গুণের আদর, সাম্যদর্শন, রাজকীয় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াও সত্য প্রচার ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা, সমবেত কীর্তন বা উপাসনা, সমবেত পানভোজন বা মহোৎসব, অস্পৃশ্যতা অস্বীকার, মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার সম্মাননা—আরও অনেক কিছু বলা যাইতে পারে, যাহা সাড়ে চারিশত বৎসর আগেকার হইলেও আধুনিক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ তো আধুনিক কালের। তাঁহাদের উক্তি বা আচরণ এই আলোচনায় হয়তো প্রাসঙ্গিক নহে।

আধুনিক শব্দের মোট তিন প্রকার অর্থ,—চলমান আধুনিক বা সাধারণভাবে আধুনিক; *ব্যঙ্গার্থে আধুনিক অর্থাৎ বিকৃত বা বিজাতীয়*; চিরন্তন আধুনিক প্রশংসার্থে ব্যবহৃত। চিরন্তন সহজ প্রকৃতি ও সহজ মানুষটিকে লইয়াই চিরন্তন আধুনিক। ইহা যেন ভাস্বর সুবর্ণ। চিরন্তন আধুনিক যাহা, তাহার স্বীকৃতির পথে সকল ক্ষেত্রে না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রখর যুক্তি আছে। মহাকবিগণের রচনায় মানব সম্বন্ধ পরিজ্ঞান বা মানব-হৃদয়ের শাশ্বত স্পন্দন অনেক সময়ে এমন ভাষায় প্রকাশ পায় যে, বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী আপন আপন বিশিষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন কালে স্বভাবতই তাহার যুগোচিত নব নব ব্যাখ্যা লাভ করে। তাহাকেই বলা চলে চিরন্তন আধুনিক।

মহাকবি দান্তের আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি শেলি বলিতেছেন,—

"সকল সমুন্নত কাব্যই অনন্ত; ইহা যেন প্রথম ওকবৃক্ষের বীজ, সকল ওকই উহার মধ্যে অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হইতে পারে, কিন্তু অর্থের অনাবৃত অন্তরতম সৌন্দর্য কখনও প্রকাশিত হইবে না। মহৎ কাব্য যেন এক প্রস্রবণ, নিত্যকাল তাহা হইতে প্রজ্ঞা ও আনন্দের সলিল উচ্ছ্বসিত হইতেছে; এবং এক ব্যক্তি ও এক যুগ তাহার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করিলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—উহা এক অ-দৃষ্টপূর্ব এবং অ-চিন্তিত-পূর্ব আনন্দের উৎস।" ১

মহামতি কার্লাইলও প্রায় একই কথা আরও সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। শেক্‌সপীয়র যুগে যুগে নূতন মনে হয় কেন? কার্লাইল বলিতেছেন—

"মানবের দূর ভবিষ্যৎ পুরুষও শেক্‌সপীয়রের মধ্যে আবিষ্কার করিবে—নূতন অর্থ, তাহাদের নিজ মনুষ্য-সত্তার নূতন স্বচ্ছ ব্যাখ্যান, বিশ্বের অনন্ত গঠন-বৈচিত্র্যের সহিত নব সঙ্গতি, পরবর্তী ভাবধারার সহিত ঐকমত্য, মানবের উন্নততর শক্তি এবং জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠতা।" ২

১ All high poetry is infinite; it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after Veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and age has exhausted all its divine influence, which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight.

—A Defence of Poetry.

২ The later generations of men will find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own human being, new harmonies with the infinite structure of the universe, concurrences with later ideas, affinities with the higher powers and senses of man.

—The Hero as Poet.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দাতব্য চিকিৎসালয়—বিগত ৩১শে জুলাই রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্প্রসারিত প্রাঙ্গণে নব নির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন-উৎসব হয়। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় সভাপতির ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধর্মের বাণী ও তাহার দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী সমাগত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রচার—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার-প্রবর্তিত সমাজশিক্ষাকেন্দ্রসমূহের শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগদান করিতে হায়দারাবাদে গমন করেন এবং তথায় সমাজশিক্ষা সম্বন্ধীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় যোগদান করেন। সম্মেলন ২৫শে জুন হইতে ২রা জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অতঃপর তিনি মাসাধিককাল দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণের নিকট নিম্নোক্ত বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন :—

ভবিষ্যৎ ভারত—(বদ্রুকা কলেজ, হায়দারাবাদ), স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী—(মহাবুব্ হল্, সেকেন্দ্রাবাদ), ধর্মজীবনে গুরুর আবশ্যকতা—(রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ), প্রকৃত শিক্ষা কি ?—(বিবেকানন্দ কলেজ, মাদ্রাজ), শিক্ষায় ত্যাগ ও সেবার আদর্শ—(মাম্বালম্ উচ্চবিদ্যালয়, মাদ্রাজ), কর্মজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ, ছাত্রজীবনে ধর্মের আবশ্যকতা ও স্বাধীন ভারতের সংঘটন—(কয়েম্বাটোর), সমাজসেবায় শিক্ষকদের অবদান—(B. T. College, ত্রিচিনপল্লী), আবাসিক শিক্ষার উপকারিতা—(রামকৃষ্ণ আশ্রম, ত্রিচি), শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—(রামকৃষ্ণ আশ্রম, ত্রিচুর), আদর্শ ধর্মজীবন ও শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ—(সারদামন্দির, ত্রিচুর), আদর্শ সমাজ সেবক, গীতায় কর্মযোগ—(গান্ধী আশ্রম, মাদুরা)।

বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত এই আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান বৎসরের (১৯৫৫) ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯ জন আই-এ পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, ১৭ জন ১ম বিভাগে এবং ২ জন ২য় বিভাগে। তিনটি ছাত্র যথাক্রমে ৩য়, ৮ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে ; ২টি ছাত্র ২০৲ টাকার এবং ৩টি ছাত্র ১৫৲ টাকার গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়াছে। আই-এস্-সি পরীক্ষা দিয়াছিল ৯০টি ছাত্র। সকলেই কৃতকার্য হইয়াছে (৮১ জন প্রথম বিভাগে) এবং ৬ জন গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করিয়াছে (একজন ২০৲ টাকার ও তিন জন ১৫৲ টাকার)। ১৯৪৩ সালে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসে। তখন হইতে বরাবর প্রতি বৎসরই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার এবং সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতিত্বই এখানকার ছাত্রদের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতিষ্ঠানের আবাসিক শিক্ষাপদ্ধতিতে যে শরীরচর্চা, আত্মসংযম, সেবা ও ধর্মবোধ জাগৃতির ব্যবস্থা আছে উহাও বিদ্যার্থিগণের চরিত্রে একটি সুন্দর

ছাপ রাখিয়া যায়। যথার্থ মানুষ তৈরীর দুরূহ কার্যে আত্ম-নিবেদিত প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা-সেবাকার্য

উত্তরপ্রদেশে বন্যার্ত-সেবা—উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক বন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ৯ই আগষ্ট হইতে যে সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ:—আজমগড় জেলার মাউ নামক স্থানে ৩০টি গ্রামের ৬৫৭টি পরিবারকে সাপ্তাহিক খাদ্যশস্য দেওয়া হইতেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিতরিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ২৭৬ মণ ৩১ সের। এতদ্ব্যতীত ১৫০৫টি শিশুকে ১৪৪ পাউণ্ড বিস্কুট ও ১,১৪৮ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং দরিদ্র গ্রামবাসিগণকে ৬৯০ খানি কাপড় দেওয়া হয়। ৩৯৪১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

জৌনপুর জেলার পিলকিচ্ছায় সেবাকেন্দ্র (থানা-সরপটা) খোলা হয় ২২শে আগষ্ট। ২০টি পল্লীগ্রামের ৫৮২টি পরিবার সাপ্তাহিক খাদ্যশস্য পাইতেছেন। ২৫।৯।৫৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪০৮ মণ ২৬ সের খাদ্যশস্য এবং ৩৩৬ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ ও ৯ মণ ৫ সের লবণ বিতরিত হইয়াছে। ৩৪৮৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

উড়িষ্যা-বন্যায় সেবাকার্য—উড়িষ্যার সাম্প্রতিক বন্যায় দুঃস্থ জনগণের সহায়তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কটক জিলার জগৎসিংপুর ও তিরতোল থানা এলাকার জয়পুর গ্রামে ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে একটি সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। ১ এবং ১১ নং ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের অধিবাসিবৃন্দকে সাপ্তাহিক খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে (চাল, চিঁড়া, গুড়, বিস্কুট, মুড়ি প্রভৃতি)। ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাহায্য-প্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা—১০,৩৭৬; খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ—৪৬৭ মণ ২৫ সের।

অন্যান্য রাজ্যে বন্যা-সেবাকার্য—বিহার রাজ্যের দ্বারভাঙ্গা জেলার দেওধা গ্রামস্থিত (রেসেরা থানার এলাকায়) সেবাকেন্দ্র হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্যাপীড়িতগণকে ৬৩০ মন ২৩ সের খাদ্যদ্রব্য, ২,৪৯৬ খানি নূতন ও ১,৮২৪ খানি পুরাতন বস্ত্র এবং ৮৭টি বাসনপত্র বিতরণ করা হইয়াছে।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় বন্যাসেবাকার্য চালানো হয় দুইটি কেন্দ্র হইতে—কোকড়াঝাড় এবং ধুবড়ী। ৩৩,০৬৯ ব্যক্তির মধ্যে ১,৫৪৯ মন ৫ সের খাদ্যদ্রব্য, ৯,১৪৮ খানি নূতন কাপড়, ২,৫১৩ গজ জামার থান এবং ৬,৯০৯ খানি চাদর বিলি করা হয়। ১৪টি গ্রাম হইতে বন্যার জলে আটক ১৮৭টি গরুবাছুরের উদ্ধারসাধন করিয়া ২ সপ্তাহ সেবাকেন্দ্রে রাখা হইয়াছিল। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সেবাকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে ১৭ই ও ২১শে সেপ্টেম্বর বন্ধ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার ঋষিপুর এবং ইংলিশবাজার হইতে ৭,৬১৬ জন বন্যার্তকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪১ মন ২৭ সের খাদ্যদ্রব্য দিয়া সাহায্য করা হয়। কুচবিহার জেলার কোতোয়ালী থানায় দাগুড়ি নামক স্থানে মিশন একটি সেবাকেন্দ্র খুলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৫৬২ ব্যক্তির মধ্যে এখান হইতে ১৪৫ মন ২২ সের চাউল বিতরিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত বিবিধ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সমকালে সেবাকার্য চালানো অতি দুরূহ ব্যাপার। অনেক এলাকায় রাজ্যসরকার হইতে কমবেশী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু এই ব্যাপক সেবাব্রতের সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু পরিনির্বাহের জন্য আমাদের নিজস্ব তহবিল হইতেও প্রচুর খরচ করা অপরিহার্য। সহৃদয় জনসাধারণের দানের উপরই ঐ তহবিল নির্ভর করে। অতএব আর্ত নরনারায়ণের সেবার জন্য আমরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহায়তা প্রার্থনা করি। নিম্নোক্ত ঠিকানাগুলিতে সাহায্য সাদরে

গৃহীত হইবে—(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়মঠ (হাওড়া) (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ (৩) ম্যানেজার অদ্বৈত আশ্রম, ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৩

(স্বাঃ) **স্বামী মাধবানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীমাঁ সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত শ্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী-গ্রন্থ 'শ্রীমা সারদা দেবী' নামক বাঙ্গলা পুস্তকের সচিত্র হিন্দী সংস্করণ। অনুবাদ করিয়াছেন এলাহাবাদের অধ্যাপক জয়রাম মিশ্র, এম্-এ, এম্-এড্, সাহিত্যরত্ন এবং পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির অধ্যাপক ভুবনেশ্বর ঝা, সাহিত্যভূষণ, সাহিত্যরত্ন। অনুবাদ-গ্রন্থটির সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী। হিন্দী ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশের বিস্তারিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। পৃষ্ঠা—৬০০; মূল্য ৬॥০ টাকা। প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম ; ৪, ওয়েলিংটন্ লেন, কলিকাতা-১২।

The Disciples of Sri Ramakrishna—(সুসম্পাদিত এবং পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫ জন সন্ন্যাসি-শিষ্য (স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত), ৯জন পুরুষ-ভক্ত এবং ৬ জন মহিলা-ভক্তের ইংরেজি ভাষায় লিখিত জীবন-কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং আলোচিত শিষ্য ও ভক্তগণের হাফটোন ছবি সম্বলিত। পৃষ্ঠা—৫০৬+১৮ ; মূল্য—৬॥০ টাকা।

ধর্মঃ—স্বামী আগমানন্দ প্রণীত ; সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তথ্যবহুল চিন্তাপূর্ণ ৫টি নিবন্ধের সংগ্রথন। পৃষ্ঠা—৮০ ; মূল্য—১৲ টাকা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, কালাড়ি, (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন)।

প্রার্থনা ও সঙ্গীত—(পরিবর্ধিত সংস্করণ) বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত স্তব, বৈদিক প্রার্থনা এবং দেবদেবীর ভজনাদির সংগ্রহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের উপাসনা-অভ্যাসের বিশেষ উপযোগী। বেলুড় মঠের বিখ্যাত শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনও প্রাঞ্জল অর্থসহ বইটিতে সংযুক্ত হইয়াছে। অনেকগুলি বন্দনা-গীতির স্বরলিপিও সম্বলিত। পৃষ্ঠা—১১৮ ; মূল্য—১৲ টাকা। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় সংস্কৃতশিক্ষা-পরিষদ্—এইবার পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃতশিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষা-ফলে অনেকগুলি অবধানযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ—একজন জার্মান ছাত্র হের ক্লাউস ক্যামান সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব স্বাধীন ভারতে সর্বজন সম্মুখে সুপ্রকট করিয়াছেন। এই ছাত্র বিগত বৎসরে পরিষদের নাগপুর-কেন্দ্র হইতে পরিষদের কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছাত্ররূপে পরিষদের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ, সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এবং পরিষদের সাংখ্যতীর্থ উপাধি লইবার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে পড়াশুনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজন মুসলমান ছাত্রও এবার পরিষদের সংস্কৃত পরীক্ষা পাশ করিয়া

ভারতের হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, ভারতের মাতৃজাতির মধ্যে গরীয়সী কয়েকজন পরিষদের আগু, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হইতে দশম স্থানের মধ্যে কতিপয় স্থান অধিকার করিয়া ভারতীয় মাতৃজাতির গৌরব বিবর্ধন করিয়াছেন।

বিশিষ্ট গ্রামসেবকের লোকান্তর—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীগুণেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী রক্তের চাপবৃদ্ধি ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ গ্রে-ষ্ট্রীট-ভবনে গত ২২শে শ্রাবণ, '৬২ (৭ই আগষ্ট, '৫৫) বেলা ১টার সময় মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে অগ্রণী ছিলেন। দুঃস্থ নরনারীর সেবা তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। পরলোকগতের আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

স্মরণে শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং বেলুড় মঠের প্রাচীন ভক্ত, অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল গত ১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৫), রবিবার তাঁহার কলিকাতা সিঁতির বাসভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনুকূল বাবুর গভীর ধর্মানুরাগ, নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য, তথা. দৃঢ় চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে বহুজনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়াছিল। কর্মজীবনে নানা স্থানে ভ্রমণব্যপদেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করিতেন। অবসর লইবার পরও নানাস্থানে তাঁহার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিত। বিদ্যাচর্চা, বিশেষতঃ ভাষাশিক্ষায় অনুকূল বাবুর প্রখর অনুরাগ ছিল। তিনি ফার্সি ও তিব্বতী ভাষাও জানিতেন। জগদম্বার অভয় চরণে প্রার্থনা, এই ধর্মপ্রাণ ভক্তের দেহবিমুক্ত আত্মা যেন বাঞ্ছিত শান্তি লাভ করে।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-বি, এল্-আর-সি-পি, এম্-আর-সি-এস্, ডি-এম্-আর-ই মহাশয়ের দেহত্যাগে (১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৫) বাঙ্গলার একজন কৃতী চিকিৎসক ও সমাজসেবী এবং বেলুড় মঠের একজন আন্তরিক বন্ধু ও ভক্তের অভাব ঘটিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজ)—পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ কালে বালক পরেশ চন্দ্র তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তৎপর কলিকাতায় ছাত্রজীবনের সময় মিশনের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয় ও এই নিবিড়তা শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। আদর্শবাদী নির্ভীক যুবকের মন স্বভাবতই মিশনের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ করিয়াছিল। ব্যাবহারিক জীবনের পিছনে ব্যক্তিগত জীবনই মানুষের প্রকৃত পরিচায়ক। সতত সত্যান্বেষী আদর্শবাদী পরেশ বাবু সমগ্র কর্মজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যথেষ্ট অসুবিধা ও নিগ্রহ ভোগ করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন তৃপ্ত ও গরীয়ান্ ছিল। পরলোকগতের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার উর্ধ্বগতি বিধান করুন ইহাই প্রার্থনা।

ভ্রমসংশোধন—এই সংখ্যার ৫১৫ পৃষ্ঠায় বাম স্তম্ভের ৯ম লাইনে '২৬ মিঃ' স্থলে '২৪ মিঃ' এবং ১০ম লাইনে '৫২ মিঃ'র পরিবর্তে '৪৮ মিঃ' পড়িতে হইবে।

উদ্বোধন

প্রকৃত তীর্থ কি?

সত্যতীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থানাং সত্যবাদিতা॥
জ্ঞানতীর্থং তপস্তীর্থং কথিতং তীর্থসপ্তকম্।
সর্বভূতদয়াতীর্থে বিশুদ্ধির্মনসো ভবেৎ॥
ন তোয়পূতদেহস্য স্নানমিত্যভিধীয়তে।
স স্নাতো যস্য বৈ পুংসঃ সুবিশুদ্ধং মনো মতম্॥

স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড-অযোধ্যামাহাত্ম্য, ১০।৪৬-৪৮

মহামুনি অগস্ত্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে অযোধ্যা-তীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

[তীর্থসেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনের নির্মলতা, কেননা মন নির্মল না হইলে ভগবদ্ভক্তি এবং আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। বাহিরের তীর্থদর্শন ও তীর্থকৃত্য তো সহজ, উহা সকলেই করিতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে সাতটি তীর্থ আছে, সেই তীর্থগুলিতে যে পৌঁছিতে ও অবগাহন করিতে পারে তাহারই তীর্থযাত্রা সার্থক।]

সেই সাতটি তীর্থের প্রথম তীর্থ হইল সত্য—যাহা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় তাহাকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করা। দ্বিতীয় তীর্থ ক্ষমা, তৃতীয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া রাখা। চতুর্থ মানসতীর্থের নাম সর্বভূতে দয়া, পঞ্চম সত্যবাদিতা, ষষ্ঠ জ্ঞানানুশীলন আর সপ্তম হইল তপস্যা। সকল জীবে দয়া বিশেষ ভাবে মনের নির্মলতা সম্পাদন করে। বাহিরের তীর্থে স্নান করিলে শরীর পরিষ্কার হইতে পারে কিন্তু মনে যদি বিষয়বাসনা রহিয়া যায় তাহা হইলে ঐ তীর্থস্নান সার্থক হইল না। যে ব্যক্তির চিত্ত সুবিশুদ্ধ সেই ব্যক্তিকেই বলিতে পারা যায় যথার্থ 'স্নাত'।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধুগণকে আমরা আমাদের শুভ ৺বিজয়ার প্রীতি ও মঙ্গলকামনা জ্ঞাপন করিতেছি। জগজ্জননী আমাদের সকলের সঙ্কল্প, উদ্যম ও চেষ্টা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনায় নিয়োজিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক

লৌকিক রাষ্ট্র—'সেকুলার স্টেট্' সংজ্ঞাটির অর্থ ইহা নয় যে ঐ রাষ্ট্রে ইহকালসর্বস্বতা ও নাস্তিকতাই রাষ্ট্রবাসীর জীবন-দর্শন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় (*সর্বভারতীয় ৩৯তম শিক্ষা-সম্মেলনের উদ্বোধনী* বক্তৃতা, দিল্লী, ২৫।১২।৫৪) "ইহার তাৎপর্য শুধু এই যে, এইরূপ রাষ্ট্রে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কে ধর্মীয় অত্যাচার ও গোঁড়ামির কোন স্থান নাই। মানুষ মানুষের প্রতি যেন ধর্ম লইয়া সহিংস অসহিষ্ণুতা এবং উন্মত্ত ঘৃণা পোষণ না করে। একটি শান্ত এবং সুসমঞ্জস জীবনরীতি এবং যথার্থ মানবিকতার অনুকূল একটি আবহাওয়া আমরা সৃষ্টি করিতে চাই।" উপরাষ্ট্রপতি নিশ্চিতই তাঁহার পদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, অতএব তাঁহার এই উক্তি যে তাঁহার নিছক ব্যক্তিগত মনোভাব নয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিরই অভিব্যঞ্জক ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ভারতের 'রাষ্ট্রকর্ণধারগণের আরও অনেকে বহুবার কথাপ্রসঙ্গে লৌকিকরাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি চল্‌তি ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লৌকিক রাষ্ট্রে বাস করিতে গেলে জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য দেওয়া চলিবে না বা কমাইয়া রাখিতে হইবে ইহা একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ উপরোক্ত বক্তৃতারই একস্থানে বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক এবং মানসিক স্বচ্ছতা ও সংস্কৃতি ব্যতীত প্রকৃত সুখলাভ অসম্ভব।"

বস্তুতঃ 'লৌকিকে'র সহিত 'আধ্যাত্মিক'-এর কোন বিরোধ নাই, বিরোধ আছে 'আধ্যাত্মিকতা'র মুখোশে সাম্প্রদায়িকতার ও একদেশিতার। ভারতবর্ষের জাতীয় একতার ঘোর অনিষ্টসাধক ভাল মানুষের মুখোশ পরিহিত এই শক্তিদ্বয়কে যত শীঘ্র নিস্তেজ করা যায় ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভারতরাষ্ট্রের 'সেকুলার'ত্ব ঘোষণায় জাতীয়তার পরিপন্থী ঐ অকল্যাণকর শক্তিদ্বয় বেশ খানিকটা ভয় পাইয়া থমকাইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

যে অর্থে আমরা বলি 'হিন্দু', 'মুসলমান', 'খ্রীষ্টান', 'বৌদ্ধ' সেই অর্থে 'আধ্যাত্মিক' শব্দেরও ব্যবহার করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিকতা কোন বিশেষ ধর্মমত নয়। উহার প্রকৃত অর্থ মানুষের আত্মিক সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা। মানুষ শুধু দেহ নয় বা দেহ-মন-প্রাণের সমবায় নয়। মানুষের অস্তিত্বের গভীরে রহিয়াছে তাহার চৈতন্যসত্তা বা আত্মা—যাহা জন্মহীন, মৃত্যুহীন, সর্ববাধানির্মুক্ত ভূমা। যে মানুষ তাহার এই আন্তর সত্তা সম্বন্ধে যত বেশী সচেতন সে তত অধিক 'আধ্যাত্মিক'। পক্ষান্তরে যাহার ভিতর এই আত্মোপলব্ধি দেখা দেয় নাই সে মন্দির-মসজিদ- গির্জা-প্যাগোডার সকল অনুষ্ঠান সারাজীবন ধরিয়া আচরণ করিলেও নিশ্চিতই 'আধ্যাত্মিক' সংজ্ঞা দাবি করিতে পারে না। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এক কথা নয়। প্রথমটি মানুষের একদেশ, মানব-সমাজের একদেশ লইয়া চলে, দ্বিতীয়টির লক্ষ্য সমগ্র মানুষকে লইয়া চলা, মানব সমাজের সকলকে আলিঙ্গন করা।

মানুষ যখন নিজের আত্মিক সত্যের আবিষ্কার করে তখন তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা অত্যদ্ভুত। উহা মানুষের ব্যক্তিত্বকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধি হইতে সীমাহীন বৃহতে লইয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই মানুষকে তখন বলিতে পারি—

"হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশ দিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।"

সেই আত্মদ্রষ্টা মানুষ হয়তো হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান বা জৈন বা বৌদ্ধ কিন্তু উহা তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ঐ ঐ ধর্মীয় সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিতে গেলে আমাদেরই বুদ্ধি যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

'আধ্যাত্মিক' মানুষই যথার্থ মানব-দরদী, কেননা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ মূল্য তিনিই জানেন। মানুষের দেহের মূল্য যদি এক পয়সা হয় তো প্রাণের মূল্য দশ পয়সা আর মনের সম্ভবতঃ বিশ পয়সা, কিন্তু মানবাত্মা অমূল্য। আধ্যাত্মিকতায় যখন কেহ সুপ্রতিষ্ঠ হন তখন শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতার ভাষায় তিনি—

"সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখেন, নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বজগৎকে দেখেন। সর্বত্র তাঁহার আসে এক উদার সমদৃষ্টি। অপরের সুখে তিনি সুখী অপরের দুঃখে তিনি দুঃখী।" (গীতা ৬।২৯,৩২) আধ্যাত্মিক মানুষ হইতে মানুষের অনিষ্টকর কোন চিন্তা বা কার্য কখনও বাহির হইতে পারে না। তিনিই প্রকৃত সমাজসেবী। আবার রাষ্ট্রের কার্যও যখন এমন মানুষের উপর ন্যস্ত হয় তখন রাষ্ট্র হয় আদর্শ কল্যাণ-রাষ্ট্র।

আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে লৌকিক রাষ্ট্রের যে আদর্শ ভারতের উপরাষ্ট্রপতির মুখে আমরা শুনিলাম ঐ আদর্শকে বাস্তব এবং জীবন্ত করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন তো আধ্যাত্মিকতাই। উপরাষ্ট্রপতির উক্তির "একটি শান্ত এবং সুসমঞ্জস জীবনরীতি এবং যথার্থ মানবিকতার অনুকূল আবহাওয়া" কে সৃষ্টি করিবে? শান্তি, সামঞ্জস্য ও মানবিকতার যথার্থ তাৎপর্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তিনিই তো। আমাদের মতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষই সেই ব্যক্তি। অতএব 'সেকুলার' রাষ্ট্রের সংহতিরক্ষার জন্যই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের তরফ হইতেই যদি এই অনুশীলনের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে 'সেকুলার' রাষ্ট্রের নীতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। আধ্যাত্মিকতা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ* সকলেরই প্রয়োজন, উহা কোন বিশেষ ধর্মমতের কল্পনা বা কৃত্য নয়—উহা মানব-সাধারণের জীবন-বিজ্ঞান। বেদে, বাইবেলে, কুর্‌আনে, আজকালকার বিজ্ঞানের কত কথাই তো নাই কিন্তু কোন্ পুরোহিত মোল্লা, পাদ্রী ভিক্ষুর ঐসব বৈজ্ঞানিক ঘোষণাকে অস্বীকার করিবার ভরসা আছে? আত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'সেকুলার' স্টেট যদি সাহিত্য-কলা-সঙ্গীতের পরিপ্রসারের জন্য সক্রিয় চেষ্টা রাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী

* শ্রীরামকৃষ্ণ কি শুধু 'হিন্দু' ছিলেন? অথবা বৈষ্ণব, শাক্ত বা নিরাকার উপাসক মাত্র? মুসলমান এবং খ্রীষ্টানগণ কি একাধিক ক্ষেত্রে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই? শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব 'ধর্মীয়' সীমার ঊর্ধ্বে 'আধ্যাত্মিক'কে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি কবির কল্পিত 'মহাপথিক' হইতে পারিয়াছিলেন। এই মাসেরই উদ্বোধনে ৬১৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের একটি ঘটনার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

* 'সর্বমনাত্মম'—বৌদ্ধধর্মের এই কাল্পনিক প্রতিজ্ঞা (imaginary hypothesis) 'আত্মৈবেদং সর্বম্'—এই উপনিষদ্ সিদ্ধান্ত দ্বারা সংশোধিত হইবার দিন সমাগত।

মনে না করিতে পারেন এবং তাহাতে যদি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান কাহারও কোন ধর্মীয় আপত্তি না উঠে তাহা হইলে আত্মবিজ্ঞানের আলোচনা অভ্যাস ও প্রচার রাষ্ট্রেরই একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে রাষ্ট্রের কোন কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়।

ধর্মের নানা সংজ্ঞা নানা সময়ে নানা সুধী দিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটি মানব-প্রকৃতির গভীর বিশ্লেষণের কথা ইঙ্গিত করে, অর্থাৎ ধর্ম মানুষের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া কোন জিনিস নয়, মানুষের প্রকৃতিরই মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকা কোন বস্তু। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এই ভাবটি অতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। "মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের নাম ধর্ম।" ধর্মের কাজ মানুষকে বিকাশ করিয়া চলা—তাহার দেব-প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ। এই সংজ্ঞায় ধর্মের ধারণা কোন সাম্প্রদায়িকতা বা মতবাদের গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া একটি সার্বজনীন সিদ্ধান্তের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ধর্মের এই প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াই তো ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা ও বিভেদের সৃষ্টি হয়। ধর্মের নিগূঢ় মর্ম যে আধ্যাত্মিকতা ইহারও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোক যদি ধর্মকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষকে লৌকিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবারও হয়তো প্রয়োজন উঠিত না। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকে এই উদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উন্নীত করিবার পথে বিপুল বাধা সম্প্রদায়গত ধর্মের বহু শিক্ষা ও রীতি-নীতির মধ্যেই বর্তমান। উহাদের পরিবর্জন ও পরিবর্তন সহজ কথা নয়, বাহিরের চাপে তো হইবার নয়ই। অতএব উপায়, সমান্তরাল ভাবে ধর্মের মর্ম—আত্মবিজ্ঞানকে শারীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় 'বিজ্ঞান' হিসাবে অনুশীলন ও প্রচার করা। ঐ প্রচারের ফলে হয়তো একদিন সম্প্রদায়গত ধর্মের চিন্তাশীল সুধীগণ আত্মোপলব্ধিতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবেন এবং নিজেদের ধর্মের মধ্যে সুসমঞ্জস বিশ্ব-মানবতার প্রতিকূল অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, বিভেদের যে সম্ভাবনাগুলি বহুশতাব্দীর পৌরোহিত্য ও অন্ধবিশ্বাসের দরুণ সঞ্চিত হইয়াছে সেগুলি দূর করিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন। সেই শুভদিনে হয়তো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 'লৌকিক' ও 'ধর্মীয়' এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োজন ফুরাইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের সময়ে একদিন যাহা বাস্তব হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীসে মনীষী প্লেটো যাহার কিছুটা কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই ধরনের শান্তি, সামঞ্জস্য ও মানবিকতার অনুকূল রাষ্ট্রে আমরা তখন বাস করিতে পারিব। উহাকে লৌকিকও বলিতে পার, ধর্মীয়ও বলিতে পার, উহা লৌকিক-ধর্মীয়ের দ্বন্দ্বনির্মুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র।

প্রচারকের দায়িত্ব

জনৈক উৎসাহী হিন্দুধর্মপ্রচারকের শিক্ষা ও প্রচার সম্বন্ধে একটি পত্র আমাদের নিকট আসিয়াছে। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"তিনি দেবদেবী মানেন না। সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথবাড়ী ও শিবসহ কালীবাড়ী যাহা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই পাহাড়ের সনাতন ধর্মকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল উহাদের প্রতি বক্তৃতাকালীন কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। গেরুয়ার প্রতি ভীষণ আক্রমণ ছিল তাঁহার বক্তৃতার এক প্রধান অংশ। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে মায়ের নিকট প্রার্থনা 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' পাঠে নাকি আমাদের মন নিম্নগামী হইতেছে। তিনি বলেন, দেবদেবীর পূজার্চনাতেও মনের উন্নতি না হইয়া অবনতি হয়, যেহেতু ব্রহ্ম অনন্ত।"

পত্রোক্ত প্রচারকের উদ্দেশ্য হয়তো সাধু কিন্তু তাঁহার প্রচারপ্রণালী যে দায়িত্বহীন তাহা আমরা বলিতে বাধ্য। হিন্দুধর্মে নিরাকার উপাসনার কথা আছে আবার দেবদেবীর উপাসনার কথাও

আছে। লক্ষ লক্ষ লোককে সাকার উপাসনার মাধ্যমেই ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে হয়। তাহাদিগের নিকট কালী এবং জগন্নাথের নিন্দা করিলে তাহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" (গীতা, ৩।২৬)

করিবে না জ্ঞানতত্ত্ব কহিয়া কেবল
কর্মাসক্ত নির্বোধের বুদ্ধি বিশৃঙ্খল;
আপনি করিয়া কর্ম জ্ঞানিজন ভবে
করিবেন কর্মে রত অজ্ঞান মানবে।

(কুমারনাথ সুধাকর কৃত পদ্যানুবাদ)

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একদিনকার কথোপকথনের (কলিকাতা, শ্যামপুকুর, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৮৫) কয়েকটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়।

সামাধ্যায়ী লেক্‌চার দিলে। বলে,—ঈশ্বর বাক্যমনের অতীত—তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর; ত্মাখো, যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলছে। এ লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়? একজন বলেছিল—আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে! গোয়ালে আবার ঘোড়া! (সকলের হাস্য)। তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া নাই!

ডাক্তার (সহাস্যে)। গরুও নাই। (সকলের হাস্য)"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ৫ম পরিচ্ছেদ

যিনি পূর্বোক্ত পত্রটি লিখিয়াছেন তাঁহাকে আমরা যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ "হে ভগবান, আমার বন্ধুদের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা কর।" —স্মরণ করিয়া লোকবুদ্ধিবিভ্রমকারী ঐ সকল প্রচারকের নিকট হইতে দূরে থাকিবার পরামর্শ দান করি।

জীবন-যজ্ঞ

আচার্য বিনোবা ভাবে অন্ধ্র রাজ্যের গুণুপুর নামক স্থানে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহার ষাট বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্তি উপলক্ষ্যে সহকর্মিগণের অভিনন্দনের উত্তরে বলেন—"যজ্ঞহীন জীবন অসার ও ব্যর্থ।" জনগণের কল্যাণের জন্য নিষ্কামভাবে যদি সেবার কাজ নিষ্পন্ন করা হয় উহা এক পবিত্র যজ্ঞ-বিশেষ এবং এই যজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার দৈনন্দিন অবশ্য করণীয় ধর্মকৃত্যের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত আচরণ করুক এই কথাই স্পষ্টত বিনোবাজী বলিতে চাহিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞের যে ধারণা ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাকে "ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ"—অর্থাৎ 'জীবগণের শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলজনক ত্যাগস্বীকার'-রূপ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া মানুষের সম্মুখে সমাজসেবার একটি বৃহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষা বর্তমান কালে বিশেষ করিয়া আলোচনা ও অভ্যাস করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বলিয়া গিয়াছেন। "ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবা"—স্বামীজীর এই বাণী নিত্য আমাদের স্মরণীয়। এই বাণী নিজেদের জীবনকে একটি বৃহৎ যজ্ঞরূপে ধারণা করিবার প্রেরণা আমাদিগকে দেয়। শুধু নিজের ও নিজের পরিবার-বর্গের সুখের জন্য যদি পরিশ্রম করি তো উহা মাত্র স্বাভাবিক আসক্তিমূলক কর্ম। উহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত আমার মায়িক সম্পর্ক নাই তাহাদিগকেও আপনার ভাবিয়া তাহাদের কষ্টমোচনের জন্য যদি খাটিতে পারি তো আমার কর্ম যজ্ঞপর্যায়ে উন্নীত হইবে। উহার আধ্যাত্মিক মূল্য বিপুল। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তাঁহার একনিষ্ঠ অনুগামী বিনোবাজী নিষ্কাম জনসেবার মহান আদর্শ পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করিতেছেন। আমরা বিনোবাজীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

"চায়না—চায়না—চায়না"

দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কতকগুলি বড় রাস্তার উপরে এবং মোড়ে সোনার জলে লেখা চিত্তাকর্ষক বৃহৎ সাইনবোর্ডগুলির সংখ্যা একটি দুটি করিয়া

ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে—"চায়না—চায়না—চায়না" (CHINA—CHINA—CHINA) —চীনা ডাইং ক্লিনিংএর দোকান। দোকানে ঢুকিলেই চোখে পড়ে অতি পরিপাটিভাবে সাজানো পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, কাউণ্টারে চীনা মহিলা-কর্মচারী অতি মিষ্ট ভাষায় খরিদ্দারগণের সহিত লেন দেন করিতেছেন। এই দোকানগুলির সংখ্যা আগামী দুই বৎসরে যে আরও অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার গরীব বাঙালী ডাইয়িং ক্লিনিংএর বিপণিগুলি কমিয়া আসিবে তাহাতে সম্ভবতঃ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঘটনাটির আন্তর্জাতীয়তা কলিকাতাবাসীর নিশ্চিতই গৌরবের বিষয়, তবে উহা যে জীবন-সংগ্রামে বাঙালীর একটি নূতন পরাজয়ের দ্যোতক তাহা অস্বীকার করা যায় কি? আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তিনি হয়তো অন্তর্নিরুদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন। আচার্য রায়ের দেশহিতৈষণা, চরিত্রবল এবং কর্মোদ্যম অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মহাত্মা গান্ধীকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছিল এবং এই নিঃস্বার্থ দেশ-সেবককে দেখিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির উপর বার বার মহাত্মাজী তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন (পুরাতন Young India পত্রিকায় তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে)। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা ও জনসেবানিষ্ঠ জীবন নিশ্চিতই ছিল সর্বভারতীয়, তথাপি তিনি বাঙালী জাতির জন্য বিশেষ করিয়া ভাবিতেন। বার বার বাঙালী যুবকগণকে সাবধান করিয়া দিতেন আলস্য ও শ্রমকুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া শিল্প, বাণিজ্য ও নানাবিধ শারীরিক শ্রমে আত্মনিয়োগ করিতে, নতুবা আগামী কালে জীবনসংগ্রামে নিদারুণ ব্যাপক পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দূরদর্শী মনীষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইতেছে তাহার প্রমাণ অহরহই বাঙালী আজ চোখের সম্মুখে দেখিতেছে। "চায়না—চায়না—চায়না" একটি নূতনতম প্রমাণ। সম্প্রতি দৈনিক বসুমতীতে কবিশেখর কালিদাস রায় একটি কবিতায় বাঙালীর এই পরাজয়ের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যঙ্গ কবিতা—কিন্তু মনে হয় মর্মভেদী বেদনার তপ্ত অশ্রু দিয়া লেখা। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"এই বাঙ্গালার মহাভারতের সাগর-তীরে
উদার ছন্দে বন্দি উদর-দেবতাটিরে।
উড়িষ্যা হইতে এসেছে উড়িয়া
বসেছে রান্নাঘরটি জুড়িয়া
নল পাতিতেছে রাস্তা খুঁড়িয়া এই শহরের বক্ষ চিরে।
এই বাঙ্গালার মহাভারতের সাগর-তীরে॥

এলো মাদ্রাজী গণিতে শাণিত জোরালো কলম হাতে,
বিনা সুপারিশে আফিসে আফিসে সবলে আসন পাতে॥
বিহারী এসেছে লইয়া মহিষ,
তারাই রজক তারাই সহিস
টানিছে রিক্স, শহরের বিষ তাদেরই মেথর বহিছে শিরে।
এই বাঙ্গালার মহাভারতের সাগর-তীরে॥

এসেছে হেথায় যুক্তপ্রদেশ হইতে যাহারা আজ
তারাই রক্ষী সারথি সিপাহী করে প্রহরীর কাজ।
পঞ্জাব হ'তে এসেছে যাহারা
যান-বাহনের মালিক তাহারা
ইয়া প্রকাণ্ড বিরাট চেহারা শহর কাঁপায়ে তাহারা ফিরে।
এই বাঙ্গালার মহামানবের সাগর-তীরে॥

নেপাল হইতে এসেছে গুরখা সেলাম বাজাই তারে।
ভুজালি-কোমরে পথরোধ করে ধনীদের দ্বারে দ্বারে।
রাজপুতনার যত কারবারী
যাহাদের লোকে বলে মাড়োয়ারী
তাহাদেরি যত পাঁচতলা বাড়ী সারাটি শহর রেখেছে ঘিরে।
এই বাঙ্গালার মহাভারতের সাগর-তীরে॥

আসিতে উদর-দেবতার ডাকে নাই হেথা কারো মানা,
গোস্তের সাথে দোস্তি করেছে ভাত রুটি ছাতু চানা।
হিন্দী উর্দু তেলেগু নেপালী
বাংলার সাথে করেছে মিতালি,
ডুবিছে কেবল বেকুব বাঙ্গালী মহামানবের গহন ভিড়ে।
এই বাঙ্গালার মহামানবের সাগর-তীরে॥"

স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতা যে সর্বতোভাবে

নিন্দনীয় ইহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে ইহাই আজিকার ভারতবাসীর সর্বজনীন আদর্শ। তবে কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের আরামপ্রিয়তা, শ্রমকুণ্ঠা এবং উদ্যম, অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও কর্মতৎপরতার অভাব থাকা উচিত নয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বাঙালীকে ইহাই বলিতে চাহিতেন এবং কবি-শেখর কালিদাস রায়েরও কবিতার লক্ষ্যও বোধ করি ইহাই।

গণতন্ত্রের বনিয়াদ

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু উহার বনিয়াদের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য এখনও যে অনেক কাজ করিবার বাকী তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধানতম কাজ হইল যাহাদের লইয়া এবং যাহাদের জন্য 'তন্ত্র' সেই 'গণ'কে সুশিক্ষিত করা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহর লাল নেহরু তাঁহার 'ভারত-আবিষ্কার' (Discovery of India) নামক গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে নানাস্থানে জনগণের সভায় তিনি সকলের জয়ধ্বনি শুনিতেন, 'ভারতমাতাকী জয়।' একবার এইরূপ একটি সভায় পণ্ডিতজী শ্রোতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করিলেন, এই জয়ধ্বনির অর্থ কি? ভারত মাতা কে? হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া সকলে আমোদ অনুভব করিতেছিল, অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন উত্তর নাই। অবশেষে একটি বলিষ্ঠ জাঠ কিষাণ উঠিয়া বলিল, ভারত মাতা বলিতে ধরিত্রী—ভারতবর্ষের শস্যশ্যামলা মাটি। পণ্ডিতজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ মাটি? তাহাদের নিজেদের গ্রামের বা জেলার বা প্রদেশের মাটি, না সমগ্র ভারতবর্ষের মাটি? তাহারা তাহাদের মত কিছু উত্তর দিল। আরও কিয়ৎক্ষণ প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পর নেহরু শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইলেন—ভারতের পর্বত, অরণ্য, শস্যক্ষেত্র এ সবই ভারতবর্ষ এবং আমাদের ভালবাসার বস্তু, কিন্তু ভারতবর্ষ ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু। এই বিশাল দেশের সর্বত্র যে জনগণ ছড়াইয়া রহিয়াছে আথেরে তাহারাই তো আমাদের মনোযোগের বিষয়। ভারতমাতা অর্থে ভারতের এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসিবৃন্দ—ভারতমাতার জয় মানে এই জনগণের জয়। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে—

> "শাসন-সংসদে কোনও বিশেষ বিধান প্রবর্তন করার উপর কোনও রাষ্ট্রের মহত্ত্ব বা শক্তিমত্তা নির্ভর করে না, উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণকর ও মহৎ চরিত্রের উপর। পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদের অপেক্ষা খাঁটি মানুষের মূল্য অনেক বেশী।"

দেশের কল্যাণকর বহুবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে জনগণের শিক্ষার প্রতি সর্বাগ্রে সবিশেষ মনোযোগ না দিলে কোন প্রচেষ্টাই সম্যক সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। গত ৫ই অক্টোবর ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (Indian Council of Economic affairs) বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ডক্টর জন্ মাথাইও এই বিষয়টিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

> "গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে বিশাল জনসঙ্ঘকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই লিখিতে পড়িতে জানে না। ফলে, তাহারা নানাপ্রকার প্রভাবের বশবর্তী হইতে পারে। আমাদের সরকারকে যদি দৃঢ় রাখিতে হয় তাহা হইলে মানুষে মানুষে বিরাট ধনবৈষম্য দূর করিয়া জনগণের জীবন ও শিক্ষার মান বাড়াইবার জন্য অবহিত হইতে হইবে।"

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীধেবর তাঁহার একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় (ব্যাঙ্গালোর, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৫) গণতন্ত্রের বনিয়াদ যে গণশিক্ষার উপর তাহা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আজ দেশের বৃহত্তম সমস্যা হইল দেশবাসীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক আদর্শকে গণতন্ত্রের অনুকূল করিয়া তৈরী করা।

রাজনৈতিক স্লোগান, পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা, বাগ্মিতা—এই সকলের দ্বারা অশিক্ষিত জনগণকে তাক লাগাইয়া তাহাদের ভোট সংগ্রহ করা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের শক্তি বাড়ে না। দেশকে যাঁহারা যথার্থ ভালবাসেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেন তাঁহারা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করুন বা না করুন জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কার্যে তাঁহাদিগকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ। এই দিকে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এবং ছাত্রছাত্রীদিগেরও করিবার অনেক কিছু আছে। রাজনীতিতে যোগদান না করিয়া দেশের গঠনমূলক কাজে যথাসাধ্য সময় ও শক্তি দিবার আহ্বান ছাত্রছাত্রীগণকে মাঝে মাঝে কোন কোন নেতা জানাইয়া থাকেন। (যথাঃ—ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু ৯ই অক্টোবর, '৫৫, কলিকাতার ওয়েলিংটনস্কোয়ারে একটি ছাত্রসভায়—

"ছাত্রছাত্রীগণ রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ হইতে দূরে থাকিয়া দেশের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ৮ই অক্টোবর, '৫৫, আমেদাবাদে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে—

"দেশের যুবসমাজকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করিয়া তুলিতে হইলে তিনটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই তিনটি পন্থা হইল—কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সত্যকারের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এবং আরও বেশী করিয়া পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যাবলীর প্রবর্তন।")

শ্রীকাটজুর উক্ত 'দেশের পুনর্গঠনের কাজ' বা ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উল্লিখিত 'পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যাবলী'র মধ্যে আমাদের মতে জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজই ছাত্রসমাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইহাতে উত্তেজনা নাই, দলাদলি নাই, ছাত্রগণের নিয়মিত দৈনন্দিন জীবনধারারও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই। সামর্থ্যানুযায়ী সপ্তাহে এক বা দুই তিন দিন অথবা প্রত্যহ কিছু সময় ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে বাড়ীর কাছেই অশিক্ষিত জনগণের নিকট শিক্ষার কিছু আলোক পৌঁছিয়া দিবার সুযোগ তরুণরা পাইতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ যুবকগণকে বলিয়াছিলেন—

"ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত নর-নারীকে বঞ্চিত করিয়া যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারা উহাদের কল্যাণ সম্বন্ধে যতদিন একান্ত উদাসীন হইয়া আছে ততদিন তাহাদের প্রত্যেককেই আমি দেশদ্রোহী মনে করি।"

জীবনহেমন্তে—

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

যা ছিল মোর বিলিয়ে দেছি নির্বিচারে।
আপনপরে বইল ঘরে ভারে ভারে।
মোর স্বপনের ফাল্গুনী ফুল চৈৎবোশেখের ফল
প্রেমপিপাসার তপ্তশ্বাতুর কুলায় কল'কল
বিলিয়ে দেছি ব্যথার মেঘের পাথার আঁখিজল।
আর—শেষ শরতের স্মৃতির সোনা যারে তারে॥

এখন আমার শূন্য প্রভু, ঝোলাঝুলি
গোপন আমি করব না কই খোলাখুলি।
হেমন্তে এই শুষ্ক জরায় অঙ্গ টল'মল।
সঙ্গীতহীন কণ্ঠ এ 'চোখ' নিষ্প্রভ সজল।
তোমায় দিতে দেহে মনে নেই কোন সম্বল।
হোক—শূন্য হাতে তোমার সাথে কোলাকুলি।

ধ্যান

স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বে অপ্রকাশিত স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাঙ্কেতিক লিপিকার এবং অনুলেখিকা—আইডা আনসেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কথা ধরিতে পারেন নাই সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন—যথা...দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যেকার শব্দ বা বাক্য স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকার ১১২তম সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫) মুদ্রিত হইয়াছে।—উঃ সঃ]

সমস্ত ধর্মেই ধ্যান বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগীরা বলেন, ধ্যাননিয়ন্ত্রিত অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তুর অনুশীলনে রত থাকে তখন ইহা তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং নিজেকে হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মানুষের মন যেন এক খণ্ড স্ফটিকের মত, নিকটে যাহাই কিছু থাকুক, তাহারই রঙ ধারণ করে। অন্তঃকরণ যাহাই স্পর্শ করে······তাহারই বর্ণে ইহাকে রঞ্জিত হইতে হয়। ইহাই তো সমস্যা। ইহারই নাম বন্ধন। ঐ বর্ণ এত তীব্র যে স্ফটিক আপনাকে বিস্মৃত হইয়া বাহিরের বর্ণের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। মনে কর একটি স্ফটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে; স্ফটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে লাল রঙের বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। আমাদেরও অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া আমরা যে যথার্থ কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। (এই আদিম ভ্রান্তির) অনুগামী অপর সমস্ত দুঃখই আসে এই একটি অচেতন শরীর হইতে। আমাদের সর্ববিধ ভয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ এই একমাত্র মহাভ্রান্তি 'আমরা শরীর' হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্নিহিত পুষ্পের বর্ণানুরঞ্জিত স্ফটিকতুল্য এই জীব! কিন্তু স্ফটিক যেমন লাল ফুল নয় আমরাও তেমনি শরীর নই। ধ্যানাভ্যাসের অনুসরণ করিতে করিতে স্ফটিক জানিতে পারে নিজের স্বরূপ এবং আপন রঙে রঙিয়া ওঠে। অন্যান্য কোন বিষয় অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে সত্যের নিকটতর প্রদেশে লইয়া যায়···।

ধর, দুই ব্যক্তির দেখা হইল। ইংরেজীতে এক্ষেত্রে তাঁহারা বলিলেন, "কেমন আছেন?" কিন্তু ভারতীয় অভিবাদন লইল, "আপনি কি স্বস্থ?" যে মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত তুমি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে তোমার দুঃখ আসিবার সম্ভাবনা। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুঝি—আত্মার নিজের উপর দাঁড়াইবার প্রচেষ্টা। আত্মা যখন নিজের অনুধ্যানে ব্যাপৃত এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার তখনকার অবস্থাটিই নিশ্চিতরূপে সুস্থতম অবস্থা। ভাবোন্মাদনা, প্রার্থনা প্রভৃতি অপরাপর যে সব প্রণালী আমাদের রহিয়াছে সেগুলিরও চরম লক্ষ্য একই। গভীর কোন আবেগের সময়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। ঐ আবেগটি হয়তো উঠিয়াছে কোন বহির্বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কিন্তু মন সেখানে কেন্দ্রীভূত।

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বলা হয় (ধারণা)—একটি বস্তুর উপরে একাগ্রতা অভ্যাস। ধর, এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিব। এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সমস্ত বিষয় মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া শুধু ইহারই উপর মনঃসংযোগ করিতে

চেষ্টা করিতে হইবে। (ইহাই ধারণা) মনের আন্দোলন এই অবস্থায় থাকে। ··· (ইহার পর) মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত নড়াচড়া করে না তখনই ঐ অবস্থাকে বলা হয় ধ্যান। আবার ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছে, যখন গ্লাসটি ও আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্ময়তা)। তখন মন এবং গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যবোধ তখন থাকে না। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্মবিরত এবং যে সকল শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়াশীল হইতেছিল (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়)। তখন গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আসিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যোগিগণের অনুষ্ঠিত ইহা একটি প্রবল শক্তির খেলা।··· ধরা যাক্ বাহিরের বস্তু বলিয়া কিছু আছে। সেক্ষেত্রে যাহা বাস্তবিকই আমাদের বাহিরে রহিয়াছে তাহা, আর যাহা আমরা দেখিতেছি তাহা এক বস্তু নয়। যে গ্লাসটি আমাদের চোখে ভাসিতেছে সেটি নিশ্চয়ই আসল বহির্বস্তু নয়। গ্লাস বলিয়া অভিহিত বাহিরের আসল বস্তুটিকে আমি জানিও না এবং কখনও জানিতে পারিব না।

কোনও কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; তৎক্ষণাৎ আমি একটি প্রতিক্রিয়া জিনিসটির দিকে পাঠাইলাম। এই উভয়ের সংযোগের ফলে হইল 'গ্লাস'। বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া—'ক' এবং ভিতর হইতে উত্থিত প্রতিক্রিয়া—'খ'। গ্লাসটি হইল 'কখ'। যখন 'ক'-এর দিকে তাকাইতেছ তখন উহাকে বলিতে পার 'বহির্জগৎ', আর যখন 'খ'-এর দিকে দৃষ্টি দাও তখন উহা 'অন্তর্জগৎ'। ··· কোন্‌টি তোমার মন আর কোন্‌টি বাহিরের জগৎ এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে কোনই প্রভেদ নাই। জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কোন কিছুর সমবায়···।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে কর, তুমি একটি হ্রদের শান্ত বুকে কতকগুলি পাথর ছুঁড়িলে। প্রত্যেকটি নিক্ষেপের পরেই দেখা যায় একটি প্রতিক্রিয়া। প্রস্তরখণ্ডটিকে বেড়িয়া সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট ঢেউ উঠে। এইরূপেই বহির্জগতের বস্তুনিচয় যেন মনরূপ সরোবরে উপলরাশির মত নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জিনিস দেখি না······; দেখি শুধু তরঙ্গ··· ···।

মনে উত্থিত তরঙ্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। আমরা ভাববাদ (Idealism) ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের (Realism) (সারবত্তার) আলোচনা করিতেছি না। মানিলাম, বাহিরের জিনিস রহিয়াছে, কিন্তু যাহা আমরা দেখি তাহা বহির্দেশে অবস্থিত বস্তু হইতে ভিন্ন, কেননা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা বহিঃস্থিত বস্তু এবং আমাদের নিজেদের সত্তার একটি সম্মিলন।

মনে কর আমার নিজের প্রদত্ত অংশটুকু গ্লাসটি হইতে উঠাইয়া লইলাম। কি অবশিষ্ট রহিল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে। যদি আমি আমার নিজের 'প্রতিক্রিয়া' ভাগটি এই টেবিলটি হইতে সরাইয়া লই, টেবিলের আর কি থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না কারণ ইহা উৎপন্ন হইয়াছিল বহির্বস্তু ও আমার ভিতরকার 'প্রতিক্রিয়া' অংশটি লইয়া। (প্রস্তরখণ্ড) যখনই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, হ্রদ বেচারীকে তখনই উহার চারিপাশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে। যে কোন উত্তেজনার প্রতি মনকে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেই হইবে। ধর···আমরা যেন মন বশীভূত করিতে পারিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আমরা প্রভু হইব। আমরা বাহিরের ঘটনাসমূহের প্রতি আমাদের প্রদেয় অংশ দিতে অস্বীকার করিলাম···। আমি যদি আমার ভাগ না দিই, উহা থামিতে বাধ্য।

অনবরতই তুমি এই বন্ধন সৃষ্টি করিতেছ।

কিরূপে? তোমার নিজের অংশ দিয়া। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া আমাদের বন্ধন শয্যা রচনা করিতেছি··· । যখন বহির্বস্তু ও আমার মধ্যে তাদাত্ম্যবোধ থামিয়া যাইবে তখন আমি আমার (প্রতিক্রিয়া) ভাগটি তুলিয়া লইতে পারিব এবং বস্তুও বিলুপ্ত হইবে। তখন আমি বলিব "এখানে এই গ্লাসটি রহিয়াছে", আর আমি আমার মনটিকে উহা হইতে উঠাইয়া লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটিও অদৃশ্য হইবে···। যদি তুমি তোমার অংশ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হও তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে পারিবে। জল আর তোমাকে ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকার কষ্টও থাকিবে না। প্রত্যেক দৃশ্যমান বিষয়ে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ। যদি তোমার অর্ধভাগ সরাইয়া লওয়া যায় তো দৃশ্যমানের বিলুপ্তি ঘটিবে।···প্রত্যেক কারণেরই আছে সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া··। যদি কোন লোক আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয়—ইহা সেই লোকটির কায এবং (বেদনা) আমার শরীরের প্রতিক্রিয়াজনিত··। মনে কর আমার শরীরের উপর আমার এতটা প্রভুত্ব আছে যে আমি ঐ স্বয়ংচালিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। এইরূপ বল কি অর্জন করা যায়? গ্রন্থ (যোগশাস্ত্র) বলে, যায়···। যদি তুমি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কিছু লাভ কর তখন বলিয়া থাক 'অলৌকিক' ঘটনা। আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা কর, তখন উহার নাম 'যোগ'।

মানসিক শক্তির দ্বারা লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিয়াছি। উহা 'অলৌকিক কর্মী'র কাজ। আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, "না হইতেই পারে না, ইহা কেবল তাঁহার মনের শক্তি প্রয়োগের ফল। লোকটি বৈজ্ঞানিক। তিনি জানেন তিনি কি করিতেছেন।"

ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে পারে। যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই, সম্ভব হইবে। আজকাল বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময় ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সব কিছু ভুলিয়া যান—এমনকি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, আর তখন মহান্ সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মত আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তুক নয় (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভবপর) সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুর বদলে ছাড়া কখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

যীশুখ্রীষ্টের কার্যের মধ্যে আমরা তথাকথিত শ্রেষ্ঠ 'অনুপ্রেরণা' দেখিতে পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে যুগ যুগ ধরিয়া কঠিন কর্মনিরত ছিলেন। তাঁহার 'অনুপ্রেরণা' তাঁহার প্রাক্তন কর্মের—কঠিন শ্রমের ফল···। 'অনুপ্রেরণা' লইয়া ঢাক পিটানো অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে ইহা বর্ষাধারার মত পতিত হইবার কথা। যে কোন বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট লোকেরা শিক্ষিত (ও কৃষ্টি সম্পন্ন) জাতি সমূহের মধ্যেই আবির্ভূত হন। প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই। অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহা আর কিছু নয়, যে সংস্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে তাহাদের কার্যপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আসে এই ফল! অতীত কর্মই ইহার কারণ।

সেখানেও দেখিবে ধ্যানশক্তির বিকাশ—চিন্তার গভীরতা। ইঁহারা নিজ নিজ আত্মাকে মন্থন করেন আর মহান্ সত্যসমূহ উপরিভাগে আসিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞানলাভের উৎকৃষ্ট পন্থা। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। ধ্যানশক্তির প্রয়োগে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার

ইত্যাদি হইতেও আমরা মুক্ত হইতে পারি, অবশ্য সাময়িক ভাবে। ধর, আমার ধারণা আছে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন, বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে। কিন্তু অপর এক যোগী ব্যক্তি রাত্রে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "যাও বিষ পান কর।" তাঁহার কথায় বিষ খাইয়াও আমার মৃত্যু হইল না। ধ্যানের ফলে সাময়িকভাবে আমার মন বিষ ও আমার নিজের মধ্যে একত্ববোধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অপর পক্ষে, সাধারণভাবে বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে *আমাকে ধ্যাননিয়ন্ত্রিত অবস্থায় উন্নীত করি তবে* যে কোন লোককেই আমি বাঁচাইতে পারি। এই কথা (যোগ) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইহা কতখানি নির্ভুল—তাহার বিচার তোমরাই করিও। * * *

সব কিছুই জড়! সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বর অপেক্ষা বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মূর্তি-পূজারত বেচারী একটি গরীব লোকের উপর তোমরা ঘৃণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু দরিদ্রটির চেয়ে তোমরাই বা বড় কিসে? ধনের পূজারী তোমরা, তোমরা কী! মূর্তিপূজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত কোন বিশেষ কিছুকেই দেবজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা তো সেটুকুও কর না। না আত্মার না বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন কিছুর তোমরা উপাসনা কর ··! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। "ঈশ্বর চৈতন্যসত্তা।" আত্মসত্তাই ঈশ্বর। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ও বিশ্বাস লইয়া ভগবদুপাসনা করিতে হইবে। আত্মা কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? "আমাদের ঈশ্বর"—এই কথার অর্থ কি? তুমিই তো আত্মা। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই ত্যাগ করিও না। আমি চেতনস্বরূপ। সমস্ত যৌগিক কৌশল এবং ধ্যানপ্রণালী আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য।

এখনই কেন আমি এই সমস্ত বলিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি (ঈশ্বরের) স্থান নির্দেশ করিতে পারিবে, তোমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। (তাঁহার) প্রকৃত স্থানটি ব্যতীত স্বর্গে এবং মর্ত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছ। আমিই চেতন প্রাণী অতএব সমস্ত চেতনার সারভূত চেতনা অবশ্যই আমারই আত্মাতে থাকিবে। যাহারা ভাবে ঐ চেতনা অন্য কোথাও তাহারা মূর্খ। অতএব (আমার আত্মসত্তারূপ) এই স্বর্গেই ইহা অন্বেষণ করিতে হইবে। অনাদিকাল হইতে যেখানে যত স্বর্গ সে-সব আমার মধ্যেই। এমন *অনেক যোগী ঋষি আছেন যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া* 'আবৃত্তচক্ষু' হন এবং নিজেদের আত্মায় সমস্ত আত্মার আত্মাকে অবলোকন করেন। ধ্যানের পরিধি তো ইহাই। ঈশ্বর ও তোমার আপন আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার কর এবং এইরূপে শক্তিলাভ কর।

তোমরা সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়া চলিয়াছ,—আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি ইহা মূর্খতামাত্র। জীবন হইতেও অনেক মহত্তর এমন কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক (এই জীবন) নিকৃষ্টতর। কেন আমি বাঁচিবার আশায় ছুটিতে যাইব? জীবন হইতে আমার স্থান যে অনেক উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই দাসত্ব। সর্বদাই আমরা (অজ্ঞানের সহিত নিজকে) মিশাইয়া ফেলিতেছি ·। সবই দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনপরম্পরা।

তুমি কোন কিছু যে লাভ কর সে কেবল নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া (আমরা শিক্ষা করি) ·· ঐ যে যুবকটি—উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে জীবনে বিপদ-আপদ আছে। আবার বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে জীবন বিপত্তিহীন, মসৃণ বলিলে তাঁহার বিশ্বাস হইবে কি? তিনি কত দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এই তো পার্থক্য।

ধ্যানের শক্তিদ্বারা এই সমস্তই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে। আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে আত্মা, মন, ভুত (জড় পদার্থ) প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য (বাস্তবিকপক্ষে কিছু নাই।) …যাহা বর্তমান তাহা একমেবাদ্বিতীয়ম্। বহু কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। অজ্ঞানের জন্যই বহু দেখি। জ্ঞানে একত্বের উপলব্ধি। · বহুকে একে পরিণত করাই বিজ্ঞান। … সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্বে প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের নাম বেদান্ত-বিদ্যা। সমুদয় জগৎ একই। আপাতপ্রতীয়মান নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই 'এক' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের পক্ষে এখন এই সমস্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমরা ইহাদিগকে দেখিতেছি—অর্থাৎ যাহা আমরা বলি পঞ্চভূত—কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, জ্যোতির্ময় ও আকাশাত্মক (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ)। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহারও পারে। আত্মা এক, মন অন্য, আকাশ আরেকটি কিছু—এরূপ কিন্তু নয়। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একই সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে। পশ্চাদনুসরণ করিলে কঠিনকে অবশ্যই তরলে পরিণত হইতে হইবে। যে ভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল সেই ভাবেই আবার তাহাদের ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কঠিন পদার্থ তরলাকার ধারণ করিবে, তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে। বহির্ব্রহ্মাণ্ডের ইহাই কল্পনা—এবং ইহা সব কিছুকে লইয়া। বাহিরের এই জগৎ আর সার্বিক আত্মা, মন, আকাশ, বায়বীয় সত্তা, জ্যোতি, এবং তরল ও কঠিন পদার্থ।

মনের ক্ষেত্রেও একই কথা। আন্তর ব্রহ্মাণ্ডে আমি ঠিক ঐ এক। আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ। আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্তায় প্রত্যাবর্তন। একটি ক্ষুদ্র জীবনে 'ব্যক্তিকে' সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবন অতিক্রম করিতে হইবে। এইরূপেই মানুষ এই জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই সে বিশ্বজীবন অতিবাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

সংগ্রামমুখর হউক আমাদের জীবন।…যদি আমরা পরম সত্যে পৌছিতে না পারি তবে অন্ততঃ এমন স্থানেও উপনীত হইব যাহা আমাদের বর্তমান অবস্থিতি হইতে উৎকৃষ্টই হইবে।

এই অভ্যাসেরই নামে ধ্যান। (সব কিছুকে সেই চরম সত্য আত্মাতে পর্যবসিত করা)। কঠিন দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাষ্পে, বাষ্প ঈথারে আর ঈথার মনে রূপান্তরিত হইবে। তৎপরে মনও গলিয়া গেলে শুধুই থাকিবে আত্মা—সমস্তই আত্মা।

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবি করেন যে এই শরীরটিই তরল বাষ্প ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। তুমি শরীরটির দ্বারা যাহা খুশি করিতে পারিবে—ইহাকে ছোট করিতে পার এমন কি বাষ্পেও পরিণত করিতে পার, এই দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাতায়াতও সম্ভব হইতে পারে—এই রকম তাঁহারা বলিয়া থাকেন। আমার অবশ্য জানা নাই। আমি কাহাকেও এখনও এরূপ করিতে দেখি নাই। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই সমস্ত কথা আছে। আর এই গ্রন্থগুলিকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের জীবনে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইলেন। পূর্বকৃত কর্মের ফলে যেন বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহা প্রতিভাত হইবে। কে জানে এখানেই হয়তো কোন প্রাচীন যোগী রহিয়াছেন, হয়তো তাঁহার মধ্যে সাধনা সম্পূর্ণ করিবার সামান্যই একটু বাকী। অভ্যাস!

একটি কল্পনা-প্রণালীর মাধ্যমে ধ্যানে পৌছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—এক একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া করিয়া—স্থূল হইতে পরবর্তী সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে,

তাহাও আবার মনে, মনকে পরিশেষে আত্মায় মিশাইয়া দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ।*

জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ। অবশ্য তিনি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আধার, প্রায় সর্বশক্তিমান্, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য নন্। যদি কেহ (কোন মুক্ত পুরুষ) বলেন, "আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ইহাকে এই পথ দিয়া ভ্রমণে বাধ্য করিব" এবং অপর একজন মুক্তাত্মা যদি বলেন, "আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, ঐ পথে চালাইব" (তবে গোলমালেরই সৃষ্টি হইবে)।

তোমরা যেন এই ভুল করিও না। যখন আমি ইংরেজীতে বলি, "আমি ঈশ্বর" তাহার কারণ আমাদের আর কোন ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর শব্দ নাই। সংস্কৃতে 'ঈশ্বর' মানে পরম সত্তা, জ্ঞান—স্বয়ং-প্রকাশ অনন্ত জ্ঞান। ঈশ্বর অর্থে কোনও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূমা।...

আমি কখনও রাম নই (ঈশ্বরের সঙ্গে—ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত কখনও এক হই না), কিন্তু আমি (ব্রহ্মের সহিত—নৈর্ব্যক্তিক সর্বত্র-বিরাজমান সত্তার সহিত এক।) এখানে একতাল কাদা রহিয়াছে। এই কাদা দিয়া আমি একটি ছোট ইঁদুর তৈরী করিলাম আর তুমি একটি ক্ষুদ্রকায় হস্তী প্রস্তুত করিলে। উভয়ই কাদার। দুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল। তাহারা মূলতঃ এক—তাই একই মৃত্তিকায় পরিণত হইল। "আমি এবং আমার পিতা এক।" (কিন্তু মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতী কখনই এক হইতে পারে না)।

কোনও জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া থাক। আবার একটি আত্মা আছেন যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই ঈশ্বর, যোগাধীশ (স্রষ্টারূপে সগুণ ঈশ্বর।) তখন তাঁহাকে একজন সর্বশক্তিমান্ 'ব্যক্তি' ভাবা হয়। *সমস্ত জীবহৃদয়ে তাঁহার আবাস।* তাঁহার কোনও শরীর নাই—শরীরের প্রয়োজনও হয় না। ধ্যানাভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পারা যায় সর্বোত্তম যোগী ঈশ্বরের চিন্তা দ্বারাও তাহা লভ্য।

ইহা আবার কোনও মহাপুরুষকে বা সর্ব প্রাণের একতাকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যায়। এই-গুলিকে বলে বস্তুতান্ত্রিক (বিষয়গত) ধ্যান। এইভাবে কয়েকটি বস্তুগত বিষয় লইয়া ধ্যান আরম্ভ করিতে হয়। বিষয়গুলি বাহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে। ধ্যান মানে মনকে ঘুরাইয়া উহারই উপর স্থাপন করা। মন সমুদয় চিন্তাতরঙ্গ থামাইয়া দেয় আর জগৎও থাকে না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারে ধ্যানের দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। ... আরও একটু বেশী পরিশ্রম কর—আরও বাড়াও, ধ্যান গভীরতর হইবে। তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর অনুভূতি থাকিবে না। যখন তুমি এইভাবে ধ্যান-মগ্ন থাকার পর বাহ্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন তোমার মনে হইবে যে ঐ সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিশ্রাম উপভোগ করিলে। ধ্যানই তোমার শরীরযন্ত্রটিকে বিশ্রাম দিবার একমাত্র উপায়। নিবিড়তম নিদ্রাতেও ঐরূপ বিশ্রাম

* মৌলিক পদার্থগুলির শুদ্ধীকরণ ভূতশুদ্ধি নামে পরিচিত; ইহা ক্রিয়ামূলক উপাসনার অঙ্গবিশেষ। উপাসক অনুভব করিতে সচেষ্ট হন যে, তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত তাহাদের তন্মাত্রাপঞ্চক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত মনে মিলাইয়া দিতেছেন। মন, বুদ্ধি ও ব্যষ্টি-অহংকারকে লীন করিয়া দেওয়া হয় মহৎ অর্থাৎ বিরাট অহংকারে। মহৎকে লয় করা হয় প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিতে, আর প্রকৃতি লীন হন ব্রহ্ম বা চরম সত্যে। মেরুমজ্জার নিম্ন-প্রদেশে মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলীকৃত কুণ্ডলিনীশক্তি উপাসকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উচ্চতম জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিষ্কে সহস্রারে নীত হয়। এই উচ্চতম কেন্দ্রে উপাসক পরমাত্মার সহিত একাত্মতার ধ্যানে নিরত থাকেন। —অনুলেঃ

পাইতে পার না। কিন্তু (ধ্যানের) ঐ কয়েকটি মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় শুদ্ধ হইয়া যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে। শরীরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই আনন্দ পাইবে যে তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ করিবে। ধ্যানে আমরা ঐইরূপ পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকি।

তারপরে বিভিন্ন বস্তুর উপরে ধ্যান। মেরু-মজ্জার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যানের প্রণালী আছে। (যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ এই দুই প্রধান পথে গমনাগমন করে।) শূন্যনালী (যাহাকে বলে সুষুম্না) মেরুমজ্জার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্না-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উন্মুক্ত হয়। (স্নায়বীয়) প্রাণ-শক্তিপ্রবাহকে (মেরুদণ্ডের নীচে) চালাইয়া দিতে পারিলে কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। জগৎও তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে। ... (এইরূপে ঐশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।)

সহস্র সহস্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না কারণ আমাদের জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি; ইহাকে বলা যাক্ 'ক'। আমাদের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা 'ক' কে দেখি বা উপলব্ধি করি। বাহিরে অবস্থিত ঐ গাছটিকে ধরা যাক্। একটি চোর আসিল, সে ঐ মুড়া গাছটিকে কি ভাবিবে? সে দেখিবে একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে। একটি শিশু উহাকে মনে করিল একটি প্রকাণ্ড ভূত। যে যুবকটি তাহার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সে কি দেখিবে? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে। কিন্তু এই মুড়া গাছটির তো কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেরূপ ছিল সেইরূপই রহিল। ঈশ্বরই কেবল আছেন, আমরাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে মানুষ, মাটি, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি দেখিয়া থাকি।

যাহারা একইভাবে গঠিত তাহারা সাধারণতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যায় তোমরা এক জায়গাতেই রহিয়াছ। সমস্ত স্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কতকগুলি বড় বৃত্ত যেন পরস্পর কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এই ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত আমরা আরেকটি সমতলের (বৃত্তকে) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে পারি। কিন্তু মন যদি কেন্দ্রের সন্ধান পায় তবে তোমার সমস্ত স্তরেরই জ্ঞান হইতে থাকিবে। ধ্যানের সময় কখনও কখনও তুমি যদি অন্য ভূমিকে স্পর্শ কর তখন তুমি অন্য জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা, আরও কত কিছুর দেখা পাইতে পার।

ধ্যানশক্তির দ্বারাই এই সব লোকে যাওয়া যায়। এই শক্তির অর্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবর্তিত করা, উহাদিগকে পরিমার্জিত করা। যদি তুমি পাঁচদিন মাত্র ঠিক ঠিক ধ্যানের অভ্যাস কর, দেখিবে ভিতরে এই (জ্ঞান-) কেন্দ্রগুলিতে এক প্রকার বেদনা বা আকর্ষণ অনুভব করিতেছ এবং তোমার শ্রবণশক্তি সূক্ষ্মতর হইতেছে। (যেমন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মার্জিত হইবে অনুভূতিও হইবে তদনুরূপ সূক্ষ্ম। তখন অধ্যাত্ম জগৎ খুলিয়া যাইবে।) এইজন্য ভারতীয় দেবতাগণের তিনটি করিয়া চক্ষু কল্পিত। তৃতীয় বা জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে আধ্যাত্মিক বিবিধ দর্শন উপস্থিত হয়।

যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক

কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে উঠিতে থাকে অমনি ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগৎ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন স্বর্গে পরিণত হয়। তোমার কথা বন্ধ হইয়া যায়। তারপরে কুণ্ডলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নামিতে থাকে। তুমি আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়া পড়। সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে সহস্রারে পৌঁছায় তখন সমুদয় দৃশ্য জগৎ (তোমার অনুভূতিতে) বিলয়প্রাপ্ত হয়। …কিছুই থাকে না, কেবল এক সত্তা। তখন তুমিই পরমাত্মা। সমুদয় স্বর্গ তাঁহা হইতেই তুমি সৃষ্টি করিতেছ, সমস্ত জগৎও তাঁহা হইতে তোমারই রচনা। তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

গানহারা

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য

অন্ধ নিশায় বন্দী যাহারা নেইক যাদের গান
অসাড় পড়িয়া রয়েছে নিঝুম ঘুমে
অগ্রপথিক পায়ে দলে যায়, ঘৃণা ও অসম্মান—
জমা হয় আজ তাদের জীবনভূমে।

যারা ছুটে চলে নীলের নেশায় হয়েছে পাগলপারা
প্রচণ্ড ঐ গতির হর্ষে বিরাম জানে না তারা।
এরা সে তুরীয়ানন্দের আজো পরশ পায়নি কোনো
বিক্ষত দেহ লয়ে
রাতের কান্না শুনে আর ঐ রাত্রির মোহে ঘন
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে নীথর হয়ে।

এদের নিকটে আসে প্রতিদিন কালো মৃত্যুর চর
এ জড়ের মত জীবনের ভূমি অতিশয় উর্বর।
অত্যাচারের ফসল ফলায়ে যে লাভের কারবার
এখানে চলেছে, হিসাব বন্ধ আজিও মেলেনি তার।

আমি ইহাদের অতি কাছে আছি ইহাদেরি পাশাপাশি
এদের জীবন নিসাড় রয়েছে বুকে বড় বাজে তাই!
মর্ম আমার হা-হা করে ওঠে দূরের যে ডাক ভাসি
এল তার ত্বরা উদ্বেল হয়ে ছুটিতে পারি না ভাই।

মানস চক্ষে দেখেছি এদের উজল ভবিষ্যৎ
সেই পথে ছোটে মন মোর বাঁধহারা
আমি ইহাদের বেশি ভালোবাসি এরা যে পায়নি পথ
ঘুমায়ে আছে যে এদের শক্তিধারা।

যারা চলে গেল তাহাদের গান রচনা আজিকে নয়
চলার তুফানে মর্মে তাদের গান জাগে অক্ষয়।
সে গান ধ্বনিয়া কণ্ঠে তাদের মুখর করিবে পথ
সেই গান গেয়ে লঙ্ঘিয়া যাবে বিপদের পর্বত।
তাদের জন্য কোন ব্যথা নাহি পাই
অনন্ত পথে ছুটেছে তারা যে ক্ষয় নাই, ক্ষতি নাই।

অন্ধ নিশায় বন্দী যাহারা নেইক যাদের গান
তাদের জাগাতে গান রচি মন ভরে।
শপথ করেছি জাগাবোই আমি তাহাদের মহাপ্রাণ
কোন্ সে পিশাচ তাহাদের ক্ষয় করে?

চলার পথের মহানন্দের অনুভূতি জাগাবোই
রাত্রির মোহ টুটায়ে আমার গানে
পথে লুণ্ঠিত যে কেতন দেখে এখন ব্যথিত হই
তারে তুলে নেবে পুলকিত মনপ্রাণে।

এখন যাহারা গানহারা ভাই ঊর্ধ্বে নিশান তুলে
সীমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে তারা যাবে অসীমের কূলে।
তারা "তমসো মা জ্যোতির্ময়" মিলিত কণ্ঠে যবে
গাহিয়া উঠিবে তখন আমার মহাব্রত শেষ হবে।

দুইটি কাহিনী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(এক)

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ বলেন যে, একদিন বৈকালে শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কে বেড়াইতে গিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন এবং গেঁড়াতলা মসজিদের জনৈক ফকীরের সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ঘটনা বলিয়াছেন যাহা কোনও জীবনচরিতে নাই। মহারাজজী আমাকে একবার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া সব শুনিয়া আসিতে বলিলেন এবং তাঁহার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা দিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দজী তৎকালে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

আমি তাঁহার নির্দেশানুসারে উক্ত ভদ্রলোকটির বাড়ীতে কয়েকদিন পরে উপস্থিত হইলাম। শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের পশ্চিম দিকের একটি দোতলা বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া আমি বলিলাম, "আমি তাঁর নিকট হতে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব আদর ও যত্ন করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট বসাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজজীর কাছে শুনেছি যে আপনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকে দর্শন এবং একবার একটি মুসলমান ফকীরের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব মিলনের ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনার কাছে আমি কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। আপনি কখন, কেন এবং কার সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন? কতদিন আপনার তাঁর নিকট যাতায়াত ছিল? আপনি কিভাবে গেঁড়াতলা মসজিদে ফকীরের কাছে ঠাকুরকে দেখতে পেলেন? এইসব বৃত্তান্ত জানবার জন্যই আপনার নিকট এসেছি।" তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ—সব কথাই আপনাকে বলব।" আপনি শুনুন—

"আমাদের বাড়ী ছিল বিডন ষ্ট্রীটে। সে সময় গান বাজনা কনসার্টের খুব প্রচলন ছিল। সবে যৌবনে পা দিয়েছি—পড়াশুনায় তেমন মন ছিল না, গানবাজনার দিকেই ঝোঁক। পাড়ার কাছেই একটি কনসার্টের দল ছিল। আমার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে সেই দলভুক্ত। আমি দলের আড্ডায় রীতিমত যাতায়াত করি। একদিন সকালে নৌকা করে আমরা কয়েকজন গান-বাজনা করতে করতে পেনেটি যাচ্ছিলাম—পথে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী পড়ায় আমরা মাঝিকে সেইখানে নৌকা থামাতে বললাম। ঘাটে পৌঁছুবার আগেই একজন বন্ধু বললেন, 'ওরে বড় খিদে পেয়েছে। শুনেছি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে একজন পরমহংস আছেন। তাঁর কাছে গেলেই তিনি কিছু খেতে দেন।'

"নৌকা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ঘাটে পৌঁছলেই কে তাঁর কাছে যাবে এই নিয়ে বাদানুবাদ চলল। শেষে আমিই বলিলাম, 'পরমহংসের কাছে যেতে তোদের এত ভয় সঙ্কোচ কেন? এই দেখ, আমি একলা গিয়ে খাবার নিয়ে আসছি।' এই বলে আমি ঘাটে নেমে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই তিনি সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে—তুই কি চাস?' আমি সরলভাবে বললাম, 'আমরা কলকাতার থা..কনসার্টের দল নিয়ে পেনেটি যাচ্ছি, রাস্তায় খুব খিদে পেয়েছে। প্রাতঃকালে না খেয়েই সবাই

বেরিয়ে পড়েছি। আপনি খেতে দিন, খুব খিদে পেয়েছে।'

"ঠাকুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। পরে উঠে আমার জন্য কিছু ফলমিষ্টি পাতায় করে দিলেন। আমি বললাম, 'এইটুকুতে কি হবে? আমরা দলে দশবারো জন লোক। এই সামান্য মিষ্টি তো আমার খেতেই ফুরিয়ে যাবে। আরও দিন—ঐ তো চাঙ্গারি ভর্তি আপনার খাবার রয়েছে।'

"ইহা শুনে ঠাকুর ঠিক বালকের মত চাঙ্গারিটি হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন যেন পাছে আমি জোর করে নিয়ে যাই। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, 'যা ছোঁড়া যা—ঐ নিয়েই যা! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে! তোর খিদে পেয়েছে—তুই খা। আবার দলশুদ্ধ সবাইকে দাও!' আমি বললাম, 'মশায়, তাদের ফেলে আমি খেতে চাই নে। এই রইল আপনার দেওয়া খাবার।' এই বলে আমি যেতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে তিনি মধুর স্বরে আমাকে ডেকে বললেন, 'ওরে হাবাতে হস নে, এই নে।' এই বলে আবার কতকগুলি খাবার দিলেন। আমি বললাম, 'এতটুকুতে কি হবে? খিদেয় সবার নাড়ী চোঁ চোঁ করছে। খাবার রয়েছে, আপনি ইচ্ছে করেই দিচ্ছেন না—কি করি বলুন।' ঠাকুর সেই কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'কেন, সবাইকে কেন দেব? তারা এখানে আসতে পারে না? তারা এসে খাবার নিয়ে যেতে পারে না? তোকে তাদের জন্য মোড়লগিরি করতে কে বলেছে?' আমি বললাম, 'আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় দেখুন নৌকাতে আমরা ১০।১২ জন আছি কি না? খিদে না পেলে আপনার কাছে আসবো কেন মশাই!' ঠাকুর তখন একজনকে ডেকে প্রায় ছোট এক চাঙ্গারি ভরে খাবার সন্দেশ প্রভৃতি দিতে বললেন। আমি তো পাওয়া মাত্রেই নৌকায় গিয়ে বন্ধুদের বললাম, 'তোরা গেলি নি সঙ্গে, আমি একলাই নিয়ে এলাম।' এই আমার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন।

"তারপর মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। তাঁকে দেখলেই মনটা আকৃষ্ট হত। তাঁর চারিদিকে অনেক ভদ্রলোক বেষ্টন করে থাকত, সব বিদ্বান পণ্ডিত—কেশববাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হত না। আমাকে দেখলেই ঠাকুর বলতেন, 'ঐ ছেলেটাকে ভাল করে খাবার দে। ওর ভারি খিদে পায়।' শুনে আমার লজ্জা বোধ হত। পরে যখন আমার বিবাহ হল, চাকরির চেষ্টায় উমেদারী করতে ঘুরতে হত, তখন তাঁর কাছে আর আমার যাওয়া হয় নি। অনেক চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্সে চাকরি যোগাড় করলাম। বেশী মাইনে নয়, তাই ধর্মতলা থেকে গেঁড়াতলা হয়ে বিডন ষ্ট্রীটে হাঁটাপথে যেতাম। একদিন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় গেঁড়াতলা মসজিদের সমুখে দেখি একটি মুসলমান ফকীর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'প্যারে আও।' চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বেশ প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছে, 'প্যারে আ জাও, আ জাও।' আমি শুনে মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী হতে নেমেই সবেগে চললেন সেই মুসলমান ফকীরের দিকে। পরে দুইজনে একেবারে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ। ভাড়াটিয়া গাড়ীতে দুইজন লোক ছিল—একজন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। —এঁর হাত দিয়ে দু'একবার মিষ্টান্ন প্রসাদ আমায় ঠাকুর দিয়েছিলেন। ঠাকুর কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃশ্য!

সেই ছবি আমার স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করছে। সেই সময় ঠাকুরকে কি চিনেছি, না জানতে ইচ্ছা হয়েছে! এই বৃদ্ধ বয়সে মনে হয়—করুণাময় ভগবানের দর্শন পেয়েও বুঝতে পারি

নাই। সময় না হ'লে কিছু হয় না—তাই ক্ষোভ হয় যৌবনের মোহে কি অমূল্য রত্ন পেয়েও হারিয়েছি।"

আমি মন্মথবাবুকে বলিলাম, "আপনি ধন্য—তবুও নরদেহে অবতীর্ণ ভগবানকে দর্শন করেছেন। স্মৃতিতে সেই নিত্য চিন্ময়রূপ তো উদয় হয়। ইহাও কম ভাগ্যের কথা নয়।"

এইরূপ কথাবার্তার পর আমি মন্মথবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম এবং পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজকে সব কথা নিবেদন করিলাম।......

(দুই)

হাওড়া হইতে বালী পর্যন্ত বাস চলাচল আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পরে একদিন বৈকালে পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ কলিকাতা হইতে বাসে বেলুড় মঠে ফিরিতেছিলেন। কিয়দ্দূর বাসটি আসিবার পর পার্শ্বস্থ জনৈক সহযাত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রামকৃষ্ণ পরমহংস মঠের?" মহারাজজী বলিলেন, "হাঁ, কিছু বলবেন কি?"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাল্যকালে বাবার নিকট শুনেছি রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের যে কি উপকার করেছেন তা মুখে বলা যায় না। আমরা জাতিতে মুসলমান এবং কামারপুকুর অঞ্চলে আমাদের বাড়ী। এখন কলকাতার চাদনীতে একটি দোকান আছে। বাবা কয়েক বৎসর হল গত হয়েছেন।

"বাবা বলেছিলেন, আমাদের তখন মধ্যবিত্ত অবস্থা ও তদুপযুক্ত ঘরদ্বার খামার ধানের গোলা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে প্রতি বৎসর আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে যেত। এইরূপ ২।৩ বার হওয়ার পর একদিন জনৈক ব্রাহ্মণবন্ধুর নিকট আমার দুঃখের কাহিনী বলছিলাম। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস ঐ পথ দিয়ে লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে কীর্তন করতে করতে গ্রামান্তরে যাচ্ছিলেন! আমার বন্ধু তাঁকে অদূরে দেখে আমাকে বলেন, ঐ যে মহাপুরুষ কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন তাঁহার শরণ লও। তিনি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।

"পিতা এই কথা শুনে সেই মহাপুরুষকে নিবেদন করবার জন্য ভক্তিভাবে বিনয়সহ ভূমিস্পর্শ করে সেলাম করতে করতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। পরমহংস পিতাকে প্রশ্ন করেন, 'কি বাবা?' পিতা বলেন, 'বাবা, আমরা ছাপোষা মধ্যবিত্ত লোক, যা কিছু ঘর বাড়ী খামার আছে প্রতি বৎসর আগুনে পুড়ে গেলে কি প্রকারে আমরা বাঁচতে পারি? এইজন্য আপনার শরণ নিচ্ছি, একটা উপায় দয়া করে করুন।' এই কথা শুনে পরমহংস জিজ্ঞাসা করেন,—'কোথায় তোমার ঘর?' রাস্তার অনতিদূরে নির্দেশ করিয়া পিতা বললেন,—'ঐ খানে—এখনও পোড়ার সব চিহ্ন রহিয়াছে।'

"পরমহংস পিতাকে বললেন—'আচ্ছা চল।' অন্যান্য লোকজনদের একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজে পিতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। বাড়ীর কাছাকাছি পৌছলে তিনি বাবাকে কয়েকটি ফুল আনতে বললেন। পিতা কয়েকটি ফুল নিয়ে এলে তিনি হাত পেতে নিলেন ও বললেন, কতটা জায়গা জুড়ে তোমার বাড়ী খামার যা আগুনে নষ্ট হয়, দেখিয়ে নিয়ে চল।' পিতা তাঁর কথামত—আগে আগে চলতে লাগলেন। পরমহংস বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একটি ফুল ফেলতে লাগলেন। এইভাবে বাড়ী খামার প্রদক্ষিণ করে পিতা একস্থানে দাঁড়ালে পরমহংস জিজ্ঞাসা করলেন 'সবটা হয়েছে?' পিতা তদুত্তরে, 'আজ্ঞে হয়েছে' বললেন। এর পর থেকে এযাবৎ আর আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগে নি। এজন্য আমরা পরমহংস মশায়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"

সৃষ্টি ও লয়

'বৈভব'

সৃষ্টি (অধ্যারোপ)

অনন্ত আঁধার গর্ভে সৃষ্টিবীজ আছে প্রতীক্ষায়
লুপ্ত নহে, সুপ্ত শুধু—আপনার গুপ্ত মহিমায়!
ওই কোথা মহাকাশে জাগে যেন কিসের স্পন্দন—
আনন্দ-বেদনা-ভরা প্রসূতির অব্যক্ত ক্রন্দন!

জড়-জীব-জগতের জননী যে জাগে মহামায়া
প্রলয়-প্রসুপ্তি হতে;—ব্যোমে ভাসে তারি আলো ছায়া!
নেচে নেচে ধেয়ে আসে আলোকের তরঙ্গের মালা
নীহারিকা-গ্রহ-তারা সূর্য-চন্দ্র ভরে বিশ্ব-ডালা!

অপূর্ব সে ছন্দোময় স্পন্দময় জ্যোতির নর্তন—
অস্ফুট-আনন্দ-ময় দেখা দেয় জীবের জীবন;
সাগর-সুনীলাম্বরা বসুন্ধরা তারে কোলে করি
করিছেন লালন পালন,—জগদ্ধাত্রী রূপ ধরি!

তরুলতা কৃমি কীট পশুপাখী মানব-দেবতা
সবাকার লাগি তাঁর সম মায়া সম স্নেহ ব্যথা।

লয় (অপবাদ)

বিশ্বের বৈচিত্র্য মাঝে ধ্যানমগ্ন মন
খুঁজিতে চাহিছে এক আদিম কারণ!
সকল বিভেদ মাঝে অতি সূক্ষ্ম রূপে
কী সেই অভেদ ভাবে হাসে চুপে চুপে;—

সকল অস্তিত্ব টানি আপনার মাঝে
প্রকাশি সকল জ্ঞান আপনাতে রাজে
সর্বপ্রাণ আনন্দের অনন্ত আকর
তরঙ্গ লীলায় তলে অতল সাগর।

চিনেছি জেনেছি তারে—আমারি সে রূপ—
যাহার প্রকাশে পূর্ণ যত কিছু রূপ!
আমি, আমি, আমি সেই প্রথম কারণ
যাহারে সন্ধান করে ধ্যানমগ্ন মন!

রো পারে যাবে তুমি সাহসী সাধক?
ই দেখ, স্বয়ং-জ্যোতি আত্ম-প্রকাশক।।

সংসার ও শান্তি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ভজন, জপ, পূজা ও ধ্যান—এইগুলির ভেতর দিয়ে তাঁকে আস্বাদন করো। তাঁকে উপাসনা করো। তিনি যে তোমার অতি কাছে রয়েছেন—তাঁর কাছে ব'স। তাঁতে স্থিতিলাভ করো। উপ পূর্বক আস অর্থাৎ উপাস্যের সমীপে ব'স।

ভজন কি কম জিনিস! 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ'—এ তাঁরই কথা। যে গায় সে মাতে, আর যাকে শোনায় তাকেও মাতায়। নেশা হয়, নেশা করিয়ে দেয়। তাইত ঠাকু' বরিশালের মহাপণ্ডিত অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন—'তোমরা ত' সংসারে থাকবে, তা' একটু গোলাপী, নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছো অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা ত' শুকদেবের মত হতে পারবে না।'

* গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, রাঁচিতে একটি আলোচনা-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ। শ্রীশচীন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক শ্রুতলিখিত।

দুটি প্রশ্ন অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে করেছিলেন। সংসারে কি করে থাকতে হয় ও কি করে তাঁকে লাভ করা যায়। এ প্রশ্ন অশ্বিনীবাবুর ব্যক্তিগত প্রশ্ন হলেও ইহা সংসারী জীবমাত্রেরই প্রশ্ন। গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্নাদি করেছিলেন, ব্যক্তিগত হলেও সেগুলি মুক্তিকামী জীবেরই প্রশ্ন। অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে এইরূপ ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরের ভেতর দিয়ে সকলের অন্তরের প্রশ্নেরই জবাব দেন। এগুলি সকলেরই জন্য। সবই খোলামেলা—গোপনীয় কিছুই নয়। তাইত মুক্তিকামী সকল মানুষের কাছে যুগাবতারের যুগোপযোগী এই উপদেশ—'একটু গোলাপী নেশা করে থাকো।'

এই নেশাটি কি? আনন্দই ত। বিষয়ে আনন্দও আনন্দ; আবার ভগবানে আনন্দও আনন্দ! বিষয়ানন্দের নেশা এ নয়। মনকে অন্তর্মুখী ক'রে তাঁর নেশায় ভ'রে যাওয়া। কিন্তু কেমন করে এ নেশা হবে? তাঁর ভজনা কর, নাম কীর্তন কর, জপ ধ্যান সাধনায় মগ্ন হয়ে মনের মলিনতা দূর কর। মলিনতা গেলেই হবে।

তিনি ত' রয়েছেন। অতি কাছেই রয়েছেন। সব সময়েই আমাদের আকর্ষণ করছেন। তিনি চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ। তবে কেন টানছেন না? ছুঁচ যে কাদামাখা রয়েছে? কাদামাখা ছুঁচ কি চুম্বক টানে? মলিনতা ঘুচলেই চুম্বক আকর্ষণ করবে। মনের মলিনতা গেলেই, শুদ্ধ সত্ত্ব মন হলেই—তিনি চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে নেবেন। আর এই কাদাটুকু ধোয়ার জন্য, মনের মলিনতা দূর করার জন্য চাই সাধনা। সাধনা ছাড়া কিছুই হবে না। তাইত ঠাকুর অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন, 'দেখো, সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।' হাঁ, খেতে হবে!

যে যুগের যা তা' দেবার জন্য যুগাবতারদের আবির্ভাব। তাইত ঠাকুর বলেছেন 'দশমূলা পাঁচন এ যুগে চলবে না। বাদশাহী আমলের টাকা এ যুগে অচল।' শাস্ত্রে সব কিছুই আছে।

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসম্ যথা ॥

ভিন্ন ভিন্ন মত। চিনিতে বালিতে মেশান আছে। তাই সাধুমুখে শুনতে হয় ধর্মতত্ত্ব। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।' তাই বলছিলাম যে যুগের যা। সাধুসঙ্গ কর। তাঁরাই ত পথ দেখাবেন—বুঝিয়ে দেবেন শাস্ত্রের কতটুকু নিতে হবে।

সৎসঙ্গ কর। অসৎসঙ্গ বড় খারাপ। দেখলে না দুর্যোধনদের দশা! মামা শকুনির সঙ্গ-দোষে তাদের কি হল? মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর কি অবস্থা?

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি? তাঁকে পাওয়া। একটি লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে পড়। 'খানদানি চাষা হও।' মাটি চষে ঠিক ঠিক প্রস্তুত হয়ে শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কর ঈপ্সিত বৃষ্টির আশায়।

পুরুষকার, দৈব ও কাল—এই তিনটির যোগাযোগ হলে তবে তাঁকে পাবে। নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। যাতে তাঁর কৃপা হয় ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো।

'সাধন করনা চাহিয়ে মনুয়া,
ভজন করনা চাহি।'

এগিয়ে, চলো। তিনি কৃপা করবেনই। শোননি কি ঠাকুরের কথা 'আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা এক ট্যাং কর।' এক পা এগোও, তিনি একশ' পা এগিয়ে আসবেন।

ঠাকুর বলেছেন ষোল আনা ভালবাসা ত' দিয়েছ কামিনী-কাঞ্চনে, তুলসীদাস বলেছেন—'জরু, জমি, টাকার পিছনেই ত' সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছ। তাঁর তরে কতটুকু রেখেছ? তাঁকে ভুলে গেছ।'

উপনিষদে রথের দৃষ্টান্তটি বেশ। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী হয়ে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বেগে ছুটে চলেছে

বিষয়ানন্দের দিকে। মন-লাগাম সহযোগে বুদ্ধি-সারথি কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছে না। বাগে আনা কি সহজ ব্যাপার! এ যে কোটী জনমের সংস্কার। যিনি মন দিয়েছেন, যিনি ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন, যিনি ভোগ করবার জন্য ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভুলেছ। এ যে জাগাঘরে চুরি! এ যে মহামায়ার ভীষণ ঠুলী!

তিনি যে দয়াল হরি! তিনি যে 'প্রাণস্য প্রাণঃ', 'প্রিয়স্য প্রিয়ঃ'। তাইত তিনি ভাঙ্গিয়ে দেন মনের এই ভুল। জীবনে দুঃখ কষ্ট বিষাদ ত' তিনিই দেন মানুষকে। মানুষ মান যশের জন্যই ত' বেহুঁস হয়ে যায়। সেই 'মান' হতে 'হুঁস' করে দিয়ে তাকে সত্যকার মানহুঁস বা মানুষ করে তোলেন তিনিই এই হুঁসই ত' বিবেক। এ সব ত' তাঁরই কৃপা। সনাতনের কি অবস্থা হল এই শ্লোকটি প'ড়ে—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোহত্তরকোশলঃ।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

রজক দুলালীর দু'টী কথা 'বেলা যায়' শ্রবণে লালাবাবুর কি হল? সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বের পিছনে জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দর্শন কি? এ সবই ত' তাঁর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মন-লাগাম সহযোগে বুদ্ধি-সারথির 'ইন্দ্রিয়'-অশ্বগুলির বাহির্মুখী গতি রোধ করে মোড় ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করার জলন্ত দৃষ্টান্ত। গীতামুখে ভগবান ত' স্পষ্টই বলেছেন,

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে ॥"

এই বুদ্ধিযোগই ত' বিবেক। সৎ অসৎ বিচারের শক্তি।

ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফেরাও। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করো। করতে চেষ্টা কর। যে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জিনিসগুলি তোমার এত প্রিয় হয়ে উঠছে, যাকে 'আমার, আমার' বলে এত আঁকড়ে ধরছো, সেগুলিকে প্রভুর চরণে একবার অর্পণ কর দেখি। বল দেখি 'প্রভু, এ সবই তোমার, তুমিই সব। যা কিছু করছো সবই তাঁকে সমর্পণ কর।'

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥"

এ ত' তাঁরই উপদেশ। ভাবো 'তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি মাতা-পিতা, আমি সন্তান; তুমি রথী, আমি রথ; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।' এই রূপ একটি ভাবকে আশ্রয় করে তোমার কাঁচা আমিটিকে, মারো। তোমার 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'তে পরিণত করো। এই ত' বিদ্যার সংসার। ভগবানের এই ভাব ছাড়া সংসারই ত' অবিদ্যার সংসার। তাঁর পাদপদ্মে এক হাত রেখে সংসার করো। 'চল্তি চাকি সব কোঈ দেখে কীল না দেখে কোঈ'। কীল অর্থাৎ খোঁটা ধরে ঘোর। খোঁটা হতে যত দূরে যাবে তত পিষে যাবে। হাঁসের মত সংসারে থাকো। যেন বিষয়ানন্দের ছোঁয়াচ না লাগে, চিদানন্দ রস আস্বাদন কর।

মহামায়া এই সংসার রচনা ক'রেছেন। তাঁরই মায়ায় জীবের এত ছোটাছুটি। এ তাঁরই লীলা। মাঝে মাঝে বেহুঁস হয়ে মন বাহিরে ছুটে যায় ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য—বিষয়-রস গ্রহণের জন্য। ভুলে যায় যে যিনি অন্তরে আসীন তিনিই রস-স্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'।

মহামায়ার এই মায়া-পাশ কাটাতে হবে। তাই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। তিনি দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবগণের মহামায়ার প্রীত্যর্থে তাই এই স্তব—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥

মনকে লক্ষ্যে স্থির রাখার জন্যই সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। মাঝে মাঝে মন-ঘড়িটাকে

মিল করে নিতে হয়। দেখে নিতে হয় সংসারের দিকে কতটা ফাষ্ট যাচ্ছে, আর ভগবানের দিকে কতটা স্লো চলছে। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব সংগ্রন্থ পাঠই নির্দেশ।

নির্ভর কর। বিশ্বাস কর। তাঁতে অনুরক্ত হও। তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন—তিনি কেমন। এ তাঁর কৃপা। একবার যদি তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করে দেন—আর ভয় নাই। ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, বরং ছেলে পড়ে যেতে পারে; কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই। তাই ব্যাকুল হয়ে ডাকো। সাধনা করতে করতে তবে তাঁর কৃপা হয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' বাঁদরছানার মত হয়ো না। বেড়ালছানার মত হয়ে থাকো। তাঁর কোন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। তিনি যেমন রাখেন তেমনি থাকো, যেখানে রাখেন সেখানে থাকো। এইরূপ নির্ভরতা থাকলে, এইরূপ ভক্তি বিশ্বাস থাকলে তিনি নিশ্চয় কৃপা করেন। হাজার বছরের অন্ধকার একটা মাত্র দেশলায়ের কাঠিতে আলোকিত হয়ে যায়। হাজারটি কাঠির দরকার হয় না।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

তাঁকে ভক্তি করতে শেখো। ঠিক ঠিক ভক্ত হও। উপবাস, পুরশ্চরণ ইত্যাদি শুধু নীরস বৈধী ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। বৈধী ভক্তিকে রসস্থ করে প্রীতি ভালবাসা দিয়ে রাগানুগা ভক্তিতে পরিণত কর। পাঁচ সিকা পাঁচ আনা অনুরাগ তাঁকে দাও।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

গীতামুখে এ ত' শ্রীভগবানেরই কথা। তাই ত ঠাকুর বলেছেন খোলমাখান জাবের কথা। প্রীতিটুকু চাই। তাঁর উপর প্রেম, অনুরাগ; প্রীতিই একমাত্র সার।

এ সব মুমুক্ষু ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ। ভগবান অর্জুনকে বড় ভালবাসেন। তাই তিনি তাঁকে গুহ্যতম উপদেশ দিচ্ছেন। 'ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।' ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর'ছেন। আর সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় মায়াযন্ত্রে ঘোরাচ্ছেন। 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' তাই তিনি বলছেন—'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' সর্ব ধর্ম অধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করে আমারই শরণ কর। আমিই তোমাকে সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি। পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর। মাস্তুল দৃঢ়ভাবে পাকড়াও। চোখ বুঝে অন্তর্মুখী হয়ে তাঁকে ধরে বসো।

ভগবান আরও বলছেন, বার বার বলছেন তাঁর আসল সার কথাগুলি ঃ—

'মন্মনা ভব'—আমাতে মন সমাহিত কর

'মদ্ভক্তো'—আমার ভক্ত হও

'মদ্‌যাজী'—আমার ভজনা কর, পূজা কর।

'মাং নমস্কুরু'—আমার কাছে তোমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে নত হও। এই সব করলে তুমি আমাতেই আসবে। একথা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।

'মাম্ এবৈষ্যসি সত্যং তে
প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।'

তুমি যে আমার প্রিয় সখা, বড়ই আপন জন।

তাই আবার বলি—এগিয়ে পড়ো, আর ডুব দাও। তাঁকে লাভ করো। সেখানেই অনাবিল শান্তি পাবে। একেই বলে শান্তি। মনুষ্যজন্ম সার্থক করো এই পরা শান্তি লাভ ক'রে। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

ধর্মবিশ্বাসের গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীকান্তি পাকড়াশী, এম্‌-এস্‌সি
(গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়)

মানুষের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ধর্মের নানা রূপ, নানা অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির গোড়াপত্তন ঠিক কবে হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে জানা না গেলেও সে সম্পর্কে তথ্যাদি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অতীত দিনের অলিখিত ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যেই নৃবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ঐ অলিখিত ইতিহাসের ধারা অতি পুরাতন সভ্যতার নানা পথে -নানা স্তরে বিবর্তিত হয়েই আধুনিক সভ্যতার আঙিনায় প্রবাহিত হয়েছে। মানুষের ধর্মীয় ভাব-বিশ্বাসের অনুবর্তন, কি বিবর্তনের একটানা প্রগতি আর বিস্তারের প্রকৃতি কি ও কেমন সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনেক আলোচনা—সমালোচনা জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ধর্মীয় ভাব-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজার্চনার পদ্ধতিগুলি কোন দিনই একটা নির্দিষ্ট পথে বা কাঠামোর মধ্যে বিবর্তিত হয়নি। মানব-সমাজ যেমন যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার স্তর পার হয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি মানুষের ধর্মীয় ভাব-বিশ্বাস, বুদ্ধি যুক্তি আর নিয়ম কানুনগুলিও ক্রমে ক্রমে জন্ম নিয়েছে—পরিবর্তিত হয়েছে—অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের স্রোত সত্যই নিরবচ্ছিন্ন—প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা পার হয়ে আধুনিক সভ্যতার সীমানায় এসে পৌঁছেছে, বিবর্তিত মানবসমাজ আর মানুষের ধর্ম। সমাজ ও ধর্ম—মানুষের দুই মৌলিক প্রয়োজন শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিচ্ছেদ্য—অবিভাজ্য হয়েই সংগঠিত সংযোজিত হয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির তালে তালে—ধাপে ধাপে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ছিল একান্তই অরণ্যচারী—দিনেরাতে বনের পশুপাখীর অন্বেষণ আর শিকার নিয়েই তার সময় কেটেছে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের আনাচে কানাচে। প্রকৃতির সাথে কঠিন সংগ্রাম ক'রেই তাকে বাঁচতে হয়েছে—বাঁচাতে হয়েছে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের। এই সংগ্রামমুখর জীবনের মধ্যেই সে প্রত্যক্ষ করেছে কেমন করে দিনের পর দিন প্রকৃতি বদলিয়েছে এক অজ্ঞেয়—অজ্ঞাত শক্তির দুর্বোধ্য নিয়ম শৃঙ্খলায়। বছরের পর বছর ছয় ঋতুর অবশ্যম্ভাবী আসা যাওয়া, দিনে রাতে সূর্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রদের উদয়াস্ত—সময়ে অসময়ে ঝড়বৃষ্টির তুমুল তাণ্ডব—এমন আরও কত শত নিরবিচ্ছিন্ন প্রকৃতির খেলায় অরণ্যবাসী মানুষের স্থূল মনে প্রথম যেদিন জেগেছিল অভূতপূর্ব বিস্ময় আর আতঙ্কের দোলা সেই দিনই সূত্রপাত হয়েছিল প্রকৃতির বিপুল শক্তি আর মহিমার উপর মানুষের নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণ। কালক্রমে এই আত্ম-সমর্পণ-ভাবের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল নানা ধর্মের বিচিত্র মূল উপাদানগুলি। মানুষের ক্ষমতার বাইরে বুদ্ধিব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে প্রকৃতির মহাজাগতিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে মানুষ জেনেছিল যে শরীর ও মনের দিক থেকে সে কত অসহায়—কত দুর্বল। এই দুর্বলতার অলঙ্ঘনীয় প্রতাপ মানুষের আত্ম-সমর্পণ-ভাবটি প্রবল হ'তে প্রবলতরই হয়েছিল দিনের পর মাস—মাসের পর বছর। জড়জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার একটানা প্রভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছিল যে, প্রকৃতির দান আর শাসন ছাড়া সে বাঁচতে পারে না—বাঁচতেও পারবে না তার আত্মরক্ষা-বিস্তার-বিনোদনের সহজাত বৃত্তিগুলি।

সেই অতীতে মানুষের অর্বাচীন অনভিজ্ঞ জীবনে ছিল কত শত বাধা-বিপত্তি, আশা-সংশয়—অনিশ্চয়তার আশঙ্কা—কঠিন অজ্ঞানতা! এই অনভিজ্ঞ জীবন-যাত্রার প্রতিপদে ঐ বিপদাশঙ্কা—অনিশ্চয়তার ভয় প্রবল চাঞ্চল্যই জাগিয়েছিল মানুষের আত্ম-রক্ষা-বিস্তার-বিনোদনের ইচ্ছাগুলিতে। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম আর প্রকৃতির দান গ্রহণ—এই দুই অলঙ্ঘনীয় বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে মানুষ আমরণ চেষ্টা করেছে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির পূর্ণ উপলব্ধিতে চূড়ান্ত সম্ভোগে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে মানুষ যতটা সাফল্য পেয়েছে বোধ করি তার চেয়ে বেশী পেয়েছে অসাফল্য। অসাফল্যের বোঝা ঋতুতে ঋতুতে গঠন করেছে মানুষের স্থূল অভিজ্ঞতা—তার সাদাসিধে বুদ্ধি যুক্তি আর সেই সাথে বিপুল বেগে দানা বেঁধে উঠেছে প্রকৃতির অলৌকিক শক্তির উপর মানুষের সংশয়হীন নির্ভরতা—আত্মসমর্পণ-ভাব। প্রকৃতির অসীম শক্তির প্রকাশ অরণ্যচারী মানুষের মৃগয়াস্থলীর চারিদিকেই—আকাশে বাতাসে—অরণ্য প্রান্তরে—লতাপাতা বনস্পতির চিরসবুজ রঙে—কালো মেঘের প্রাণদায়ী জল ছড়ানোর মধ্যে—এই শক্তির রূপ প্রতিক্ষণে বিহ্বল করেছে প্রাগৈতিহাসিক শিকারী-মানুষের অনুন্নত প্রাণ-মন।

আদিম মানুষের স্থূল বুদ্ধি যুক্তি আর ক্ষমতার ঊর্ধ্বে চির-বিরাজিত প্রকৃতির মহাশক্তি—যে শক্তি শুধু অনুভব করা যায়—ব্যাখ্যা করা সম্ভব জড়জগতের প্রাকৃতিক ঘটনা-বলীর গুণাগুণ বিচারে। অনন্ত নীলাকাশ—দুরন্ত বাতাস—প্রচণ্ড সূর্য—স্নিগ্ধ চন্দ্রমা সবই যে এক অতিমানব মহাশক্তির আধার এই যুগান্তকারী অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস অরণ্যবাসী মানুষের অস্ফুট বুদ্ধিযুক্তির দুর্বলতার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল তার সংগ্রামময় জীবন-যাত্রায়। কোন সন্দেহ নাই যে এই অলৌকিক অদৃশ্য শক্তির মহিমা আদি মানুষের মনে জাগিয়েছিল প্রবল বিস্ময়—অসীম ভয়—দুরন্ত শ্রদ্ধা—আর অপার আনন্দ। কালক্রমে মানুষের মনে বিস্ময় আনল সম্ভ্রম, ভয়ে জাগাল ভক্তি—শ্রদ্ধায় ফুটল পূজাভিলাষ—আনন্দে জমাট বাঁধল সব সংশয়—সব অজ্ঞতা। এই ভাবেই মানুষের চেতনায় মূর্ত হ'য়ে উঠলো অলৌকিক শক্তির নানা রূপ—নানা ধ্বনি—নানা রস—নানা ব্যঞ্জনা। এই রূপের কল্পনাতে কালের আবর্তনে গড়ে উঠেছে কত দেবদেবীর কল্যাণময়ী মূর্তি—এই ধর্মের স্পন্দনে সৃষ্ট হয়েছে কত স্তোত্র, ধর্মসঙ্গীত—এই রসের মধুর পরশে ফুটেছে কত ভাব আবেগ—এই ব্যঞ্জনার সংস্পর্শে জন্ম নিয়েছে কত নতুন ধ্যান-ধারণা! আদিম মানুষের মন ভরেছে এক অনাস্বাদিত রস সুধায়!

প্রকৃতির সাথে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সত্য হ'য়ে আছে আজও। একদিকে যেমন প্রকৃতির লীলা-মহিমা নিয়ম-শৃঙ্খলার তীক্ষ্ণ প্রভাব সেই অতীত থেকে সংগঠিত ক'রে চলেছে মানুষের মন আর শরীর, সমাজ আর জীবন, অন্য দিকে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষেরও বিরাম নাই প্রকৃতির মর্মোদ্ঘাটন করার কঠিন সাধনায়। যুগের পর যুগ প্রকৃতি আর মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে চলেছে—এই দ্বন্দ্বে মানুষ কোন সময় হয়েছে জয়ী; আর না হয় শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিপর্যস্ত। কিন্তু তা সত্বেও প্রকৃতিকে জানার অদম্য অভিলাষ—প্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তির গুণাগুণ বিশ্লেষণ ক'রে বশে আনার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এমনকি প্রকৃতির উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করার ধৃষ্টতাপূর্ণ উদ্যম প্রকাশ করতে মানুষ যুগে যুগে এগিয়েই গেছে। সব ক্ষেত্রেই যে পূর্ণ সাফল্য মানুষ পেয়েছিল তা নয়—পরাজয়ের গ্লানিতে তার দুর্বার ইচ্ছা আরও প্রবলই হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সাফল্য কোন মতেই এল না তখনই আদিম মানুষের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে তীক্ষ্ণ

ক'রে তুলেছে ঐ মহাশক্তির হাতে মানুষের নিঃসন্দেহ আত্মসমর্পণের ভাবাবেগ। এই আত্মসমর্পণের ভাবাবেগ সকল মানবধর্মের মূল ভিত্তি—সকল ধর্মাচারের প্রধান আধার।

মানুষের আত্মরক্ষা-বিস্তার-বিনোদনের সহজাত বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত হ'তে না পারলেই মানুষের আত্মসমর্পণের বৃত্তিটি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে জীবনে নানা বাধা-বিপত্তির সংশয়াশঙ্কার বন্ধুর পথে। আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত শারীরিক শক্তি আর মানসিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি—মৃত্যুর শাসন এড়াতে পারেনি—তখনই যে এই আত্মসমর্পণের বৃত্তি তীব্র হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জীবনকে সব বিপদ—সমস্ত অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাবার প্রয়োজন অরণ্যচারী আদিম মানুষের সহজাত প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের সমস্ত বাস্তব বাধা-বিপদ—অজানা অনিশ্চয়তা—প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অর্বাচীন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় দূর করা কি সম্ভব ছিল? নিশ্চয়ই নয়। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আদি পূর্বপুরুষরা নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল সেই মহাশক্তিরই উপর; যার করুণায় মহাজাগতিক—জাগতিক ঘটনাগুলি প্রতিক্ষণেই মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে বিপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের বিচিত্র পরিবেশে। জন্মমৃত্যুর রহস্য তার জানা ছিল না—কিন্তু অঙ্কুর থেকে নতুন প্রাণের জন্মের অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল নিশ্চয়ই। কেমন করে সম্ভব হয় এই নতুন প্রাণের সঞ্চার? আত্মবিস্তারের ধারা এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে ধাবমান; কিন্তু এই অবিচ্ছিন্ন বিস্তারের মূল কারণ কি? কে??

জন্ম হয় নতুন প্রাণের—মৃত্যু ঘটে পুরানো জীবনের—এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও ছিল না কোন ব্যতিক্রম—এতটুকু ফাঁক। এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যাখ্যাই সেই অতীতে বন্য জন্তু শিকারী মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে আশ্রয় পায়নি। জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্যের সমস্যা সেদিনের মানুষের নিজ ক্ষমতায় সমাধান করা সম্ভব হয়নি বলেই না মানুষ নির্ভর ক'রেছিল এক অজ্ঞাত অজ্ঞেয় শক্তির উপর—যার অমোঘ নিয়মে এই জড়জগতে জীবন্তদের জন্মপ্রবাহ কোনদিনই রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি। ঐ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধি যুক্তি ও মেধার মাপকাঠিতে যে মুহূর্তে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক ঘটনাবলীর মর্মোদ্ঘাটন করা অসম্ভব হয়ে প'ড়েছিল তখনই মানুষ এই সত্যতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল যে, এই বিরাট পৃথিবী এক অতি প্রাকৃতিক শক্তিরই শাসনে চালিত হচ্ছে। এই অতি প্রাকৃতিক শক্তির সঠিক রূপ কি ও কেমন সে বিষয়ে গোড়ায় কোন বাস্তববোধ অবশ্যই ছিল না, আর না থাকার ফলে অন্যদিকে আদিম মানুষ অন্য একটি সত্যতা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস আর স্বীকার ক'রে নিয়েছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত জড় জীবন্ত বস্তুই হচ্ছে এই অতি প্রাকৃতিক শক্তির পবিত্র আধার। এই বিশ্বাসের মূলে নাই বা থাকল কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা, নাই বা রইল যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ, তবুও এই বিশ্বাসের জোরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ উপলব্ধি ক'রেছিল—অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাথে তার নিকট সম্পর্ক সৃষ্টি ক'রেছিল আদিম ধর্মভাব ধারণাগুলির সহজ অথবা জটিল কাঠামো। এই আদিম ভাব ধারণাগুলি আজও বেঁচে আছে গাছ পাথর নদীনালা জন্তু জানোয়ারের পূজাচারের মধ্যে—বেঁচে আছে আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার আরাধনার আচার-বিচারে। এই পূজাচার আর আরাধনার আচার-বিচারের মাধ্যমেই বিবর্তিত হয়েছে মানবধর্মের মৌলিক উপাদানগুলি।

আদিম অরণ্যচারী মানুষের জীবনে সে দিন প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা-বোধের মধ্যে

ছিলনা কোন ভেদাভেদ; তাই প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রবাহ একান্তভাবেই সংগঠিত ও সঞ্জীবিত ক'রেছিল মানুষের জীবনপ্রভাতের প্রতিদিনের প্রতিটি ঋতুচক্রের কর্মধারা। দৈনন্দিন জীবনের প্রগতি ও কল্যাণের জন্য সে অতীতে অরণ্যবাসী শিকারীদের আরাধনা করতে হয়েছিল অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে। তাকে প্রতিনিয়ত সাধনাও করতে হয়েছিল ঐ শক্তির—যার শাসনে যার কল্যাণে ঠিক সময়মত বৃষ্টি হয়—সূর্য ওঠে—বীজ অঙ্কুরিত হয়—বন্য শিকারের অভাব হয় না—বিপদ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়—অজানিত ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তা দূর হয়। মোটকথা, প্রতিদিন রাত্রির কাজকর্মে চলাফেরায় না আসে কোন অকস্মাৎ বিপর্যয়—না ঘটে কোন অভাবনীয় দুর্ঘটনার দুঃখ—বন্ধ হ'য়ে না যায় পুরুষানুক্রমের জীবনপ্রবাহ—এই ছিল আদিম মনের একান্ত কামনা—চিরন্তন আশা। ব্যক্তি কি সমষ্টিগত জীবনের প্রগতি আর মঙ্গলের জন্য কোন মতেই যেন অতি প্রাকৃতিক শক্তির শাসনে প্রাকৃতিক জগতের শৃঙ্খলিত সৃষ্টি ও ধ্বংসের স্রোত ব্যাহত না হয়—এই ধ্যান ধারণাই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অত্যাবশ্যক অবলম্বন হ'য়ে সংগঠিত হ'য়েছিল কালের প্রবাহে। যেহেতু সেদিন অর্বাচীন, বন্যপশুপাখী-শিকারী আদিম মানুষের কোন ক্ষমতাই ছিল না কোন নৈসর্গিক অথবা জাগরিত ঘটনা শাসন করার, নিয়ন্ত্রিত করার—তাই মানুষ নিতান্ত অসহায় ভাবে নিজেকে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল ঐ অতিমানব শক্তির কাছে। আত্মসমর্পণের ভাবটি চূড়ান্ত ভাবে দানা বাঁধল সেই শক্তির রূপ কল্পনায়, আরাধনায়, সাধনায়। সাধনা আরাধনার পদ্ধতিগুলিও ক্রমে ক্রমে নিয়মবাঁধা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই স্থায়ী হয়ে গেছে যুগের প্রবাহে—সভ্যতার বিবর্তনে—মানবীয় ধ্যান ধারণার পরিবর্তনে—পরিবর্ধনে।

কালের স্রোতে একদিকে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণগুলিও ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এর অভিঘাত পড়েছে আধুনিক ধর্মভাব ও বিশ্বাসের কাঠামোগুলিতে। যুগে যুগে ধর্মের রূপ বদলেছে—ধর্মের ব্যাখ্যা পরিমার্জিত হ'য়েছে—ধর্মাচারের নিয়ম কানুন আরও জটিলতার মধ্যে সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু এখনও ঐ প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করা সম্ভব হয়নি—সম্পূর্ণ হয়নি মানুষের অবিস্মরণীয় জিজ্ঞাসা—কে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা? জন্ম মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন ধারা কার শাসনে—কালের শাসন অগ্রাহ্য করে চলেছে? কে সেই বিশ্বরচক যার শুভ ইঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে ঐ অসীম নীলাকাশ—গহন ভয়াল অরণ্যানী—উদ্বেল ভয়ঙ্কর সিন্ধু? কোথায় সেই শক্তিমান বিরাট যার ছায়া দেখি ঐ তুষারাচ্ছন্ন উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরে—চির-শ্যামল শস্যভারে আনত ক্ষেত-প্রান্তরে—ঘনকুন্তল-কাল মেঘপুঞ্জে—রামধনুর সাত রঙের ছটায়—নানা ফুলের, নানা ফলের বর্ণালীর বিচিত্র বিন্যাসে?

উত্তর কি? কে জানে?? তাই শুধু বিশ্বাসেই মিললো সে উত্তর—"তর্কে নয়,"—কিন্তু তবু—তবু তো প্রশ্ন থেকে যায়—শেষ হয় না ঐ বিপুল শক্তির রহস্য উন্মোচন করার অদম্য কৌতূহল—অশেষ অধ্যবসায়। তাই এখনও ধর্মের প্রভাব থেকে মানুষ মুক্ত হ'তে পারেনি—মুক্ত হ'তে পারেনি ধর্মীয় ভাব-বিশ্বাসের জটিল জটাজাল থেকে। মুক্তি পায়নি চিরনূতন বিশ্বস্রষ্টার পায়ে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ-ভাব—যে ভাবের ভাবনায় মানবকণ্ঠেই একদিন ধ্বনিত হ'ল—

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং,
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—

কে এই তিনি?? তারই সর্বকালজয়ী মহাশক্তির স্বরূপ উপলব্ধিতে বিভিন্ন মানবসমাজের বিচিত্র ধর্মের বিপুল অভিব্যক্তি—জটিল প্রবাহ। প্রাগৈতিহাসিক

প্রস্তর-যুগবাহী সভ্যতা পার হ'য়ে এই প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হয়ে আজও বেঁচে আছে বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে—বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রকৃতির লীলার শেষ নাই—শেষ নাই তাঁর অলৌকিক শক্তির অপূর্ব বিকাশ—তাই শেষ নাই মানুষের চিরন্তন ধর্মজিজ্ঞাসা।

দিশারী

। 'প্রস্বনী' ছন্দে লিখিত ।

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তব স্বপ্নে মম সত্তা ওঠে নিত্য বিভাসি'
ওগো দীপ্ত প্রেমে মগ্ন চির দিব্য-স্বপনী !
প্রাণ-সূর্য তব ছন্দ-গানে আত্ম-প্রকাশি'
করে মূর্ত সারা চিত্তে হেম স্বর্গ-সরণী ॥

ধ্রুব-কান্ত তরে মুগ্ধা রাধা কৃষ্ণ-পিয়াসী
জাগো বিশ্ববুকে,—ধন্য তব পুণ্য লীলা-ছল
শিব-অঙ্ক লাগি' পঙ্কমাঝে পদ্ম-বিলাসী
ফোটে উদ্ভাসন-মন্ত্রে মেলি' শুভ্র হিয়া-দল ॥

দানি' মর্তে তব স্বর্ণ-দিশা, শঙ্কা নাশি' হায়
তব শঙ্খ ওঠে মর্মে বাজি'—ক্ষুদ্র ধরাতল
কী আনন্দে হয়ে মত্ত তব স্পর্শ আজি চায়,
ওগো সত্য, হে আদিত্য, চিরশান্ত, সুবিমল ॥

দেব অর্ঘ-সম সত্তা তব দিব্য-চরণে
লভি' পূর্ণ নব-জন্ম তব নিত্য-শরণে।

উর্বশী*

শ্রীমতী বাসনা দেবী

সমগ্র ভারতীয় স[illegible] বেদ। বহু বৈপ্লবিক ঘাত-প্রতিঘাতে ভারত আজও যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার কারণ হিন্দুশাস্ত্ররাশি আজও সেই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সাধারণতঃ আমরা বেদ বলতে খুব চলতি কথায় যা বুঝি তাই কিন্তু বেদের পুরোপুরি অর্থ নয়। লোকে যেমন বলে—'এ লোকটি খুব পণ্ডিত—এর বেদবেদান্ত পড়া আছে।' বেদবেদান্ত কথাটি যেন এক সঙ্গেই চলে এসেছে। বেদ [illegible] ক্রিয়া তা নয়, বা কেবল নীতিবাক্যের সমাবেশ তাও নয়। ভারতবর্ষ সত্যিই এক বিচিত্র পুণ্যভূমি। তার সভ্যতাকে জাহির করার জন্য যে গ্রন্থকে ভারতবর্ষ খাড়া করেছে তাতে আছে না আছে এমন বস্তু নেই। সমস্ত বেদশাস্ত্রকে অতি নিপুণভাবে পড়বার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। যদি কিছু অংশও পড়া যায় তবে দেখা যায়

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে

এই বেদের মধ্যেই ধর্ম, দর্শন, ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য সবই বিদ্যমান। অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আজ আমরা কাব্য ও সাহিত্যের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

ভারতীয় সাহিত্য ও কাব্য যে পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার উৎস বেদ। বেদে যে সমস্ত ঋতুবর্ণনা ও প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোকে অবলম্বন করেই বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কাব্যের মধ্যে যে বিভিন্ন রসসৃষ্টি হয়েছে এবং শৃঙ্গার, বীর, ভয়ানক, করুণ প্রভৃতি এক একটি রসকে অবলম্বন করে সুমধুর কাব্য রচিত হয়েছে—অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তার মূল বেদেই নিহিত রয়েছে।

উর্বশীর প্রসঙ্গ আমরা প্রথম বেদের মধ্যে দেখতে পাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন—দেবী, অসুরী, মানবী, অপ্সরী ও কিন্নরী। অপ্সরী ও কিন্নরী এই দুটি জাতিকে গন্ধর্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তা বলা যায়।

বেদের টীকাকার সায়নাচার্য উর্বশী শব্দের অর্থ উষা করেছেন। বেদের মধ্যে পুরূরবা ও উর্বশীর যে গল্প আমরা পাই তাতে টীকাকার বলছেন—পুরূরবা শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হলে উষা আর থাকে না। পুরূরবাকে পরিত্যাগ করে উর্বশী যে চলে যাচ্ছে সেটা যেন সঙ্কতই কারণ রূপক দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সূর্যের সঙ্গে উষা কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না।

অপ্সরী ও কিন্নরীদের এই বৈশিষ্ট্য ছিল—অপ্সরশ্রেণী খুব সুন্দরী রূপসী নৃত্যশীলা রূপে পরিচিতা আর কিন্নরীরা সুকণ্ঠী গায়িকা। সেজন্য লোকে কথায় বলে কিন্নরকণ্ঠ। এই দুই শ্রেণীরই দেবশরীর—মর্ত্যের মরণশীল মানুষের মত তারা বাস করতে পারে না। অথচ দেবতাদের মত তপস্যা প্রভাবে তারা কোন শক্তিলাভ করতেও পারে না।

উর্বশীর রূপ-বর্ণনায় বলা হয়েছে "আকাশ থেকে পতনশীল বিদ্যুতের মত ঔজ্জ্বল্য ছিল আর সে রূপচ্ছটায় চন্দ্রমা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়।"

বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তি যে অপ্যা কাম্যানি
জনিষ্টো আপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ু॥

ঋগ্বেদ (১০।৮।৯৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধে উর্বশীর উৎপত্তি আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে। রম্ভা, মেনকা, উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গের অপ্সরাগণের মধ্যে উর্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মানবী দেহ ধারণ করেছিল এবং স্বর্গচ্যুত হয়েছিল।

শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা
তদান্তকমুপেয়ায় দেবী স্মরপরাদিতা
মিত্রাবরুণয়োঃ পাপাদাপন্না নরলোকতাম্
নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্।

ইন্দ্রের ভবনে দেবতাগণ যখন সমবেত হয়েছেন, সেখানে অপ্সরীদের নৃত্যগীতের আসর বসেছে, অন্যান্য অপ্সরীগণ গীতিমাধুর্যে ও নৃত্যকুশলতায় সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করছেন এমন সময় উর্বশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে দেখে মিত্রাবরুণ তাকে অভিশাপ দিলেন।

মহাভারতের বনপর্বের মধ্যে আমরা এই উর্বশী-আখ্যায়িকা দেখতে পাই। উর্বশী অর্জুনের কাছে এসে বলেছিল—

ন কেবলং হি শত্রেণ প্রেষিতা চাহমাগতা
চিরাভিলষিতো বীর মমাপ্যেষ মনোরথঃ।

অর্জুন তার উত্তরে উর্বশীকে মায়ের মত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন—

'ন মামর্হসি কল্যাণি অন্যথা গন্তুমঙ্গনে
গুরোর্গুরুতরী ত্বং মে মম বংশবিবর্দ্ধনী
যথা কুন্তী চ মাদ্রী চ শচী চৈব সমা ইহ
তথা স্ববংশজননী ত্বং হি মেঽদ্য গরীয়সী।
গচ্ছ মূর্দ্ধা প্রপন্নোঽস্মি পাদৌ তে বরবর্ণিনি
ত্বং হি মে মাতৃবৎ পূজ্যা রক্ষ্যোঽহং পুত্রবৎ ত্বয়া।

অপ্সরীরা যে শুধু নৃত্যশীলা রূপসী ছিল তা নয়।

শাস্ত্রজ্ঞানও তাদের ছিল এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে দেখতে পাই উর্বশী মহারাজ পুরূরবাকে বল্ছে—

"এই সকল দেবতা তোমাকে বলছেন তুমি মৃত্যুজয়ী হবে। স্বীয় হোমদ্রব্য দ্বারা দেবতাদের পূজা করে তুমি স্বর্গে যাবে।"

"ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি
মাদয়াসে"। (১০।৮।৯৬।১৮)

হিন্দু-ধর্মের অমর বাণী—'ত্বমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি' উর্বশীর জানা ছিল।

শ্রীমদ্ভগবতেও ঠিক এই কথাই উর্বশী বলেছে। তার কথার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে।

"তেন যজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্
উর্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্বদেবময়ং হরিম্
এক এব পুরা বেদঃ প্রণব সর্ববাঙ্ময়
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নি বর্ণ এব চ।"

হরি যে সর্বদেবময় এবং প্রণবশব্দ যে সমস্ত শব্দের গূঢ়ার্থসূচক উর্বশীর কথাপ্রসঙ্গে জানা যায় যে, ভারতীয় রহস্যবিদ্যা তার জ্ঞাত ছিল।

মহাকবি কালিদাস এই উর্বশীর কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত 'বিক্রমোর্বশী' লিখেছিলেন। বিক্রমোর্বশী নাটকের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের সেই বৈদিক যুগেই চলে যেতে হবে। বেদের মধ্যে যেটা মাত্র আখ্যায়িকারূপে বর্ণিত হয়েছে কবি কালিদাস তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও নিপুণ রচনাশৈলীর দ্বারা তাকে নাটকে রূপায়িত করেছেন।

উর্বশীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনায় কবি কালিদাস গেয়েছেন—

অস্যা সর্গবিধৌ প্রজাপতিশ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃংগারৈকরসঃ স্বয়ং ন মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলো
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ।
(বিক্রমোর্বশী)

সমস্ত অপ্সরীরা নারায়ণ ঋষির যোগবিঘ্নসৃষ্টি করতে গিয়েছিল। নারায়ণ ঋষি উরু থেকে উৎপন্ন এই উর্বশীকে দর্শন করে লজ্জিত হয়েছিলেন। কারণ উর্বশীকে তপস্বীর সৃষ্টি বলে মনে হয় না। একে সৃষ্টি করার জন্য চন্দ্র স্বয়ং প্রজাপতি হয়ে নিজের উজ্জ্বল কান্তি বিতরণ করেছেন। নইলে নরনারায়ণ কি করে এই মনোহর রূপনির্মাণে সমর্থ হবেন?

ঠিক এমনি লীলায়িত ছন্দে কবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলায় শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করেছেন—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।"

শকুন্তলার শরীরসৌন্দর্য চিন্তা করে এটাই জানা গেল যে বিধাতা জগতের সমস্ত নির্মাণসামগ্রী এক জায়গায় আহরণ করে রূপরাশির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই যেন অপর একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করেছেন।

অপ্সরীদের রূপ-মাধুর্য প্রকৃতির সঙ্গে যে কত সুনিবিড় যোগ রেখেছিল তার পরিচয় দিচ্ছেন কালিদাস—

বহুকুসুমিতাস্বপি সখে নোপবনলতাসু রম্যবিটপাসু
চক্ষুর্দধাতি ধৃতিং তদঙ্গনালোকদুর্ললিতম্।

পৌরাণিক কাহিনী থেকে আমরা দেখতে পাই উর্বশী মিত্রাবরুণের অভিশাপে ধরায় এসেছিল। কিন্তু মহাকবি কালিদাস তাঁর নাটকের মধ্যে অন্য রূপে দেখিয়েছেন। উপাধ্যায় মহর্ষি ভরত যখন অগ্নিশরণ গৃহ থেকে মহেন্দ্রভবনে গিয়েছিলেন তখন 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নামে এক নাটকের দ্বারা দেবসভা পরিতুষ্ট করেছিলেন। এই নাটকে উর্বশী লক্ষ্মী সেজেছিল আর মেনকা বারুণী সেজেছিল। মেনকা যখন উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেশবের সঙ্গে ত্রৈলোক্যের সমস্ত পুরুষ সমাগত হয়েছেন, হে উর্বশী তোমার হৃদয় এখন

কোথায় অভিনিবিষ্ট আছে? উর্বশী তখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, পুরুষোত্তম বলতে গিয়ে পুরূরবা শব্দ উচ্চারণ করে ফেললো। পুরুষোত্তমই জগতের অধিপতি ও পালয়িতা, লক্ষ্মীর হৃদয় তো তাতেই সমাসীন হবে? কিন্তু উর্বশী নাটক করতে গিয়ে হঠাৎ সে চিন্তা ভুলে গিয়ে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করে ফেলেছিল। ভরতমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়েছিলেন—"আমার উপদেশ তুমি লঙ্ঘন করলে, তোমার দিব্য-জ্ঞান হবে না।" দেবরাজ ইন্দ্র তখন উর্বশীকে লজ্জায় অধোমুখী দেখে বলেছিলেন—"কিছুকাল মর্ত্যবাসের পর তুমি আবার স্বর্গে আসতে পারবে।"

কবি কালিদাস নাটক রূপায়ণের জন্য বহু ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন—উর্বশী কুমারবনে প্রবেশ করে লতারূপে পরিণত হলো, তারপর সঙ্গমণীয় মণি দ্বারা মহারাজ পুরূরবা যে তাকে উদ্ধার করলেন এ কালিদাসের মৌলিক রচনা।

উর্বশী-চরিত্র রচনায় আমরা দেখতে পাই অতি প্রাচীন ভারত এক অপরূপ রূপ-সৌন্দর্যের কল্পনা করেছিল। সমস্ত রূপসাগর মথিত করে রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্বশী এই সব অপ্সরীদের চিত্র এঁকেছিল। বুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে যেমন ভারতীয় মন পৌঁছতে পেরেছিল—একই আত্মার স্ফুরণ সর্বভূতে অনুভব করে যেমন অনুপম অদ্বৈতবাদ ভারতের অতুলনীয় দান—তেমন পাঞ্চভৌতিক সৌন্দর্য মাধুর্যের উৎকর্ষ এই উর্বশীর রূপ কল্পনায় নিহিত রয়েছে। অধ্যাত্মরাজ্যে যেমন ভারতপ্রাণ উচুস্বরে বাঁধা তার শিল্পরসসৃষ্টিতেও সেই সুর একই তানে বেঁধেছিল। তাই সম্ভব হয়েছিল এমন সব চরিত্র-কল্পনা। আবার যখন প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখে কবিপ্রাণ মুগ্ধ হয়েছিল, তাঁরই লেখনী সেই ছন্দোময়ী সুরে বেজে উঠেছিল—

"বাপীজলানাং মণিমেখলানাং
শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্
চূতদ্রুমানাং কুসুমানতানাং দদাতি সৌরভ্যময়ং বসন্তঃ
কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরবনূপুরণাদরম্যা
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নবধূরিব রূপরম্যা।" (ঋতুসংহার)

উর্বশীর লাবণ্যবর্ণনায় কবিকণ্ঠ যখন ধ্বনিত হয়েছে—

আবির্ভূতে শশনি তমসা রিচ্যমানেব
রাত্রির্নৈশস্যার্চিহুতভুজ ইব ছিন্ন ভূয়িষ্ট ধূমা
মোহেনান্তবরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গারোধঃ পতন কলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥
(বিক্রমোর্বশী)

তখন মনে হয় কবির প্রাণ যেন প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যতান বেঁধেছে আর তারই সুরলালিত্য যেন উর্বশী প্রভৃতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নবীন ভারতও প্রাচীনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মূর্চ্ছনায় বেজে উঠলো—

"নহ মাতা নহ কন্যা
নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

"এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রীভূত করিবার, তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, আর সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্মরণে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, বি-এড্

আমার জীবনে যত বার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ঘটিয়াছে আমি নিজস্মৃতি হইতে সেগুলি সংকলন করিয়া উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমি এই ঘটনাগুলির সময় লিপিবদ্ধ করি নাই। সুতরাং সেগুলির সময় নির্ণয় করিতে পারিলাম না। সুধী পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীমাকে আমি সর্বপ্রথম দর্শন করি, নীলাচল-ধামে। তখন রেলগাড়ীর চলাচল সবে শুরু হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বড়ছাণ্ডের উপর, শ্রীমন্দিরের অদূরবর্তী, ক্ষেত্রবাসী মঠে বাস করিতেছেন। বাড়ীটির দেওয়ালগুলি চূণকামকরা এবং বাড়ীটি খড় দিয়া ছাওয়ান। আমি, আমার মা ও মধ্যম ভ্রাতা ৺কৈলাসচন্দ্রের সহিত শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থানে গেলাম। কৈলাসদাদা গৌরবর্ণ ও আমি কৃষ্ণবর্ণ। মা আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়া "এস, কৃষ্ণ বলরাম এস" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন দাদার বয়স বোধহয় ১৭ ও আমার বয়স সম্ভবতঃ ১৪। আমরা এই প্রথম দর্শনের পর আরও দু'একবার তাঁহার কাছে সেই ক্ষেত্রবাসী মঠে গিয়াছি। তিনি পূর্ববৎ আমাদিগকে "কৃষ্ণ বলরাম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

প্রায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথমবার কলিকাতা গিয়া যোগোদ্যানে থাকি। সেখান থেকে একাকী কামারপুকুর ও পরে জয়রামবাটী যাত্রা করি। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। আমি পূর্বাহ্ণে তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সময় তিনি দুটি পা ছড়াইয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। আমার সঙ্গে একটু কথা বলিবার পর আমাকে একটু রামায়ণ পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। আমি ৫।৭ মিনিট পড়িবার পর তিনি উঠিলেন এবং যখন জানিলেন আমি কামারপুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছি, আমাকে জলযোগ করাইলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার মাতা (আমাদের আই-ঠাকুরাণী)র সহিত পূর্বাহ্ণের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা-ই সব রান্না করিলেন। তিনি নিজহাতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া আমাকে সস্নেহে খাওয়াইলেন। এমন পরিপাটীর সহিত রান্না আমি জীবনে অল্পই খাইয়াছি। আমার খাওয়া হইয়া গেলে আমি এঁটো পাড়িতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বলিলেন, "থাক্, থাক্, ওসব করার জন্য লোক আছে। তুমি একটু ততক্ষণ বিশ্রাম করগে।" আমি বাহিরে গেলাম। অল্পক্ষণ পরে ভিতরে আসিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা নিজহাতে উচ্ছিষ্ট উঠাইতেছেন। আমি তাঁহাকে বারণ করায় তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমার ছেলে নও? মা কি ছেলের এঁটো পাড়ে না?" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া নিরস্ত হইলাম, কিন্তু মনটা ব্যস্ত হইল।

খাওয়ার পর আই-ঠাকুরাণী পান খাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "আমি পান খাই না।" তিনি বলিলেন, "তবে আর কিছু খাও। একটা কিছু নেশা ক'রতে হয়।" তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "কেন, ও যখন কোন নেশা করে না, তখন একটা নেশা করার কি দরকার?" আমি বলিলাম, "ভাত খাওয়ার পর আমার কোন কিছু খাওয়ার দরকার হয় না।" শ্রীশ্রীমা, "ভালই" বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

তাহার পর শ্রীশ্রীমা, আই-ঠাকুরাণীর সহিত খাইতে বসিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া নিকটে

বসাইলেন। আমি তখন ১৫।১৬ বৎসরের ছেলে-মানুষ। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আর কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে? আমাদের সঙ্গে খাও না?" আমি বলিলাম, "না মা, আমার পেট ভরা।" তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে শ্রীশ্রীমা বাহিরের ঘরে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দীক্ষা হয়েছে?" আমি বলিলাম, "না মা, আমার দীক্ষা হয় নাই। আমার সন্ন্যাসী হওযার ইচ্ছা। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা লইব বলিয়া স্থির করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "তা ভালকথা। তাই হবে।"

জয়রামবাটী হইতে যোগোত্থানে ফিরিয়া গেলাম। অল্পদিন পরে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) যোগোত্থানে আসিলেন—যোগোত্থানের পরিচালক স্বামী যোগবিনোদের সশ্রদ্ধ নিমন্ত্রণে। তিনি আমাকে আমার দীক্ষা লইবার কথা প্রশ্ন করিলে, আমি তাঁহাকে উপরোক্ত ঘটনার কথা বলিলাম। মহারাজ বলিলেন, "তুমি করলে কি? হাইকোর্ট ছেড়ে, মুনসফ. কোর্টে এলে?" আমি ইহা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলাম।

তখন যোগোত্থান হইতে 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। আমি তাহাতে "পুণ্যভূমি কামারপুকুর দর্শন" নামে একটি প্রবন্ধ ছাপাইব বলিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলাম। পরে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়কে (কথামৃত-কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাহা দেখাইতে লইয়া গেলাম। তিনি প্রবন্ধটি দেখিয়া আমাকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীমার অপার স্নেহের এতগুলি কথা ছাপিও না। কিছু বাদ দাও। তা' না হলে, যে কেহ তাঁর কাছে যাবে, সে ব'লবে, মা আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করলেন না কেন?" তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী আমি প্রবন্ধের কিছু অংশ বাদ দিলাম।

একবার কাঁকুড়গাছি যোগোত্থানের অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদ কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করিবার সংকল্প করেন। তিনি বেলুড় মঠের সাধুদিগকে এবং বহু ভক্তকে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

তিনি কামারপুকুরে পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে লইয়া আসেন। উৎসব সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইল। যাঁহারা সে উৎসবে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সহজে সে উৎসবের মাধুর্য ভুলিতে পারিবেন না।

আমার তখন বয়স প্রায় ২১।২২। আমা হইতে বুদ্ধি, বিদ্যা, ভক্তি ও বয়সে বড়, বহু ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা, কেন জানি না, আমাকে বারংবার ডাকিয়া তাঁহার কাছে বসাইতেন। ভারত এবং ভারতেতর দেশবাসী তাঁহার সন্ন্যাসী ও ভক্ত সন্তানগণের পত্রাবলী আমাকে দিয়া পড়াইতেন ও পত্রগুলির উত্তরও লেখাইতেন। আমি ইহাতে নিজেকে কত যে ভাগ্যবান মনে করিতাম, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমার নিকট থাকিবার সময় তিনি আমাকে রাধুর বিবাহের কথা বলিলেন। দেখিলাম তিনি রাধুর—তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ রাধুর বিবাহের জন্য সর্বদা চিন্তান্বিতা। তখন আমি বলিলাম, "মা, মাষ্টার মহাশয় মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসনের কর্তা। তাঁকে বললে তো তিনি সেখানকার ছেলেদের ভেতর থেকে একটি ভাল পাত্র স্থির করে দিতে পারেন। এই কথা শোনা মাত্র শ্রীশ্রীমা তাঁর স্বাভাবিক মৃদুতা পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি? আমি কোন ছেলেকে বন্ধনে ফেল্‌তে বলবো? কেউ নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে করুক, আমি কারুকে বন্ধনে ফেলতে বলবো না।" তাঁর এই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। জানিলাম ইঁহারা "মৃদুনি কুসুমাদপি" হইলেও সময় ও ঘটনা বিশেষে "বজ্রাদপি কঠোরাণি।"

একবার আমি যোগোত্থানে থাকিবার সময় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্বোধনবাড়ীতে

যাই। সেখানে পৌঁছিবামাত্র একজন সাধু বলিলেন, "মা এখন ক্লান্ত, দেখা হবে না।" আমি বলিলাম, "আপনি দয়া করে তাঁকে খবর দিন। তিনি যা বলবেন তাই হবে।" তিনি ঐরূপ করিলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কৃষ্ণ? সে কী রামের বাগানের কৃষ্ণ?" সাধুটি আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিলাম, "বলে দিন, হ্যাঁ আমি রামবাবুর বাগানের কৃষ্ণ।" শ্রীশ্রীমা আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া লইলেন এবং আমাকে দেখিয়াই ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "মা সকলের সামনে ঘোমটা দেন কেন? তিনি বলিলেন, "দেখ যাদের ভিতর পুরুষভাব প্রবল, তাদের সামনে ঘোমটা দি, নচেৎ সকলের সামনে দি না।" তারপর যোগোদ্যানবাসী সাধু ব্রহ্মচারীদের কুশল প্রশ্ন করিলেন ও আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিলেন। আরও কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আছেন। তাঁহার বেলুড় মঠের সন্তানগণ তাঁহাকে বেলুড় মঠে অভিবাদন করিবার জন্য স্থির করিলেন। অনুরূপ সাজসজ্জায় মঠ সুসজ্জিত হইল। আমি যোগোদ্যান হইতে সকাল আটটার মধ্যে মঠে পৌঁছিলাম। সকলে শ্রীশ্রীমার আগমনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন। মঠ সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দে পূর্ণ। মঠের প্রবেশ-দ্বারে মাঙ্গলিক ঘটদ্বয় আম্রপাতায় সুশোভিত।

শ্রীশ্রীমায়ের আসিবার সময় উপস্থিত—সকাল প্রায় ৯টা। যে রাস্তায় তিনি আসিবেন, সেই রাস্তার দুইধারে সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। পূজ্যপাদ মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), প্রমুখ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তাঁহার পুণ্য দর্শনের আশায় চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীমার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে ৯টা বোমার ধ্বনি হইল। কাহারও জানিতে বাকি রইল না যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-জননী বেলুড় মঠে শুভ পদার্পণ করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান সকলের মধ্য দিয়া আসিবার সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কোন অংশ লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। মনে হইতেছিল যেন কাপড়ের একটি সচল প্রতিমা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীশ্রীমা যখন ধীরপদক্ষেপে আসিতেছেন, তখন মহারাজের আদেশ হইল, "সাবধান, কেহ শ্রীশ্রীমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" সকলেই সাবধান হইলেন। হইলেন না মঠের সবচেয়ে ছেলেমানুষটি খোকা মহারাজ। তিনি আদেশ শুনিবার অল্পক্ষণ পরেই এক নিমেষে ব্যূহভেদ করে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করিলেন! সকলেই অবাক! মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে "ধর, ধর" বলিয়া চিৎকার করিলেন। কে কাহাকে ধরে! খোকা মহারাজ কাজ সারিয়া উধাও হইয়াছেন। এই ঘটনায় সকলের মুখে হাসি- সকলে খোকা মহারাজকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা মঠের প্রাঙ্গণে পৌঁছিলেন। তারপর দোতলায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে দোতলার এমন জায়গায় বসান হইল, যেখান থেকে তিনি—উৎসবের সব কিছু উত্তমরূপে দেখিতে পান।

অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাতঃকালীন ভোগ সমাপ্ত হইল। সেই প্রসাদের থালা শ্রীশ্রীমাকে সমর্পিত হইল। তিনি যৎসামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থালাটি নীচে পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন। স্বামীজীর শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সেই থালাটি হাতে করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে উদ্যত। এমন সময়ে ভক্তবর গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীশ্রী-ঠাকুরের প্রসাদ। শ্রীশ্রীমা তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়াছেন। আমি থাকিতে এ মহাপ্রসাদ বিতরণ আর কাহাকেও করিতে দিব না।" তৎক্ষণাৎ তিনি শরৎবাবুর হাত হইতে প্রসাদের থালাটি

লইয়া মাথায় তুলিলেন। তারপর উপস্থিত ৪।৫ জনকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া শরৎবাবুকে বলিলেন, "এবার তুমি বিতরণ কর।" এইরূপে প্রসাদ বিতরণের পালা শেষ হইল।

তারপর আরম্ভ করা হইল কালীকীর্তন। কালী-কীর্তন মঠে বহুবার হইয়াছে। অন্যত্রও কালী-কীর্তন শোনা গিয়াছে। কিন্তু আজকের কালী-কীর্তন যে কী মধুর হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। শ্রীশ্রীমা উপর হইতে মনোযোগ দিয়া কীর্তন শুনিতেছেন। মহারাজ একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। তিনি তামাক সেবন করিতেছেন। তাই হাতে হুঁকার নল। সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলী মঠের উঠানে কীর্তনমণ্ডলীর চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইয়া কীর্তন-সুধা পানে উন্মত্ত।

এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। পূজ্যপাদ মহারাজের হাত হইতে হুঁকার নলটি খসিয়া পড়িল। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া সমাধিস্থ! সকলে স্তব্ধ! কালী-কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি সেই সমাধিমগ্ন সন্ন্যাসীবরের উপর। দুই ঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু তাঁহার সমাধি ভাঙ্গে না। তখন শ্রীশ্রীমা কী এক নাম বলিয়া এক ব্রহ্মচারীকে মহারাজের নিকট নীচে পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত ব্রহ্মচারী, মহারাজের কানে উক্ত নামটি উচ্চারণ করা মাত্র মহারাজের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি চতুর্দিকে চাহিয়া, "চলুক্, চলুক্" বলিয়া কালী-কীর্তনকে ইসারা করিলেন। তাঁহার উক্তি শুনিয়া মনে হইল যেন ২।৩ মিনিট আগে কীর্তন চলিতেছিল। কীর্তন যে দুই ঘণ্টার উপর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার হুঁস নাই।

কালী-কীর্তন শেষ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ন-ভোগ হইল। শ্রীশ্রীমা প্রসাদ পাইলেন। তারপর উপস্থিত সকলে আকণ্ঠ প্রসাদ পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিলেন!

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। তিনি আবার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়-মান ভক্তগণের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি ফটকের নিকট পৌঁছিবার সময় আবার নয়টি কামান-ধ্বনি করা হইল। লোকে জানিল শ্রীশ্রীমা আনন্দের হাট শেষ করিয়া আজকের মত মঠ হইতে বিদায় লইলেন।

এইরূপে মহানন্দপ্রদায়িনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদামণির পুণ্য প্রতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। আমিও যোগোদ্যানে ফিরিলাম।

সবার মা

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

জননী সারদামণি!
যুগ-অবতার পূজিলেন তব চরণকমলখানি।
সামান্যা নারী তুমি তো নহ মা কভু
পরমাপ্রকৃতি—ঘোষেন বিশ্ব-প্রভু।
ধন্যা মোদের বঙ্গমাতা যে তোমারে কন্যা পেয়ে
কত শত প্রাণ উঠিল জাগিয়া মাতৃমন্ত্র গেয়ে।

এলো কেশদাম দুলিছে বক্ষোপরি
অকৃপণ করে পড়িছে অভয় ঝরি।
সর্ব দেহেতে স্বর্গ-সুষমা মাতৃরূপেতে ফুটে
স্নিগ্ধ চাহনি নিমেষে নিতেছে সন্তান-মন লুটে।

বাঁকুড়া জেলার অজানা সে এক গ্রাম
আজ কে না জানে পরম পুণ্যধাম ?
জয়রামবাটী চির-বরেণ্যা তোমারে অঙ্কে ধ'রে
পর্ণকুটিরে চরণের ছায়া রেখে গেলে চিরতরে।
স্বরূপ লুকায়ে অতি সাধারণ রূপে
সবাকার সেবা করেছ মা চুপে চুপে।
কঠোর সাধনা সাধিলে কতই কত না যাতনা স'য়ে
সকলের দুঃখে কাঁদিলে আপনি সবাকার ব্যথা ব'য়ে।

জননি তোমার পূত চরিত্র-ধারা
সারা ভুবনেরে করিল আপনা হারা।
মহা-ভারতের আদর্শ নারী হে মহিমময়ী মাতা
দিকে দিকে কত ভকত-হৃদয়ে তোমারি আসন পাতা।
ভক্তির সুধা বিতরিলে কল্যাণি—
দিলে চেতনায় নূতন দ্যোতনা আনি।
নিবিড় আঁধারে তোমার জীবন ধ্রুবতারা সম জ্বলে
বিশ্ব-নারীর পথ-নির্দেশ সেই আলোতেই মিলে।

জননী সারদামণি !
যুগাবতারের সকল শক্তি অভেদ তোমাতে জানি।
সার্থক মাগো সাধিয়া আপন কাজ
সঙ্ঘ-জননী শুধু তো নহ মা আজ।
জগদ্-বন্দ্যা সবার মা তুমি শ্রীচরণ তব ধরি—
রাখিনু মিনতি রেখো মা সতত পদরেণুকণা করি।

শিক্ষার সাফল্য

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

[**ভূমিকা**—স্বদেশী-আন্দোলনের প্রভাবে এই শতকের গোড়ার দিকে দেশের শিক্ষার প্রতি সেই সময়কার মনীষীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বিদেশী শিক্ষার সংঘাত থেকে জাতির অবসন্ন মনকে উদ্ধার করবার জন্তে সেই সময় বাংলা দেশে একটা প্রাণবন্ত শিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং সেই প্রেরণা থেকেই ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা 'জাতীয় শিক্ষা' এই উপলক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। নানাকারণে কয়েক বছরের মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রভাব শিথিল হয়ে আসে। তখন ১৯১৯ সাল নাগাদ আবার একটা নতুন উদ্যোগ মাথা তুলে ওঠে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা জোগাবার জন্তে দেশের চিন্তানায়কদের নিয়ে জ্ঞান-প্রচার-সমিতি নামে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হন এই সমিতির প্রথম সভাপতি। ভারতের কৃষ্টি ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বক্তৃতার আয়োজন এই সমিতি থেকে করা হয়। স্যার জন উড্রফ্ এই সমিতিতে প্রথম বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, তিনি অবশ্য তখন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর সেই বক্তৃতাটিই এখানে আজকের যুগের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হলো। শিক্ষা সম্বন্ধে সেদিন যে সমস্যা ছিল, সে সমস্যা আজ আরও গভীরতরভাবে দেশের লোককে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। মনে হয়, এক নতুন শিক্ষা-আন্দোলনের বলিষ্ঠ সূচনা হওয়া দরকার। —শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়]

শিক্ষা নামে যে জিনিসটা আমাদের দেশে চলিতেছে, সেটাকে যাঁহারা একটি বিরাট প্রহসন মাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কতকটা বাড়াবাড়ি করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, এ শিক্ষার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে এবং ইহা নিজের মূল শিকড়গুলি সত্যের গভীর স্তর পর্যন্ত চালাইয়া দিয়া নিজেকে সর্বতোভাবে বাস্তব ও যথার্থরূপে সফল করিয়া তুলিতে পারে নাই। এ দেশের উপর দিয়া পশ্চিমের সভ্যতার যে বেনোজল কিছুকাল ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহারই নরম পলিমাটিতে প্রধানতঃ এ শিক্ষার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং তাহারই রসে ইহার বিকাশ ও পরিপুষ্টি হইতেছে দেখা যায়; কিন্তু এই পলিমাটির নীচে দেশের বহু শতাব্দীব্যাপী সাধনার ও সভ্যতার যে জমাট ও সারাল মাটির স্তরগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সাজান রহিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ একথা আমাদের ভুলিলে চলিতেছে না যে সেই স্তরগুলিকে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে আমাদের দেশের মাটিতে বেশীর ভাগ আগাছা-পরগাছারই ফসল ফলিবে, কিন্তু কোনও ফলবান তরু নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, ঝড় বাতাসের সঙ্গে যুঝিয়া শীত-গ্রীষ্ম, শুখো ডুবো প্রভৃতি প্রকৃতির অবস্থা-বিপর্যয়-গুলিকে নিজের সেবায় ও সার্থকতায় পরিপূর্ণতা সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া নহে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি অপরাপর ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

মোটামুটিভাবে এ কথা সকলেই মানিয়া লন। আমাদের শিক্ষার ত্রুটী যথেষ্ট এবং ইহার অনেকটাই মিথ্যা, এ কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের যে প্রথিতযশা মনীষী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সর্বোচ্চ সনন্দখানিকে 'চোতা কাগজ' বলিয়া একদিন উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছের ভরমটা সভার মাঝে ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে কতকটা লজ্জা দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাবের ঘরে চুরি চলে না, সেই ভাবের ঘরে বসিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সত্যের বাজারে যাচাই করিতে যাইলে আমাদের সর্বোচ্চ সনন্দ-

গুলিরও জাল দলিল বলিয়া ধরা পড়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

পৃথিবীর ধূলামাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর যেন সন্ধ্যার একটি শুভ্র নির্মল আলোকরেখার মত স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও আজ সশরীরে যদি আমাদের মাঝখানে বিদ্যমান থাকিতেন, তো আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি হীরেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করিতেন না। কিছুদিন তাঁহার অন্তেবাসী হইয়া আমরা জানিয়াছিলাম যে শেষ জীবনে তাঁহার বেদ-সমুজ্জলা বুদ্ধি ও সদাচার-মার্জিত ব্রাহ্মণ্য-প্রকৃতি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিল এবং শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায়, অনুষ্ঠানে, আচারে ব্যবহারে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের যে পশ্চিমাভিমুখীনতার মোহ, যে অন্ধ অনুচিকীর্ষার ব্যাধি এবং পরকীয় গৌরবের আওতায় থাকিবার মিথ্যা অভিমান তাহাই তাঁহার ঋষি-দেবতা-বরেণ্য জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি হইয়াছিল। অমন জ্ঞান-গাম্ভীর্যের অন্তরালে যে সরস, কোমল, ভাবপূর্ণ হৃদয়খানি তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ও ও নানাবিধ জাতীয় অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা, অসারতা অশোভনতা গভীর বেদনার চাঞ্চল্য উৎপাদিত করিত, ইহা আমরা জানি।

শিক্ষার গলদ স্বীকার করিতে আমরা গররাজী নই। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি তেমন স্পষ্ট ও তীব্র নহে। এই জন্য এক্ষেত্রেও আমাদের কথা, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে পরস্পর মিল নাই। যেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মুখে সায় দিই, সেটাকে অন্তরাত্মায় তেমন নিবিড়ভাবে হয়ত তো অনুভব করি না। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অস্পষ্ট ও সাহসশূন্য, প্রতিপালনশিথিল, বাধা-প্রাপ্ত, অশোভন ও অসফল হইয়া থাকে।

গাহিতে বসিলে যে ব্যক্তির সুরগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গত হইল না এবং তাল, মান, লয়ের সংবাদ রাখিল না তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমাদের প্রশংসা অর্জন করিলেও আমরা তাহার শিক্ষাকে অস্বীকার না করিয়া পারি না। স্বভাব যাহা পাইয়াছে ও রাখিয়াছে শিক্ষা তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া অবসর দিবে; স্বভাবে যাহা কেবল সুন্দর, শিক্ষায় তাহা শিব ও সত্য হইয়া উঠিবে; স্বভাবে যেটি আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষায় সেটি সঙ্গতি; স্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা চরিতার্থতা; স্বভাবে যাহা অল্প, শিক্ষায় তাহা ভূমা।

এইজন্য যেখানে দেখি সুন্দর জিনিস সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাশ্বত এবং কল্যাণে সফল ও ধন্য হইল না, তাহাকে পাইয়া আমরা আদর করিলেও তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হইয়া বাস করিতে পারি না। ঝরণার জলে পিপাসা মিটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা নীচে গড়াইয়া না আসিল, ততক্ষণ তাহার জলে অবগাহন করিয়া এবং আমাদের মাটি সরস ও উর্বরা করিয়া তৃপ্ত ও ফলবান হইতে পারি না। অতএব শুধু প্রেরণা যথেষ্ট নয়, চরিতার্থতা চাই; আরম্ভ হইলেই হইল না, উপসংহার চাই; পাখীর ডাকে, পাতার মর্মরে, বাতাসের আকুল অভিসারে যে সুরলহরীগুলি এ বিশ্বে জাগিতেছে, মাধুর্যসম্পদে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে কি সেগুলির ন্যূনতা আছে? তবুও সে মহাসঙ্গীতে মানুষ নিজের ষোল আনা সব সময়ে ধরা দিয়া থাকিতে পারে না কেন? কেন মানুষের সভ্যতার আদিম ঊষা সামগানে আবার মুখর হইতে যাইল? কেন তবে মানুষের মন্দিরে ও কুঞ্জে, মিলনে ও বিচ্ছেদে, সুখে দুঃখে, ধর্মে কর্মে, জীবনে মরণে সঙ্গীতের আয়োজন চিরদিন এত সাগ্রহ হইয়া রহিয়াছে? বিশ্ব-সঙ্গীতের মাঝে কি খুঁজিয়া পায় না যাহা যোগাইতে মানুষের কণ্ঠ ও যন্ত্র এত রাগ রাগিণীর সৃষ্টিতে অক্লান্ত, এত তালমান-লয়ের বন্ধনে স্বেচ্ছায় বদ্ধ ও তাহাদের পরিচর্যায় সতর্ক? সেটি

স্বরের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য নহে ; কারণ বিশ্বে তাহার স্বাভাবিক আয়োজন অপ্রচুর নহে। তবে স্বভাবে সে স্বরগুলি পরস্পরের সঙ্গে অপেক্ষা ও মিল রাখিয়া এবং পরস্পরের পরিচর্যা করিয়া এমন একটি কিছু পূর্ণাবয়ব স্বরসৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতেছে না যাহাকে আমরা আমাদের ভাবসমূহের বাণীমূর্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতিতে সুর-তালগুলি যেন পরস্পরের খোঁজ রাখিতেছে না ; পরস্পরের অন্বেষণ করিতেছে না। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণীতে, তাল-মানলয়ে সুরগুলির পরস্পর অন্বেষণ, অপেক্ষা, সঙ্গতি ও সহায়তা রহিয়াছে। আবার আমাদের সঙ্গীতে সুরগুলির উদয়, স্থিতি, পরিপুষ্টি ও লয় আমাদের স্বায়ত্ত ; আমরা যেটিকে যখন যেরূপ ভাবে চাই, সেটিকে তখন সেইরূপ ভাবে পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতির মহোৎসবে আমরা চাই বলিয়া কিছু পাইতেছি না, যাহা আপনা হইতে আসিতেছে তাহারই আস্বাদ করিয়া সুখী হইতেছি, যাহা আপনা হইতে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আমাদের নিষ্ফল। বর্ষার পূর্ণিমা-রাত্রিতে বর্ষণ-পরিতৃপ্ত যূথভ্রষ্ট একখানা মেঘ স্নিগ্ধ কৌমুদী অঙ্গে মাখিয়া কোন অজানা স্বপ্ন-লোকের একটা ইঙ্গিতের মত আমাদিগকে মুগ্ধ আত্মহারা করিয়া দেয় ; কিন্তু বাতাস যখন তাহাদিগকে সরাইয়া দিবে তখন আমাদের অপরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। প্রকৃতিকে শুধু চিত্রসম্বন্ধে নয়, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সম্বন্ধেও দেখি যে, সেগুলি আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসে না এবং যাইবার সময় আমাদের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যায়। প্রকৃতিতে আমাদের বাঞ্ছিত ও উপভোগ্য জিনিস প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমাদের স্বায়ত্ত নয় বলিয়া, আমরা উপভোগ্য সামগ্রীর একটা আলাদা আয়োজনও করিয়া লইয়াছি। শব্দের দিক হইতে সেইটি আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত এবং তাহার রাগরাগিণী, তাল-মান-লয়। অতএব দেখিতেছি যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে আমাদের এই আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক স্বরগুলির মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা, মিলন ও সহায়তা পাইতেছি না বলিয়া। দ্বিতীয়তঃ সেগুলির আসা যাওয়া বিকাশ ও পরিণতি আমাদের আয়ত্ত নয় বলিয়া। ইহাই হইল প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতা, এবং অসম্পূর্ণতার যথাসম্ভব পূরণের জন্যই আমরা যে উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি সেইটার নাম শিক্ষা। শুধু সঙ্গীতকলার দিক হইতে নয়, মানুষের সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষার এই লক্ষণ গ্রহণ করা চলিতে পারে।

মানুষের নানান দিক—শরীর, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা। এ সকলের নানান্ বৃত্তি রহিয়াছে ; কতদিকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা রহিয়াছে ; কতরকম আরম্ভের চেষ্টা রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময়ে ও সর্বতোভাবে তাহাদের বৃত্তি-গুলির মধ্যে পরস্পরে মিল ও সহকারিতা থাকে না, সকল সময়ে তাহাদের আকাঙ্ক্ষার আবেগ চরিতার্থতার মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না এবং সকল সময়ে তাহাদের আরম্ভ উপসংহার পর্যন্ত পৌছিবার শক্তি যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমাদের ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার এই একটা দিক। আবার আমাদের সংস্কারগুলি, আবেগগুলি, ও বৃত্তিগুলি সর্বতোভাবে তো আমাদের বশে নয়। যাহা চাই যেটি চাওয়াতেই আমার কল্যাণ বলিয়া আমি মনে করি, যেটি আমার প্রেয়ঃ বা শ্রেয়ঃ অথবা উভয়ই, সেইটিরই পরিচর্যায় ও উপকারিতায় আমার সকল দেওয়াকে ত ঢালিয়া দিতে পারে না। আমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে মিল নাই ; আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন, লক্ষ্য এবং যাত্রা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার মধ্যে এমন কোনও একটা অসন্দিগ্ধ ও চিরন্তন যুক্তবেণী আমি খুঁজিয়া পাই না যেখানকার পুণ্যতীর্থোদকে অবগাহন

করিতে পাইয়া আমার এই বহুজন্মব্যাপী মহাতীর্থযাত্রা চতুর্বর্গের সফলতা লাভে ধন্য হইয়া উঠিবে।

আমার প্রকৃতি যে আমার আদর্শের অনুবর্তন করে না, আমার শক্তির সাহস যে আমার লক্ষ্যের বিপুলতার সামনে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং আমার লক্ষ্যও যে অব্যভিচরিত রূপে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নহে ;—ইহাই হইল আমার স্বাতন্ত্র্যের অভাব এবং এইটি আমার ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার অপর দিক্। অতএব সামঞ্জস্য ও স্বাতন্ত্র্য, প্রধানতঃ এই দুই দিকে আমাদের প্রকৃতির সুরগুলিকে নিযুক্ত করিয়া লইয়া জীবনরাগিণীর সৃষ্টি করিতে হইবে; নহিলে সে সুরগুলিতে কতকটা খণ্ডিত মাধুর্যের সম্ভাবনা থাকিলেও সেগুলি আমাদের 'জীবন-কুঞ্জে' একটা অখণ্ডৈকরস পূর্ণ-মধুর রাগিণী রচিয়া দিবে না এবং সে রাগিণী আমাদেরই আয়ত্ত থাকিয়া আমাদেরই আকাঙ্ক্ষা আশা ও ভরসার বাণী-মূর্তি হইয়া, হে আমার চিরবাঞ্ছিত, তোমারই আবাহনে ও আপ্যায়নে সর্বদা ও সর্বতোভাবে বরিত ও কৃতার্থ হইবে না। এই জন্য শিক্ষা চাই এবং সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিচয় ঐ দুইটিতে—আমাদের সকল দিকের মধ্যে এবং ভিতরে ও বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য; এবং আমাদের ভিতরের সবটা ও বাহিরের অন্ততঃ যতটার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত ততটার উপরে আমাদের অবিসংবাদিত স্বাধিকার।

এই দুইটি না হইলে শিক্ষা হয় না এবং এই দুইটির উপরে আমাদের সদ্ভাব ও অভাব এবং তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের শিক্ষার হিসাব নিকাশ লইতে হইবে। অতএব বর্তমানে যে আমরা আমাদের কথা, চিন্তা, ও কাজের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাইতেছি না এবং যেটাকে বুঝিতেছি সেটাকে কর্মের মধ্যে আকার দিয়া মূর্ত করিয়া তুলিতে যে সাহস ও শক্তি পাইতেছি না, ইহাতে সামঞ্জস্য ও স্বাধিকার এই দুইটিকেই আমরা হারাইতেছি; এবং এই দুইটি যদি না থাকিল, তবে আমাদের শিক্ষা যে বাস্তব হইতেছে না সে পক্ষে আর সন্দেহ রাখিব কি?

এক কথায় যদি শিক্ষার লক্ষণ দিতে হয়, তবে বলিব স্বারাজ্য। সামঞ্জস্য ইহার ভিতরকারই কথা। বহুকে লইয়া যেখানে এক স্বরাট্ হইবে, সেখানে বহুর পরিচালনাসূত্রগুলি একই স্থানে ন্যস্ত হওয়া চাই। মাকড়সা যে উদ্দেশ্যেই জাল পাতুক, জাল পাতাটা বেশই হয়, এবং তার ফলে সে জালে তার নিশ্চিন্ত স্বাধিকার। তাই স্বারাজ্য বলিলেই সামঞ্জস্য আপনা হইতেই আসিল।

প্রাচীন ঋষিরা এই স্বারাজ্যসিদ্ধির মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া ইহার জয়গানে তাঁহাদের বেদবাণী উদাত্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। "তমসঃ পরস্তাৎ" যে "আদিত্যবর্ণ" পুরুষ রহিয়াছেন, স্বারাজ্যসিদ্ধির ফলে "অমৃতের পুত্র" মানুষ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর পারে গমন করিয়া থাকে। এই অমৃতত্বের পর আর কিছু পাওয়া মানুষের পক্ষে হইতে পারে না; সুতরাং স্বারাজ্য-সিদ্ধির চেয়ে বড় আর কোন সিদ্ধি মানুষের নাই। ইহা পাইলে আর কিছুরই অভাব বা অপেক্ষা থাকে না; এবং ইহা যতক্ষণ না পাইল ততক্ষণ মানুষ আর কিছুরই মধ্যে নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ধরা দিয়া শান্ত থাকিতে পারে না। সমুদ্রে সকল "আপঃ" প্রবেশ করিতেছে, অথচ সমুদ্র যেমন নিজের পরিপূর্ণতায় "অচলপ্রতিষ্ঠ" মহাকাশে এই সমগ্র বিশ্বটা নাচিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আকাশ যেমন নিজের সমাহিত গৌরবে নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সেইরূপ স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে মানবের সকল প্রেরণা ও সকল কামনা, সম্মিলিত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে অথচ ইহার নিজের গভীরতায় কোনও ক্ষোভের চাঞ্চল্য নাই, এবং ইহার নিজের প্রতিষ্ঠা শাশ্বত ভূমিতেই সুস্থির রহিয়াছে।

মানুষের ব্যষ্টিরূপ ও সমষ্টিরূপ—সে নিজে এবং তাহার সমাজ। এ দু'টির কোনটাকে উপেক্ষা করিয়া স্বারাজ্য হয় না। গাছ বাড়িয়া ফল পুষ্পে সার্থক হইবার পক্ষে শুধু বীজের নিজস্ব শক্তিটাই যথেষ্ট নহে; শূন্যের মাঝখানে অসম্ভব, প্রতিকূল বা অসম্পূর্ণ অবস্থার মাঝখানে ফেলিয়া রাখিলে সে বীজের নিজস্ব প্রকৃতি রিক্ত এবং ব্যর্থই রহিয়া যায়। মাটির রসে, বাহিরের তাপ, আলোক, বাতাস ও শিশিরে সে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে হাজির করিবার অবসর পাইবে; যতক্ষণ না মধু-মক্ষিকা বা বসন্তবাতাস প্রতিবেশী পাদপের পুষ্প-পরাগরেণু বহিয়া আনিয়া তাহার নিজের পুষ্পসজ্জার মাঝে ছড়াইয়া দিবে, ততক্ষণ তাহার পুষ্পসম্ভার একটি নিষ্ফল রূপের হাট পাতিয়া রাখিবে মাত্র, সে হাটে কোন কিছুরও বিনিময় হইয়া কাহাকেও সফলতা আনিয়া দিবে না। মানুষও যদি সত্যকার জীবন পাইতে চায় তবে তাহার সমষ্টিরূপ বা সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, সমাজ যেখানে পরতন্ত্র, অবসন্ন, অসংস্কৃত ও অসুন্দর সেখানে ব্যক্তির সেই সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্য দিয়া এবং তাহাকে তদবস্থ ফেলিয়া রাখিয়া স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? স্বারাজ্য পাইতে হইলে হয় তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত পাইতে হয়, নয় তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একটিমাত্রও জীব বদ্ধ রহিল, মুক্তি পাইল না ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই মুক্তি পাইবে না। মুক্তি এমন একটা মন্দির যাহার দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে সকল জীবকে হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, অগ্রপশ্চাৎভাবে প্রবেশ করা চলিবে না; একথা যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। এ প্রকার মুক্তি-কল্পনার উদারতা একদিকে আমাদের হৃদয়টাকে নিখিল জীবের সঙ্গে মমতাবন্ধনে বাঁধিয়া দেয় এবং আমাদের সকল প্রকার লোক-সেবার প্রচেষ্টাকে মহাগৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেয়; কারণ এবংবিধ মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের যে আর সকলকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে; যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একটি সহযাত্রীও পথে পিছাইয়া থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ারের কাছে আমায় যে তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। অপর দিকে কিন্তু এ প্রকার মুক্তি-কল্পনা আমাদের তীর্থ-যাত্রার অসীমতা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তরে ভয় আনিয়া দেয়। বিশ্বজীবের মুক্তিতে তবে আমার মুক্তি। সে মুক্তিতে কোনও দিনও তবে আমি পৌঁছিতে পারিব না। সমষ্টি মুক্তি? তাহার জন্য কালের তো কোনও সীমারেখা টানিয়া দেওয়া যায় না যাহার মধ্যে সে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য—কেহই তো তবে এখনও পারে যাইতে পারেন নাই, সকলেই খেয়ার ঘাটে বসিয়া আছেন ও পথের পানে চাহিয়া আমাদের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করিতেছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও "পথের ধূলায় অন্ধ" ও মলিন হইয়া আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পারের মাঝি তাহার নৌকা ভাসাইবে না বলিয়া কবুল জবাব করিয়াছে যে। তবে উপায়—আমার মত অসহিষ্ণু, ব্যস্তবাগীশ, আত্মসার জীবের উপায়? উপায় খুঁজিয়া লইবার জন্য আমাকে একটা রফা করিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ধারা রফা শেষ পর্যন্ত চলুক আর নাই চলুক, আমি এক রকম করিয়া লইয়াছি। নিজেকে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে কতক দূর পর্যন্ত আমাকে সমাজের সঙ্গে ও সমাজকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত নাই। খানিক দূর পর্যন্ত সমাজের আশ্রয়ে এবং সমাজের সর্ববিধ শুভ ব্যবস্থার সহায়তা লইয়া আমাকে থাকিতেই হইবে, অন্য দিকে আমি যখন শ্রেয়োলাভের পথে চলিতে আরম্ভ

করিব, তখন অনেক দূর পর্যন্ত সমাজকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আমাকে সর্ববিধ সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা সমাজকেও আমাদের কল্যাণের অংশভাগী করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই হইল অপরের আমার উপর দাবী। এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া যে চলিতে গেল, সে কল্যাণের দিকে পিছন ফিরিয়াই চলিল। কিন্তু এ দাবীরও একটা সীমা আছে; খানিকদূর পর্যন্ত আত্মোন্নতি ও লোকসেবা এ দুয়ের মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা থাকিলেও, মানবাত্মা পরিণামে এমন একটা ভূমিতে গিয়া পৌঁছায় যেখানে সে আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইয়াই নিঃশ্রেয়সের চরম পদবীতে আরোহণ করে, সেখানে আর তাহার সঙ্গ নাই এবং কাহারও জন্য বা কিছুরও জন্য অপেক্ষা নাই। এ ভূমিতে পৌঁছিয়া লোকসেবা না করিলেও ক্ষতি নাই; এবং যে এ ভূমিতে পৌঁছিয়াছে সে ইচ্ছাপূর্বক লোকসেবা করুক' আর নাই করুক, তাহার মহনীয় ও বরণীয় পুণ্য জ্যোতিঃ এ ভব-অটবীর অভ্যন্তর ভাগে তাহার স্নিগ্ধ সংস্পর্শে তমো-মালিন্য কতকটা দূর করিয়া দিবেই। আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি এমনভাবেই যে কেবল জনসেবা করা হয় এমন নয়; আমাদের ধী-বৃত্তিগুলিকে সকলপ্রকার শুভ বাসনায় নিয়োগ করিতেছেন যে সবিতা, তিনি কি আমাদের ধরিবার, ছুঁইবার, মাপিবার, জিনিস? অতএব কথাটি দাঁড়াইতেছে এইরূপ:—মানবাত্মার স্বারাজ্য লাভের যে শেষ ভূমি সেখানে 'স্ব' মানে আত্মেতর আর কিছুই নয়; তখন স্বারাজ্যের জন্য কিছুরও অপেক্ষা নাই; সমাজ বা বিশ্বমানব সে ভূমির কাছাকাছি পৌঁছাক আর নাই পৌঁছাক, আত্মা তখন "সুস্থিরঃ স্বে মহিম্নি।" আসল কথা, সে ভূমিতে আপন ও পরের মাঝে যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহার বিলয় হইয়া যায়। এখন 'আমি'ও একটা যেমন, 'তুমি'ও একটা তেমন এবং 'সে'ও একটা তেমন; কিন্তু স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে 'তুমি' ও 'সে', 'আমি'র পাশে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু নহে—'আমি'র ভিতরেই তাহাদের স্থান; একটা বিরাট 'আমি' বিশ্বকে কুক্ষিগত করিয়া বিশ্বের সুখদুঃখ, জীবনমরণ, উত্থানপতন নিজেরই ভাবনার মধ্যে সমাপ্ত করিয়া টানিয়া লয়,—বাহিরে পড়িয়া থাকিতে দেয় না; তখন যে স্বরাট্ সেই—বিশ্বরাট্; তখন কে আমার বাহিরে পর হইয়া, উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিল যে তাহাকে আদরে যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া না লইলে আমার অসমাপ্তি রহিয়া যাইবে? যখন আত্মাই হোতা, আত্মাই হবিঃ, আত্মাই হবন, আত্মাই হবির্ভুক্ অগ্নি, এবং আত্মাই যজ্ঞশেষ অমৃত; তখন কে কাহাকে বরণ করিয়া লইবে, কে কাহাকে যজ্ঞান্তে মোচন করিবে? এক ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ মহাপাদপের শাখায় শাখায় স্বাদু পিপ্পলের ফল যতক্ষণ আমি খাইয়া বেড়াইতেছি, ততক্ষণই আরেকটি সুপর্ণ পক্ষী কিছু না খাইয়া কেবল দেখিতেছে; কিন্তু আত্মাই যখন মহাপাদপের মূলে, শাখায়, ছন্দোরূপে পত্ররাজিতে, ফলে, ভোক্তায় ও ভোগ্যে, দ্রষ্টায় ও দৃশ্যে নিজেকে ওতপ্রোত দেখিল, তখন কে তাহার বাহিরে পড়িয়া রহিল যে তাহার পরীক্ষায় নিজের সত্তাকে সে যাচাই করিয়া লইবে?

শিক্ষার প্রসঙ্গে এত বড় কথা না পাড়িলেও বোধ হয় চলিত; কিন্তু এটাও আবার ভুলিলে চলিতেছে না যে, শুধু ছোট কথায় এবং মাঝারি কথায় মানবাত্মার সাজপোষাকেরই পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার স্বরূপের সার সত্যের পরিচয় দেওয়া চলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে স্বাস্থ্য, সম্পদ্, জ্ঞান ও শক্তি আনিয়া দেওয়া—শুধু এ কথা বলিয়া শেষ করিলে জিনিসের খোসাতেই শেষ করা হইল, সার পর্যন্ত পৌঁছানো হইল না। শিক্ষা আমাদের শরীরটাকে সুস্থ করিবে, অন্নমুষ্টি যোগাইবে,

লেখাপড়া শিখাইবে, চরিত্রবান্ করিবে—এগুলি বেশ কথা এবং মোটামুটিভাবে দেখিতে যাইলে সোজা কথা। কিন্তু এ কথাগুলি বলিলেই আসল কথা বলা হইল না; এমন একটা কথা বাকি রহিয়া গেল যেটা না বলিলে এ কথাগুলির মধ্যে কোনও নিয়ত বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোনওরূপ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা যায় না, কোনওরূপ পরিণতি ও সম্পূর্ণতার একটা দিগদর্শন আবিষ্কার করা চলে না। শরীরটাকেই সবচেয়ে বড় না করিব কেন? অন্নমুষ্টি যোগানটাকেই শিক্ষা বলিতে আপত্তি কি? মস্তিষ্ক ও হৃদয় এ দুটার মধ্যে একটাকে খাটো করিয়া অপরটার অনুশীলন করিলে হানি কি? সবই আসিল কিন্তু জীবনে পবিত্রতার সৌন্দর্য থাকিল না। তাহাতেই বা আসিয়া যাইল কি। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলিবে না যতক্ষণ না একটা কথা আমরা বলিতে পারিতেছি, সেই কথাটি স্বারাজ্য। অতএব বড় কথা, গোলমেলে কথা বলিয়া ভয় পাইলে আমাদের চলিতেছে কই? অনাবৃষ্টিতে মৃত্তিকা যখন নীরস, তখন বাগানের মালীকে ডাকিয়া ফুলফলের গাছপালার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা হইয়াছে কি না; কিন্তু আষাঢ়ের মধ্যাহ্নে বিশ্বাত্মার সঞ্চরণশীল স্নেহের মত একখানা মেঘ উঠিয়া যেদিন নিজেকে রিক্ত করিয়া 'তৃষিতধরা' মাঝে ঢালিয়া দিয়া গেল, সেদিন আর গাছপালার তথ্য লইবার প্রয়োজন থাকে না। 'স্বারাজ্য' বলিলে এমন একটা কিছু পাইলাম যাহা আমাদের প্রকৃতি-উদ্যানের সর্বাংশে অকাতরে অপক্ষপাতে বর্ষিয়া গেল; তাহাকে আর ঝাঁঝরি হাতে করিয়া প্রত্যেক তরুগুল্মটির মূলে কুণ্ঠিত বারিধারা আলাদা যোগাইয়া বেড়াইতে হয় না।

লক্ষ্য দূরে থাকিলে অস্পষ্ট আবছায়ার মত দেখাইবেই। কিন্তু সেখানে না পৌঁছিলে যদি আমাদের চরিতার্থতা না থাকে তবে পথের ধারে চোখের সামনে উপস্থিত যাহা পাইলাম তাহাতেই আমাদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম বিলাইয়া দিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিলে চলে কি? দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় যখন আমার অভীপ্সিত দেবমন্দিরের চূড়া অস্পষ্ট দেখা গিয়াছে, তখন পথিমধ্যে এক পান্থশালায় নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ফেলিয়া রাখিব কি? দিনের বেলায় হাটে বেচাকেনা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মাঝি পদ্মার জলে ডিঙি ভাসাইয়া, যখন দূরে গগন সীমান্তে অস্পষ্ট মসীরেখার মত আপন "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" পল্লীবাসটি দেখিতে পায়, তখন সে পরপারের নিকট একটা বালির চরে ডিঙি বাঁধিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া জলকল্লোলে ক্ষুৎপিপাসা মিটাইয়া পড়িয়া থাকিবে কি? গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিলে যদি আমাদের চলিত তবে না হয় এখানে সেখানে এটা সেটা লইয়া থাকিয়া যাইতাম; যেটি ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, কাজেই অল্প লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের চলে না। শুধু শরীরের স্বাস্থ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; শুধু খাইতে পরিতে পাইলেই হইল না; শুধু লেখাপড়া শিখিলেই রেহাই নাই; যশ, সম্পদ, এমনকি চরিত্র,—এগুলিতেও বিরাম স্থান নাই। পথ চলিতে চলিতে যথাসম্ভব এ সমস্ত আমাদের পাইতে হইবে, কিন্তু সে পাওয়াকে আরও একটা বড় পাওয়ার আরম্ভ বা ভূমিকা করিয়া না লইতে পারিলে, আমাকে যে অল্পেই পড়িয়া থাকিতে হইল, এবং অল্প কিছুতেই সুখ নাই, স্বস্তি নাই। আবার আদর্শ অস্পষ্ট বলিয়া—তাহার প্রভাব যে আমাদের উপর কম হইবে, এ কথাও ঠিক কথা নহে। "পাখীগণ" যখন করে 'রব' তখন শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে মন দেয় বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা রহিয়াছে সেটা গুরু মহাশয়ের বেত্রদণ্ড এবং সেটা শিশুদের ত্বগিন্দ্রিয়ের কাছে বেজায় স্পষ্ট। "রাখাল"ও যখন 'গরুর পাল' লয়ে মাঠে যায়, তখনও প্রেরণাটি ঠিক ইহাই। কিন্তু কবি

বা শিল্পী যখন সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে বসিল, তখন সে ধ্যানের যে আদর্শটি অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকেই বাস্তবের মাঝখানে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল; কবির প্রত্যেক ভাব, ভাষা ও ছন্দের এবং শিল্পীর প্রত্যেক তুলিকাসম্পাত ও বর্ণবিন্যাসের পশ্চাতে সেই ধ্যানলব্ধ অস্পষ্ট আদর্শ টিরই প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু সে প্রভাবের মূল অস্পষ্ট বলিয়া তাহার নির্দেশ কি অব্যবস্থিত, তাহার দাবি কি একটুও শিথিল? যেমন আদর্শটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া একটা লক্ষণ বা বিবৃতি দিয়া হাজির করা যায় না, সেইরূপ কবির বা শিল্পীর সাধনা যে পুরস্কারের আশায় রহিয়াছে, অথবা ব্যর্থতার আশঙ্কা করিতেছে, তাহাকেও স্পষ্ট কোনও বিবরণ দিয়া প্রকাশ করা চলে না; তাহা সৃষ্টির আনন্দ বা ব্যর্থতার নৈরাশ্য এই রকম একটা অস্পষ্ট কথায় আমাদের বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু সাধনার মূলে উৎস এবং শেষ পরিণতি এ দুইটাই অস্পষ্ট হইলে কি হইবে—কবি তার প্রতি পদক্ষেপে এমন একটা কিছুর প্রেরণা ও নির্দেশ অনুভব করে যেটার প্রভাব ও শাসন, উদ্যত বেত্রদণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী সতর্ক ও মর্মান্তিক। অতএব স্বারাজ্য বুঝি না বলিলে রেহাই নাই।

অনেক বড় কথা আমরা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই বুঝি না। ছোটর কাছে যে আপনাকে ক্রীতদাস করিয়া ধরা দিয়াছে, তাহার বড়র আশাও নাই এবং বড়তে তাহার প্রয়োজনও নাই। যে জীব গর্তের অন্ধকারেই নিজের স্বাভাবিক বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার গর্তের দ্বারে যদি উদার বিশ্বের ভূমালোক গিয়া কোনও দিন উপনীত হয়—তবে সে যে ভয়ে গর্তের ভিতর তাহার অসহিষ্ণু দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবে। আমরা শরীরের ভোগ-সুখ, খাওয়াপরার সুখ প্রভৃতি তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদিগকে এমনভাবে সমাপ্ত ও অভ্যস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি যে, অনেক বড় সত্য কথা আমাদের কাছে বাজে কথারই সামিল হইয়া আছে; সে সব কথা শুনিলে আমরা বুঝি না এবং বুঝিবার সম্ভাবনা হইলেও অস্বস্তি বোধ করি। বড় কথা, গোলমেলে কথা বলিয়া আমরা নিজ নিজ গর্তের মধ্যে বেশ বিজ্ঞের মতই জীবনটা কাটাইয়া দিই; কিন্তু যে সকল মহাজন বড়র জন্য, সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্যই তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বড় লইয়াই যাঁহাদের দরকার, এবং বড় নহিলে যাঁহাদের কোনমতেই চলিবে না; তাঁহাদের মুখে "বড় কথা, গোলমেলে কথা" এ আপত্তি ত কেহ কোনও দিন শুনিল না। পক্ষান্তরে সংসারের ঐহিকসর্বস্বেরা যে কথা-গুলিকে সাদাসিধা বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছে; সে কথাগুলির অনেকটাই আপাততঃ সাদাসিধা, বস্তুতঃ নহে। যে দেখে যে পৃথিবী সমতল এবং পৃথিবীরই চারিধারে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র জগৎ ঘুরিয়া পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে, তার দেখা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষের সহজ ধারণার খুবই অনুকূল সন্দেহ নাই; কিন্তু একটুখানি তলাইয়া দেখিতে যাইলেই সে দেখার ভুল ধরা পড়ে, আমাদের সহজ ধারণাগুলির মধ্যে গোল বাহির হইয়া পড়ে। এ সহজ ধারণাকে উল্‌টাইয়া দিয়া বিজ্ঞান কিছুকাল ধরিয়া যে কথাটা আমাদের শুনাইতেছে, সেটা শুনিতে ও বুঝিতে খুব শক্ত কথা সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের যে কৈফিয়ৎ পাই তাহা সত্যের সরলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বজনীন সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য-সম্পাতে চিত্তাকর্ষক।

আমাদের অনেক সহজ জ্ঞানের মধ্যে যে গোল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বিজ্ঞানে গিয়া ধরা পড়ে; আর দূর হইতে আনাড়ীর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের যে সত্যগুলি দুর্ধর্ষ ও জটিলতায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, পরীক্ষায় ও উপলব্ধিতে সে সত্যগুলির সরল সৌন্দর্য ও নির্মল ঔদার্য মানবাত্মাকে বিস্মিত,

মুগ্ধ, ও সম্বর্ধিত না করিয়া যায় না। স্বারাজ্য-সিদ্ধির চরম ভূমিতে 'আমি'র মধ্যেই 'তুমি', না 'আমি'র পাশে 'তুমি' এ বিচার আগে করিয়া লইয়া তবে স্বারাজ্যের কথায় ঘাড় পাতিয়া দিব, একথা যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহারা কথাবার্তার অধিক আর কিছুই করিবেন না; তাঁহারা তাঁহাদের নিরালা পুরীর অর্গলগুলি খুলিয়া পথে বাহির হইয়া তীর্থযাত্রা করিবার প্রয়োজন সত্য সত্যই প্রাণে এখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহারা আগে বুঝিতে চান যে, মানবাত্মার এই মহাব্রত প্রতিষ্ঠার অবসানে দেবতার প্রসাদ লইয়া সোজাসুজি মুখে দিতে হয়, না মস্তক বেষ্টন করিয়া মুখে দিতে হয়। যেন এই মহাসত্যটি বুঝিবার অপেক্ষাতেই তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল অধ্যবসায় পড়িয়া আছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ডেভিডের গাথা

("O Lord, rebuke me not in anger" গাথার পদ্যানুবাদ)

শ্রীপবিত্রকুমার রায়

আমায় কোরো না প্রভু সরোষ ভর্ৎসনা
দূরে রেখো না কো তব বিমুখ বিরাগে,
দয়া কর নাথ আমি অতি শক্তিহীন
শান্তি দাও অস্থি মোর বেদনায় জাগে।

কতকাল রব আর প্রতীক্ষায় স্বামী?
বিষম বিক্ষুব্ধ আজ অন্তর আমার,
এসো তুমি মুক্তি দাও অসীম কৃপায়
লঘু কর হৃদয়ের বেদনার ভার।

মৃত্যু? সে তো অন্ধকার—নাহি তব স্মৃতি,
নাহিকো প্রসাদ-লাভ, দেওয়া ধন্যবাদ;
বিনিদ্ররজনী কাটে অশ্রুর প্লাবনে,
কণ্ঠ মোর রুদ্ধ করে ক্লান্ত আর্তনাদ।

দুঃখে অন্ধ আঁখিদুটি দৃষ্টিশক্তিহারা
জরাগ্রস্ত করে মোরে শত্রুর তাড়ন,
দূরে যাও আছ যারা পাপের পূজারী,
শুনেছেন প্রভু মোর আর্ত আবেদন।

জানি, তিনি শুনেছেন ক্রন্দনের ধ্বনি
বিগলিত আজ প্রভু মোর প্রার্থনায়,
শত্রুদল হোক আজ লাঞ্ছিত লজ্জিত,
ভাসাক তাদের সত্তা বিমূঢ় বিস্ময়।

কবি রজনীকান্ত সেন

বেলা দে

আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে যাঁরা যশস্বী করেছেন—তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেন। সাধারণতঃ কবি বলতে যেমন একটা উদাসীন ভাবসর্বস্ব ও নিশ্চেষ্ট জীবন অনেকের মনে জেগে ওঠে, রজনীকান্ত সে শ্রেণীর কবি ছিলেন না। তিনি সাধক কবি, আর এই সাধনা যে কত কঠোর, তা যাঁরা তাঁর কাব্য সাহিত্য পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন। রজনীকান্ত ছিলেন ভাবুক কবি।

কিন্তু তিনি নির্মল হৃদয়ের সহজ স্পন্দনের প্রেরণায় স্বাধীন! স্বদেশপ্রেমিক রজনীকান্ত, বৈদিক ঋষির সাধন-সম্পদের রসাস্বাদনের আকুলতায় বিনম্র-হৃদয় রজনীকান্ত নিজের জাতীয় সাধনার ভূমিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে, মহামানবের মানস-সুন্দরীর অভিষেক গীত গেয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে—

"তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর
শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন
প্রভাময়।
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি হে,
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়
ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল পিয়াসা
ক্ষুধা না রয়।"

সেকালকার সাধারণ দিনের অতি সাধারণ মানুষটির ভিতরে যে অসাধারণত্ব দিয়ে ভগবান ধরাতলে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তা তাঁর জীবিতকালে সম্যক্ উপলব্ধ না হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীতধারার মধ্যে যে অপূর্ব ভগবৎপ্রেম ও ন্যায়বিচার পরিস্ফুট হয়ে আছে তা আজ সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছে। রজনীকান্তের অধিকাংশ কবিতাই গান। তাঁর গানে একটি অপূর্ব বিশিষ্টতা আছে। তিনি জ্ঞাতসারে সাহিত্যের শিল্প সৃষ্টি করেন নি। 'কাব্যং যশসে' এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি ছিলেন ভক্তকবি। ভক্তির আবেগে আপনা থেকে যা বাহির হ'ত তাই তাঁর সাহিত্য। এই অপরূপ স্বাভাবিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে অভীষ্ট দেবতার চরণে নিবেদন করতেন। তাই সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের সঙ্গে কান্ত কবির কোথায় যেন মিল আছে। কবির সুবিখ্যাত গান—"সেথা আমি কি গাহিব গান" কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি বেশ ফুটে উঠেছে! একদিন কবিকে কেউ গান গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"কি আর গাহিব, গাহিবার আর কিছু নাই।" তারপর মনের সেই স্বতঃ-উৎসারিত ভাবটিকে গানের রূপ দিয়ে গাইলেন—

"সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী জলপ্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত রাগ উদিল হরষে;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।"

এই গানটির মধ্যে একদিকে যেমন কবির বিনম্র চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় তাঁর স্বদেশের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা। শুধু ভক্তিতত্ত্বের গান নয়, তাঁর প্রাকৃতিক রচনাগুলিও অতি সুন্দর—

"তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী
শ্যাম ধরণী সরসা—
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত মণি
রঞ্জিত নভ নীলাঞ্চলা।
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা
শান্ত কুশল দরশা।" —ইত্যাদি

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহতত্ত্ব রচনাও আমাদের বিস্মিত করে। এ ছাড়া কান্তকবি রসিকতার মধ্য দিয়ে মানুষকে যে কত বড় কঠোর সত্যের রূপ দেখিয়েছেন তারও তুলনা নেই।

রজনীকান্ত সেন ১২৭২ সালে ১২ই শ্রাবণ (১৮৬৫ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গুরুপ্রসাদ সেন। শিশুকাল থেকেই

তাঁর কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ জন্মে। লেখাপড়াতেও রজনীকান্তের অসাধারণ মেধা ছিল। রজনীকান্ত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১০৲ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। এর পর যথাক্রমে এফ্-এ, ও বি-এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ওকালতি পাশ করেন এবং রাজসাহীতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও তিনি বাংলা দেশের সঙ্গীতভাণ্ডারে যা দান করে গেছেন তা তাঁকে নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর রচিত অমর সঙ্গীতগুলি আজও আমাদের প্রতিটি সুখ-দুঃখে সমভাবে আনন্দ দেয়। রজনীকান্তের রচিত গান "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই," আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত। এই একটি রচনার ফলে রাজসাহীর পল্লীকবি রজনীকান্ত সমগ্র বাংলার জাতীয় কবি "কান্ত কবি রজনীকান্ত" হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের সঙ্গীত-শিল্পে যে নতুন ধারা প্রবাহিত তার মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কান্তকবি রজনীকান্তের গানও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণযোগ্য। গত ৬০ বৎসর ধরে বাংলাদেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে হল একটি সংগ্রামী জাতির সাহিত্য। দেশের সাহিত্য শিল্পের মধ্যে সেই সংগ্রামের স্মারক চিহ্ন না থেকে কি পারে? রজনীকান্তের সাহিত্যের মধ্যেও স্তরে স্তরে এই জাতিগত প্রেরণার দিক আমরা খুঁজে পাই। রজনীকান্তের কাব্য ও সঙ্গীত ভারতের অধ্যাত্মবাদের সৌন্দর্যরূপ! মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনের এক অবিচ্ছিন্ন চিরন্তন লীলা এই বিশ্বজগৎ! এক সর্ব-চরাচরব্যাপী বিশ্বদেবের অনুভূতি মানবজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। রূপের মধ্যেই অরূপের, সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশ—অসংখ্য গানে রজনীকান্ত এই সত্যই প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমস্ত সঙ্গীতে এই বিশ্ব-প্রকৃতির ঐক্যই যেন ঘোষিত হয়েছে। সমগ্র মানবজাতি সেই পরম একের—সেই অমৃতের অভিব্যক্তি। তাঁর সেই অমর সঙ্গীত "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে"—গানটির মধ্যে এই ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বিদেশীর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

আজ আমরা শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অভ্যাস, সংস্কার ও ভাবধারাকে এমনই সব বিদেশী প্রভাবে ঢেকে ফেলেছি যে, আমাদের আসল স্বরূপ যে কি তা ধারণা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ আশ্চর্য হই, যখন দেখি গাঁয়ের মানুষের দিকে—হ্যাঁ, তবুও—আজও! আমাদের অনেকেই বেদ-গীতা-পুরাণ বা ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানীগুণীদের নাম পর্যন্ত জানেন না, কিন্তু বিদেশের অনেক বই ও লোকের—এমনকি, চিত্রতারকাদের সকল বৃত্তান্ত আমাদের নখদর্পণে! অনেক ডিগ্রি-পাওয়া বিশেষ শিক্ষিত আধুনিক কেতা-দুরস্ত ও মার্জিতরুচি বন্ধুকে দেখি, অনেক সময়ে বসবার চেয়ারেই জুতাসমেত পা তুলে দিতে, নাকঝাড়া রুমালেই খাবার আগে বেশ করে হাত-মুখ মুছতে, জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে ধুতে, খাবার পর মুখ পরিষ্কারের দিকে বিশেষ যত্ন না নিতে, আরও এমনই কত সব। এঁরা গ্রামের লোককে 'আন্‌কাল্‌চার্ড', 'নেটিভ', 'অর্থোডক্স্' প্রভৃতি বলতে ছাড়েন না। অথচ গ্রামের ঐ সব অশিক্ষিত—মানে, আধুনিক কলেজীয় দীক্ষায় অপাংক্তেয় ব্যক্তিরা এ সব পারেন না।

আত্মবিস্মৃত পতঙ্গের মত নিজের যা কিছুকে এত সহজে ছেড়ে না দিয়ে, আগে যথেষ্ট অধ্যবসায় নিয়ে দেখা দরকার আমাদের কি ছিল, আর কেনই বা। কারণ, এটা তো মোটা চোখের বিষয়-বস্তু নয়, এতে যে প্রয়োজন রয়েছে যথেষ্ট সূক্ষ্মানুভূতির। 'মেড্ ইজি' দিয়ে ডিগ্রি নেবার মত সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে এত সহজে পেতে গেলে অন্ধের হাতী দেখার মত, ল্যাজে হাত বুলিয়েই হাতীকে সাপের মত বলা হবে ; তার চেয়ে না পড়াও ঢের ভাল। এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হতে পারে ? আমাদের দেশে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্, যার এত পড়েও আমরা তার মানেই আজ ঠিক মত করতে পারি না, সেই সব আগে মুখে মুখে শিখে অভ্যাস ক'রে মুনি-ঋষি, কত বিদুষী নারী, এমন কি রাজা-মহারাজা পর্যন্ত যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, আমরা জীবনে আজ তার কণামাত্রও আস্বাদ পাই না।

আজকাল বিদেশী, আমদানী-করা, মাত্র কিছু-কালের একটা প্রলেপ দেখে আমরা যারা হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টি-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সন্দেহ-পোষণ করি, তাদের ভাবা উচিত 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—

"যাদের মন দূরদর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম, যাহারা,--যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিতেছে তদপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ের কথনও চিন্তা করে না, এরূপ ব্যক্তিগণ যদি ভারতে যায়, তাহারা কি দেখে ? তাহারা দেখে—চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য, আবর্জনা, কুসংস্কার, অন্ধকার বীভৎসভাবে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। ...পাশ্চাত্ত্য দিগ্বিজয়ীগণ তরবারি হস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে, তাহারা বর্বর—স্বপ্নমুগ্ধ জাতি মাত্র, তাদের ধর্ম কেবল পৌরাণিক গল্প মাত্র।"...

"পাশ্চাত্ত্য দেশে একটা মুটে মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু 'ব্যারণের' বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত অরণ্যবাসী বল্কল-পরিহিত, আরণ্যফলমূলভোজী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, অকিঞ্চন, ঋষিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা ঐরূপ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই ; আর যতদিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।"...

তবু যাঁরা নিজের দিকে দৃকপাত করেন না, দেশের একটা ছেঁড়া-ন্যাকড়াপরা সন্ন্যাসীর চেয়ে বিদেশী কোন সাহেব কবে কি বলেছেন, পরের মুখে ঝাল খাবার মত এই দিকেই যাঁদের নজর, তাঁদের জন্যে আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই সঙ্কলন উপস্থিত করছি। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "হিন্দু ডুবিল" গ্রন্থে এ সব বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

১। ভাষা ঃ—(ক) "সংস্কৃতই পৃথিবীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ ভাষা"—বলেছেন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার 'সাইন্স অফ ল্যাঙ্গোয়েজে'।

(খ) এস্ ডোবাইজ্ বলেছেন, "সংস্কৃতই ইয়োরোপের আধুনিক ভাষার মূল বিশেষ।"

(গ) প্রোঃ হীরেন (Prof. Heeren) তাঁহার 'হিষ্টরিক্যাল রিসার্চেস্ গ্রন্থে বলেছেন,—"পারস্যের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত হইতেই গঠিত।" ইহা ছাড়া ডাঃ বিলেণ্টাইন (Dr. Beellantyne), প্রঃ বোপ্ (Prof. Bopp) যথাক্রমে "এডিনবার্গ রেভিউ" নামক গ্রন্থে এবং "হিষ্ট্রি অফ লিটারেচার" নামক গ্রন্থে এই মত পোষণ ও সমর্থন করিয়াছেন।

২। ব্যাকরণ ঃ—(ক) প্রফেসর উইল্‌সন্ বলেন,—"শব্দের এমন পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির আবিষ্কার একমাত্র হিন্দু ছাড়া আর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

(খ) অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলেন,—"সম্পূর্ণ ভাষা মাত্রই যে কয়েকটি মূল ধাতুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এ'সত্য (যাহা ষোড়শ শতাব্দীর আগে ইয়োরোপীয়-গণেরও জানা ছিল না) বহুযুগ আগে একমাত্র ভারতীয় ব্রাহ্মণদেরই জানা ছিল।

৩। জ্যামিতি ঃ—(ক) স্যার জন উড্রফ্ বলেন,—"বুধায়ণের শুল্ব সূত্র যখন রচিত হয় তখন হইতেই হিন্দুরা জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতেছেন।

পিথাগোরাস্ ভারত হইতেই জ্যামিতি শিখিয়াছিলেন।

৪। **বীজগণিত** ঃ—(ক) কাজরি (Cajori) বলেন—"ভারতীয়রাই মূলতঃ বীজগণিতের স্রষ্টা। ভারত হইতেই এ বিদ্যা প্রথমে আরবে এবং পরে ইউরোপে যায়।"

(খ) "বীজগণিতে গ্রীক অপেক্ষা হিন্দুরা বহু উন্নত।" বলেছেন, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্।

৫। **পাটীগণিত** ঃ—(ক) ডাঃ মর্গান বলেন,—"ভারতীয় পাটীগণিতই আমরা এখন ব্যবহার করি।"

(খ) ডাঃ শারেডার (Dr. Von Schorader) বলেছেন যে পীথাগোরাস্ ভারত হইতেই অঙ্ক শিখিয়াছিলেন।

৬। **দর্শন** ঃ—(ক) ডেভিস্ তাঁর 'হিন্দু ফিলজফি' গ্রন্থে বলেছেন, "পৃথিবীতে কপিলের দর্শনশাস্ত্রই প্রথম লিপিবদ্ধ দার্শনিক মত হিসাবে পরিগণিত।"

(খ) ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে দর্শন ধর্মের সহিত একত্র গ্রথিত এবং বাস্তব জীবনে অভ্যাসযোগ্য। ইউরোপে ইহা মতবাদ মাত্র ও কল্পনাপ্রসূত।"

৭। **জ্যোতিষশাস্ত্র** ঃ—"খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বেও ভারত জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিল। তাদের উন্নতির প্রথমাংশেই অন্য সমস্ত জাতির এ বিষয়ে ছিল বহুতর অনভিজ্ঞতা। ইউরোপ মাত্র সম্প্রতি এ আবিষ্কারের জ্ঞানলাভ করিয়াছে।" বলেছেন মিঃ কোলব্রুক।

৮। **বিজ্ঞান** ঃ—(ক) "ভৈষজ্য লক্ষণ, ভেষজ নিদান, শব-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভ্রুণবিদ্যা, ধাতু পরিস্করণ বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, চিকিৎসাপ্রণালী, বর্ণনাপূর্ণ প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের গবেষণা মূল্যবান বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হইয়াছিল।" বলেছেন মিঃ কলেব্রুক।

(খ) "ভেষজীয় প্রণালী শিক্ষার বিষয়ে প্রথমেই আমরা ভারতের নিকট ঋণী"—ডাঃ রয়েল, ডাঃ উইলসন, এবং ডাঃ ওয়াইজ।

(গ) অধ্যাপক হিরেণ তাঁর 'হিষ্টরিক্যাল রিসার্চ' গ্রন্থে বলেছেন—"ভারতবর্ষই একমাত্র আদি সূত্র সেখান হইতে শুধু অবশিষ্ট এশিয়াই নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিই তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম আহরণ করিয়াছে।"

৯। **সঙ্গীত** ঃ—স্যার উইলিয়ম জোন্স্ এবং মিঃ প্যাটারসন্ হিন্দুদের সঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ ও যথেষ্ট মার্জিত বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, ভারতীয় সঙ্গীতই ভারতীয় ভেষজের মত ভারত হইতে ইউরোপে গিয়াছে।

১০। **চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্যবিদ্যা** ঃ—ডাঃ ফার্গুসন বলেন, "স্থপতিবিদ্যা, ভাস্কর্যবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায় ভারতীয়গণের কৃতিত্ব অসাধারণ। ইঁহাদের শিল্প সম্পূর্ণই এইদেশীয় নিদর্শন স্বরূপ। হিন্দুরাই প্রথম স্থপতিবিদ্যা অর্জন করেন। পরে ইহা ভারত হইতেই অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করে।" এই মত ডাঃ হান্টার ও 'রাজস্থানে' কর্ণেল টড্ও সমর্থন করিয়াছেন।

১১। **হিন্দু জাহাজ** ঃ—(ক) প্লিনি তাঁহার 'নেচারেল হিষ্ট্রি'তে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬০ অব্দে কয়েকজন হিন্দু নাবিক ইউরোপের বাল্টিক সাগরে জাহাজ চালাইয়াছিলেন।"

(খ) স্যার জন ম্যালকম বলেছেন,—"প্রাচীন ভারতীয়গণ এমন নিপুণ ভাবে ঐ সব জাহাজ নির্মাণ করিতেন যে বর্তমানকালের সব প্রয়োজনই মিটিত। ইউরোপীয়ানরা তাহার উপর বড় বেশী উন্নতি করেন নাই।"

১২। **সহশিক্ষা** ঃ—আবে দুবোয়া (Abbe F. A. Dubios) বলিয়াছেন,—"পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ইয়োরোপের ভীষণ ভুল হইয়াছে। শিক্ষায় এবং আচরণে

হিন্দুরা ইয়োরোপীয়গণের অপেক্ষা ঢের বেশী উন্নত। আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে হিন্দু মহিলারা অক্ষর না চিনিলেও কর্তব্যরতা সুকন্যা, একান্ত অনুগতা স্ত্রী এবং সন্তানবৎসলা মাতা এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী।"

১১। **শ্রেণী-বিভাগ**ঃ—হার্বার্ট স্পেন্সার, অধ্যাপক গিডিংস্, অধ্যাপক জনসন, স্যার জন-উড্রফ্ প্রভৃতি বলেন—"ভারতের সামাজিক আদর্শ ধর্মানুসারেই গঠিত এবং প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার আদর্শের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের সুন্দর সংমিশ্রণ।" "যে কোনও সামাজিক সংস্কার শ্রেণী-হীন করিয়া গঠন করিতে চাহিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।" "কর্মে, দক্ষতায় কিংবা প্রয়োজনীয়তায় সকল লোকই সমান, এ কথনই দেখা যায় না।" "আসলে আধুনিক ইয়োরোপের কোন একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি বা লক্ষ্য নাই।"

সমালোচনা

বাঙলার মহাপুরুষ—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১২০ ; মূল্য দেড় টাকা।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত শ্রীঅরবিন্দের এই জীবন-চরিতটি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যাঁহার বাল্যের অদ্ভুত জ্ঞানস্পৃহা, কাব্যপ্রতিভা ও স্বাদেশিকতার অপূর্ব মিলন তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশকর্মী, দার্শনিক ও যোগীতে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাঁহার জীবনী প্রত্যেকেরই জানা উচিত। ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ সাতটি ও ভারতীয় সাতটি ভাষায় কিভাবে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, ভারতের মানসক্ষেত্রে কিরূপে স্বাধীনতার আলো জ্বালিয়াছিলেন, "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের তারুণ্য-শক্তিকে জাগাইতে ও ইংরেজ শাসকের সুকঠিন অক্টোপাস-বন্ধনকে শিথিল করিতে কিভাবে তিনি স্বদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিপ্লবের বহ্নিশিখা ছড়াইয়াছিলেন সুলেখক গ্রন্থকার স্বচ্ছ ভাষায় কৃতিত্বের সহিত তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত: (১) বাল্য-পর্ব (সাত বছর), (২) বিলাত-পর্ব (চৌদ্দ বছর), (৩) বরোদা-পর্ব (তের বছর), (৪) বাংলা পর্ব (চার বছর), (৫) পণ্ডিচেরী পর্ব (চল্লিশ বছর)। বইখানিকে শুধু একটি প্রামাণ্য জীবনী বলিলে ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়—ইহাতে স্বাধীনতার প্রথম যুগ ও বাঙলার তথা ভারতের বিপ্লববাদ-আন্দোলন সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য অনেক কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে, কারণ শ্রীঅরবিন্দ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তৎকালে স্বাধীনতার অগ্রদূতরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আলোচ্য বইটিতে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের মূল কথাগুলি যেমন 'নিবর্তন ও বিবর্তন', 'অতিমানস', 'অবতাররহস্য', 'আমূল রূপান্তর', 'অবতরণ ও আরোহণ' দুর্বোধ্য হইলেও সহজবোধ্য করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বইখানি যাহাদের জন্য লেখা সেই বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে ইহা পড়িলে তাহাদের দেশভক্তি ও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধির সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দের বাল্যকাল হইতে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি পুস্তকটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে।

পৃশ্নিঃ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ; প্রকাশক: শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; পৃষ্ঠা—১৩২ ; মূল্য এক টাকা।

পৃশ্নি শব্দের অর্থ চয়নিকা। ভারতের

প্রাচীনতম ও সর্বোত্তম গ্রন্থ বেদচতুষ্টয়। চতুর্থ অথর্ব বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব শাখা ও আঙ্গিরস শাখা। অথর্ব বেদের এই আঙ্গিরস শাখার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার 'পৃশ্নি' নামকরণ করিয়াছেন। গ্রন্থটিকে ১৫টি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে, যথা:— পুরুষার্থ, কামকার-নিরাস, প্রজ্ঞানিষ্ঠা — কর্মযোগ, অধি-আত্মা—ধ্যানযোগ, বিশ্ব-বিসৃষ্টি, ব্রহ্মনিষ্ঠা—জ্ঞানযোগ, রুদ্রনিষ্ঠা—ভক্তিযোগ, ইন্দ্রষ্টোম, বিষ্ণুস্তোত্র, দেবীসূক্ত, সাধনা, দেবযান, ধর্মচক্র, স্বাধ্যায়, বিশ্বামিত্র। প্রথমাংশে শ্লোকাবলী ও পরবর্তী ব্যাখ্যান-অংশে ইহাদের অন্বয়, টীকা বঙ্গানুবাদ এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য পৃথক্ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রারম্ভে প্রদত্ত অবতরণিকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ; ইহাতে অথর্ব বেদের ভার্গব শাখা ইরানে প্রচলিত 'জেন্দ-আবেস্তা' লেখক ইহা যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভার্গব শাখা ভারতে অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহা কোন গিরিকন্দরে নিহিত আছে কি না কে নির্ণয় করিবে? যাহা হউক এই ধরনের সঞ্চয়ন-গ্রন্থ কমই চোখে পড়ে, 'অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের দ্বারা' ইহা সমাদৃত হইলে গ্রন্থকারের শ্রমমূলক গবেষণা ফলবতী হইবে।

(১) পরাপূজা (২) হস্তামলক (৩) মোহমুদ্গর [মূল ও পদ্যানুবাদ] অনুবাদক: অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার দত্ত। ডাক্তার শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক এ, আই, সি, প্রেস—কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—(১) প্রকাশকের নিকট, ৫৮, ক্রীক্ রো, (২) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—১৮, ৮, ৮; মুদ্রণ-সাহায্য যথাক্রমে ।৵০, ।০, ৵০।

(১) আচার্য শংকর-বিরচিত পরাপূজার অপর নাম নির্গুণ মানস-পূজা বা আত্মপূজা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শ্রুতির এই সার্বভৌম উপদেশ স্বীকার করিয়াও নির্গুণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বা পরব্রহ্মের পূজা উপাসনা কিভাবে হইতে পারে প্রশ্নোত্তর ছলে তাহাই নির্দেশিত হইয়াছে। 'পরা পূজা'র মাধ্যমে বাহ্য উপচারাদির রূপকের আবরণটি উদ্ঘাটন করিয়া পূজার আসল তত্ত্বটি পূজকের সামনে প্রকট করাই উদ্দেশ্য।

(২) একটি মূকভাবাপন্ন সৌম্যদর্শন বালকের জ্ঞানগর্ভ 'বেদান্ত-সিদ্ধান্ত' বাক্যে প্রথম বাক্‌স্ফূর্তির ছন্দোময় রূপ। উত্তরকালে এই বালকই শিবাবতার শংকরাচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য হস্তামলকাচার্যরূপে প্রখ্যাত হন। আচার্য শংকর স্বয়ং 'হস্তামলকে'র দ্বাদশটি কারিকার উপর ভাষ্য রচনা করায় বেদান্ত-জগতে ইহার স্থান অতি উচ্চে বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-সময়ে এই কারিকাটি আত্মতত্ত্বপ্রচারার্থে মুদ্রিত পুস্তিকাকারে বিতরণ করিতেন।

(৩) ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্যের 'মোহমুদ্গর' স্তোত্রটি মোহাচ্ছন্ন মানবগণের বিবেকবুদ্ধি এবং পার্থিব ভোগসুখে বৈরাগ্য জাগাইবার জন্য পজ্ঝটিকা-ছন্দোবদ্ধ অপূর্ব উপদেশামৃত। যথার্থ ই উক্ত হইয়াছে:

"যাদের ইহা করবে নাকো
বিবেক-জ্ঞানের সঞ্চরণ,
তাদের তরে করবে কেবা
এর বেশি আর সংঘটন!"

কুশলী অনুবাদক আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের অমূল্য শ্লোকগুলি সরল বাঙলায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। পাদটীকায় পাঠান্তর ও দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদে মূল বিষয়বস্তুর মর্মার্থ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সংস্কৃত ছন্দগুলির গণবিভাগ করিয়া লঘুগুরু প্রদর্শিত হওয়ায় আবৃত্তির সহায়ক হইবে। প্রথম ও শেষের পুস্তকে শংকরাচার্যের জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জী প্রদত্ত

হইয়াছে। এই 'স্মৃতিগ্রন্থমালা' নামমাত্র মুদ্রণ-সাহায্য লইয়া বিক্রীত হইতেছে বলিয়া জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

গীতাসন্দেশ—ত্রৈমাসিক পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীসত্যমিত্র ব্রহ্মচারী, 'গীতাসন্দেশ' কার্যালয়, হৃষীকেশ (উত্তরাখণ্ড), উত্তর প্রদেশ। পৃষ্ঠা—৬৪; বার্ষিক মূল্য (বিশেষাঙ্ক-সমেত) ৩৲ টাকা।

তপোভূমি উত্তরাখণ্ডের পবিত্র তীর্থ হৃষীকেশ হইতে 'গীতাসন্দেশ' নামক এই নূতন আধ্যাত্মিক হিন্দী সাময়িকীখানি বহু সাধুসন্ত ও ভারতের রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রমুখ দেশভক্ত বিদ্বজ্জনগণের আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা লইয়া এবং সমৃদ্ধ রচনা সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমরাও ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অক্ষুণ্ণ আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠ দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া ইহার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি। পাঠক-পাঠিকার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিবার মত পত্রিকাখানিতে রচনার অভাব নাই, অধিকাংশ প্রবন্ধ গীতাবিষয়ক হইলেও উপনিষদ্ এবং ভারতীয় সনাতন ভাবধারা ও কৃষ্টি অবলম্বনে রচিত অনেক রচনা ইহাতে আছে। কয়েকটি উচ্চকোটির লেখা যথা: বৈরাগ্যকে উপদেশ—মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীস্বামী মহেশ্বরানন্দজী; গীতা মেঁ হিংসা হ্যায় ইয়া অহিংসা?—আচার্য বিনোবা ভাবে; বুরী বাসনায়োঁ কা নাশ করো—শ্রীস্বামী শিবানন্দজী সরস্বতী; গীতা কা স্থিতপ্রজ্ঞ (কবিতা)—রাষ্ট্রকবি শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত। সম্পাদনা ভাল তবে ছবি ও ছাপার আরও উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতী-স্তুতি-মাধুকরী—স্বামী বাসুদেবানন্দ-প্রণীত। প্রথম প্রকাশ স্নানযাত্রা, ১৩৬২, প্রকাশিকা: শ্রীমতী চারুপ্রভা দেবী, ৩১, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা—২৯; পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৯০; মূল্য দুই টাকা।

বেদ উপনিষৎ পুরাণ তন্ত্র ও দেবদেবীর সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে শ্লোকাংশ লইয়া অথবা তাহাদের ছায়া-অবলম্বনে এবং অধিকাংশ স্বরচিত শ্রুতিসুখকর ছন্দে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগবত জীবনের সংস্কৃত শ্লোকে বন্দনা। মধুকর যেমন ফুলে ফুলে মধুসংগ্রহ করে লেখকও সেইরূপ যেখানে যে শ্লোকটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্তুতির উপযোগী দেখিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। 'ভাগবতী-স্তুতি-মাধুকরী'র মধ্যে এমন একটি ধারা অনুস্যূত হইয়াছে যাহাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবনটিকে ভক্তহৃদয়ে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিবার ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা। শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিবার সময় মন প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। মোট ২৩৪টি শ্লোক পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোকের নিম্নে প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় পাঠের সময় অর্থটিও মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। সুন্দর কাগজে মোটা বড় হরফে সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটে গ্রন্থকারের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'পেনসিল কপি'-ছবি সকলকেই আকৃষ্ট করে। নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এই গ্রন্থ ভক্তমাত্রেরই আদরণীয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

মহাত্মা লালন ফকির—শ্রীবসন্তকুমার পাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, সম্পাদক, বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবসন্তকুমার পাল, মনসাতলা পাড়া, গোপালনগর রোড, নাসরা পোঃ, নদীয়া ও আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাত সিকা মাত্র।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত চাপড়ায় বিখ্যাত কর মহাশয়দের বংশে জাত মহাত্মা লালন ফকিরের জীবনী ও উপদেশাবলী উদ্ধার করিয়া লেখক বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন

হইয়াছেন। লেখক নিজেও একজন সাধক, ইহা তাঁহার উক্ত জীবনী সঙ্কলনের পদ্ধতি দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। লালন ফকিরের জীবনের এক প্রধান ঘটনা তাঁহার পুনর্জন্মলাভ। পথিমধ্যে বসন্ত-রোগে আক্রান্ত ও মৃতজ্ঞানে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত লালন মুসলমান রমণীর শুশ্রূষায় নবজীবন লাভ করিয়া সমাজে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কারণ তাঁহার মৃত্যুসংবাদে শ্রাদ্ধাদি পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল। সমাজের অবৈধ নিগ্রহ ও অসহ্য অবজ্ঞায় লালন গৃহত্যাগ করিয়া সিরাজ সাঁইজীর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়া গুপ্তমিত্রের আখড়ায় জীবন অতিবাহিত করেন। শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন, তাঁহার উপদেশাবলীতে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। লালন ফকির ভক্তিমার্গের সাধক এবং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে এবং উহাতে সাঁইজীর লিখিত সঙ্গীত—

"ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়;
আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।"

লেখক বোধ হয় সাঁইজীর জীবনের বীজমন্ত্র জ্ঞান করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ আশীর্বচনে যে আশা করিয়াছেন অর্থাৎ "তিনি 'মহাত্মা লালন ফকির' অনুরূপ আরও বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধকের জীবনকথা সংগ্রহ ও প্রচার করিবেন"—আমরাও ঐরূপ আশা করি।

—শ্রীবিজন চন্দ্র গোস্বামী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বৃন্দাবনে সেবাকার্য— শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম খ্রীঃ ১৯০৭ সাল হইতে সুদীর্ঘকাল জনগণের অক্লান্ত সেবা করিয়া ৪৮তম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। আধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৫৫টি শয্যা-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত। এই সেবাশ্রমের পৃথক চক্ষুচিকিৎসা বিভাগে প্রতি বৎসর উত্তর ভারতের বহুস্থানের সহস্র সহস্র নরনারী অস্ত্রচিকিৎসাদি লাভ করিতেছেন। ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত বার্ষিক কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে সাধারণ রোগীর মোট সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮২ এবং ১,১৩,৭১৫ (নূতন ৩১,৮৮০); উভয় বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় (১৯৭+৪,৪৪৬)=৪৬৪৩টি। ইনজেকশনের সংখ্যা—১৪,৭৪৩; চক্ষু চিকিৎসাঃ— অন্তর্বিভাগে—১,০২৩; বহির্বিভাগে—২৮০৫৫; অপারেশন ও ইনজেকশন—৭,৬০১; রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বিভাগে ৩৮২+৩২ জন রোগী পরীক্ষিত হন এবং ক্লিনিক্যাল লেবরেটরিতে মল-মূত্রাদির ২০৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে দন্তরোগ চিকিৎসার জন্য একটি নূতন বিভাগ সংযোজিত হইয়াছে। ৩৮টি দুঃস্থকে (অধিকাংশই সম্ভ্রান্তবংশীয় বিধবা মহিলা) সাময়িক সাহায্য বাবদ ২৮৬৲ টাকা দেওয়া হয়। ৪ মাসের জন্য অস্থায়ি-ভাবে একটি দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্র খোলা হয়, উহাতে বিতরিত দুগ্ধের পরিমাণ ২৮,৩৮৬ পাউণ্ড। এই সর্বজনপ্রিয় সেবায়তনটির স্থান পরিবর্তন অপরিহার্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে ও যমুনাতীরে অবস্থিত থাকায় ইহাকে যেন বর্ষারম্ভ হইতেই বন্যার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। ১৯৪৭ সালে সম্পূর্ণ সেবা-শ্রমটি ৪ দিন ব্যাপী জলমগ্ন হওয়ায় সাময়িকভাবে হাসপাতালের সর্ববিধ কার্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

উপরন্তু সেবাশ্রমের বর্তমান অবস্থিতি শহর হইতে দূরে বলিয়া রোগীদিগের পক্ষে ইহার সেবালাভ অনায়াসলভ্য নয়। নবনির্বাচিত স্থানটি মথুরা-বৃন্দাবন সড়কের পার্শ্বে তারা মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত, ইহার পরিমাণ ২২.৭৬ একর; সহৃদয় উত্তরপ্রদেশ সরকার ইহার অধিকারনামা মঞ্জুর করিয়াছেন, এখন হাসপাতালের বিভিন্ন বাড়ীগুলি এবং চিকিৎসক ও কর্মিবৃন্দের কক্ষাদি নির্মাণের জন্য ১৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে ৯৮,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বদান্য জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকার্য ত্বরিতগতি লাভ করিবে।

হরিদ্বারে সেবাকার্য—কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম মনোরম স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কুলকুলনাদিনী গঙ্গাপ্রবাহিত হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯৫৪ সালের (৫৪তম) বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে রোগীসংখ্যা ছিল ১৪৪৫। বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন ৫৭,৩৪৭ জন, তন্মধ্যে ১৯,৮৫৪ জন নূতন এবং পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৭,৪৯৩; এই বিভাগে সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা প্রাপ্ত হন ৫৮৮ জন। পরীক্ষাগারে থুথুরক্তাদির পরীক্ষা হয় ১৯২৪টি; নেত্ররোগ-চিকিৎসা বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্তের সংখ্যা ২৪৩ (নূতন ২০৮)। সেবাশ্রমে রোগীদিগের একটি গ্রন্থাগার আছে। সেবাধর্মের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে ৩০০০ দরিদ্রকে পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হয়। আগামী ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারেও সাধুসন্ত ও যাত্রীদিগের সেবার জন্য রিলিফকার্য করিবার ব্যবস্থা হইবে। উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট সেবাশ্রমের জলসরবরাহাদি কার্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং চিকিৎসা-ভবনের বৈদ্যুতীকরণ ও সংস্কার উপলক্ষ্যে ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্যামলাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—আলমোড়া জেলায় ভারতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে প্রকৃতির লীলানিকেতনে ১৯১৪ সালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের (৪০তম বার্ষিক) মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশ্রমটি ৪৯৪৪ ফুট উচ্চে উত্তরপূর্ব রেলপথের টনকপুর স্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামগুলির অসহায় অধিবাসিগণের রোগে স্থায়ীভাবে চিকিৎসাদির সুযোগ দেওয়া আশ্রমের অন্যতম সেবাকার্য। বহুদূর হইতে দিনের পর দিন পথ চলিয়াও পর্বতীয়েরা এখানে ঔষধ লইতে আসেন, কারণ ঐ অঞ্চলে ইহাই একমাত্র পীড়িতের জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান। আলোচ্য বর্ষে নূতন রোগীর সংখ্যা বহির্বিভাগে ৫৪৮৬ (পুরুষ—৩০০৩, স্ত্রীলোক—১২৫২, শিশু—১২৩১) এবং অন্তর্বিভাগে ১৩৭। পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১১২৮। সেবাশ্রমের আর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ হইল পশুচিকিৎসালয়; ইহা স্থাপিত হয় ১৯৩৯ সালে। এখানে এ যাবৎ গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ৩৮,৯৩০টি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত পশুর সংখ্যা ১৮৯৬ (নূতন ১৭০৬)।

লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের কার্য বিবরণী আমরা পাইয়াছি। সেবাশ্রমের কার্য-প্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত—(১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার (২) শিক্ষাদান (৩) রোগীর সেবা ও চিকিৎসা। নিয়মিত বক্তৃতা, শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মসভা প্রভৃতির দ্বারা সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সপ্তাহের ৪ দিন যে নিয়মিতভাবে ধর্মসভা হয় তাহার মধ্যে শনিবার ও রবিবারের সভা বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রোতৃবর্গের

অধিকাংশই শিক্ষিত। গড়ে (পুরুষ ও মহিলা) প্রায় ১০০ জন যোগদান করেন। এই বৎসর মোট ১৬৭টি সভা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন হয়—গড়ে উপস্থিতি ১২৫ জন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৩৬ জন ব্যক্তিকে মাসে ৪৲ টাকা হারে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল।

সেবাশ্রমের গ্রন্থালয়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ছয় হাজার মূল্যবান পুস্তক আছে। এই বৎসরে ৪৬২৪ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ পঠনার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠাগারে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক মোট ২৯ খানি পত্রিকা ছিল। গড়ে ২৬ জন পাঠক নিয়মিত ভাবে আসেন। সেবাশ্রমের বহির্বিভাগীয় ঔষধালয়ে এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দুই পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে মোট ১,১২,০১১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল। এই বিভাগে ঔষধ সহাযে অজ্ঞান করিয়া ১২০৫ জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করাও হইয়াছিল।

স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মন্মথনাথ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দ্বিতল সুবৃহৎ বসতবাটীখানি সেবাশ্রমকে দান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে একটি নূতন ঠাকুর ঘর ও দ্বিতলের তিন দিকের বারান্দার ছাদ নির্মিত হওয়ায় উৎসবাদিতে ভক্তদের বসিবার স্থানাভাব দূর হইয়াছে।

বেলুড় মঠে ও শাখা-কেন্দ্রসমূহে

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব—পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর পূজার্চনা প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সহিত পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ৫ই কার্তিক (২৩শে অক্টোবর) রবিবার সপ্তমী পূজার দিন অধিকাংশ সময়েই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বর্ষাকালের মত মধ্যে মধ্যে প্রবল বারিবর্ষণ শারদীয়া সুষমাকে আবৃত করিয়া রাখিলেও ভক্তবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহকে ম্লান করিতে পারে নাই। পূজার অবশিষ্ট কয়েকটি দিবসে শারদ প্রকৃতির হাসি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে এবং মায়ের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য ভক্তগণ প্রাণের আকুতি লইয়া দলে দলে সমবেত হইতে থাকেন। মহাষ্টমীর দিন আনুমানিক চার হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন, অন্যান্য দিনও কয়েক সহস্র ভক্তকে হাতে হাতে মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত শাখা-আশ্রমগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গার পূজা ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে:—বোম্বাই, আসানসোল, বরিশাল, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, কাথি, ঢাকা, বালিয়াটি (ঢাকা), দিনাজপুর, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রহড়া, শিলং, শ্রীহট্ট।

খার (বোম্বাই) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সর্বধর্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব্। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণের যোগদানে এবং সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। ধর্মপ্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন রেভারেণ্ড জন পোথেন্ (খ্রীষ্টধর্ম), প্রফেসর এ বি ডাডারকর (ইসলাম), অধ্যাপক এন্ কে ভাগবত (বৌদ্ধধর্ম), ডক্টর এ সি বসু (হিন্দুধর্ম), মিস্টার জামসেদ্ সি তারাপুর (জোরোয়াস্ট্রীয় ধর্ম) এবং শ্রীনবীনচন্দ্র এ ডোশী (জৈনধর্ম)।

বালিয়াটি (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন ৪।৫ শত ভক্ত প্রসাদ পান। দুই দিন যাত্রা গান এবং একদিন পুতুল নাচ হয়।

উদ্বোধনের আগামী নূতন বর্ষ

এই বৎসর (১৩৬২) মাঘ মাসে উদ্বোধন ৫৮তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। নূতন বৎসরের চাঁদা ৫৲ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছানো অত্যাবশ্যক। মণি অর্ডার কুপনে পুরা নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ না থাকিলে টাকা যথাযথ জমা করিতে আমাদিগকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে এই বিষয়টিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পূর্বপাকিস্তানের গ্রাহকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের ঢাকা আফিসে টাকা পাঠাইবেন (ঠিকানা :—সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) এবং টাকা পাঠাইবার সংবাদ গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখপূর্বক আমাদিগের কলিকাতার কার্যালয়েও জানাইয়া দিবেন।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও বদান্যতার উপরই উদ্বোধনের অস্তিত্ব ও প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করে। অতএব পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষেও যে তাঁহাদের নাম আমাদের গ্রাহকতালিকাভুক্ত রাখিবেন ইহাই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তথাপি অনিবার্য কারণে যদি কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া ১৫ই পৌষের মধ্যে আমাদিগকে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখপূর্বক উহা জানাইয়া দিবেন।

১৫ই পৌষের মধ্যে বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা না পৌঁছিলে অথবা গ্রাহক থাকিবার অসামর্থ্যজ্ঞাপক তাঁহার পত্রও না পাইলে আমরা যথারীতি তাঁহাকে ভি পি যোগে পত্রিকা পাঠাইব। তবে এক্ষেত্রে আমাদের বিনীত বক্তব্য এই যে, ভি পি-তে কাগজ আসিবার অপেক্ষা না করিয়া গ্রাহকগণ যদি পূর্বেই মণি অর্ডার যোগে তাঁহাদের চাঁদা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের অতিরিক্ত ডাকব্যয় ৷৹ আনা বাঁচিয়া যায় এবং মাঘ সংখ্যার কাগজ পাইতেও অযথা বিলম্ব ঘটে না। আমাদের আফিসের কাজেরও যে অনেকটা লাঘব হয়, তাহাও সহজেই অনুমেয়।

উদ্বোধনের গ্রাহক-গোষ্ঠিতে আমরা নূতন নূতন বন্ধুর সমাগম সর্বদাই অভিনন্দিত করি। নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা পাঠাইবার সময়ে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি মণি অর্ডার কুপনে অবশ্য উল্লেখ করিবেন।

উদ্বোধন

যে পাওয়া পাওয়া

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
    ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সংপাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
    কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
    দিঙ্‌মণ্ডলং ভ্রমসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
    ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৬৭, ৭০

দেহধারী মানুষ যদি অজস্র কামনার পরিপূর্তি-সাধক বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করে তাহা হইলেই বা কি হইল? শত্রুগণের মস্তকে পা রাখিয়া তাহাদের গর্ব খর্ব করিবার শক্তিই যদি লাভ হয় তাহাতেই বা কি কৃতিত্ব? ধনবিভবের বলে অনেক স্তাবক বন্ধু যদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও বা এমন কি? অথবা পঞ্চভূতাত্মক ভঙ্গুর শরীরটিকে যদি কল্পান্তকাল পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় তাহাতেই বা উল্লাস কিসের?

মন, তোমার চাঞ্চল্যের তো ইতি দেখি না! এই মুহূর্তে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে হাজির হইতেছ আবার পরমুহূর্তে সুদূর আকাশ ডিঙাইয়া দিঙ্‌মণ্ডলে ছুটিয়া বেড়াইতেছ। নিজের নির্মল স্বরূপের কথা—যাঁহাকে পাইলে তোমার সকল পাওয়া সার্থক হইবে, তুমি পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবে তোমারই আত্মাতে অবস্থিত সেই বৃহত্তম সত্য—ব্রহ্মের কথা, কই, ভুলিয়াও তো কখনো ভাবিলে না?

কথাপ্রসঙ্গে

জীবন ও মুক্তি

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আমরা কি অবস্থায় ছিলাম, কেমন ছিলাম তাহা আমাদের মনে থাকিবার কথা নয়, মনে করিয়াও কোন লাভ নাই, কিন্তু জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে মানুষের সর্বজনীন অনুভূতি এই যে, 'জীবন' আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। আমরা যত বড় হইতে থাকি, জ্ঞান-বুদ্ধি-আবেগ-কর্ম যত বাড়িতে থাকে, আমাদিগের নিকট আমাদের জীবনের মূল্যও তত বৃদ্ধি পাইয়া চলে। পৃথিবীর মাটিতে জীবন-তরু ক্রমাগত নূতন নূতন শিকড় বিস্তার করে, 'জীবন' বলিতে তখন শুধু আমার দৈহিক জীবনটুকুই বুঝি না, বহু লোকের বহু পরিবেশের, বহু বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত একটি বৃহৎ পরিধি জীবনের সহিত জড়াইয়া যায়। 'জীবন' তখন এই বৃহৎ জীবন। সেই জীবনের উপর আমাদের মমতা তো স্বাভাবিকই। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক অপর কোন অস্তিত্বের কথা আমরা যে ভাবিতে শঙ্কিত হইব, ইহাও কিছু আশ্চর্য নয়।

এত যে প্রিয় আমাদের জীবন—ইহা দাঁড়াইয়া আছে আমাদের শরীরের উপর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের কথা একটু তলাইয়া ভাবি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের জীবনের সমগ্র মূল্যের অতি কম ভাগই রক্তমাংসের দেহের জন্য। আমি বাঁচিতে চাই শুধু শরীরের সহিত প্রাণকে কোনও মতে যুক্ত রাখিতে নয়, দেহের মধ্যে যে মন বাস করে, যে হৃদয় জাগিয়া থাকে তাহাদের বিচিত্র সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য, বিস্তার করিবার জন্য। আমার জ্ঞানস্পৃহা, আমার চতুষ্পার্শ্বের বিপুল প্রকৃতিকে নানাভাবে উপলব্ধি করিবার আগ্রহ, আমার ভালবাসা, সমাজ-বোধ, সহানুভূতি, শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-নীতি-দর্শন, আমার সৃজনপ্রতিভা—এ সকলই আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, না—ইহারাই আমার জীবনের দৈহিক অংশের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। এক কথায়, আমার মন এবং হৃদয় সংসারে চলিতে চলিতে আমার জন্য একটি 'আদর্শ' গঠন করিয়াছে। ঐ 'আদর্শ'ই আমার জীবনের মুখ্য আশ্রয়, জীবন-মূল্যের প্রধান পরিমাপক। যদি আমি আমার চোখ কান নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির আবেদনকে বরণ করিতে না পারি, আমার জ্ঞানশক্তি, বিচারশক্তি বিকল হইয়া বসে, সারা জগতে ভালবাসিবার কোন পাত্র খুঁজিয়া না পাই, হৃদয়ে সকল প্রকার আশা, উৎসাহ, উন্নত অনুভূতি শুকাইয়া যায়, চতুষ্পার্শ্বে করিবার মত কোন কাজ না থাকে—এক কথায়, আমার জীবনের 'আদর্শ' যদি আমার নিকট হইতে সরিয়া যায় তাহা হইলে দেহে প্রাণ থাকিলেও আমি মৃত। আমার জীবনের তখন আর কোন মূল্য নাই। আদর্শের সাধনাই জীবনের চিহ্ন, আদর্শের উপলব্ধিতেই জীবনের সার্থকতা। আদর্শহীন জীবন মানুষের পক্ষে মরণেরই নামান্তর।

বিচিত্র মানুষের মন। কত বিভিন্নভাবে উহা নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। তাই মানুষে মানুষে চরিত্রের যে প্রভেদ হইবে ইহা মানুষের পৃথিবীর একটি সহজ সত্য। মানব-প্রকৃতির এই বিভিন্নতার জন্য আদর্শেরও বহুবিধত্ব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। অসংখ্য আদর্শ থাকুক, এক এক মানব-গোষ্ঠি এক এক আদর্শে চালিত হউক, ইহাতে কাহারও মাথাব্যথা থাকা উচিত নয়, যেমন দেশে দেশে বহিঃপ্রকৃতির তরুলতা-ফুল ফলের অনন্ত বৈচিত্র্য আছে বলিয়া

আমাদের প্রাণে কোন অভিযোগ নাই, সেইরূপ। কিন্তু আদর্শে আদর্শে তুলনা করা অবশ্যই অন্যায় নয়, যেমন নানা বৃক্ষলতাগুল্মপুষ্পের সৌন্দর্য আমরা তুলনা করি, পারস্পরিক গুণাগুণ বিচার করি।

বাল্যকালে বনবাদাড়ে সাথীদের লইয়া যখন খেলা করিতাম তখন জংলা ফুল চয়নেই ছিল কত আনন্দ। বর্ণে, গঠনে, আকারে সে ফুলের দারিদ্র্য ও সাধারণতা তখন ধরা পড়ে নাই। ক্রমে উদ্যানে বহু যত্নে রোপিত নূতন নূতন গাছে কত নূতন নূতন ফুল চিনিলাম, ভালবাসিলাম, নিজেও বাগান সাজাইয়া কত বিচিত্র পুষ্পসম্ভারের সহিত মিতালি পাতাইলাম। আদর্শের ক্ষেত্রেও এইরূপ। এক সময়ে যে আদর্শ মনঃপ্রাণকে মাতাইয়া রাখে পরে উহা ছাড়িয়া নূতন আদর্শের পতাকা বহিতে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আদর্শের মূল্যবিচার করিতে শিখে, ছোটকে ত্যাগ করিয়া বড়কে বরণ করে। ইহাতে তাহার দুঃখ নাই, কেননা সে জানে—বড়র মধ্যে ছোট নিহিত রহিয়াছে। ইহারই নাম মানুষের প্রগতি। যথার্থ প্রগতি ধ্বংসাত্মক নয়, যোগাত্মক। তাহার সম্মুখ-গতির মধ্যে পশ্চাতের সকল শক্তি ঢুকিয়া থাকে।

আদর্শকে আবিষ্কার করা, গ্রহণ করা, উহার পরিপূর্তির জন্য চেষ্টা করা, নিম্নতর আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শে ব্রতী হওয়া—ইহাই তবে মানুষের জীবনের ইতিহাস। এক এক মানুষ এক একটি জায়গা পর্যন্ত আসিয়াছে, প্রত্যেক মানুষের তাই আলাদা ইতিহাস, অসংখ্য মানুষের অগণ্য ইতিহাস—দিনে দিনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার সংযোজনে সৃজ্যমান গতিশীল ইতিহাস। প্রত্যেকটির দাম আছে, কার্যকারিতা আছে, শিক্ষা আছে!

কিন্তু ইতিহাসের শেষ কি নাই? জীবন কি অবিরত নূতন নূতন চিন্তা, ভাব ও কর্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকা? মানুষের কি বিশ্রামের দাবি নাই? বিশ্রাম মানেই কি মৃত্যু; জীবনের পরাজয়?

ইহারই নাম মুক্তির প্রশ্ন। এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বলেন এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা নাই, উহা সংগ্রাম-ভীরু কর্মবিমুখের নিন্দিত পলায়ন-পরতার একটি অলস, যুক্তিহীন, শক্তিহীন সমর্থন-প্রচেষ্টা মাত্র। জীবনই সত্য। আ-মৃত্যু চলিতে হইবে, ছুটিতে হইবে, খাটিতে হইবে, জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। কেন? না, 'কেন'র কোন উত্তর নাই। জীবন মানেই চলমানতা, গতি, শক্তি-সঞ্চয়। জীবনই জীবনের লক্ষ্য; জীবনই সাধন, জীবনই সিদ্ধি।

এই উক্তির পশ্চাতে যে সুস্পষ্ট, বলবান আবেগ আছে, তাহা অনেকেরই পক্ষে অস্বীকার করা কঠিন। তাই সংসারের সহস্র সহস্র লোককে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই চলিতে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক মনোমুগ্ধকর দার্শনিক সংজ্ঞাও আছে যথা, জীবনবাদ, প্রাণবাদ ইত্যাদি। কিন্তু এমনও অনেক মনীষী ছিলেন এবং আছেন যাঁহারা মুক্তির প্রশ্নটিকে এইরূপ দাবাইয়া দিতে পারেন না। তাঁহারা দেখিতে পান যে, যে মানুষ তাহার হৃদয় ও মনের বিস্তার দ্বারা জীবনকে নিছক দৈহিকতা হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতির বৃহৎ পরিধিতে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল সেই মানুষই একদিন তাহার অপ্রতিরোধ্য সৃজন-প্রতিভার সামর্থ্যেই জীবনকে একটি বিশালতর ক্ষেত্রে উপনীত করে—মুক্তির ক্ষেত্রে। তাঁহাদিগের নিকট মুক্তি অলস কল্পনা নয়, জীবনের বৃহত্তম সত্য; কর্ম হইতে পলায়ন নয়, প্রখরতম কর্মকে সর্বতোভাবে আলিঙ্গন; জীবন-বিচ্ছিন্ন অজ্ঞেয় শূন্যতা নয়, অতি-জীবনের সমৃদ্ধ পরিপূর্তি।

মানুষ যখন মুক্তির স্বপ্ন দেখে তখন সে শুধু দৈহিকতা নয়, মানসিকতা এবং প্রাণধর্মেরও ঊর্ধ্বে অন্য একটি ক্ষেত্রে বাসা বাঁধিবার সাহসী হইয়াছে। ঐ ক্ষেত্র মানুষের আত্মা। ভারতবর্ষের উপনিষৎ-শাস্ত্রে উহার বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয়া

যায়। আত্মার জিজ্ঞাসা মানুষের চরম জিজ্ঞাসা, সার্থকতম জিজ্ঞাসা। দেহ যেমন সত্য, মন যেমন সত্য, হৃদয় যেমন সত্য, দেহ-মন-হৃদয়কে বেড়িয়া মানব-জীবনের অজস্র মূল্য যেমন সত্য, আত্মাও তেমনিই সত্য, মানুষের আত্ম-কেন্দ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও তেমনই সত্য। দেহের সীমা আছে, ক্ষয় আছে -মনের এবং হৃদয়েরও বাধা আছে, পরিবর্তন আছে, আত্মার কিন্তু সীমা নাই, ক্ষয় নাই, বাধা নাই, রূপান্তর নাই। আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন, কালিমাহীন, শোকহীন, ভয়হীন—চিরশুদ্ধ, চিরবুদ্ধ, চিরমুক্ত।

না, মানুষকে চিরদিন চলিতে হইবে না, চিরদিন আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে সংক্রমণ করিয়া ভিখারীর মত শক্তি এবং আলোক খুঁজিতে হইবে না। চলার শেষ আছে, অন্বেষণ ও সঞ্চয়ের পরিসমাপ্তি আছে। ঐ সমাপ্তির নামই মুক্তি, মানুষের নিজের বৃহত্তম সত্যকে আবিষ্কার, বরণ, উহার সহিত একাত্মতা। মানুষের ঐ সত্য তাহার দেহ, মন ও প্রাণকে ধরিয়া আছে, কিন্তু উহাদের অস্তিত্বের উপর সেই সত্য নির্ভর করে না। মানুষ বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মুখে স্বীকার করুক বা নাই করুক মুক্তির স্বপ্ন তাহার মনের অতলে রহিয়াছেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন, "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আকাশ যেমন চরাচর বিশাল স্থূল সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তেমনি নিখিল জীবজীবনের অন্তস্তলে যদি এই ভূমানন্দ না থাকিত তাহা হইলে কে বা এক মুহূর্ত বাঁচিতে পারিত? প্রত্যেক নিশ্বাসপ্রশ্বাসটিকে পর্যন্ত সেই ভূমাই যে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

অতএব, মুক্তির স্বপ্ন জীবনের পরিপূর্ণতারই স্বপ্ন। মানুষ সারাজীবন ধরিয়া যত আদর্শের সাধনা করে, প্রত্যেকটি সাধনারই মর্যাদা আছে, মূল্য আছে কিন্তু কোন সাধনাই শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। শেষ প্রশ্নের মীমাংসা পাই যখন আমরা মুক্তিকে আবিষ্কার ক'রি। উহা আবিষ্কার মাত্র—নূতন সৃষ্টি নয়। মানুষের নিজকে আবিষ্কার। মুক্তি মানুষের নিজের স্বরূপ। উহাকে সে পাইয়াই আছে। সে জন্ম হইতেই, এমন কি জন্মের পূর্ব হইতেই মুক্তিকে লইয়া ঘুরিতেছে। এই আবিষ্কারে পিছনে-রাখিয়া-আসা যাবতীয় আদর্শের প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাই—কোনটিই নষ্ট হইয়া যায় না, সকলগুলিই পরিপূর্ণতা লাভ করে—জ্ঞান, ভালবাসা, সুখ, শক্তি, কল্যাণ।

জীবন আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কেন? প্রেমস্বরূপ আত্মা জীবনের মধ্যে লুকাইয়া আছেন বলিয়া। জীবনে এত বিচিত্র চাওয়া, এত কর্মোদ্যম, এত বিস্তারের চেষ্টা কেন? সর্বস্বরূপ আত্মাকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে বলিয়া। আত্মা যেন বৃহৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অনবরত জীবনকে নিজের দিকে টানিতেছেন। জীবন যতদিন না আত্মস্থ হয় ততদিন উহার বিরাম নাই। আত্মস্থ হইলে তবে বিশ্রাম—মুক্তি। মুক্তির জন্যই জীবন।

সংস্কৃতের প্রসার

গত ২৪শে কার্তিক (১১ই নভেম্বর, ১৯৫৫) তিরুপতিতে 'সংস্কৃত বিশ্বপরিষদে'র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংস্কৃতভাষার ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মূল্যবান কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই অভিনন্দিত করিবেন।

"সংস্কৃত হইতেছে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জীবন-প্রেরণার ভাষা। ভারতের সমুদয় অতীত মহত্ত্ব, উচ্চ চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই ভাষার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। * * * ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির পরিচয়ের জন্যই হউক কিংবা নৃত্য গীত প্রভৃতি ভারতীয় চারুকলার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিতে অথবা আমাদের জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের অন্তরালবর্তী লুপ্ত তথ্যগুলি উদ্ধার করিতেই হউক, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়।"

রাষ্ট্রপতি সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য বৈদেশিক পণ্ডিতবর্গের গভীর অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। মানবের উচ্চ চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য এই ভাষার বিশিষ্ট স্থান কি তাহা আমরা ঐ সকল বৈদেশিক সুধীজনের নিকট হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। তিনি আরও বলেন, বিদেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার সংস্থা একশত বৎসর পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে। জার্মান ও ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা একটি আবশ্যিক পাঠ্য।

সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের এইবারকার সম্মেলনে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার গুলিকে উচ্চবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়রূপে নির্ধারিত করিবার অনুরোধ জানানো হইয়াছে। অধিবেশনে সমবেত তেরশত প্রতিনিধির নিকট প্রস্তাবটি সাদর সমর্থন লাভ করে।

স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের উপর চিন্তাশীল মনীষী এবং নেতৃগণের কেহ কেহ মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সভায় যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন উহাকে অলস ভাবপ্রবণতা মনে করা উচিত নয়। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষায় যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে তাহাদের ইংরেজী বা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ পড়িয়া লইলেই তো চলে, বহুশ্রমসাধ্য সংস্কৃত ভাষা শিখিবার কি প্রয়োজন ? স্বামী বিবেকানন্দ ইহার উত্তর দিয়াছিলেন—

"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। * * * বুদ্ধ সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ ভাবসমূহ অনুবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তৃত লইতে লাগিল। দূরে, অতি দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। * * * সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় জানিতে পারিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই।"

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক একতার পরিপুষ্টি, ভারতবাসীর নিজস্ব সংস্কৃতির মর্মোপলব্ধি, নানা প্রাদেশিক ভাষার বলিষ্ঠতা-সম্পাদন এবং জাতিভেদের বৈষম্য দূরীকরণ —এতগুলি গুরুতর প্রয়োজনের সংসিদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষা আমাদের জাতীয়শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারসমূহ কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হইবেন ইহাই আমাদের একান্ত আশা।

অনুকরণীয়

কৃষ্ণনগরের জনৈক সমাজকর্মী একটি আনন্দের সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। নদীয়া জেলার গাছা আদিবাসী পল্লীতে তিনি এবং তাঁহার সহকর্মিগণ গ্রামবাসীদের লইয়া এবার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন—কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় বহু আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত সখের সর্বজনীন পূজাবিলাস নয়, সকল প্রকার সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত অবহেলিত জনগণের প্রাণের পূজা। এই অঞ্চলের শত শত আদিবাসী জীবনে এই প্রথম অনুভব করিবার সুযোগ লাভ করিল যে তাহারাও বৃহৎ হিন্দুসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জগজ্জননী দুর্গা যেমন ধনী ও অভিজাতদের মা, তেমন তাহাদেরও মা ; মায়ের আরাধনায় তাহাদেরও অধিকার আছে। সংবাদদাতা লিখিতেছেন, আদিবাসীজনগণ মায়ের পূজাসংশ্লিষ্ট নানা কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান

করিবার সুযোগ পাইয়া অভূতপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দবোধ করিয়াছে।

"মহকুমা-শাসক শ্রীএস্ কে গাঙ্গুলি মহাশয় পূজানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সপ্তমী দিবস জেলা-শাসক শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর আদিবাসীদিগের দুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। * * * সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী দিবসে এই অঞ্চলের অগণিত স্ত্রী পুরুষ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একত্রে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং প্রসাদ গ্রহণ করে। * " * বিজয়া দশমীর দিন গ্রামবাসিগণ প্রতিমা লইয়া ক্ষুদ্র একটি শোভা-যাত্রা বাহির করিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ করে। এই অঞ্চল অস্পৃশ্য এলাকা বলিয়া কোন প্রতিমাই এদিকে কখনও আসে না। প্রতিমা যখন ঐ সকল পল্লীতে প্রবেশ করে তখন স্থানীয় জনগণের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহিয়া গিয়াছে এবং মায়ের চরণে প্রণাম করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ যুবক, যুবতী নির্বিশেষে সকলে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।"

পূর্বোক্ত সমাজসেবক এবং তাঁহার সহকর্মিগণ নদীয়া জেলার ঐ অঞ্চলে আদিবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও অন্যান্য গঠনমূলক সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র জনসেবার কী বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে! যাঁহারা নিষ্ফল রাজনৈতিক দলাদলি ও সরকারের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতেছেন তাঁহাদিগকে এই নিঃস্বার্থ উৎসাহী সমাজ-সেবকগণের আদর্শ অনুকরণ করিতে বলি।

'তেষাং সুখং শাশ্বতং'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শাশ্বত আনন্দ আছে তোমারই মাঝারে ;
ভিক্ষুকের মতো কেন ঘুরি দ্বারে দ্বারে
একটু সুখের লাগি? কামিনী, কাঞ্চন,
খ্যাতির পশরা—এরা ছায়ার মতন।
ছায়া দিয়ে পূর্ণ হয় মানব-হৃদয়?
ভূমৈব সুখম্—সুখ অল্পে কভু নয়।

শাশ্বত এ মহাসত্য বুঝিনাকো ব'লে
জীবনের এত দুঃখ! তাই মরি জ্ব'লে
বাসনার তুষানলে। এত আয়োজন
ইন্দ্রিয় সুখের লাগি—তবু অনুক্ষণ
কাঁদে রিক্ত ক্লান্ত চিত্ত। আমি আজ মৃত
বজ্রাহত তরু সম ; তুমি তো অমৃত ;

তুমি তো এ নিখিলের সর্বব্যাপী প্রাণ!
করুণা করিয়া মোরে করো পরিত্রাণ।

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

[ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজ) আগামী জন্মদিন ৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫), শুক্রবার। মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন এমন দুই জনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। —উঃ সঃ]

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৪ সালে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ গ্রীষ্মের সময় মালদহের দিকে প্রচার কার্যে যান। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে মঠে ফিরলেন। আষাঢ়-শ্রাবণ দু'মাস আমাদের স্বামীজীর রাজযোগ পড়া হয়। স্বামী ভজনানন্দ (চারুদা) পড়তেন এবং স্বামীজীর ছোট ভাই মহিম বাবু ব্যাখ্যা করে বলতেন। একদিন রাজযোগের মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা সূত্র পড়া হচ্ছে, স্বামীজীর ব্যাখ্যা পাঠের পর বাবুরাম মহারাজ বলতে লাগলেন, কেন আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা হয় এবং কেমন করে চিত্তপ্রসাদ আসে। বললেন, "চিত্তের চঞ্চলতা আমরা নিজেরাই ডেকে আনি, অধিকাংশ সময় আমরা এর জন্য নিজেরাই দায়ী ! যেমন—

(১) যার সুখে আমাদের কোনও ভালমন্দ স্বার্থ নেই, অর্থাৎ আমাদের ব্যাঘাত ঘটবার কোনও কারণ নেই, সেখানেও অকারণ ঈর্ষা এসে উপস্থিত হয়। যাকে কখনও চিনি না, তারও রূপ গুণ ঐশ্বর্য দেখলে কেমন একটা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

(২) যে শত্রু তার দুঃখ দেখলে, একটা ক্রুর হাসি মুখে ফুটে ওঠে; অথবা শত্রুকে কোন বিপজ্জনক কাজ করতে দেখলে তাতে উৎসাহ দেওয়া, নীরবে থাকা বা গোপনে আনন্দ করা। এর নাম গুপ্ত-হিংসা।

(৩) একজন লোক কোনও ভাল কাজ করছে, কিন্তু সে যদি ভিন্ন দলের লোক হয়, অমনি মনটা খারাপ হয়ে পড়ে, এও ঐ গুপ্ত হিংসা।

(৪) কাকেও দোষ করতে দেখলে বা শুনলে নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা কিছুই মনে পড়ে না, ক্রোধ এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা বিচারকের আসন গ্রহণ করে বসি।

"আর একটা ব্যাপার শোন। মনের কার্য-কলাপ বিচার করে দেখতে দেখতে সব গাঁট খুলে যায়, সেইজন্য বলছি মিথ্যা কথা বলতে বলতে মানুষের শেষে বোধই থাকে না যে সে মিথ্যা কথা বলছে। ভাল লোকের সঙ্গে মিত্রতা, দুঃখীর প্রতি করুণা, পরের ভাল দেখলে আনন্দ, দুষ্টের ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা যে করতে পারে সে তো মহাপুরুষ। উল্টে লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। ছেলেরা প্রথম ভয়ে মিথ্যা কথা অভ্যাস করে, বয়স হলে আবার ঠাট্টা করে মিথ্যা বলে, কিন্তু সেগুলো বেশীক্ষণ থাকে না; তারপর রাগের মাথায় মিথ্যা যা তা বলে, এটা কিন্তু অনেক দিন থাকে অর্থাৎ যতদিন রাগটা না যায়। এর চাইতে আর একটা মিথ্যা আছে, সেটা আরও ভয়ানক, লোকে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে, অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যাটা বলতে বলতে ঠিক সত্যের মত হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অনুসন্ধান না করে লোকের উড়ো কথার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেটাকে পুনঃ পুনঃ বলতে বলতে সেটা তার এবং তার মত লোকের কাছে একেবারে খবরের কাগজের সত্যের মত হয়ে পড়ে। দেখিস্ নি ইলেকসনের সময়, যুদ্ধের সময়—একটা মানুষ বা দল বা জাতকে দাবাবার জন্য মানুষ কি না করে। আর ঐ মিথ্যাবাদীরা যদি জিতে যায় ত ঐ মিথ্যাটাই ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়।

আর যদি বা চেতনা হয়, তখন আর সত্য কথাটা বলবার ভরসা হয় না, একটা ছোট ব্যাপারকে এমন বড় ক'রে লোকের সামনে ধরেছে যে এখন সেটা লোকের কাছে প্রকাশ হলে নিজের ধর্ম-ধ্বজিতাটা একেবারে ভেঙে পড়বে—আর ফেরবার উপায় নেই—যতদিন লোকের কাছে সাধু বলে পরিচয় দিতে হবে, যতদিন বাচতে হবে, ততদিন ঐ মিথ্যাটাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে হবে। আর নইলে বলে, আগে এইরূপ দোষ ছিল এখন শুধরে গেছে। একবার শুনেছিলাম ও দেশে একটা ডাক্তার একটা অপারেশন ভুল করে দোষটা এ্যাসিস্ট্যান্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। রোগীটা মারা গেল। দুর্নামের ভয়ে সত্য কথা বললে না। নার্স দেখেও চাকরির ভয়ে সাহস করে কিছু বলতে সাহস করলে না। এ্যাসিস্ট্যান্ট বেচারী লজ্জায় ভয়ে আত্মগোপন ক'রে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে অন্য রকম কাজ নিয়ে রইল। তারপর ঐ বড় ডাক্তারটা রিটায়ার ক'রে নিজের দোষটা প্রকাশ করলে। দেখ, মিথ্যার জন্য কত সুন্দর সুন্দর জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

"আবার যদিই বা কারুর একটু ছিদ্র পেলে তো সেটা সারা জীবন পুষে রেখে দিল, দরকার হলেই সেটা কাজে লাগাবে। শিশুকালের দোষের জন্য শাস্তি দেওয়ায়, মাণ্ডব্য ঋষি যমরাজকে শাপ দেন, তিন জন্ম মানুষ হয়ে জন্মাতে হল, ধর্মব্যাধ, বিদুর ও যুধিষ্ঠির। সুফীদের বইতে একটা বেশ গল্প আছে। একজন খুব অতিথিসৎকার করতেন। একজন পথিককে একবার রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে খাবার জোগাড় করে দিলেন, পথিক ভগবানের নাম না করেই খেতে আরম্ভ করে দিলে। তাই দেখে গৃহস্বামী বললেন, 'তুমি যাও, তোমার মত অকৃতজ্ঞের সৎকার আমি করি না।' পথিক চলে গেল, তখন সুফী শুনতে পেলেন প্রভুর বাণী, 'দেখ, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালেও আমি একে সারাজীবন ধরে খাওয়াচ্ছি, আর তুমি একদিনও এর গাফিলতি ক্ষমা করতে পারলে না।' তখন সুফী আবার পথিকের নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে খাওয়ালে।"

* * *

১৯১৬ সালের শীতের প্রারম্ভে গীতা পড়া হচ্ছে বেলুড় মঠের 'ভিজিটার্স রুমে'। গীতার ২।২৯ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান শঙ্কর বলছেন—"যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আশ্চর্য লোক। আবার যাঁরা বলেন ও শ্রবণ করেন তাঁরাও আশ্চর্য ব্যক্তি, কারণ এইরূপ বুদ্ধি অনেক সহস্রের মধ্যে দুই এক জনের হয়ে থাকে। অতএব এই শ্লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে, আত্মা অতি দুর্বোধ্য।" এই সময় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আত্মস্থ ব্যক্তি চতুর্দশ ভুবন অতিক্রম করে থাকেন। আত্মদর্শীরা আশ্চর্য লোক। ঠাকুর গাইতেন—

"প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেমিক এমনি রত্নধন, কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন।
(ও সে) হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় নাক জাতি চায় না সুখ্যা'ত
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া।
আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে
বানায় ঘর॥"

* *

(দুই)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

১৯১৮ সালের গোড়ার দিক। স্বামী প্রেমানন্দ গুরুতর রোগাক্রান্ত। কলিকাতার চিকিৎসায় তেমন

কোন উপকার না হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনে ফল হইতে পারে ভাবিয়া তিন জন উপযুক্ত সেবক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেওঘর পাঠান হইল। সেখানে সেবকদের সযত্ন শুশ্রূষায় বাবুরাম মহারাজ দিনাতিপাত করিতেছেন। কলিকাতা শহর হতে অনেক দূরে অবস্থান করিলেও প্রেমিক মহাপুরুষের ভালবাসায় আকৃষ্ট ভক্তবৃন্দ সময় সময় দেওঘর আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রত্যহ ভক্ত অতিথি ওখানে উপস্থিত হইতেন, সংখ্যায় কখনও বেশী, কখনও কম। সেবকগণের যাহাতে বেশী অসুবিধা না হয় অথচ ভক্তগণও যাহাতে অপ্রস্তুত না বোধ করেন, উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য বাবুরাম মহারাজ প্রত্যহ রান্নাশেষে একটি হাঁড়িতে জল চাপাইয়া রাখিবার নির্দেশ দিলেন; যদি কেহ আসে অমনি চাউল হাঁড়িতে চাপাইয়া দিয়া অনতিবিলম্বে ভক্তসেবা সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই হইত। গাড়ী অনেক বেলাতে ১১টায় আসিত। যাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিতেন তাঁহাদের বাবুরাম মহারাজের বাসস্থানে লইয়া আসিবার জন্য জনৈক সেবক প্রত্যহ ষ্টেশনে প্রেরিত হইত। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) যখন দেওঘরে বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে আসেন তখন তিনি এইসব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ, এখানেও এসে তুমি দেখছি এক মঠ জাগিয়ে বসেছো।" উত্তরে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন—"তারকদা, বাবুরামের হোটেল যতদিন তার শরীর থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।"

বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। খুবই দুর্বল, কাশি হইয়াছে; বার বার উঠিয়া থুথু ফেলিবার শক্তি নাই। রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি পায়। এক রাত্রিতে কাশি উঠিবার পর পিকদানি খুঁজিতে গিয়া হাতড়াইতেছেন। এমন সময় জনৈক সেবকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাবুরাম মহারাজের পার্শ্বেই শুইত। সে উঠিয়া পিকদানি আগাইয়া দিল এবং বলিল—"আমি আপনার পার্শ্বে থাকি। আমার গায়ে একটু হাত লাগালেই জেগে উঠি। আমরা জাগালে তো এত কষ্ট হত না!" বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন—"তোরা দিনরাত সেবা করছিস্, খাটছিস্—তোরা একটু বিশ্রামও করবি নি? তোদের কোন্ প্রাণে আমি রাত্রিতেও বিরক্ত করতে পারি বল্?" বলিতে বলিতেই বাবুরাম মহারাজের চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

এ সময় একদিন একটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। আজ রাত্রি কাটিবে কিনা সন্দেহ। সে শুনিতে পাইয়াছে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এখানে থাকেন। তাই সে আসিয়াছে এ আসন্ন বিপদে তাঁহাদের কোন সহায়তা পাওয়া যায় কিনা। শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। একটি সেবককে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের পরিচিত এক ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাইবার জন্যও বলিয়া দিলেন। ডাক্তার আনিয়া রোগীকে দেখান হইল। যথাবিধি ঔষধাদিও সেবন করান হইল। ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার অপর সেবককেও পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় সেবকটিকেও পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুতর অসুস্থতায় সেবকহীন অবস্থায় সারা রাত কাটান নিরাপদ নহে মনে করিয়া তৃতীয় সেবক যান নাই। সকলের সমবেত সেবা এবং যত্নেও যক্ষ্মারোগীর কিন্তু কোন উন্নতি দেখা গেল না। রোগী সেই রাত্রেই দেহত্যাগ করিল।

এই সংবাদ মঠে পৌছিয়াছিল। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজী দেওঘর আসিলে পরে এ ঘটনা উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "তুমি যে এখানে একটি সেবাশ্রমও খুলে বসেছো দেখছি।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "কি বলব তারকদা,

সেই ছেলেটির বিপন্ন অবস্থার কাহিনী শুনে আমার মনে হল, আমার সেবার কিছু দরকার নেই, আমি বেশ আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন একটা প্রেরণা দিলেন, তাই পাঠালুম এদের এক এক করে। এরা এসব দেখে শুনে যদি মানুষ হয়, তবেই সব সার্থক।"

দেওঘরে থাকিতে প্রচুর দুধ রাখা হইত। সময় সময় প্রায়ই এত বেশী দুধ থাকিত যে উহা দ্বারা কি করা হইবে একটা চিন্তার বিষয় হইল। একটি সেবক ছানা প্রস্তুত করিয়া নানা রকম মিষ্টি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পর উহা নিত্যকার কাজ হইয়া দাঁড়াইল। বাবুরাম মহারাজ কোনকালেই জিনিসের অপচয় পছন্দ করিতেন না। একদিন তিনি সেই সেবকটিকে একটু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "সে কি রে, রসনার তৃপ্তির জন্ম সাধু হয়েছিস? যতটুকু দরকার ততটুকু দুধ রাখ্‌বি। অতিরিক্ত ব্যয় করবি কেন?" সেবকটির খুব অভিমান হইল। সে না বলিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, কেহ স্থির করিতে পারিল না। এই ঘটনায় বাবুরাম মহারাজের প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অপর একজন সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "ছাখ ও কোথায় গেল—খুঁজে নিয়ে আয়।" অমনি একজন সেবক তাহার খোঁজে বাহির হইয়া গেল। অনেক সন্ধানের পর তাহাকে পাওয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে, রাগ করেছিস? আমার উপর রাগ হয়েছে? ছাখ্, যা বলি তোদের কল্যাণের জন্ম। তোরা বাপ মা ভাই বোন সব ছেড়ে এসেছিস সাধু হবার জন্ম। তোরা যাতে ঠিক ঠিক আদর্শবান সাধু হতে পারিস্ তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জিহ্বাসংযম খুবই বড় সংযম। শাস্ত্র বলেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে'—জিহ্বা সংযত হ'লে সকল ইন্দ্রিয় সংযত হয়। তাই বলেছিলাম, তা বলে রাগ করতে আছে? অভিমান করতে আছে? ছি, ছি, ছি! লাজ মান ভয়, এ তিন থাকতে নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা রে।" এইভাবে উপদেশ দ্বারা সেবককে শান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে তাহাকে নিজ হাতে মিষ্টি পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সেবক পরে বাবুরাম মহারাজের প্রেমবিগলিত হৃদয়ের কথা বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

শিক্ষার সাফল্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

মানুষ হাট-বাজারে বেচা কেনা করে, বাস করে না। কারবার করিতে গিয়া তাহাকে একটা না একটা মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরের মাল, কত সস্তায় কিনিবে এবং নিজের মাল কত বেশী দরে বিকাইবে ইহাই তাহার চিন্তা। এখানে সত্যের আসল ছবিটি তার কাছে অন্তর্হিত। কিন্তু বাস করিবার জন্ম একটা মন্দিরও আছে। সেইটার নাম অন্তরাত্মা। এখানে 'শান্তশীতল রাগে' যে ঠাকুরটি বিরাজ করিতেছেন তাঁহার স্নেহ-জাগ্রত নয়নের নিম্নে মানুষের প্রাণকে নিরাবরণ হইয়া হাজির হইতে হয়। হাটে মিথ্যা কারবার করিয়া, একরাশি অভিমানের পশরা বহিয়া মানুষ যখন অবসন্নপদে তার মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে মন্দিরাভ্যন্তরের 'মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ-

নিনাদ' তাহার কম্পিত মস্তক হইতে সকল অভিমানের ও প্রবঞ্চনার ঝুড়ি ধূলির উপর লুটাইয়া দেয়। সে পশরা মাথায় বহিয়া অন্তরাত্মার মন্দিরে যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে 'চিন্তামণির নাচদুয়ারে' আমায় যে মুখোস খুলিয়া ফেলিতেই হইবে। এখানে আসিয়া ঝুটাকে সাচ্চা হইতেই হইবে যে। এখানে মানুষের ছোট বড় দুইটা দিকই বেশ করিয়া মিলাইয়া, হিসাব নিকাশ করিয়া পাকা খাতায় তুলিতে হইবেই যে। বাজারে কানাকড়ি লইয়া খেলিয়াছি, কানাকড়িই কুড়াইয়াছি, কিন্তু আমার নিভৃত গৃহকোণে 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' যে অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছেন সেখানে আমার পুঁজিপাটার কড়াক্রান্তির একটা হিসাব আমায় করিয়া লইতেই হইবে যে। নিজের ধন-রত্নের সিন্দুকটি কেহ ঘাড়ে করিয়া হাটে যায় না; সেখানে কারবারের ফল কুড়াইয়া আনিবার জন্য একটা ছোট থলেই যথেষ্ট; কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে থলেটিকে লইয়া সিন্দুকের কাছেই ত হাজির করিতে হয়; ছোটকে আর ছোট করিয়া ফেলিয়া রাখা চলে না, বড়র সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। সকল কাজের মধ্যে ছুটি করিয়া লইয়া আমার অন্তরাত্মার মাঝে যে বড়টির কাছে আমার এক আধ বার হাজির হইতেই হয়, সেই বড়ই ত স্বরাজ্য। হাটের মাঝে কেহ আমাকে ইহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কবুল করি না; বলি স্বারাজ্য আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আর আত্মবঞ্চনা চলে কি? মানুষ যতক্ষণ বলিতেছে আমি শরীরের সুখ চাই, যশ চাই, প্রতিপত্তি চাই, বাহ্য সম্পদ চাই, ততক্ষণ সে ফুলের বাহিরে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে মাত্র; ফুলে যেই সে বসিতে পাইল সেই সে সুস্থির হইল; কারণ তখন যে তার নিশ্চিন্ত ও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া হইয়াছে, এটা চাই, ওটা চাই করিয়া আর ব্যর্থ প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। সেই ফুলটাই তার অন্তরাত্মা এবং তাহাতেই যে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠার আনন্দ তাহাই স্বারাজ্য-সিদ্ধি।

ভাঁটার সময় সাগর যখন আপনাকে একটু সরাইয়া লইয়াছিল তখন তাহারই রসে সিক্ত বেলা-ভূমিতে বসিয়া তাহার পানে পিছন ফিরিয়া নিজের ভিতরে যে দীনতার মণ্ডূকটি বাস করে তাহার জন্য একটা গর্ত কাটিতেছিলাম। পশ্চাতে বিপুল উচ্ছ্বাসে সাগরের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু আমি তার শাশ্বত ভৈরব বাণীকে একটা অজানা রহস্য ভাবিয়া গ্রাহ্য করি নাই; মনকে বুঝাইয়াছিলাম যে ও বিরাট রহস্যের সঙ্গে আমার নিজস্ব ছোট গর্তটির কোনও সম্পর্ক নাই। আমার মণ্ডূকজীবনের ক্ষুদ্রতা নিজেই পরিব্যাপ্ত এবং সেই-টুকখানিই আমার কায়েমী স্বারাজ্য। খাওয়া-পরার কথা ভাবিব, সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা ভাবিব এবং সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে নিজেকে খুব চালাক ও লায়েক করিয়া তোলাই আমার শিক্ষা। ভেক গর্তের জলটুকুতে লাফাইতে শিখিবে, বেশ চালাকি করিয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া খাইতে শিখিবে, বংশবৃদ্ধি করিয়া যাইতে অলস্য থাকিবে না, এবং অবসরমত গর্তের পাঁরে বসিয়া সাগরের বিপুলতা ও নদনদীর স্বাধীনতাকে বেশ বিজ্ঞের মত উপহাস করিবে—ইহাই হইল তাহার শিক্ষা এবং ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু হে মানবাত্মা! সাগরের জলের বিপুলতা ও গভীরতার মাঝখানেই যে তোমার স্বাভাবিক মন্দির একথা কতক্ষণ নিজেকে তুমি ভুলাইয়া রাখিয়া কূপ-মাণ্ডুক্যের তুচ্ছতাকে বরণ করিয়া রহিবে? বিরাট তুমি, তোমার এ তুচ্ছের সাজ কতক্ষণের জন্য? ভূমা তুমি, তোমার এ অল্পের ভান কতক্ষণ টিকিবে? কতক্ষণ তুমি বলিবে যে সাগরসৈকতে যে একরত্তি জল চোয়াইয়া গর্তের ভিতর আসিতেছে তাহাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত; কেবলমাত্র খাওয়া-পরা, লম্ফঝম্পের যে কৃপণ, কুণ্ঠিত সুখ তাহাই আমার

বাঞ্ছনীয়? যে শাশ্বত আনন্দে এ নিখিল বিশ্ব স্থষ্টির সম্প্রসারণ অনুভব করিয়াছে, যে বাধহীন, সঙ্কোচহীন আনন্দে এ জগৎটা প্রতিষ্ঠিত, এবং সাগরের জলে বরফের মত যে অপরিমেয় আনন্দে স্থষ্টি নিজের বিশিষ্ট রূপ আবার হারাইয়া ফেলিবে সে আনন্দ যে তোমারই আনন্দ, সে যে তোমার নিজেকে নিজের ভালবাসার চরিতার্থতা; কতক্ষণ সে আনন্দের পূর্ণাভিষেক হইতে নিজেকে ভয়ে তুমি সরাইয়া রাখিতে পারিবে? ঐ দেখ সাগরের জলে আবার জোয়ার আসিতেছে; যে সঙ্কীর্ণ বেলাভূমিতে সাগর এ সংসারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সেটাকে মাঝে মাঝে সাগর নিজের বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া না লইলে, বুঝি বা গর্তের জলে মানবাত্মার মণ্ডুক-লীলাভিনয় চিরন্তন হইত। কিন্তু জোয়ারের সময় সিন্ধু যখন তোমার বালির খেলা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যাইবে, তখন, হে মণ্ডুক! তুমি তোমার দীনতার ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া সেই প্রাচীন সুপর্ণ পক্ষীটির মত হিরণ্ময় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া সাগরের বিশালতার পানেই অভিযান করিবে না কি? যেখানে সাগরের অশান্ত গাঢ় নীলিমা আকাশের সুস্থির নীলিমার কাছে ধরা দিয়াছে, যেখানে সমগ্র স্থষ্টিটা চিদাকাশের সমাধিবেদী-প্রান্তে সম্ভ্রমে প্রণত সে দিকে হে মানবাত্মা! খেলা ভাঙ্গিবার পর তোমার পুণ্য-অভিযান। ঊর্ধ্ব, অধঃ চতুর্দিক্ যথায় অন্তরের পূর্ণমহিমায় দীপ্ত সুনির্মল, যে ভূমিতে পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে, যে পদবী "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—তথায় হে স্থরি! তোমার হিরণ্ময় পক্ষ বিস্তার করিয়া, তোমার অপগত মোহ "আতত চক্ষু" মেলিয়া দেশকালের সীমা-রেখার বাহিরে যে আত্মার সর্বাত্মতা তুমি অনুভব করিবে, তাহাই তোমার স্বারাজ্য। এখানে স্ব এর মধ্যেই সব, 'আমি'র ভেতরেই 'তুমি'।

আর একদিন দেখি পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কাহার কাছে, কি যেন কি একটা চাই; কি যেন কি একটা না পাইলে আমার প্রাণের ক্ষুধা ভরে না, পিপাসা মিটে না; সেই চাওয়াটার নাম দিয়াছি আমার ভিক্ষার ঝুলি। সেই ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এই মগব্রজের কুঞ্জ দ্বারে দ্বারে আমি 'জয় রাধে' বলিয়া মাধুকরী করিয়া বেড়াইতেছি। ভিক্ষা-মুষ্টি হাতে করিয়া সে যখন কুঞ্জ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া আমি বলিতেছি—হে আমার চির-বাঞ্ছিত! তোমারই পায়ে আমায় বিকাইতে না পারিলে আমার চরিতার্থতা নাই। তোমারই গৃহাঙ্গন আমার প্রাণের অঞ্চল দিয়া নিত্য মুছাইতে না পারিলে যে আমার স্বস্তি নাই; তোমারই ডাকে আমার চরণ চঞ্চল, তোমারই সেবায় আমার কর দুটি অনলস করিতে না পারিলে আমার 'জনম'টাই যে বৃথায় যাইবে। অতএব হে আমার 'তুমি'! তোমারই আবাহনে, আপ্যায়নে ও পরিচর্যায় আমার 'আমি' কে স্বীকার করিয়া লও। ইহাই তোমার দ্বারে আমার এ ভিক্ষা। আমার এ ভিক্ষার মর্ম সে বুঝিল না, ফিরিয়া গেল। বাউলও অন্য দ্বারে গিয়া তাহার ঝুলি পাতিয়াছে। এ জগতের প্রত্যেক হৃদয়টার কাছে সে আপনাকে বিনা কড়িতে লুটাইয়া বিলাইয়া দিতে চায়; কিন্তু জগতের প্রাণী যে কড়ি দিয়া কিনিতে ও বেচিতেই অভ্যস্ত; যেখানে কড়ির নামগন্ধও নাই, আদান-প্রদানের একটা কষাকষি মাজামাজি নাই, সেখানে যে পা বাড়াইয়া দিয়াছিল সে ত সত্যসত্যই বাউল, সে বুদ্ধিমান, হুঁসিয়ার জীবের কারবারের বাহিরে। শকুন্তলা যে দিন নবমল্লিকার মূলে বারি সেচন করিতে গিয়া দর্ভাঙ্কুর-বিদ্ধচরণা কাহার পানে সলজ্জ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াছিল, শ্রীরাধা যেদিন 'কনক-কলসে' যমুনার জল ভরিতে আসিয়া কাহার বেণুরবে স্রোতের মুখে বেতসীর মত কাঁপিয়া উঠিতেছিল, জুলিয়েট যেদিন রোমিওর বক্ষোলগ্ন

হইয়া বিহগকণ্ঠে উষার জাগরণ শব্দটাকে নিশীথের সুখস্বপ্নেরই সামিল করিয়া লইতেছিল, দেস্‌দেমিনা যেদিন স্বামীর আততায়ী-হস্তের নিষ্পেষণে শেষনিশ্বাসে বলিতেছিল—"প্রভু—"সেদিন কিন্তু সে সকলের মধ্যে সেই প্রাচীন বাউলটাই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যেদিন নির্বাণের জন্য, জীবের জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখ দূর করিবার জন্য বোধি-বৃক্ষতলে সমাধি করিলেন, খ্রীষ্ট যেদিন জগতের কলুষ-কলঙ্ক নিজের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে উঠিলেন, চৈতন্য যেদিন জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাইবার জন্য জাহ্নবীতীরে সন্ন্যাস লইলেন, কবীর যেদিন কুষ্ঠী কুৎসিত জীবের মুখের কাছে "এ হি মেরা রাম" বলিয়া প্রেমের আরতি করিলেন, সেদিন সেই পরিচিত বাউলটারই আমরা সাড়া পাইয়াছি। সে যে আমার বড়ই দরদী, সাচ্চা ফেলিয়া ঝুটা লইয়া থাকিতে আমায় কোন মতেই দিবে না। তাই আমাদের "ক্ষুধিত পাষাণের" চারিধারে সেই বাউলটাই আবার আপন মনে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে—"তফাৎ যাও,—সব ঝুটা হ্যায়।" বাউল আমাদিগকে যে স্বারাজ্য দিবে সে যে সেবার স্বারাজ্য, প্রেমের স্বারাজ্য; সেখানে 'তুমি'র পাশে 'আমি'—'তুমি'র দুয়ারে নিত্য বিকাইয়া 'আমি,' বলির দুয়ারে যেমন ভগবান।

প্রেমের স্বারাজ্য বড়, কি নির্বাণের স্বারাজ্য বড়—ইহা লইয়া গোলমাল করিয়া কোনও ফল নাই। প্রেমের স্বারাজ্যে জগৎ সংসারটা 'আমার,' জ্ঞানের স্বারাজ্যে জগৎ সংসারটা 'আমি'। প্রথমটিতে তোমার সঙ্গে আমার সেবার সম্বন্ধ, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে; দ্বিতীয়টিতে তোমার সঙ্গে আমার ভাবনার সম্বন্ধ, আমি ভাবিতেছি বলিয়াই তুমি রহিয়াছ; সুতরাং তুমি আমার বাহিরে থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরে। প্রথমটিতে, আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া আমার প্রেমকে অকাতরে সকলের কাছে বিলাইয়া দিয়াছি, সুতরাং কেহ আমার পর নাই, কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, কোনখানে আমার ব্যাঘাত নাই, নিজেকে ঢালিয়া দিতে কোন কিছুরও অপেক্ষা নাই, ইহাই হইল আমার স্বারাজ্য। জগতে এমন কেহ দীন অকিঞ্চন নাই, যাহাকে আমার ভাণ্ডারের বাহিরে এক পাশে শূন্য রহিয়া যাইতে হইবে. জগতে এত বড় ঐশ্বর্যের স্পর্ধা নাই যেখানে আমার সাধের বাউলটি হাজির হইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। এ স্বারাজ্য কি কম স্বারাজ্য? ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাহারও সাধ্য আছে কি, যে একটা সীমারেখা টানিয়া দিয়া বলিতে পারে—ওহে বাউল! তোমার সেবার অধিকার এই পর্যন্তই। কোন পাপী তাহাকে বলিতে পারে—ওগো, আমার কাছে তুমি এসো না, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। কোন পুণ্যশ্লোক তাহাকে বলিবে—ওগো, আমার পুণ্যমহিমাই আমার কাছে পর্যাপ্ত, তোমার সেবায় আমার প্রয়োজন নাই? কে আছে এমন রাজা যে, মিথ্যা স্তুতিগানের কোলাহল উপেক্ষা করিয়া একটিবার প্রাসাদ-বাতায়ন-পথে পথের ঐ বাউলটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিবে না? পথিক আজ তার সিংহদ্বারে যে দান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দান বরিয়া লইতে রাজবেশের মণিমুক্তার বন্ধনের ভিতর হইতেও মানবাত্মা সাগ্রহ হইয়া উঠে; সে দানের স্থির স্নিগ্ধ আভার সম্মুখে রাজচক্রবর্তীর গৌরব-সমুজ্জ্বল বিজয়শ্রী এবং অসামান্য-সাম্রাজ্যলক্ষ্মীও যে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ে! আবার কে আছে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগারে এমন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত চিরবন্দী, যাহার কারাকক্ষের লৌহ-অর্গল ঐ বাউলের ডাকে নিঃশব্দে খুলিয়া যাইবে না, যাহার ক্লিষ্ট পীড়িত অঙ্গ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল সে ডাকের সম্ভ্রমে খুলিয়া পড়িবে না। আয়েষা যেদিন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের কারা-কক্ষে সঞ্চারিণী শুশ্রূষার মত আসিয়া 'হাতীশালে হাতী ও ঘোড়াশালে ঘোড়ার' কথা বলিয়াছিল,

সেদিনও আমরা আমাদের ঐ বাউলটিকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। দ্বিতীয়টিতেও আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া, সৃষ্টির নিখিল সামগ্রী নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছি! কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই; কারণ সবই যে আমি। আমার ভাবনার ভিতরেই বিশ্বটা বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে, মিলাইতেছে। সকল সুখ-দুঃখকে বুকে করিয়া আমি আনন্দ; সকল আলো-আঁধার অন্তরে বহিয়া আমি "ধ্রুবজ্যোতিঃ"; সকল শুভ-অশুভকে জড়াইয়া লইয়া আমি শিব; সকল সুধা ও গরল সমন্বয় করিয়া আমি অমৃত; এবং সকল সুন্দর-অসুন্দরের সমন্বয় করিয়া লইয়া আমি মধুর। ইহাই আমার স্বারাজ্য। তবেই প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান বড় না প্রেম বড়? শিক্ষায় সেবক করিয়া তুলিবে, না বৈরাগী করিয়া তুলিবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বারাজ্য একথা বলিলেই ত পরিষ্কার হইল না—স্বারাজ্য যে দুই রকম হইতেছে সেবায় ও প্রেমে কি মানবাত্মার চরিতার্থতা, অথবা নিজের ব্রহ্মত্ব উপলব্ধিতে? প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষায় আমাদের শিক্ষার ও সাধনার সকল আয়োজন অনুষ্ঠান স্থগিত করিয়া রাখার কোনও কারণ নাই। শিক্ষার বা সাধনার একটা মূল অবিচ্ছিন্ন কাণ্ড রহিয়াছে, যাহা হইতে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া, সেবার ধর্ম ও বৈরাগ্যের ধর্ম শাখার ন্যায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্নদিকে গিয়াছে। গোড়ায় অনেকদূর পর্যন্ত জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে, সেবা ও বৈরাগ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ এমনকি আত্মীয়তাও রহিয়াছে। পরে হয়ত আলাদা ব্যবস্থা, এবং চরমে হয়ত আবার একাত্মতা। যার তুচ্ছ ভোগ-সুখে অনাসক্তি নাই, সে কি প্রাণ ঢালিয়া পরের সেবা করিতে জানে? আবার পরের জন্য যার প্রাণ টানিতেছে না, ভাইবন্ধুর জন্য, স্ত্রী-পুত্রের জন্য, দীনদুঃখীর জন্য, দেশের জন্য যাহার প্রাণে দরদ হইতেছে না, সেকি নিজের ভোগ সুখে অনাসক্ত, বৈরাগী সহজে হইতে পারে? যে নিজের দিকে তাকাইল না, তার এমন একটা কিছু জুটিয়াছে যার দিকে তার পিছন ফিরিতে আর সাধ্য বা অবকাশ নাই। লোকসেবা না করিলে, সর্বভূত-হিতে রত না হইলে, বাসনা ত্যাগ হয় না, সুতরাং বৈরাগী ও নিঃসঙ্গ হওয়া সম্ভবে না। এই জন্য জ্ঞানীর পক্ষে, ব্রহ্মমন্দিরে যাত্রীর পক্ষে, ফলাভিসন্ধান শূন্য হইয়া লোকসেবা করা সাধনার প্রথম ও অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। যে ইহা দ্বারা চিত্তের সম্প্রসারণ ও বাসনার সংশোধন করিয়া না লইল, ব্রহ্মাত্মতা-রূপ স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে তাহার অধিকার ও যোগ্যতা সাব্যস্ত হইল না। অতএব যে বলিতেছে যে, স্বারাজ্যের জন্য গোড়া হইতেই লোক-সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, দেশ ও সমাজকে উপেক্ষা করিতে হইবে, সে অন্ধতমিস্রার সঙ্কীর্ণ গুহারই অন্বেষণ করিতেছে, জ্ঞানের বিপুল ভাস্বর মন্দির তাহার আশার সীমারেখার বাহিরে। পক্ষান্তরে যে বলিতেছে—আমি ভালবাসিব, সেবা করিব,—জানিয়া শুনিয়া আমার লাভ কি? সেও বড় কাঁচা কথা বলিতেছে। ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞান—এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুব দিতে না পারিলে সেবা কখনও নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী কল্যাণে ধন্য হয় না। মায়ের মত সন্তানের ভাল করিবার ইচ্ছা কার, কিন্তু ভাল করিবার শক্তি এবং ভালর জ্ঞান না থাকিলে মা যে অনর্থ ঘটাইয়া বসেন, তাহার জন্য ভবগ্রাহী জনার্দনের কাছেও বোধ হয় ক্ষমা নাই। সেবাকে বাস্তব ও সুন্দর করিবার জন্য যেমন পশ্চাতে প্রেম চাই, তেমন তাহাকে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার জন্য জ্ঞান চাই। চলিবার ইচ্ছা থাকিলেই শুধু চলা হয় না, দেখিয়া শুনিয়া চলিতে পারা চাই, নহিলে চলিতে ইচ্ছা থাকিলে মন্দিরে, গিয়া পড়িব কোন পাথারে!

যে জগৎ ভালবাসিবে, তার খাঁটী করিয়া আপনাকে ভালবাসা চাই, যে যজ্ঞে তোমাকে

'আমি' চিনিয়া বরণ করিয়া লইব, সে যজ্ঞে যজমান 'আমি' নিজেকে আগে চিনিয়া লইব অথবা একই চেনার দুইটা দিক্—তুমি ও আমি। যজমান ও পুরোহিত, হোতা ও দেবতা, পরস্পর পরস্পরকে চেতাইয়া লইতেছে। ইহাই অরণি-সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি – ইহাই সাকার পূজায় দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; একটি প্রদীপ-শিখা হইতে অন্য প্রদীপ-শিখা প্রবর্তিত হইল এবং উভয়ের রশ্মি সংহত হইয়া আলোকের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিল, প্রকাশকে সাহস ও অভয় দিল। ইহাই উপসংহারে সেই মহাবাক্য "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" যে পুরাণ বৃক্ষের শাখায় আত্মা বিচরণ করিতেছে, তাহারই মূলে ও শিরায় শিরায় যেমন রস চাই, তাহার পাতায় পাতায় তেমনই আলোকের অল্পনা চাই; নহিলে সে শুথাইয়া মরিয়া স্থাণু হইয়া রহিবে। রস—প্রেম বা আনন্দ, আলোক—অনুভূতি বা জ্ঞান। যে হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ অপিহিত রহিয়াছে তাহার উন্মোচন করিলে দেখিব পক্ষিশাবকের মত মানবাত্মা একটা অমৃতের মাঝে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহার দুইটি পক্ষপুট, একটি জানা, অপরটি চাওয়া; একটি পাওয়া অপরটি দেওয়া; একটি "আমি' অপরটি 'তুমি'। শিক্ষা সাধনা আত্মাকে স্বারাজ্যের ভূমিতে তুলিতে গিয়া এ দুয়ের কাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া কাহাকে বজায় রাখিবে? অতএব জ্ঞানের স্বারাজ্য ও প্রেমের স্বারাজ্য এ দুয়ের মধ্যে গোড়া-পত্তনের সময় হইতেই একটা খাত কাটিয়া রাখা চলে না। জড় লইয়া যদি গড়িয়া তুলিতে হইত, তবে পত্তনের সময়েই আমাকে শেষ ভাবিয়া লইতে হইত; কিন্তু একটা সজীব পদার্থ যেখানে বাড়িয়া উঠিতেছে সেখানে মূল কাণ্ডটা অবিভক্ত থাকিল বলিয়া, শাখা-প্রশাখা-ফল পুষ্পের ভবিষ্যতের জন্য আমার আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। পরিণামে যেখানে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক, গোড়ায় সেখানে অবিভক্ত সম্মিলিত ও সাপেক্ষ থাকাটাও স্বাভাবিক হইতে পারে। যে সেবা চায় সে জ্ঞানের, এবং যে জ্ঞান চায় সে সেবার মুখদর্শন করিবে না এরূপ প্রতিজ্ঞা গোড়াতে অসঙ্গত ও মারাত্মক। "এহ বাহ্য আগে কহ আর" শুধু এই কথাই প্রভু কহেন নাই; "এহ হয় আগে কহ আর" একথাও প্রভু কহিয়াছেন। বৈরাগীর ধর্ম শিখাইতে গিয়া ভারতবর্ষ ঠকিয়া গেল—একথা আংশিকভাবেই সত্য। প্রথমতঃ কালের মাপ কাঠিটা একটু বড় করিয়া লইলে, কার হার, কার জিত, তাহা অনেক সময় বলা শক্ত, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ যদি শেষ পর্যন্ত ঠকিয়াই গিয়া থাকে, বৈরাগীর ধর্ম যে তার জন্য কতটা দায়ী তাহা দেখাইয়া দেওয়াও সহজ নহে। যদি কতক পরিমাণেও দায়ী হয়, তবে তাহা প্রাচীন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সমাজাত্মার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই। আগে চতুরাশ্রমের ভিতরে কর্ম ও সন্ন্যাসের, সমষ্টি ও ব্যষ্টির যে সমন্বয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বারাজ্যের পত্তনভূমি; সে ব্যবস্থায়, সেবা ও বৈরাগ্যের যে অবিভক্ত মূলকাণ্ডের কথা বলিতেছিলাম, তাহা বেশই দৃঢ়, দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট। এ সমন্বয়ের পুরবর্তী বেদ হইতেছে গীতা। নানা ভাব-বিপ্লব ও কর্ম-বিপ্লবের মধ্য হইতে যজ্ঞ বরাহরূপে এই বেদের সমুদ্ধার ভগবান করিয়া আসিতেছেন বার বার। প্রেম এই বেদের মন্ত্র, জ্ঞান এই বেদের ব্রাহ্মণ; 'তুমি' এই বেদের দেবতা, 'আমি' এই বেদের ঋষি, সেবা এই বেদের ছন্দঃ; ত্যাগ এই বেদের ঋক্, প্রেম এই বেদের সাম এবং জীবন এই বেদের যজুঃ। হে অগ্নি সনাতনি! তোমার বরেণ্য ভর্গঃ আমাদের অশান্ত ধী-বৃত্তিগুলিকে আবার শুভ বাসনায় বিনিয়োগ করুন, সে তোমার প্রসাদ পাইবার আশাতেই সম্প্রতি যে রক্তগঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার আশা কি সফল হইবে? ভারতের মহাকাল-মন্দিরের পূজারী ভারতের অন্তরাত্মা; তাহার

নিদ্রালস নেত্রে আবার তোমার জ্ঞানাঞ্জন বিলেপিত হউক ; সে উঠিয়া মন্দির-দ্বার খুলিয়া দেখুক, আজ নিখিল বিশ্বের অন্তস্তলে তাহারই মন্দিরাভিমুখে তীর্থযাত্রার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; বিশ্বমানব যেদিন শ্রদ্ধার নৈবেদ্য মথায় বহিয়া আনিয়া তাহার মন্দিরের চারিধারে ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন, হে প্রাচীন পূজারি ! তুমি যেন সজাগ থাকিও, তোমার সেই সিন্ধু-সরস্বতী-গুল্ম-পীযূষাভিসিক্ত সামগানে অভ্যস্ত কণ্ঠ, স্বর-সম্পদে ও ছন্দোবৈভবে যেন অকুণ্ঠিত থাকে ; তোমার দেবতার প্রসাদ-নির্মাল্যে বিশ্বমানবের নৈবেদ্য যেন সার্থক হয় ; তোমার ধীরোদাত্ত আশীর্বাণী যেন বিশ্বমানবের প্রাণে অভয় ও আশ্বাস আনিয়া দেয়। তোমার মন্দিরাভ্যন্তরের এককোণে যে বর্তিকাটি তুমি এতকাল ধরিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছ, তাহাই তোমার আশার বর্তিকা, তাহাই তোমার প্রাচীন স্বারাজ্যের অবশেষ এবং ভাবী স্বারাজ্যের ভরসা। সাগ্নিকের অগ্নির মত তাহা তোমার নিরলস ও অকুণ্ঠিতভাবে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার ঐ মন্দিরের আলো যদি নিবিয়াই যায়, তবে হে মন্দভাগ্য পুরোহিত! রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্যের মিথ্যা গৌরব ও বাহ্য সম্পদের তুচ্ছ চাকচিক্য তোমার অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিয়া দিবে না। তোমার প্রকৃত স্বারাজ্যের বিনিময়ে যদি তুমি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্য ও বাহ্য সম্পদ পাও, তবে তাহাতে স্বারাজ্য ও সম্পদকে উপহাস করা হইবে মাত্র। কারণ সে স্বারাজ্যে স্বাত্মতা নাই এবং সে সম্পদ শ্রেয়ঃ পদবীকে আশ্রয় করে না।

শিক্ষার লক্ষণ এক কথায় যেমন স্বারাজ্য, স্বারাজ্যের লক্ষণ এক কথায় তেমনই শক্তি। অশক্তের স্বারাজ্য হয় না। বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য হন না। প্রেমের স্বারাজ্য ও জ্ঞানের স্বারাজ্য, এ দুইটারই গোড়ার কথা শক্তি। বালকের রোদনই বল, কিন্তু বল ত বটে। যে কাঁদিয়া জিতিয়া যাইতেছে, সে জিতিয়াই যাইতেছে, হারিয়া যাইতেছে না। প্রেমের জয়ও জয়। শুধু ইহাই নহে, প্রেমের জয়ই জয়। যে ভালবাসিল কিন্তু জিতিতে পারিল না, তার এখনও ভালবাসা হয় নাই। সে নিজের তুচ্ছ অভিমান ও স্বার্থের কাছে এখনও বিজিত হইয়াই আছে। অহেতুক প্রেমের রাগাত্মিকা ভক্তির কোথাও কোন অবস্থাতেই পরাভব নাই। কোনও একজন ধনুর্ধরের ভুবন-বিজয়ী ও দুর্নিবার বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু চালাকি করিতে গিয়া হর-কোপানলে তাহাকে ভস্মত্ব পাইতে হইয়াছিল ; এইখানে তাহার পরাভব। কিন্তু যে প্রেমের কথা আমরা ভাবিতেছি, তাহার পূজায় মহাদেবের সমাধি ত ভাঙ্গিয়াছিলই অধিকন্তু যেদিন সেই প্রেমের শব-প্রতিমাখানিকে স্কন্ধে করিয়া 'পাগল শিব প্রমথেশ' এই মহাবিশ্বের পরতে পরতে কাঁদিয়া ফুকরাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেদিন স্বয়ং চক্রীর সুদর্শনচক্র সতীকলেবর জগতের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া সতীনাথের শোকভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু জগৎটাকে এমন একটা মহাপীঠ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে, আমাদের মত অপ্রেমিক অভাজনকে এই পুণ্যক্ষেত্রে অতি সঙ্কোচে পা বাড়াইয়া চলিতে হয়—পাছে কোনও ভক্তের জবাপুষ্পাঞ্জলি আমাদের অসতর্ক পদস্পর্শে অপমানিত হইয়া পড়ে। অতএব মৃত্যুতে প্রেমের পরাভব নাই। আলেকজান্দারের, সিরাজের অথবা নেপোলিয়ানের বিজয় অক্ষৌহিণী, যাহা গড়িতে পারিয়াছিল তাহা ত ভাঙ্গিয়াই ছিল ; কিন্তু বুদ্ধের, খ্রীষ্টের, অথবা গৌরাঙ্গের প্রেম যাহা গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার ভিত্তি মানবাত্মার ভিতর সুস্থির রহিয়াছে, তাহার সাম্রাজ্য আস্তীর্ণ করিয়া রাখিতে পৃথ্বী বিপুলতরা হইলেও চলিত এবং তাহার বিজয়-নিশান বহন করিয়া লইতে কালবর্ত্ম আরও নিরবধি হইলেও মন্দ হইত না। দন্তে তৃণ করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, প্রেমিক, রাজরাজেশ্বরের দুয়ারে ভিক্ষার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল, রাজরাজেশ্বর তাহাকে

তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারটা ঢালিয়া ত পার পাইবেন না; তাঁহার নিজেকে তার কাছে বাঁধা দিতে হইবে যে। যে ঐশ্বর্য চায় তাকে ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিলেই সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু যে মাধুর্য চায়, আমাকে চায়, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, আমাকেই তার কাছে ধরা দিতে হইবে এবং সে আমার কাছ হইতে ফিরিবার নামটি করিবে না। যে ঐশ্বর্যের ভিখারী সে ঐশ্বর্য পাইয়া আমার গোলাম হইল, আর যে মাধুর্যের ভিখারী, তার কাছে ভিক্ষা দিতে গিয়া, আমিই তার গোলাম হইয়া বসিলাম। যে আসিয়া ধন-দৌলত চাহিয়াছে তাহাকে আমার খাজাঞ্চিখানায় পাঠাইয়া দিয়া আমি খালাস, কিন্তু যে আমাকেই দেখিতে আসিয়াছিল তার জন্য যে এই বর্ষার নিরালা বাসরে প্রাণের ফাঁকাটার ভিতর হইতে থাকিয়া থাকিয়া একটা করুণ সুর উঠে— "মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর"। অতএব প্রেমের স্বারাজ্যের দাপট বড় কম নয়। জ্ঞানের স্বারাজ্যের কথা আর না হয় নাই বলিলাম, কথাটা দাঁড়াইল শক্তি। যে সুপর্ণ-পক্ষীটির খবর আমরা ইতিপূর্বেই দিয়াছি, তার জ্ঞান ও প্রেম, এই দুইটি পক্ষপুট; এবং সেই পক্ষপুটের বিস্তার ও সঞ্চালন যেটাকে পাইয়া হয়, তাহাই হইল শক্তি। শক্তি নহিলে পক্ষপুটের ব্যবহারও নাই, প্রয়োজনও নাই।

শক্তির প্রয়োগ কোথায় বা কাহার উপরে? মানুষের একটা ভিতর, একটা বাহির। বাহিরের যেমন নানান্ থাক্, নানান্ বৈচিত্র্য, ভিতরেও তেমন। ভিতরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা; ইহাদের নানা সংস্কার, নানা বৃত্তি, নানা চেষ্টা। বাহিরে শরীর, সমাজ, প্রাণিজগৎ ও জড়প্রকৃতি। এই সমস্তগুলিকে জড়াইয়া লইয়া, এবং এইগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, যেটা রহিয়াছে সেইটাই পুরা মানুষ। প্রেমেই হউক, আর জ্ঞানেই হউক, মানুষকে নিজের এই ষোলআনা বুঝিয়া লইয়া দখল করিতে হইবে। এই দখল সাব্যস্ত করিতে শক্তি চাই; এবং দখল সাব্যস্ত হইবার নামই স্বারাজ্য। কেহ জগতের দ্বারে দ্বারে নিজেকে ধরা দিয়া জগৎকে স্বীকার করিয়া যাইয়াছে; কেহ বা জগৎটা নিজের ধ্যানের মধ্যেই টানিয়া লইয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিতরে বা বাহিরে কিছু বা কেহ অস্বীকৃত হইয়া, পর হইয়া থাকিল, ততক্ষণ আমি একটা চৌহদ্দীর ভিতর বাঁধা পড়িয়া থাকিলাম—অল্প কৃপণ ও কুণ্ঠিতই রহিয়া গেলাম—এ অবস্থায় আমার ছুটি নাই।

নিজের ভিতর শক্তি জাগাইব কি উপায়ে? ক্ষুদ্র আমিত্বের বোঝাটুকু বহিতেই আমার শক্তিটুকু মূর্ছিত হইয়া পড়ে; আমি, জ্ঞানের সম্পর্কেই হউক, আর প্রেমের সম্পর্কেই হউক, এত বড় জগৎটাকে আবাহন করিয়া আনিয়া আমার অন্তরাত্মার সিংহাসনে বসাইব কোন্ সাহসে? এত অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়া যেদিন পাদ্যার্ঘ্য যোগাইতে হইবে সেদিন কি আমার ভৃঙ্গার নিত্য পূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য একটি একটি করিয়া বাহিরের শিশির কুড়াইয়া আনিব? অথবা আমারই ভিতরে এমন কোন রুদ্ধ উৎস উপেক্ষিত, অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যেটিকে কোন উপায়ে একবার বহাইয়া লইতে পারিলে, আমার ভৃঙ্গার ত ভরিবেই, অধিকন্তু তার স্নিগ্ধ অনাবিল প্রবাহ আমার বিশ্ব-নারায়ণের পাদমূলে স্বচ্ছন্দে গড়াইয়া আসিয়া ধন্য হইবে? আমি ছুটিব তবে কোন দিকে? কোথায় আমার পাদ্যার্ঘ্য, কোথায় আমার নৈবেদ্য, কোথায় আচমনীয়, কোথায় দক্ষিণা? বাহির হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে অথবা নিজেরই অন্দরের ঠাকুর ঘরে আমার কোন আপন জন পূজার সব আয়োজন প্রস্তুত রাখিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কখন আমি স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিয়া তার দুয়ারে করাঘাত করিব? ছুটিয়া বেড়ান পশ্চিমের হাল ব্যবস্থা, আর

হৃদিরত্নাকরের অগাধজলে ডুব দেওয়া আমাদের সাবেক ঘরোয়া ব্যবস্থা। ভাল কোনটা, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কি? মহাদেব যেদিন কৈলাস পর্বতে মহাধ্যানে বসিয়াছেন, আর নন্দীর শাসনে মুখরা চঞ্চলা প্রকৃতি যেন চিত্রার্পিতবৎ হইয়া রহিয়াছে, সেদিন আমরা দেখিতেছি জ্ঞানের স্বারাজ্য। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। এ ক্ষেত্রের বাহিরে ত ছুটাছুটি নাই-ই, বরং সমস্ত বাহিরটা ভিতরের শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়া সুস্থির রহিয়াছে। আর যেদিন গৌরাঙ্গ "শান্তিপুর ডুবুডুবু" রাখিয়া—'নদে ভাসাইয়া' অযাচককে প্রেম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন, সেদিন তাঁর বাহিরে অনেক ছুটাছুটি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শিশির কুড়াইয়া ভাণ্ড ভরিবার ছুটাছুটি নহে, সে যে জলভারাবনত আষাঢ়ের নব মেঘের পৃথিবীর সন্তপ্ত ধূলিরাশির মাঝে নিজেকে ঢালিয়া দিবার পুণ্যাভিসার। সে যে আসলে আহরণ নয় বিতরণ, বিতরণের জন্যই আহরণের ভঙ্গী।

স্বারাজ্যের কথা—শক্তির কথা বলিয়া সকল প্রকার ক্লৈব্যকে আমাদের পরিহার করিতে হইবে—ভাবনায় ক্লৈব্য বিশেষতঃ। যাঁহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, অনুষ্ঠানে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার কথা বলেন, দেশের ও জগতের হাওয়া বুঝিয়া তাহারই অনুবর্তন করার পরামর্শ দেন, আমি যেটি চাহিতেছি বিনা ওজরে আমার মুখের কাছে তাহাই জোগাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাসিতে চাহিলে ভাসিয়া যাওয়াই হইবে, রহিয়া বসিয়া যাওয়া হইবে না; যাহারা ভাসিয়া চলিল, প্রকৃতির বিচার তাদের জন্য এমন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যেখানকার নীরব, বিপুল অন্ধকারে গণনাতীত দুর্বল, ভরসাহীন, বিশ্বাসহীন, আদর্শহীন জাতি নিজেদের সকল চিহ্ন ও সকল কাহিনী হারাইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে মানবকে সত্য, শিব ও সুন্দর জিনিসটাই চাহিতে শিখান; সকল সাধনার লক্ষ্য হইবে সেই বাঞ্ছিত পদার্থটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে মানুষকে মিলাইয়া দেওয়া। যেটি চাহিতেছি সেটাকে পাইবার শক্তি দেওয়াই দেওয়া নহে; চাহিবার মত জিনিস চাহিবার শক্তি দেওয়াও দেওয়া।

কাজ করিবার জন্য এক প্রকার বড় কথা আছে, আবার কাজে ওজর করিবার জন্য আর একরকমও আছে। যে বড় কথা পাড়িয়া কাজে ঢিল দিল বা কাজ হইতে সরিয়া পড়িল তার দুর্বলতার বরং ক্ষমা আছে; কিন্তু ভণ্ডামির ত ক্ষমা নাই। স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে আসিয়া আমরা সকলে হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করি, আর আগু পিছু হইয়াই প্রবেশ করি, দীর্ঘ যাত্রার পথে যে আমরা সকলে সমান তালে হাঁটিতেছি না, সে পক্ষে সন্দেহ আছে কি? বিশ্বমানবের পাঠশালায় কাহারও হাতে শিশু-শিক্ষা কাহারও হাতে ব্যাপ্তিপঞ্চক দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কেহই স্বারাজ্য পায় নাই, সুতরাং সকলেই সমবস্থ; কেহই নিজের বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট নয়, অতএব সকলেরই বর্তমান অবস্থা তুল্য; এইরূপ বড় কথায় যে ছোট বড় সকলকে টানিয়া সমানগোত্র করিয়া দিবে তার ঠিকে ভুল হয়ত হইতে পারে, কিন্তু এ কথা পাড়িয়া যদি সে কেবল ছোটকেই একটা মিথ্যাভিমানেই মগ্ন করিয়া রাখিতে চায়, তবে তার সে কপটাচারের ত ক্ষমা নাই।

তপস্যা দ্বারা অমৃতের ভজনা করা হয়, মৃত্যুর নহে। স্বারাজ্য-সিদ্ধিই ধ্যানের ফল, নৈষ্কর্ম্য ও দীনতা নহে। সকল অসমঞ্জসকে সামঞ্জস্য দিবার জন্য সকল খণ্ডিতকে সমগ্র ও পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই তপস্যা ও ধ্যান। বাহিরের সকল উদ্যম ও অনুষ্ঠান আমাদিগকে সচল করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু এ সচলতা কল্যাণের মুখে হইবে না, অমৃতের অন্বেষণে হইবে না, যদি ইহার প্রেরণা ও উপদেশ আমাদের ভিতরকার অচলায়তনের বাস্তু দেবতাটির

কাছ হইতে না আসে। আমি চলিতেছি কিন্তু আমার দৃষ্টি যদি লক্ষ্যে স্থির না রহিল, আমার পদবিক্ষেপের নিম্নে পথ যদি ব্যবস্থিত ও সুস্থির হইয়া না থাকিল তবে আমার চলার পরিণাম কোথায়, সার্থকতা কিসে? সমরক্ষেত্রে একটা বিপুল বাহিনী অভিযান করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিপুলতা, সাহস ও শৌর্য তাহাকে ধ্বংস হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে না, জয়শ্রী আনিয়া দিবে না, যদি তার সকল কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে সেনাপতি তার পরিচালনার সব সূত্রগুলি, নিজের ধ্যানের মধ্যে একত্র ও সম্বদ্ধ করিয়া না লন। আমাদের পৃথিবীর গ্রহ ও উপগ্রহগুলির মহাশূন্যে যে অভিযান তাহাতে শৃঙ্খলা ও অভয় থাকিত না, যদি সবিতার কেন্দ্রাকর্ষণ তাহাদের জন্য একটা পথ নির্দিষ্ট করিয়া না দিত। সকল সফলতার সিদ্ধি ও অভয় দিবার এমন কিছুর উপদেশ ও পরিচালনা আবশ্যক, যেটি নিজে ধীর ও নির্ভয়। সেই অচল ও অভয়ের ভূমিতে দাঁড়াইবার জন্য যেটি চাই তাহাই তপস্যা—তাহাই ধ্যান। অমৃতের পুত্রই অমৃত লাভ করিবে। সচল ও অচলের মধ্যে, কর্ম ও ভাবনার মধ্যে, যোগ ও ক্ষেমের ভিতরে, মৃত্যু ও অমৃতত্বের মাঝখানে যেখানে মিল হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইয়া গেল সেইটাই স্বারাজ্যভূমি, তাহাই শিক্ষার সাফল্য। তপস্যার বাড়াবাড়ি করিয়া কেহ কখনও ঠকে নাই—আমাদের ভারতবর্ষও নহে। আমরা ইতিহাস ভুল শিখিয়াছি। সমাপ্ত

বাংলার মাতৃসাধনা ও তাহার পরিণতি শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী

শ্রীসুধা সেন, এম্-এ

সহস্র সহস্র বৎসর আগে মানুষ যখন আদিম অবস্থায় ছিল—তখন তাহাদের জীবিকা-সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন তাহাদের বিভিন্ন পরিবারগুলি এক এক নেত্রী বা মাতার নামে পরিচিত হইত। এইরূপে স্ত্রী-প্রাধান্যের ফলে পরিবারগুলি হইতেই ক্রমে দল, গোষ্ঠী এমনকি গোত্র পর্যন্ত এক একজন নেত্রীর নামেই পরিচিত হয়। এইরূপে সমাজে মাতৃ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাতা জননী, শক্তিময়ী—মাতৃত্বের সুকঠোর কর্তব্য ও দায়িত্ব, গভীর মমত্ব এবং সম্ভবতঃ অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ধারণা হইতেই প্রথমে মাতৃদেবতার প্রকাশ হয়। ঈজিপ্টের দেবী ইসিসে, মেসোপটেমিয়ার দেবী ইশতরে, বাইবেলের ভার্জিন মেরীতেও এই মাতৃদেবতার প্রকাশ দেখা যায়।

ভারতবর্ষে — আর্যগণ যখন প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বৈদিক ধর্মে, পুরুষ-দেবতা যথা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ অল্পই; রোদসী রুদ্রাণী ভবানী প্রভৃতি দেবীর নাম থাকিলেও এবং ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে শক্তিপূজার উল্লেখ থাকিলেও—ইহা ঠিক বর্তমানের রুদ্রাণী বা ভবানীরূপিণী পরমেশ্বরী নহেন।

মানুষের সিদ্ধি সাধনালব্ধ—একদিনে তাহা আসে না,—আর্যগণও অনাদি অনন্ত এ মাতৃশক্তির মহিমা প্রথমেই বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলা—সুজলা, সুফলা, স্নেহময়ী মাতৃ-রূপা, এই দেশের আবহাওয়া মানুষের উপর যে স্নেহের পরশ বুলাইয়া দেয়—তাহাতে মানুষের ও ধর্মের এক সুকোমল রূপান্তর ঘটিয়া যায়। সুকঠোর

সাংখ্যের পুরুষের মিলন ঘটে মাতৃরূপিণী প্রকৃতির সঙ্গে, ইহাতেই উদ্ভূত হয় বিশ্ব, চরাচর হয় সৃষ্ট।

এই আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া এবং তাঁহারই পূজার জন্য পুরাণ এবং তন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই তন্ত্র বা তান্ত্রিক ধর্ম দীর্ঘকাল ধরিয়াই হিন্দুদের ধর্ম হইলেও কাশ্মীর এবং বাংলা দেশেই ইহার বিকাশ এবং বিস্তারলাভ ঘটে।

তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি দ্রুতগামী—কিন্তু ইহার* সাধনা অতি কঠিন—অতি গুহ্য। তাহাতে সাধারণ লোকের উত্থানের চেয়ে পতনের সম্ভাবনাই অধিক। বিশেষতঃ অনার্য ও বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে—ডাকিনী, শাকিনী, যন্ত্র-মন্ত্র, তুক্‌তাক্‌ ও সর্বোপরি বামাচার-সাধনা এই ধর্মকে অনেকটা সর্বনাশা বিকৃতির পথে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। পরিশুদ্ধ মাতৃভাব ইহাতে পদে পদেই ব্যাহত হইতে লাগিল।

কিন্তু একদিকে যেমন ঐ ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল—অপর দিকে তেমনি নিভৃতে বাংলার আকাশ বাতাসে ধীরে ধীরে যেন দূর হইতে মাতার এক আগমনীর সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ঋগ্বেদে রাত্রিদেবীর পূজার কথা আছে—এই রাত্রিদেবীই কালী। বাস্তবিক রাত্রির গভীরতার সঙ্গে বিশেষতঃ অমারজনীর সীমাহীন নিকষ-কালো অন্ধকারের নিবিড়তার সঙ্গে দেবী কালীর সাদৃশ্য কল্পনা করা অতি স্বাভাবিক।

আবার এই বাংলার একদিকে আরণ্য প্রকৃতি—অপরদিকে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ের পুনঃপুনঃ অভ্যুদয়—আকাশে ঘন কালো মেঘের এলায়িত কেশরাশির ন্যায় রূপ—দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামলিমা রাত্রিকে কালীতে এবং কালীকে স্নেহময়ী মা উমারূপে, কবে যে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহা কে জানে?

উমা দুর্গা, কালী চণ্ডী যদিও অভেদ—কিন্তু আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতির চণ্ডীর সঙ্গে বাংলার উমা-রূপের অনেক তফাৎ। চণ্ডী অসুর-নাশিনী—ভয়হারিণী, ঐশ্বর্যশালিনী—তাই 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—হইলেও তাঁহাকে ঠিক আপন ঘরের মা'টির মতো দেখিতে আমরা অভ্যস্ত নই। হিন্দুর নিত্যপাঠ্য চণ্ডীতে আমরা প্রার্থনা করি—

মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥

এবং চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অশুভ ও অসুর বিনাশিনী, ঐশ্বর্যশালিনী, শক্তিরূপা মা—ইনি যেন রাজরানী—কতো তাঁহার ক্ষমতা—কতো বা বিধিনিষেধের কড়া পাহারা।

কিন্তু বাংলার নিজস্ব যে দুর্গাপূজা—তাহাতেই বিরাজিত সুকোমল—সুনির্মল মাতৃত্বের সুরটি। সারা বৎসরের অশ্রুসজল প্রতীক্ষার অবসানে মাত্র তিনটি দিনের জন্য উমা ঘরে আসিবেন—মায়ের আর দেরি সহে না—বিরহ-দুঃখ আর হৃদয়ে ধরে না—তাই কাঁদিয়া বলেন, 'গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না, আমায় বলে বলবে লোকে মন্দ—আমি কারু কথা শুনবো না।' সত্যই তো পাগল, শ্মশানবাসী ভিখারীর হাতে মেয়েটিকে দিয়া সারাবৎসর ধরিয়া তাঁহার আসার আশায় পথ চাওয়া—আর যে গিরিরানীর সহে না—তাঁহার বিচ্ছেদ ব্যথা বাংলার ঘরে ঘরে মায়েদের বুকে বহিয়া আনে কন্যা-বিদায়ের দুঃসহ ব্যথার ভার, চোখে আনে জল। মাত্র তো তিনটি দিনের আসা, তবুও সে আসা সার্থক হইয়া উঠে—গিরিরাজের তথা বাংলার ঘরে ঘরে—

'আজ বুঝি আনন্দ হৈল গিরির ভবন,
মা আসলেন মণ্ডপেতে—বাদ্যভাণ্ড যত সাজে
রাণী বলেন আইস উমা ধন।'

এই আগমনীর শেফালি-সুরভিত সুর আ

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ চণ্ডীমঙ্গলবোধিনীতে (প্রণেতা শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়) আছে।

বিসর্জনের অশ্রুজল—এতো ফাঁকি নয়! বাংলায় মাতৃসাধনা এইখানেই অপরাজেয়—অমর।

এই মাতৃসাধনারই পরিণতি দেখিতে পাই—শ্রীশ্রীমা সারদামণিতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়।

বাংলার ক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াই ছিল—তাই মৃন্ময়ীকেও ছোট্ট মানুষের মেয়েটি হইয়া শাঁখারীর কাছ হইতে শাঁখা পরিয়া ভক্তের বাড়ীর দিকে দামের জন্য দেখাইয়া দিয়া লুকাইতে দেখি—আবার ভক্তের আহ্বানে শাঁখাপরা রাঙ্গা দুইখানি করতল জলের উপর তুলিয়া ধরিতেও দেখি।

চিন্ময়ীকে হৃদয়ে আনিয়া স্থাপিত করিয়া তাঁহার স্নেহে পাগল হইতে কি রামপ্রসাদকেও দেখি নাই? দরিদ্র রামপ্রসাদের কি ছিল আর সম্বল, কণ্ঠ ভরিয়া শুধুই ছিল গান, মিলনে বিরহে অভিমানে শুধুই গান! এই মুহূর্তে গাহিতেছেন—'দুঃখহরা তারা নাম তোমার, তাই ডাকি মা বারে বার।' একবার দেখেন মনে—আবার দেখেন চোখে—ছোট্ট মা'টি আসিয়া বাঁধিয়া দেন রামপ্রসাদের বেড়া! পরমুহূর্তেই আবার কোথায় থাকেন লুকাইয়া—শত ডাকেও সাড়া পাওয়া যায় না—

'মা, মা, ব'লে আর ডাকবো না,
ওমা দিয়েছ দিতেছ বড়ই যন্ত্রণা—'

কিন্তু তবুও ডাকিতে হয়—নইলে আর সন্তানের কিসের দাবি?

এমনি আকুল ডাকই শুনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে—'মা, মাগো—' আকুলক্রন্দনে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হইতে থাকে কিন্তু মায়ের দেখা মিলে না—চোখে ঝরে না স্নেহ, হাত বাড়াইয়া তিনি অভয় দেন না সন্তানকে। অসহ্য প্রতীক্ষার দিবসরাত্রি কোথায় দিয়া কাটিয়া যায়—অশন-বসন, লজ্জা-মান-অপমানের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই—লোকে বলে ক্ষ্যাপা—বলে পাগল! কিন্তু পাগলের সে জ্ঞান নাই—'দেখা দিলিনে মা? আরও একটা দিন যে চলে গেল—তবুও দেখা দিবিনে?' কালীর সামনে বলির খড়্গ—তাহাই টানিয়া লইলেন—আজ আর এ ব্যর্থ প্রাণ রাখিবেন না। এবার মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইলেন, দাঁড়াইলেন সে মধুরহাসিনী শ্যামা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে। দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিল সে দেখা না দেখার খেলা—অপূর্ব রসাস্বাদন। সে সাধনার ধারাই রহিল অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত—কখনও গানের সুরে, বেদনার অশ্রুজলে সবাক—কখনও অরূপের রূপের মধ্যে সমাধিমগ্ন, নির্বাক!

এই মাতৃদর্শনই রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন। নারী মাত্রেই মা—চিন্ময়ীর অংশ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের খণ্ড বিগ্রহ প্রতিমা, রাস্তায় প্রতীক্ষারতা পতিতাতেও সেই মা—সেই মা-ই চন্দ্রমণি—সেই মা-ই সারদা।

পদসেবা করিতেছেন সারদা—জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি তোমার কে গো?' 'তুমি? যেই মা মন্দিরে—সেই মা-ই নহবতে, সেই মা-ই আমার পদসেবাকারিণী—ওখানেও তুমি, এখানেও তুমি।'

এই সারদাই মা—স্ত্রী নহেন—তাই এক নীরব নিঃশব্দ রাত্রিতে মাতৃপূজার আয়োজন করিলেন রামকৃষ্ণ, বসিলেন পূজারী হইয়া—পূজা করিলেন সারদা দেবীকে। মাতৃমন্ত্রে আহ্বান করিলেন, চিন্ময়ী অনাদি অনন্ত শক্তিকে সারদার দেহে। সারদাও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া বসিয়া রহিলেন—তদ্ভাবিতা তন্ময় হইয়া। হোম, পূজা সারা হইল—ঠাকুর অর্ঘ্য দিলেন মায়ের পায়ে—আমার যজ্ঞ, তপস্যা, সাধনা, ইষ্টনাম, জপের মালা—সব সমর্পণ করিলাম তোমার পায়ে—ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন রামকৃষ্ণ সারদার পায়ে। সারদা নিশ্চল প্রতিমার মতোই গ্রহণ করিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধকের সে প্রণাম। কোথা হইতে আসিল তাঁহার এই শক্তি—যাহার ফলে রামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করিতে তাঁহার হৃদয় এতটুকু কম্পিত হইল না, চরণ এতটুকু টলিল না?

আধার ঠিক না হইলে আধেয় তাহার মধ্যে স্থির হইয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারে না—সারদা তেমনি

আধার—যাহার মধ্যে পূর্ণশক্তি বিদ্যমান—কিন্তু তাহা অপ্রকাশ। নতুবা দিনের পর দিন দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আত্মগোপন করার আর তো কোনও কারণ নাই। তিনি মা, জগজ্জননীর ছবি—কিন্তু তিনি ঐশ্বর্যরূপিণী মা নহেন। তিনিই বলেন,—আমি তোদের পাতানো মা নই, ডাকা মা নই—সত্যিকারের মা।

মা ছাড়া এ সংসারে কাহার এতোখানি ভালো-বাসা, কাহার এতোখানি ত্যাগ? রামকৃষ্ণ পরম সাধক, সুকঠোর তাঁহার তপস্যা—কিন্তু মায়ের কোনও তপস্যাই তো চোখে পড়িল না। দরিদ্র-ঘরের মেয়েটি—কখনও গরুর জন্য দল ঘাস কাটিয়া আনেন—কখনও মায়ের সংসারের কাজগুলি গুছাইয়া রাখেন সযত্নে—কখনও বা ছোট দুইখানি হাতে পাখা লইয়া দরিদ্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের অন্ন দেন জুড়াইয়া। ৬ বৎসরের বালিকা—বিবাহ হইল পাগল ভোলার সঙ্গে—তাই কতো আনন্দ—ছোট্ট আঁচলখানি দিয়া স্বামীর রাতুল চরণ মুছাইয়া দেন, করেন ক্ষুদ্র সেবা।

স্বামী নিরাসক্ত সাধক—দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর ফেলিয়া রাখিয়াছেন পিত্রালয়ে—লোকে কত কথা বলে, কতো কানাঘুষা—কিন্তু কিশোরী সারদার মনে জাগে না ভয়—জাগে শুধু একটু দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। পরম প্রতীক্ষার অবসানে একদিন শুভলগ্ন আসে জীবনে—রামকৃষ্ণ সারদামণিকে ডাকিয়া নেন কামারপুকুরে। এক দিন বুঝি ঘরে কেউ নাই—হৃদয়ভরা কত আশঙ্কা, সারদা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাকে কি তুমি ত্যাগ করেছ, হ্যাঁগো?' ঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন—'যিনি আদ্যাশক্তি—আমার আরাধ্যা তাঁহাকেই ত্যাগ করিলে আমার রহিল কি?'

আনন্দের ঘট পূর্ণ হইয়া গেল সারদার—আর ভয় নাই, আর নাই কোনও প্রার্থনা!

রামকৃষ্ণের ছিল তপস্যা কিন্তু সারদার ছিল কি? সংসারের কোন্ মেয়ে একটি নিভৃত সুখের নীড় গড়িতে চায় না—কে চায় না স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সন্তান? সারদারও হয়তো অস্ফুটে একদিন জাগিয়াছিল একটি ছেলের মা-ডাক শুনিবার আকাঙ্ক্ষা—ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—'একটি ছেলে কি গো—মা ডাকে যে তিষ্ঠুতেই পারবে না তুমি।'

সেইখানেই নিবৃত্তি সংসার-কামনার—ঐখানেই ইতি। রাত্রি গভীর চরাচর নিস্তব্ধ—একই শয্যায় শায়িত রামকৃষ্ণ ও সারদা। রামকৃষ্ণের চলিয়াছে সুকঠোর অগ্নিপরীক্ষা—আত্মবিশ্লেষণ, কিন্তু সারদার? তাঁহার মনে দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই—নাই এতটুকু কামনার ছায়া—থাকিলে কি হইত কে জানে? আত্মসংযমের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন রামকৃষ্ণ—কিন্তু কতোখানি ইহাতে সারদার দান, কে তাহার হিসাব রাখে?

শাস্ত্রে বলে—নারী নরকের দ্বার—আমরাও জানি আমরাই প্রলয়ঙ্করী অথচ আমরাই মোহিনী। কিন্তু সারদাও তো নারী—যিনি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্থিরচিত্তে স্বামীর পাশে জাগিয়া কাটাইলেন রাত্রির পর রাত্রি—স্বামীকে সংসার পথে টানিবার জন্য নয়—তাঁহাকে ইষ্টপথে সাহায্য করিবার জন্য। কতো মুনি ঋষির সুকঠোর সুদীর্ঘ তপস্যা খান খান করিয়া দিতে পারে যে সর্বনাশী—সেই সর্বনাশীর অংশ সারদাতেও কি ছিল না? কিন্তু কোথায় গেল সে অশুভকারিণী পলাইয়া, আসিলেন শুভঙ্করী কল্যাণী মাতা।

কতো তাঁর সন্তান—কতো বা তাঁর স্নেহ। সে স্নেহধারা আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্ত একদিকে বিশ্বপূজ্য স্বামীজী বিবেকানন্দ, লাটু মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতি সব দিক্‌পাল—অপর দিকে বিপথগামী মাতাল, পতিতা, অভিনেতা, অভিনেত্রী দীন দুঃখীজন! কেউ দূর নয়—কেউ নয় পর—তিনি সকলের মা!

তাই দেখি যে গিরিশ ঘোষ একদা পাপের পঙ্কে ডুবিয়া ছিলেন, যিনি নিজের নেত্রকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একদিন মায়ের মুখের দিকে তাকান নাই—সেই গিরিশের বিছানা, বালিশের ওয়াড় কাচিয়া রাখিয়াছেন মা—নিজের হাতে। শুইতে গিয়া গিরিশ দেখেন—শুভ্র সুকোমল মাতৃস্নেহ প্রসারিত হইয়া আছে তাঁহার শয্যায়—তাঁহার মস্তকে। অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল—অথচ অন্তরে সুগভীর আনন্দ—'মাগো! এত ভালোবাস তুমি, অধমের প্রতি এত করুণা?'

বাগবাজারের পদ্মবিনোদ পাঁড় মাতাল—গিরিশচন্দ্রের নাটকে অভিনয় করেন। শরৎ মহারাজকে ডাকেন দোস্ত বলিয়া।

দোতলায় মা শুইয়া আছেন—নীচে শরৎ মহারাজ আর আর কেউ। হঠাৎ দুপুর রাত্রে দোস্ত দোস্ত' ডাকাডাকি শুরু হইল—মা উপরে নিদ্রামগ্না—পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়—সেই ভয়ে শরৎ মহারাজ নিজে তো সাড়া দিলেনই না—অন্য সবাইকেও চুপ করাইয়া রাখিলেন। মাতাল পদ্মবিনোদ ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—'আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এত পথ এলুম আর দোস্ত তুমি একবার জানালাটিও খুললে না!'

পরের রাত্রি—সে রাত্রিও স্তব্ধ গভীর—পদ্মবিনোদ আবার আসিয়াছেন—এবার আর দোস্ত নয়—এত্তেলা পাঠাইলেন স্বয়ং মায়ের দরজায় গানের সুরের ধারায়:—

'ওঠো গো করুণাময়ী খোলগো কুটির-দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার;
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার!
সন্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে
মা মা বলে ডেকে মোর হোলো অস্থিচর্মসার।
* * *
রাম বলে ত্যজি তোরে যাব কার কাছে আর
মা বিনে কে লবে এই অকৃতি-অধম-ভার॥'

উপরের ঘরের জানালা খুলিয়া গেল। এমনি করিয়াই খোলে, ডাকিতে জানিলে দরজায় দেখা দেন জননী। জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন মা!

পদ্মবিনোদের কণ্ঠে আবার আসিল সুর—'উঠেছ মা, সন্তানের ডাক কানে গেছে? প্রণাম গ্রহণ কর মাগো!' দর্শন মিলিয়াছে—চলিলেন আবার আপনমনে গাহিতে গাহিতে—

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে—'

জোরে জোরে আখর যোজনা করিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন—

'মন তুমি দেখ আর আমি দেখি—
আর যেন কেউ নাহি দেখে—
দোস্ত যেন নাহি দেখে!'

এমনি সব সন্তান—শুধু জ্ঞানী, গুণী, সাধুই সন্তান হইবেন, এই বা কি কথা? একটি পতিতা আসিয়াছে মায়ের কাছে কাঁদিতে। 'চোখের জলে মালিন্য ঘুচিয়া গিয়াছে, আর ভয় কি মা?' অভয় দিলেন মা! মেয়েদের প্রতি মায়ের ভালবাসা যেন আরো গভীর, আরো মধুর। মা যে জানেন—মেয়েরা আসে শুধু অধীনতার নিগড় পরিয়া পরের মন যোগাইতে, শিক্ষা-দীক্ষা কি আছে তাদের? তাই সহজ সরল পথটি নির্দেশ করিবার জন্যই যেন মা ফেলিয়া ধরিলেন আপনার অনাড়ম্বর কর্মময় তপস্যাটিকে মেয়েদের সামনে।

ভগবানের নামে কাজ কর—পরনিন্দা, পরচর্চা ছাড়িয়া দাও—নিরলস হাতে সংসারের সেবা কর—ইহাই মেয়েদের সাধনা। তাই দেখি—যিনি রাজরাজেশ্বরী—তিনি বাসন মাজেন—রান্না করেন, এঁটো পরিষ্কার করেন ভক্তের, নিরভিমান সে সেবা।

সহধর্মিণী হইয়া সহধর্ম আচরণ কর—সংসারের

নীচতার মধ্যে স্বামীকে টানিয়া না আনিয়া ইষ্টপথে সাহায্য কর না? যখনই সময় পাও তাঁহাকে শুধু একটিবার ডাকো—আর কিছুই চাই না।

অতীতে তুমি যদি পতিতা বা কুপথগামিনী থাকিয়াও থাকো—তবু আজ শুধু অনুতাপের অশ্রু-জলে তাঁহার শরণ লও—সব ময়লা নিমেষেই ধুইয়া যাইবে।

তাই তিনকড়ি প্রভৃতি অভিনেত্রীরা যখন আসে মায়ের কাছে—সকলের বিরক্তি সহ্য করিয়াও মা তাহাদের কাছে ডাকিয়া আনেন, আদর করেন, গান শোনেন, তিনকড়ির সুরের ধারায় প্লাবন বহিয়াযায়—মা সমাধিস্থা হইয়া পড়েন। গানের শেষে তিনকড়ির মাথায় ঝরিয়া পড়ে তাঁহার অজস্র আশীর্বাদ। যাহার কণ্ঠে সুর এবং সে সুরে ভক্তির অশ্রুজল—কে বলে সে অবিদ্যা?

এমনি শত সহস্র—কত আর নিদর্শন দিব? ভিখারিণীর পেয়ারা—দরিদ্র রমণীর মোটা শাড়ীর জন্য মা কি লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন—না ধন্য করিয়াছিলেন তাহাদের?

শুচি, অশুচি—জাতি ধর্ম সব কিছুকেই ঠেলিয়া দিয়াছেন নীচে মাতৃত্বের তলায়। তাই সাহেব, মেম, পতিতা, ভিখারিণী, শূদ্র, অধম সকলের প্রতিই সমান দরদ, সমান ভালোবাসা। তিনিই একদিন অভয় দিয়া বলিয়াছেন 'মাতৃভাব বিকাশের জন্যই ঠাকুর এবার আমাকে রেখে গিয়েছেন।' কাজেই সন্তানের সব দায়-দায়িত্ব তাঁহার। সন্তানের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের ইহকাল-পরকালের সমস্ত কর্তব্যের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো। সন্তানের আর ভয় কি?

ধ্যানময়ী

শ্রীআশুতোষ দাস

শুদ্ধা সনাতনী শক্তি-স্বরূপিণী নর-হিতে নরদেহ-ধারিণী।
রক্ত শতদল- যুক্ত চরণ-তল ভক্ত-হৃদয়মল-হারিণী॥
কমনীয়া কোমলা শ্যামা-সুতা শ্যামলা রামচন্দ্রদ্বিজ-দুহিতা।
রামকৃষ্ণ-জায়া রামকৃষ্ণ-ছায়া রামকৃষ্ণময়জীবিতা॥
অর্ধাবগুণ্ঠিতা লোকলাজকুণ্ঠিতা সংবৃত-তনু শ্বেত-বসনা।
চির-আয়ুষ্মতী পতি-পরায়ণা সতী কনক-বলয়-কর-ভূষণা॥
সরলতা-সমাবেশ সুমধুর বধূ-বেশ এলোকেশ-প্রসারিত বক্ষে।
ক্ষমায় ধরণীসমা করুণায় অনুপমা স্নেহচ্ছায়া অচপল-চক্ষে॥
ভোগ-বিবর্জিতা যোগ-বিমণ্ডিতা যুগ-দেবী ত্যাগের প্রতিমা।
স্মরণীয়া বরদা সুখাসনা সারদা প্রণতি চরণে তব জয় মা॥

ধর্ম

কাবশেখর শ্রীকালিদাস রায়

স্নেহমায়া ভোগতৃষ্ণা যশোলোভ প্রভুত্বপিপাসা
বিলাস-বাসনে রতি অসংখ্য দুরাশা
দেহ-মন বাঁধিয়াছে সহস্র বন্ধনে
মুক্তি কাম্য এদেরি মোচনে।
জ্ঞানে হোক, কর্মে হোক, ভক্তিপথে হোক
যে সব বাঁধনে বাঁধে দুঃখ তাপ শোক
তাদেরি বিলোপ যাতে তারে ধর্ম জানি।
আর কোন ধর্ম নাহি মানি।

নানা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্মশালা সমাজ সংসার
চাপায় তাহারা স্কন্ধে ভারের উপর শুধু ভার।
যাত্রাপথে গতি এরা করিছে মন্থর
লক্ষ্য হতে তারা শুধু বাড়ায় অন্তর,
তাহারাই দেহে মনে রচিছে নির্মোক।
জ্ঞানে হোক, কর্মে হোক, ভক্তিপথে হোক
তাহারি মোচনে মুক্তি,—ধর্ম বলি জানি
আর কোন ধর্ম নাহি মানি।

যোগ-দর্শনের মর্মকথা

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

পতঞ্জলি যোগ-দর্শনের রচয়িতা। হিন্দু-জীবনের উপর ইহার প্রভাব এত বেশী যে ইহাকে হিন্দু-নীতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য কিভাবে সফল হয়?—এই সকল প্রশ্ন নীতিশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোন নীতিশাস্ত্রই দর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। জীবন ও জগতের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য যথার্থ নীতিশাস্ত্র দর্শনের উপর নির্ভরশীল। যোগদর্শনেরও মূল ভিত্তি সাংখ্য-দর্শন।

যদিও সাংখ্য যোগশাস্ত্রের পটভূমি, তথাপি যোগশাস্ত্র কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে সাংখ্য হইতে পৃথক। ইহা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই। অধিকন্তু, সাংখ্যকারের মতে পুরুষার্থ-লাভ কেবলমাত্র বিবেক-

জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু যোগশাস্ত্র বিবেকজ্ঞান স্বীকার করিয়াও, পুরুষার্থ-সিদ্ধির একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছে।

'আত্মানং বিদ্ধি'—ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল বাণী। ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতার দর্শন। যোগশাস্ত্রের মতেও আত্মোপলব্ধি জীবের চরম কাম্য। পতঞ্জলি জীবনের এই চরম উদ্দেশ্য লাভের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগই ইহা লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।' চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের স্বরূপে অবস্থান ঘটিয়া থাকে। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।' শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্মাই জীবের স্বরূপ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীব তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মস্থ হইয়া থাকে। সাংখ্যের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিন তত্ত্বের দ্বারা যোগশাস্ত্রের 'চিত্ত' গঠিত।

চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি রহিয়াছে,—যথা, প্রমাণ বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। সাংখ্যের ন্যায় যোগশাস্ত্রও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণকে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া মনে করে। মিথ্যা জ্ঞানকে বিপর্যয় বলা হয়। বিকল্পের অর্থ নিছক কল্পনা—যে কল্পনানুযায়ী কোন বিষয় বস্তু নাই। নিদ্রাও একটি চিত্তবৃত্তি। ইহা তমো-প্রধান। চিত্তের এই অবস্থায় কোন জাগতিক জ্ঞান অথবা স্বপ্নভাব থাকে না। স্মৃতিবৃত্তিবলেই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে স্মরণ করিতে পারি।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগফলে প্রথমে চিত্ত আবির্ভূত হয়। আত্মা এই চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া অবিদ্যাবশতঃ নিজকে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করেন ইহা আত্মার বদ্ধ অবস্থা। এই বদ্ধাবস্থায় আত্মা পঞ্চ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া জন্মমৃত্যু নিয়মের অধীন হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রমতে ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। সকল ক্লেশের মূল অবিদ্যা। ইহা নিজেও একটি ক্লেশ এবং অন্যান্য ক্লেশেরও জনক। অবিদ্যাপ্রভাবে সত্য মিথ্যা-রূপে এবং মিথ্যা সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়। এই অবিদ্যার ফলে নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ পুরুষ নিজকে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অস্মিতা প্রভাবেই আত্মার এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। রাগ বা বিষয়ানুরক্তির ফলে পুরুষের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। দ্বেষ এবং অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়ও বদ্ধজীবের পরম ক্লেশের কারণ। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে পুরুষের বন্ধন অবস্থা কাটিয়া এবং ইহা ক্লেশমুক্ত হইয়া স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ-সাধনই শ্রেয়স্কামী জীবের কর্তব্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য যোগশাস্ত্র যোগপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছে এবং ইহা বিশ্বাস করে যে, যত্ন ও অভ্যাসের ফলে মানুষ যোগ-সাধনায় কৃতকার্য হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা রহিয়াছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এই পাঁচটি ভূমির প্রত্যেকটি যোগসাধনার উপযোগী নহে। ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকে বলিয়া চিত্ত সকল সময় চঞ্চল থাকে। চিত্তের এই চঞ্চল অবস্থা যোগাভ্যাসকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। মূঢ় অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং তমোগুণ মানুষকে নিষ্ক্রিয় রাখে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা রজঃপ্রধান বলিয়া অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং ইহাও যোগসাধনার অনুকূল নহে। একাগ্রাবস্থায় সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করিয়া চিত্তকে প্রশান্ত ও ধ্যানের উপযোগী করিয়া তোলে। কিন্তু এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না। একাগ্র-ভূমিতে চিত্ত নিজকে অন্যান্য বিষয় হইতে অপসারিত করিয়া এক নির্দিষ্ট বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন থাকে। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোন ক্ষোভ বা বৃত্তি থাকে না। এই অবস্থাতে পূর্ণ সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

যোগ-সাধনার পথ অতি কঠোর পথ। বিষয়ানুরক্তি না চলিয়া গেলে, যোগ-পথে চলা সম্ভবপর নহে। পুরুষার্থলাভের জন্ম যোগশাস্ত্র অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লইয়া—অষ্টাঙ্গিক যোগপ্রণালী গঠিত। ধারণা ও ধ্যান সমাধির অন্তরঙ্গ এবং অবশিষ্টগুলি বহিরঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এইগুলি যম। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এইগুলি নিয়ম। যোগাভ্যাসের জন্ম সুস্থ দেহেরও একান্ত প্রয়োজন। দেহের সহিত চিত্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। রুগ্ন ও দুর্বল দেহে যোগ-সাধনার উপযোগী চিত্ত থাকিতে পারে না। দেহকে সুস্থ ও সবল এবং চিত্তকে সত্ত্বপ্রধান ও প্রশান্ত রাখিবার জন্ম প্রত্যেক ব্যক্তির কয়েকটি সংযমের নিয়ম ও ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। সংযম ব্যতীত দেহ ও চিত্ত পবিত্র থাকিতে পারে না। মুমুক্ষু ব্যক্তির অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি কাহাকেও হিংসা করিবেন না। সর্ব জীবে তাঁহার প্রেম সমভাবে থাকিবে। তিনি সত্যাশ্রয়ী হইবেন এবং কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। অপরের দ্রব্য অপহরণ না করাকে অস্তেয় এবং বিনা প্রয়োজনে অপরের নিকট হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ কহে। এই ব্রত-দুইটি মুমুক্ষু ব্যক্তি অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিবেন। তিনি দেহ ও মনকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিবার জন্ম ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সংযত জীবন যাপন করিবেন এবং কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করিবেন।

যিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তিনি নিয়মিতভাবে হস্তপদাদি প্রক্ষালন এবং বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহকে এবং সৎ চিন্তা দ্বারা মনকে পবিত্র রাখিবেন। তিনি সর্বদা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং কঠোর সাধনার জন্ম শীতাতপকে অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস করিবেন। তিনি ধর্মপুস্তকাদি নিয়মিতভাবে পাঠ করিবেন এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবেন। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্ম পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই আসনগুলি শরীরকে দৃঢ় ও নীরোগ করিয়া থাকে। নিয়মিত-ভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত শান্ত থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধির অধীনে রাখিতে হইবে। যাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ বহির্মুখী তাহার চিত্ত সর্বদা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং বিক্ষিপ্তচিত্তে কেহ সমাধি লাভ করিতে পারে না।

যম নিয়ম পালন করিলে চিত্ত সমাধির উপযোগী হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ত কোন বস্তুকে ধ্যান করিতে পারে। চিত্তকে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উপর নিবদ্ধ রাখার নাম ধারণা এবং সেই বস্তুর অনুক্ষণ চিন্তা ধ্যান এবং ধ্যানের পর সমাধি। সমাধিই যোগ। ইহা দুইপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে বিষয়টি সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়। এই সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতের কোন প্রভেদ থাকে না। জ্ঞাতা জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে আশ্রয় করিয়া হয় বলিয়া ইহাকে সবীজ সমাধিও বলে।

যেমন ধানুষ্ক স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিতে চেষ্টা করে, স্থূল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয় অবলম্বন করিয়া যোগীর যোগাভ্যাস করিতে হয়। বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা। বিতর্ক দুই প্রকার—সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক। দেশ ও কাল সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাদি স্থূল বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের ধারণা ও ধ্যান

হইতে যে সমাপত্তি লাভ হয় তাহাকে সবিতর্ক এবং দেশকাল সম্বন্ধহীন কেবলমাত্র সেই বিষয়ের অনুক্ষণ চিন্তন হইতে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে নির্বিতর্ক সমাধি বলা হয়। কোনও বিশেষ স্থান ও কালের আগম ও বিচার-লব্ধ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রার যে কোন একটির ধ্যান হইতে যে সমাধি তাহা সবিচার এবং কেবলমাত্র সাধারণ তন্মাত্রা অবলম্বনে যে সমাপত্তি তাহা নির্বিচার। আনন্দ-প্রদায়ক অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদি করণকে আশ্রয় করিয়া যে সমাধি তাহা সানন্দ এবং বুদ্ধি নিজকেই ধ্যানের বিষয় করিয়া যে সমাধি লাভ করে তাহাই সাস্মিতা সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগী সিদ্ধিলাভ করিলে প্রজ্ঞালাভ করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞা-সংস্কার অন্যান্য সংস্কারগুলির নিরোধ ঘটাইয়া থাকে। সেই সংস্কারের নিরোধে নির্বীজ অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়। এই সমাধিতে অবিদ্যা-প্রভাব নষ্ট হয় এবং আত্মা স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। কোন ভাবের নিরোধ ঘটাইতে হইলে তাহার প্রতিকূল ভাব চিত্তে আনয়ন করিয়া যত্নের সহিত সর্বদা ধারণ করিলে তাহার সংস্কার দৃঢ় হয় এবং পূর্বভাব নষ্ট হয়। যোগ-সাধনার এই নীতি অপরিহার্য।

যোগী যোগপথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইলে নানারকম অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সমাধির বিষয়ানুসারে তিনি শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার অপূর্ব শক্তি লাভ করেন। তিনি অতি দূরের জিনিস দেখিতে এবং দূরের শব্দ শুনিতে পারেন। তিনি অপূর্ব তেজঃ এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করেন। কিন্তু, যিনি এই সকল শক্তি লাভ করিয়া গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া যান এবং নিজকে সফলকাম বলিয়া মনে করেন তিনি কখনও পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন না। অচিরেই তাঁহার পতন ঘটিয়া থাকে। যিনি প্রকৃত সাধক তিনি এই সকল প্রলোভনে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়চিত্তে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং পরিণামে মুক্তি লাভ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যোগশাস্ত্রকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁহার মতে ঈশ্বরও এক বিশিষ্ট পুরুষ। 'ক্লেশ-কর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'। তাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশ নাই। তিনি কর্ম করিলেও তাহার ফল ভোগ করেন না। তিনি বাসনামুক্ত। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। যে সাধক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সাধকের সাধন-পথের সমস্ত বিঘ্ন তিনি দূর করিয়া উহা সুগম করেন। তিনি জগৎনিয়ন্তা এবং পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ঘটাইয়া প্রকৃতির পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করেন। যোগ-শাস্ত্রকার অন্যভাবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদ অভ্রান্ত এবং বেদে ঈশ্বরকে জগৎনিয়ন্তা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। কাজেই ঈশ্বরে কাহারও অবিশ্বাস সঙ্গত নহে। আমরা সকলেই জ্ঞান ও মুক্তি পথের পথিক। কিন্তু সকলেই যাত্রাপথের একই স্থানে নহে। কেহ বা দূরে অগ্রসর হইয়াছে, কেহ বা পিছনে রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য রহিয়াছে। কাজেই পুরুষদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি উৎকৃষ্ট এবং যাহার সত্তা প্রকৃষ্ট। এই পুরুষই ঈশ্বর। তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্। ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকৃষ্ট এবং অনন্ত। তিনি চিরমুক্ত এবং' পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তিনি অনাদি এবং অনন্ত। তাঁহার কোন বন্ধন ও মুক্তির প্রশ্ন নাই।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, এম্-এ, পি এইচ্-ডি

সম্প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ) পড়ে দেখবার সুযোগ হয়েছে। ভক্তের লেখা, কাজেই স্থানে স্থানে কিছু অতিরঞ্জন হওয়া স্বাভাবিক —তাকে ত্রুটি বলা চলে না। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন—"আমার তত্ত্ব নেই, শাস্ত্র নেই, তন্ত্র-মন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।" "তত্ত্ব নেই" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়;—মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা তত্ত্ব-ও রয়েছে। তবে সবটা মিলে গ্রন্থকার যে সাহিত্যিক ভঙ্গী দিয়েছেন, তা এতই মনোহর যে সেই গুণে সব বৈগুণ্য ভেসে গিয়েছে! সাহিত্যের রসলোক থেকে যে বর্ণনার ঝরণা প্রবাহিত হ'য়েছে, তাতে অনেক অস্পষ্ট কথাও বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে! বিশেষতঃ মহাপুরুষের মানবীয় ভাবটা এত চমৎকার ফুটেছে, আর তার টুকরো ঘটনাগুলো এমন সুসঙ্গত হয়েছে যে অবাক হ'তে হয়। এর কোনো কোনো অংশ পড়বার পর আমি হজরত মহম্মদের জীবনীটাও যেন একটু নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি। সাধন-মার্গের সব গুহ্য কথা বুঝা যায় না, তবে সাহিত্যিক বর্ণনার গুণে যতটা আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা অস্পষ্ট হ'লেও মূল্যবান।

দুই মাসের মধ্যেই তিনবার মুদ্রণ করে প্রায় ১৮,০০০ কপি ছাপতে হয়েছে, এর থেকেই পাঠক-সমাজের কাছে বইখানার কত কদর হয়েছে তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। বাঙালী জাত ভক্তিপ্রবণ বলেই যে এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে তা বললে একটু অবিচার করা হয়। অবশ্য, মনের মত কথা সবাই শুনতে চায়, কিন্তু বলবার মত করেও বলা চাই। আমার মনে হয়, সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতাই এ-বইএর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। সহজবোধ্য ঝরঝরে বর্ণনা জনসাধারণের উপযোগী। এই দিক দিয়েও বইখানা সার্থক হয়েছে। পণ্ডিতের মনের মধ্যে পাণ্ডিত্য এমন শক্ত ক'রে খুঁটি গেড়ে বসে যে সচরাচর দেখতে পাই পাণ্ডিত্য জাহির করবার প্রচেষ্টাই আসল, বক্তব্যটা গৌণ। কিন্তু অচিন্ত্যবাবু জীবনচরিত লিখবার যে সহজ ধারার নমুনা দেখিয়েছেন তা সাধারণ লোকের ত বটেই, বিশেষ করে পণ্ডিতের কাছেও আদর্শ বলে গণ্য হ'তে পারে। দেশের মনোধারার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ যোগ রয়েছে বলেই রামায়ণ মহাভারত মহাগ্রন্থ হ'তে পেরেছে। বাঙালী হিন্দুর সূক্ষ্ম সরল চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মধ্য দিয়ে যে সহজ সৌন্দর্যে বিকসিত হয়েছে গ্রন্থকার সেই সবের অতি স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন। এতেই বইখানার বিশেষত্ব, এতেই এর শ্রেষ্ঠতা।

নিষ্কলুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-সুলভ সরলতা আর অন্যের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশবার ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাঁর বিবাহের ঘটনায়, অভিনয়-দক্ষতায় আর সর্ব-ধর্ম-সাধন ব্যাপারে। মুসলিম ধর্মসাধন ব্যাপারে একটা জিনিস আমার কাছে বেশ কৌতুকজনক মনে হ'য়েছে—সেটি হ'চ্ছে ব্রাহ্মণের হাতের রান্না চাই, অথচ কাছা খুলে রান্না করাও চাই। বোধ হয় হিন্দুত্বের সংস্কার মনে এত দৃঢ়মূল হ'য়ে রয়েছে যে অনেক কিছু ছাড়া গেলেও "ব্রাহ্মণ"টুকু ছাড়া যাচ্ছে না। কেউ হয়ত বলবেন, মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এটুকু রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, সমাজ কিংবা জন্মদাত্রীর মুখ চেয়ে

কাজ করবার মত মানুষ ছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। এ-টি হয়ত তাঁর একটি গূঢ় কৌতুক!

অন্যান্য অনেক মহাপুরুষের মত শ্রীরামকৃষ্ণও সিদ্ধাই-এর জন্য লালায়িত ছিলেন না। তাঁর মধ্যে মহাভাবের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি শুধু "নামের নেশা"তেই মাকে ডাকতেন, তাঁকে নানা বিচিত্ররূপে মনের ভিতর অনুভব করেছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছার ওপর নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন বলেই তাঁর সাধনা অনায়াসে বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করতে পেরেছিল—এ সব কথা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

মোটের উপর এমন একখানা চমৎকার গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি করে অচিন্ত্যকুমার বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

'আমার সুন্দর এসো'

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি-এ,বি-টি, সাহিত্যশাস্ত্রী

আমার সুন্দর এসো শুচিস্নিগ্ধ শান্ত দিগঙ্গনে
যেখানে গোধূলি নামে দিবাশেষে পূরবীর সুরে,
আলিম্পিত হয়ে ওঠে সান্ধ্য রক্তরাগে ক্ষণে ক্ষণে
আবাহনী-গীতিসুর ভেসে যায় দূর হতে দূরে।

অবসন্ন দেহমন ; অবসন্ন স্মৃতি ও এষণা
নূতন উৎসাহে মাতে, ভুলে যায় ক্লান্তি দিবসের ;
সত্য শিব সুন্দরের অতন্দ্রিত মৌন আরাধনা
মুছে দেবে যত ক্লেদ কর্মক্লান্ত দীর্ঘ জীবনের।

আমার সুন্দর এসো, পূজা হোক চিরসুন্দরের,
অসুন্দর কোন কিছু রয়নাকো যেন হেথা কভু ;
দীনতা বাহিরে থাক্, দূর হোক দৈন্য হৃদয়ের
স্বাগত জানাই তোমা হে সুন্দর, হে আমার প্রভু!

ধর্মগ্রন্থে সাম্যবাদ

শ্রীমাণিক চট্টোপাধ্যায়

আজকাল সারা পৃথিবীতে সাম্যবাদ কথাটি লইয়া বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক বড় বড় জাতির ভাগ্যনিয়ন্তারা কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক ছোট বড় সমস্ত প্রকার সঙ্কট এবং সমস্যাগুলিকেই 'সাম্যবাদ' কিংবা অনুরূপ কোন সূত্রের দ্বারা নিরসন করা সম্ভব এই কথাটাই বার বার জোর করিয়া বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গণতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির ন্যায় সাম্যবাদও একটি বিশিষ্ট মতবাদ নয়। সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্রবাদ কোন এক শ্রেণীর বা জাতির কিংবা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্বারা অনুরঞ্জিত বা পুষ্ট, পক্ষান্তরে সাম্যবাদ রাষ্ট্রনৈতিক বা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিলেও কেবলমাত্র উপরোক্ত দুইটি নীতির সুরেই একান্তভাবে বাঁধা নয়। ইহা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানবসমাজের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মানবসভ্যতার প্রদোষ কাল হইতে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বসংঘাত সত্ত্বেও মানুষে মানুষে

তথা দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্র গ্রথিত করিয়াছে। মানুষ বা মানবসমাজ সাময়িকভাবে ইহার প্রভাবমুক্ত হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয় বটে কিন্তু একেবারে ইহাঁর প্রভাবমুক্ত হওয়া মানবসমাজের সাধ্যাতীত; সর্বপ্রকার স্বার্থ-জনিত ভেদবুদ্ধিসত্ত্বেও মানুষে মানুষে এই যে ঐক্যের বাঁধনে বাঁধা থাকিবার প্রবৃত্তি যাহা সর্বকালের এবং সর্বজাতির লোকের মধ্যে বিরাজমান তাহাই 'সাম্যবাদ'।

সাম্যবাদ একটি মতবাদ নয় বলিয়া লৌকিক কাযকারিতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অন্য সমস্ত মতবাদ বা "ism" অপেক্ষা মানব-মনের প্রতি ইহার আবেদন ঘনিষ্ঠতর। সেইজন্যই 'সাম্যবাদ' বলিতে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা যা বুঝি ইংরেজ, আমেরিকান, রাশিয়ান, বা চৈনিক প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন জাতিরাও তাহাই বুঝে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে মতের এবং সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও এই যে একটি বিশিষ্টক্ষেত্রে বোধশক্তির একান্ত সমতা ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের হইলেও একেবারে অসঙ্গত নয়। কারণ, ক্ষেত্র বিভিন্ন হইলেও একই বীজ হইতে এই সাম্যবাদরূপ মহা-বৃক্ষের উৎপত্তি। ঐ বীজ হইতেছে 'ধর্ম'। প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। এই বিশিষ্ট ধর্ম ঐ জাতির কর্মনিয়ন্ত্রণের পথ এবং বিচার করিবার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। প্রত্যেকটি পথ ও বিচারধারার বাহ্যিক কাঠামো পৃথক হইলেও উহাদের লক্ষ্য মানুষকে 'বিরাটের' দিকে লইয়া যাওয়া। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'; খ্রীষ্টানের ধর্ম-গ্রন্থ 'বাইবেল'। ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু এই দুই গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য এক। তাই গীতা কিংবা বাইবেল এই দুইখানি গ্রন্থের একখানির মর্ম যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে অপরটিরও মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয়। কর্মনিয়ন্ত্রণ তথা বোধশক্তির এই যে সমতা ইহাই এককালে সমগ্র মানবসমাজের একটি অভিন্ন প্রবৃত্তি বা ভাবধারার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাকেই 'সাম্যবাদ' রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। গীতার এই বাণী শুধু নিষ্ঠাবান হিন্দুর নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গীতার শ্রীকৃষ্ণ বা বাইবেলের যীশুখ্রীষ্ট কখনই কোন এক বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না। কি উপনিষদে, কি গীতায়, কি বাইবেলে ভগবান সর্বত্রই মানুষের কাছে বিরাট এবং মহা-মহনীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। সকল ধর্মগ্রন্থেরই আবেদন মানুষ যেন তাহার ক্ষুদ্রতা বিসর্জন দিয়া সেই বিরাটের আশ্রয় লয়। সেই বিরাটরূপ পরম সমতা সকল মানুষকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এক করিয়া রাখিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় আজ দেবতার স্থান অধিকৃত হইয়াছে মানুষের দ্বারা। রাশিয়া জনগণের কল্যাণবিধানে অসাধ্য সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, যে নূতন সৃষ্টি এবং ঐতিহ্য স্থাপনের কৃতিত্ব আজ রাশিয়াকে দেওয়া হইতেছে তাহা মানবসমাজের আদিম প্রবৃত্তি সেই সাম্যবাদেরই নামান্তর। এই প্রবৃত্তি আজ নূতন করিয়া রাশিয়াতে উদ্ভব হয় নাই। রাশিয়াতে তাহা প্রসারলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু রাশিয়ার ন্যায় আমাদের এই ভারতবর্ষে এমনকি প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডেও এই একই সত্য নিহিত রহিয়াছে। উপনিষদের বাণী হইল সামান্য তৃণখণ্ড হইতে জগতের ছোট বড় সমস্ত জিনিসই ব্রহ্মময় অর্থাৎ সমগোত্রীয়। উপনিষদের এই বাণীও সাম্যবাদের অন্তর্গত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি মানুষের মধ্যে যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা পরিপূর্ণভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই তখন হইতেই ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাম্যবাদের পরিসর যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। কি গীতা,

কি বাইবেল সমস্ত ধর্মগ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৃহত্তর জনকল্যাণ সাধন। মানবসভ্যতার প্রদোষকালে মানবমনের অপ্রসারতা হেতু কোন লোকই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইতে পারেন নাই, তাই বৃহত্তর জনকল্যাণ বাদ দিয়া আত্মমুক্তি লইয়া তখন অনেকে ব্যস্ত থাকিতেন। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সাম্যবাদের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত রহিয়াছে তাহা নূতন করিয়া চোখে পড়া দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তদীয় প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগে বিশেষ করিয়া এই দিকে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান স্মরণীয়—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই আহ্বান মানুষের প্রকৃতিনিহিত চিরন্তন সাম্যবাদের উপর স্থাপিত। বর্তমানে নানা বিষয়ে সঙ্কটাপন্ন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে বিশেষ করিয়া বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অনুসৃত পথে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে সাম্যবাদকে নবরূপে প্রতীয়মান করিতে হইবে। জগতের সুমক্ষে আর একবার ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ-রচয়িতাদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিবলে এবং পূর্বসূরীদের মহান্ আত্মত্যাগের প্রেরণায় আমরা যদি আবার পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নিহিত সত্য যথা "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই মহাবাণীর পূর্ণ মর্যাদা বিশ্ববাসীকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলেই ভারতের মহান্ ঐতিহ্য বজায় থাকিবে। পৃথিবীর মানব-সমাজ তখন বুঝিতে পারিবে যে 'সাম্যবাদ' শুধুমাত্র রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারের বা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়, ইহা সামাজিক জীব এবং পরমাণু-শক্তির অধিকারী বিংশ শতাব্দীর আপাত-নাস্তিক মানুষদের চরমতম আস্তিক্যবুদ্ধির নবরূপায়ণ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, 'সাম্যবাদ' কথাটিতে যতই রং ফলান যাক্ না কেন, মূলতঃ ইহা মনুষ্য-সমাজের ধারক এবং বাহক যে 'ধর্ম' তাহারই আশ্রয়ে যুগ যুগ ধরিয়া লালিত পালিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তবে কালচক্রের আবর্তনে ধর্মগ্রন্থগুলির বক্তব্য যেমন যেমন ভাবে পরিবর্তিত এবং রূপায়িত হইয়াছে মনুষ্য-সমাজের উপর ইহাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তিরও তদ্রূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা হইলেও যদি কেহ অভিনিবেশ সহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে তিনি স্বভাবতই অনুভব করিবেন যে, ভাষা এবং আচার-বিচার বা অনুষ্ঠানগত ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নতা থাকিলেও এই ধর্মগ্রন্থগুলির মূল সুর 'সাম্যবাদের' তন্ত্রীতেই বাঁধা। ধর্মগ্রন্থ-নির্দিষ্ট সাম্যবাদ মানুষে মানুষে ভেদ বিবাদ ভুলিয়া বৃহত্তম সত্য পরমেশ্বরের অনুভূতিতে সকলকে এক হইতে উপদেশ দিয়াছে।

"তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যমের ক্ষেত্রে পুরা পাশ্চাত্ত্য জাতির মত হইয়া আবার ধর্মীয় সংস্কৃতি ও প্রেরণায় খাঁটি হিন্দু হইতে পার? ইহাই এখন প্রয়োজন, আর আমরা অবশ্যই ইহা করিব।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

[ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (মে, ১৯২২ হইতে ফেব্রুআরি, ১৯৩৪ পর্যন্ত) শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজের) আগামী জন্মতিথি এই বৎসর পড়িয়াছে ২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৬), রবিবার। ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ আমরা তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত বর্তমান লেখকের এই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাটি এবং পরে মহাপুরুষ মহারাজের স্বহস্তলিখিত তিনটি পত্রও এই মাসে প্রকাশ করিলাম।—উঃ সঃ]

খ্রীঃ ১৯২৩ সালে কার্যোপলক্ষে কাশী গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় শুনিতে পাইলাম 'অদ্বৈত আশ্রমে' 'মহাপুরুষ মহারাজ' রহিযাছেন, পরদিনই হরিদ্বার চলিয়া যাইবেন। কাশীতে নূতন গিয়াছি, 'অদ্বৈত আশ্রম' কোথায় আর এই মহাপুরুষ মহারাজই বা কে কিছুই জানিতাম না। তবুও সাধুদর্শনের একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং জনৈক বন্ধুকে (ইনিও কাশীতে আমারই মত আগন্তুক) লইয়া পরদিবস সকালে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি খালি টাঙ্গাগাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহার চালককে তাড়াতাড়ি অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছাইতে বলিলাম। উত্তরে সে যখন জানাইল যে ঐ আশ্রম চিনে না তখন আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে ত সময়মত পৌঁছিয়া মহাপুরুষজীর দর্শন পাওয়া অসম্ভব হইল। প্রাণের মধ্যে তখন যে কিরূপ ব্যাকুলতা আসিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। রাস্তায যেখানে দাঁড়াইয়া টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলিতেছিলাম ঠিক তাহার পাশেই একটি বাগানবাড়ী ছিল। সহসা তথা হইতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক গেঞ্জি গায়ে ও চটি জুতা পায়ে বাহির হইয়া বাড়ীর ফটক খুলিয়া রাস্তায় আসিলেন এবং টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি লইয়া আমাদের বচসা হইতেছে। সে বলিল, "বাবু কৌন্ ঠিকানা বতাতে হৈঁ সো ম্যয় নহীঁ পহচান্তা হুঁ।" ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোথায় যাইতে চাই। আমি অদ্বৈতাশ্রমের নাম করিলে তিনি গাড়ীওয়ালাকে বলিলেন, "আবে তুম্ লাক্সা হাসপাতাল নেহী জান্তে হো?" সে উত্তর দিল, "জরুর জানতা হুঁ।" তখন তিনি বলিলেন, "উঁহাই লে যাও।" এই বলিয়াই তিনি চটি জুতার আওয়াজ করিতে করিতে ফটক বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিযা গেলেন। মনে হইল তিনি যেন আমাদিগের গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিতেই প্রেরিত হইয়া রাস্তায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশমত টাঙ্গাওয়ালা আমাদিগকে লইয়া গাড়ী হাঁকাইল ও বক্‌সিসের লোভে অতি শীঘ্রই পৌঁছাইয়া দিল। জনৈক পূর্ব-পরিচিত সন্ন্যাসী দেখিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। মহাপুরুষজী এখনও আছেন, তবে যাওযার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে বসে সকলকে দর্শন দিচ্ছেন, শীঘ্র ভিতরে চলুন।" তাঁহার কাছে তখনই প্রথম জানিলাম এই মহাপুরুষজীর নাম স্বামী শিবানন্দ এবং তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রেসিডেন্ট। সন্ন্যাসীটি তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর নিকট লইয়া গিয়া আমাকে একজন পোষ্ট আফিসের কর্মচারী এবং 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুত শরৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের বন্ধু বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ঐ পরিচয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে নিকটে বসিবার নির্দেশ দিলেন।

আমি আবেগবশতঃ একটি কথাও বলিতে পারিলাম না—শুধু প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলাম। তাঁহার বালকের ন্যায় সরল হাসিমাখা মুখখানি হইতে যেন করুণা-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাই দর্শন মাত্রেই প্রাণে অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, "ইনি প্রকৃতই মহাপুরুষ, ইনি যদি আমায় কৃপা করেন তবেই জীবন সফল ও ধন্য হয়।" বলা বাহুল্য ইহার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা বা কোনও সংকল্প ছিল না। আমাদের বসিবার কিছুক্ষণ পরেই একজন দন্তনির্মাতা শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের বাঁধানো দাঁত (বোধহয় প্রথম বাঁধানো দাঁত) আনিয়াছিল। মহারাজ তাহাকে উহা তাঁহার মুখে পরাইয়া দিতে বলিলেন এবং ঐ দাঁত পরিয়া উপস্থিত একজন সেবককে একখানি আয়না আনিবার আদেশ দিলেন। আয়না আসিলে তাহাতে মুখ দেখিয়া তিনি অতগুলি লোকের মধ্যেই এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যাহা একমাত্র সরল বালকের পক্ষেই সম্ভব। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম ইনিই কি জগৎজোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সভাপতি? এত বড় পদমর্যাদার বিষয়ে কোনই খেয়াল নাই—একেবারে যেন প্রকৃতি মায়ের দুলাল শিশুর মতই প্রাণখোলা হাসি! আমার অন্তর যেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাধুর্যে ভরিয়া গেল, জীবনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের আস্বাদ পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া মহারাজ কন্‌খল যাত্রা করিলেন এবং আমরাও পরিপূর্ণহৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

ইহার পরে দীক্ষা লওয়ার বাসনা মনে মধ্যে মধ্যে জাগিতে থাকিলেও সুযোগের অভাবে উহা ফলবতী হইতে না পারায় ক্রমে স্তিমিতভাব ধারণ করিল। সুযোগ যখন আসিল তখন পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সাল, আমি বরিশালে বদলি হইয়াছি। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার একটি বিশেষ উপসর্গ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে তীব্র বিরক্তি। বরিশালে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের সহিত পরিচিত হইলাম। তাঁহার সহায়তায় বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট পত্রে আমার সকল বিষয় জানাইবার সুযোগ হইল এবং সস্ত্রীক দীক্ষার জন্য মঠে আসিতে মহারাজজীর অনুমতি লাভ করিলাম। আমার দুর্ভাবনা ছিল যে বেলুড় মঠে অনেক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী দেখিয়া না জানি আমার স্ত্রী কি অনর্থই ঘটাইয়া বসিবেন অথবা সেখানে যাইতে আদৌ সম্মত হইবেন কিনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আদেশ জানিয়া তৎক্ষণাৎ মঠে যাইতে সম্মত হইলেন ও মঠে পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার সাধু-বিদ্বেষ একেবারে অন্তর্হিত হইল এবং তাঁহার অসুস্থ হওয়ার কোনও লক্ষণই আর দেখা গেল না। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর সাক্ষাৎ হইলে তিনি তৎপরদিনই দীপান্বিতা অমাবস্যায় (শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার দিন) দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন এবং ঐ দিনেই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া মন্ত্রদীক্ষা দানে আমাদের জীবন ধন্য করিয়া দিলেন। দীক্ষান্তে মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার দীক্ষা দেওয়ার মানে জান? আমি তোমাদের সকলকে ঠাকুরের হাতে সঁপে দিলাম, আর তিনিও তোমাদের নিয়ে নিলেন। আজ থেকে তোমরা ঠাকুরের হয়ে গেলে।" কি গভীর আশার বাণী! সত্যই আমরা কৃতার্থ হইলাম। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রীর যে ধর্মজীবন মস্তিষ্কের রোগের জন্য একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, মহাপুরুষ মহারাজের করুণায় তাহা আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাইয়া ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করিতে লাগিল। তিনি সকলকেই মালা জপ করিতে বলিতেন না।

মন্ত্রজপের জন্য মালা লইতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে মহাপুরুষজী আমাকে বলিয়াছিলেন—

"মালা জপে শালা, কর্ জপে সো ভাই।
মন্ মন্ যো জপে উস্‌কো বলিহারী যাই॥"

এই কথা বলিয়াই আমায় বলিলেন, "তোমাদের মালা নেবার প্রয়োজন নেই।" তাহার পরে যত দিন যাইতে লাগিল ততই উপলব্ধি করিতে পারিলাম কেন আমাকে মহারাজ মালা লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পোষ্ট আফিস পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়া অধিকাংশ দিনই আমাকে জপের সময় স্টীমার বা রেলগাড়ীর কামরায় বা অন্য যান-বাহনে পোষাক-পরিহিত অবস্থায় কাটাইতে হইত এবং অগত্যা ঐ সময়ে আমাকে মনে মনেই জপ সারিতে হইত। মালা লইলে উহার মর্যাদা রক্ষা করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হইত না। ইহা বুঝিয়াই মহারাজ আমায় মালা লইতে দেন নাই।

একবারে মঠে গিয়া দেখি মহাপুরুষজী শ্বাস-রোগে কষ্ট পাইতেছেন। আমরা বসিয়া থাকার সময়েই একজন ভক্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কেমন আছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "বেশ ভালই আছি। জব্ তক্ জান্‌কী রাম নাম লেতী হ্যায় তব্ তক্ তো অচ্ছী হ্যায়।" ভক্তটি বলিলেন, "মহারাজ, আমরা দেখছি আপনার খুব শ্বাস-কষ্ট হচ্ছে। তাহাতে মহাপুরুষজী বলিলেন, "ওঃ এই দেহটার কথা বল্‌ছ? তা এ'ত হবেই; দেহ ষড়বিকারাত্মক; এখন এর 'অপক্ষীয়তে' দশা চল্‌ছে, এর পর 'নশ্যতি' দশা আসবে। তা আমি তো আর এই দেহ নই। ঠাকুর আমায় বেশ বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিয়েছেন আমি দেহ থেকে পৃথক; দেহের কষ্টে আমার কোনই কষ্ট হয় না।" দেহাভিমানী মানুষ আমরা, আমাদের পক্ষে মহাপুরুষ মহারাজের এই কথাগুলি সহসা হৃদয়ঙ্গম করা বেশ কঠিন বোধ হইল।

শেষ দর্শন হয় তাঁহার অন্তিম অসুখের সময়। তখন আমরা বহরমপুরে থাকি। সারগাছি আশ্রম হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সাংঘাতিক অসুখের সংবাদ টেলিগ্রামে পাইয়া বেলুড় মঠে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ জনৈক সাধুর নিকট পাইয়া আমি অত্যন্ত হতাশ হইলাম এবং বেলুড়ে স্বামী অখণ্ডানন্দের নামে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া শেষ দর্শন সম্ভব কিনা জানিতে চাহিলাম। উত্তরে তিনি আমাদিগকে যাইবার আদেশ দিলে আমি ছুটি পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া উপরিওয়ালাকে অবস্থা জানাইয়াই আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলাম। বেলুড় স্টেশনে কোন যানবাহন না পাওয়ায় প্রাণের আবেগে আমরা হাঁটিয়াই মঠে পৌঁছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম মহারাজের অসুস্থ অবস্থায় কাহাকেও দর্শন করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমাদের তখনকার মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যাহা হউক একজন সন্ন্যাসী দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ঘরের নিকট লইয়া গেলেন এবং উপস্থিত সেবককে বলিলেন, "এঁরা বহুদূর থেকে আগ্রহ নিয়ে এসেছেন, কিছুমাত্র বিরক্ত না করে শুধু দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম করেই চলে যাবেন।" এই অনুরোধে সেবক দরজা খুলিয়া দিলেন। আমরা ভিতরে না গিয়া বাহির হইতেই প্রণাম ও প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া শেষ দর্শন সমাধা করিলাম। আমার মনে পড়িল শ্রীশ্রীমহাপুরুষ-জীর শ্রীমুখের বাণী—"আমি ত এই দেহ নই।" মনে হইতে লাগিল এই দেহের নাশ হইলেও তিনি বর্তমান থাকিবেন। পরবর্তী জীবনে অনেক সময়েই অনুভব করিয়াছি তিনি এখনও রহিয়াছেন এবং তাঁহারই করুণাময়ী গুরুশক্তি আমাদিগের অভিভাবকত্ব করিতেছে ও অভীষ্টলাভের জন্য আমাদিগকে নানাবিধ সুযোগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে ঠিক পথেই লইয়া যাইতেছে।

মহাপুরুষ মহারাজের পত্র

(১)

[শিক্ষাদান-কার্যে নিয়োজিত কয়েকজন ত্যাগী যুবককে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং . মঠ, বেলুড়, হাওড়া

১০।৮।২২

শ্রীমান ব—, ই—, (হে— ও স—)

হে—র পত্র পূর্বেই পাইয়াছি। তার পূর্বে স—র পত্রও পাইয়াছিলাম। তোমাদের পত্র পূর্বেও একখানি পাইয়াছিলাম এবং গতকল্যও একখানি পাইয়াছি। তোমরা সকলে প্রভুর কৃপায় ভাল আছ ও ওখানকার কাজকর্মও বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে ও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রভুর পদে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং তাঁর কাজ খুব যত্নের সহিত কর। ইহাতে তোমাদের ও দেশের অনেক মঙ্গল হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। দেহ সকলেরই নশ্বর তবে, প্রভু নিত্য, তাঁর কার্যও প্রবাহরূপে নিত্য ইহাতেও সন্দেহ নাই। স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন (ঠাকুর সম্বন্ধে), "যে শক্তির অবতারণা হইয়াছে তাহা এখন হইতে ৭।৮ শত বৎসর অবাধে চলিতে থাকিবে, কোন বাধাই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না তোমরা নিশ্চয় জানিও।" আমরাও দেখিতেছি উহা খুব সত্য, প্রভুর কার্য ধীরে ধীরে সমগ্র জগতেই বৃদ্ধি হইতেছে। তোমাদের কোন ভয় নাই, প্রভু তোমাদের সর্বদা সর্বত্রই দেখিতেছেন। আমার আন্তরিক, স্নেহাশীর্বাদ তুমি, ই—, হে—, ও ছেলেরা বিশেষ শৈ— সকলে জানিবে। প্রার্থনা করি তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক। স্কুলটি ধীরে ধীরে বাড়ুক। আমার শরীর এখনও তত খারাপ হয় নাই। মঠে জ্বর-জ্বালা আরম্ভ হইয়াছে, যেমন হয় ফি বছর। ৺মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা হইবার কথা হইতেছে। এখন মার ইচ্ছা। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া

শ্রীচরণভরসা ১১।৭।২৩

শ্রীমান ব—,

তোমার পত্র পাইয়াছি, সাধনভজন ও কর্ম দুইই সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের শিক্ষা এইরূপই perfect life (পূর্ণ জীবন)। মনকে যে ভাবে গঠন করিতে ইচ্ছা করিবে ঠিক সেইরূপই গঠিত হইবে। মন তোমাদের অধীন, তোমরা মনের অধীন নও। ঠাকুর বলিয়াছেন, মন যেন ধোপার বাড়ীর কাপড় (অর্থাৎ ধৌত বস্ত্র) তাকে যে রংএ ছোপাবে সেই রংই হবে, সাদা কাল ইত্যাদি ইত্যাদি। আদর্শ হবে Perfect life, তার মানে ভগবৎবিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞানও পুরা থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কার্য—শুভ কার্য—যাহা এক প্রকার তোমরা করিতেছ, নিষ্কামভাবে পুরোদমে করতে হবে। এই হচ্ছে আদর্শ perfect life। ইহাই ঠাকুর-স্বামীজীর জগতে শিক্ষা। তাঁরা নিজেও তাহা করে দেখিয়ে গেছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ছেলেদের সকলকে স্নেহাশীর্বাদ। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

(৩)

[মঠের জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং Sri Ramakrishna Math,
Mylapore, Madras,
26. 5. 26

শ্রীমান উ—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার

মায়ের কঠিন পীড়ার সংবাদে বড়ই চিন্তিত রহিলাম। যা হোক এ সময়ে পুত্রোচিত কার্য করা (অর্থাৎ তাঁর সেবা ইত্যাদি) খুব উচিত। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমার মা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীভগবানকে স্মরণ রাখিতে পারেন। অবশ্য সবই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তিনি দয়া করিলে সবই সম্ভব। তুমি তাঁর কাছে বসিয়া নিত্যই ভগবৎবিষয় চর্চা করিয়া তাঁকে শুনাইও। এই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ জানাবে। প্রার্থনা করি প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন। এখানকার সব এক প্রকার কুশল। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

সন্ধানসুখে

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

ভুবন এবং ভুবনেশ্বর এক
ভুবনে সেবিয়া কর তাঁর অভিষেক।
তাঁহার কৃপায় ভুবনে চেনার
　　প্রয়াস বাড়িয়া চলে ;
বিপুল পুলকে অচেনারে চিনি
　　তাঁরি মহিমার বলে।
বিশ্ব নিখিলে যাহা কিছু আছে
　　ভালো যে লেগেছে মনে,
প্রত্যহ তাঁরে চিনিয়া চলেছি
　　চিনিয়া দূরের জনে।
কাঠ-বিড়ালী যে বাঁধিছে সাগরে তাই,
ক্ষুদ্র বক্ষে আশার অন্ত নাই।

ধরণীর হিতে ঘুরিব রাত্রিদিন,
ক্ষণ-ভঙ্গুর হোক্ এই দেহ ক্ষীণ।
প্রীতির ভোজেতে ঘরে ঘরে ফিরি
　　করিয়া নিমন্ত্রণ,
আমি যে জীবন যাপিয়া যাইব
　　সাধিয়া আমার পণ।
মহিমা তাঁহার করিয়া প্রচার
　　সন্ধান দিব তাঁর ;
সবে ভালোবেসে লভুক সকলে
　　তাঁর পূজা-অধিকার।
আজিকে জোনাকী সূর্য-আকাঙ্ক্ষায়,
জ্বলে' যে উঠেছে জানি তাঁরি মহিমায়।

তাঁকেই চেনার চেষ্টায় থাকি জেগে,
অসহ পুলকে পথ চলে যাই বেগে।
বামুন-চাঁড়াল বলে কেহ নাই
　　সে মোর হয়েছে হুঁস ;
পূর্ণ না হোক্ ভগবানেরই—
　　শ্রেষ্ঠাংশ মানুষ।
ঘটে ঘটে শ্যাম করেন বিরাজ—
　　তাঁরি সন্ধান লয়ে,
তাঁরে পাই নাই, তাঁরি মহিমার
　　বাণী ফিরি করে কয়ে।
'সন্ধানসুখে' ভরি রয় সদা প্রাণ,
মোর তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিছে গান।

সমালোচনা

আচারাঙ্গসূত্র (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ)—শ্রীহীরা-কুমারী ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা, ৩, পর্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৭২+।৹ ; মূল্যের উল্লেখ নাই।

জৈনধর্মের চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের উপদেশাবলী তাঁহার এগারো জন ব্রাহ্মণ শিষ্য বারোখানি 'অঙ্গ'গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম অঙ্গগ্রন্থের নাম আচারাঙ্গ সূত্র। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম শ্রুতস্কন্ধ ও দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ। আলোচ্য পুস্তকটি মূল অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত আচারাঙ্গসূত্রে প্রথম শ্রুতস্কন্ধের বঙ্গানুবাদ। উপদেশগুলি নয়টি অধ্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ। জৈনশাস্ত্র 'আচার' বা চারিত্রিক সংযম ও ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। আচারাঙ্গসূত্রের উপদেশগুলিতে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার জন্য অবশ্য-অভ্যাসনীয় 'আচার'সমূহের বিশেষতঃ 'অহিংসা'র বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কেন আমরা 'অহিংসা' সাধিব, কিভাবে সাধিব এবং অহিংসার পূর্ণ আদর্শ কি এ সম্বন্ধে মূল জৈনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

সুপণ্ডিতা অনুবাদিকা গ্রন্থের ভূমিকায় বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত যে ঐক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। 'লোকসার' নামীয় পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ 'উদ্দেশকে'র ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"তিনি (জ্ঞানী) সংসারভ্রমণের ও তাহার কারণের স্বরূপ অবগত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর মার্গ ত্যাগ করেন এবং মুক্তির আনন্দলাভ করেন। সেথান হইতে সমস্ত বাণী প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেখানে তর্কের কোন স্থান নাই, মন তাহাকে কল্পনা করিতে পারে না। (একমাত্র রাগদ্বেষশূন্য) ওজস্বী পুরুষই সেই স্বতঃসিদ্ধ বস্তুকে জানিতে পারেন। (সেই মুক্তপুরুষ) দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে, বর্তুল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকারও নহে; সে কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত বা শুক্লবর্ণও নহে; সে সুগন্ধি বা দুর্গন্ধিও নহে; সে তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল বা মধুরও নহে; সে কর্কশ, কোমল, গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ বা রুক্ষও নহে; তাহার শরীরও নাই, পুনর্জন্মও হয় না; স সম্বন্ধিতও হয় না, সে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসও নহে; সে জ্ঞাতা, সে দ্রষ্টা, কোন উপমার দ্বারা তাহাকে জানা যায় না; তাহার অস্তিত্ব আছে অথচ সে নিরাকার; নিরুপাধিক তাহার কোন উপাধি নাই; সে শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস বা স্পর্শও নহে; এই সকলের মধ্যে সে কিছুই নহে—ইহাই আমি বলিতেছি।"

উপনিষদে বর্ণিত মুক্তির ধারণা ও আচারাঙ্গ-সূত্রের বর্ণিত মুক্তির উপরোক্ত আদর্শ কত কাছাকাছি!

(১) নারদীয় ভক্তিসূত্র (২) শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (ঠিকানা—৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩) পকেট সাইজ; পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে—৫০ ও ৬৪ ; মূল্য যথাক্রমে—।৴৹ আনা ও ।৵৹ আনা।

ভক্তির স্বরূপ, সাধন এবং সিদ্ধি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ কৃত ৮৪টি সূত্র এবং মহর্ষি শাণ্ডিল্য রচিত ১০০টি সূত্র প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে পরিগণিত। 'সুদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার এই সূত্রগুলির মূল অর্থ এবং 'অনুধ্যান' সহ এই সুলভ সহজবোধ্য সংস্করণ দুটি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা ধর্মসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা-গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রথম পুস্তিকায় 'ভক্তি-রহস্য' এবং দ্বিতীয়টিতে 'পূর্বাভাস' নামক সুলিখিত উপক্রমণিকাদ্বয় বিশেষ মূল্যবান।

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠন—অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—সলিল পাল, 'কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র', ১৩।২, কাঁটাপুকুর

থার্ড বাই লেন, হাওড়া। প্রাপ্তিস্থান—অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—৩৮; মূল্য—।• আনা।

এই স্বল্পায়তন পুস্তিকাটিতে শিক্ষাব্রতী লেখক শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে আমাদের চিন্তনীয় ও করণীয় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অতি সহজ এবং পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও মৌলিকতা সুপরিস্ফুট। অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অমিয়বাবুর এই ছোট বইটি পড়িয়া শিশুকে মানুষ করা সম্বন্ধে অনেক আলোক পাইবেন। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আনন্দময়ী মা—লেখক—চন্দ্রগুপ্ত; প্রকাশক—নিউ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯, গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—৯৪; মূল্য—১৷• আনা।

সমসাময়িক ধর্ম-আন্দোলনসমূহ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট আনন্দময়ী মা'র নাম সুপরিচিত। ইঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলাদেশ ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে বহু নরনারী ধর্ম-জীবন-যাপনে প্রভূত সহায়তা ও উদ্দীপনা লাভ করিতেছেন। এই মহিলা পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলায় খেওড়া গাঁ পল্লীতে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই অতীন্দ্রিয়ভাবের আবেগ তাঁহাতে দেখা যাইত। ক্রমশঃ তাঁহার ধর্ম-জীবন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং বিবাহ করিয়া সংসারে থাকিলেও পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির বলে তিনি উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেন। আলোচ্য পুস্তকে এই মহীয়সীর জীবনকথা সরল চলতি ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপিপাসুগণ পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। বইএর শেষে আনন্দময়ী মা'-র মহত্ত্ব জ্ঞাপক কয়েকজন মনীষীর (ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডক্টর এম্ হাফিজ সৈয়দ, শ্রীবারিন্দ্রকুমার ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ৺ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার সাধুরাম ঠাকুর) অভিমত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

—অনিরুদ্ধ

মল্লভূম কাহিনী—শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমনোজমোহন রায়, বি-এ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; পৃষ্ঠা—৭৫; মূল্য—৮৹ আনা

আলোচ্য পুস্তকটিতে প্রাচীন বিষ্ণুপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া লেখক বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানির সবটা লিখিত ইতিহাসের সংকলন নহে। ইহাতে কিংবদন্তী এবং গ্রন্থকারের মৌলিক পর্যবেক্ষণও রহিয়াছে যথেষ্ট। বিষ্ণুপুরের রাজারা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহারা নামের শেষে 'মল্ল' উপাধি ব্যবহার করিতেন। এই কারণেই ঐ অঞ্চল 'মল্লভূমি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। মল্লভূমের রাজারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সহায়ক ছিলেন। মল্লভূমির শিল্প, কলা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশিষ্ট অংশ জুড়িয়া আছে। বর্তমানে মল্লভূমির অনেক অংশ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই ক্ষুদ্র বইখানি যদি বর্তমান যুবকদের মধ্যে ভগবৎকৃপায় অনুসন্ধিৎসা জাগাতে পারে তা'হলেই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।" গ্রন্থকারের সহিত আমরাও সেই আশা পোষণ করি। বর্তমান সংস্করণের অনেকগুলি মারাত্মক ছাপার ভুল পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—শ্রীবিজনচন্দ্র গোস্বামী

কর্মের পথে—"অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর" শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস প্রণীত; অযাচক আশ্রম, ডি৪৬।১৯-এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বেনারস; পৃষ্ঠা—৮০; মূল্য—১৲ টাকা।

বাংলা ১৩২৭ সনের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থকারের পত্রসমূহ হইতে নির্বাচিত অংশ বিষয়-বিভাগে সাজাইয়া বর্তমান গ্রন্থের (অষ্টম সংস্করণ) আকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে বইখানি একটি ছয় পয়সা মূল্যের পুস্তিকা মাত্র ছিল। পরে অনুরূপ আরও পাঁচখানি পুস্তিকা একত্র করিয়া সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'নিবেদন' হইতে জানা যায়—প্রথম প্রকাশ সময়ে এই বইটি তৎকালীন পত্রিকাগুলির এবং অনেক সুধীজনের প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। চরিত্রগঠন, দেশসেবা, আত্মত্যাগ, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি বিষয়ে যুবকগণের ভিতর প্রভূত প্রেরণা জাগানোই পুস্তকটির লক্ষ্য। ভাষায় শক্তি আছে। "অখণ্ড মণ্ডলেশ্বরের" একটি ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইলে বোধ হয় আরও ভাল হইত।

(১) **কুম্ভ মহামেলা** (২) **Kumbha Maha-Mela**—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমন্দির, ৮৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট (উত্তরাংশ), কলিকাতা। মূল্য —"শ্রীশ্রীকালীমন্দির নির্মাণার্থ সশ্রদ্ধ দান।"

যথাক্রমে ২১ ও ১৭ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাদ্বয়ে কুম্ভ মহামেলার পরিচয় ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। বাংলা পুস্তিকাটির শেষাংশ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

> "জাতি তার সনাতন বৈদিক আদর্শ শিক্ষায় মূলমন্ত্র গ্রহণ করুক—'আত্মানাং বিদ্ধি'। বৃথা মোহের বশে ছুটাছুটি না করিয়া আত্মচেতনা বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হইতে হইবে। ত্রিবেণীর ত্রি-ধারাকে তীর্থ প্রয়াগে নহে, দেহপ্রয়াগ-যন্ত্রে প্রবাহিত করাইতে হইবে।"

লেখকের উন্নত মানস-পটভূমি এই পঙ্‌ক্তি-গুলিতে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তিকা দুটির সুপ্রচার কামনা করি।

দেবী-মাহাত্ম্য (কথকতায়) — সঙ্কলক—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত; প্রকাশক—মহাজাতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৭, ডাক্তার জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—৩২; মূল্য—৷৷৹ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে চণ্ডীর উপাখ্যান কথকতার আকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। চণ্ডী হইতে নির্বাচিত কতকগুলি মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং দেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক অনেকগুলি সঙ্গীত (কয়েকটি সঙ্কলয়িতা কর্তৃক রচিত) জায়গায় জায়গায় সুসমঞ্জস ভাবে সাজানো আছে। বর্ণনা সুখপাঠ্য। নাটা-গড়ের (সোদপুর) 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠচক্র' এই পুস্তিকাটি অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে দেবী-মাহাত্ম্যের কথকতা গান করিতেছেন। তাঁহাদের শুভ চেষ্টা ফলবতী হউক।

মনের কোণে—(কবিতার বই)—শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেবী-বিরচিত; প্রকাশক—চীন ভারত সংস্কৃতি, ঠাকুরপুকুর, পোঃ জোকা (২৪ পরগণা); পৃষ্ঠা (ডিমাই অক্টেভো)—৬০; "দক্ষিণা"—২৲ টাকা।

সুদৃশ্য এবং সুমুদ্রিত এই কাব্যগ্রন্থে ২২টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। গর্ভধারিণী জননীর উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করিয়া রচয়িত্রী লিখিয়াছেন—

"আমার মনের কোণে যাহা কিছু আছে,
সে তোমারি দান;
তোমার চরণ স্মরি' অর্ঘ রচি' মনে মনে
দিতে চায় প্রাণ।
হ'ক যত তুচ্ছ তবু ও চরণে স্নেহে পাবে ঠাঁই;
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিনু যে তাই।"

কিন্তু লেখিকার রচিত অর্ঘ্যগুলির কোনটিই 'তুচ্ছ' নয়। ধর্ম, সমাজ, দেশহিতৈষণা, বরেণ্য চরিত্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি নানা বিষয় কবিতাগুলির উপজীব্য। প্রকাশভঙ্গী সাবলীল, ছন্দ দুর্বল নয়, শব্দসজ্জা শোভন। ডাঃ কালিদাস নাগ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার লিখিত অভিমতে বলিয়াছেন,—"এই পুস্তকের কবিতাগুলিতে প্রাচীন ও নব্য উভয়

ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাইলাম। রচনার মধ্যে আন্তরিকতা, শুচিতা ও সহৃদয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালি (শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনী)—শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, পোঃ পীরপুর (ঢাকা) পূর্বপাকিস্তান; পৃষ্ঠা—৪২; মূল্য—।৹ আনা।

পূর্ববঙ্গের যশস্বী কবি জীবনের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকথা মনোজ্ঞ পদ্যে সংগ্রথিত করিয়া ঠাকুরের ভক্তদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই 'পাঁচালি'তে বিভিন্ন ছন্দের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। তাহাতে বর্ণনার লালিত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অবলম্বনে রচিত কয়েকটি পাঁচালি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু অক্রুর বাবুর রচনা উহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হইল। পুস্তিকাটির বহুল সমাদর প্রার্থনা করি।

ভ্রমসংশোধন

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সমালোচনাস্তম্ভে 'মহাত্মা লালন ফকির' নামক পুস্তকের সমালোচনায় ৬৫৩ পৃঃ, বামদিকের ১২শ পঙ্‌ক্তিতে 'শুভমিত্রের আখড়ায়' স্থলে 'সেঁউড়িয়া আখড়ায়' পড়িতে হইবে। সমালোচকের এই অনবধানতার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। —উঃ সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি—জননী সারদা দেবীর পুণ্য জন্মতিথি (১০৩-তম) এই বৎসর পড়িয়াছে ১৯শে পৌষ, বুধবার (৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৬)। বেলুড়মঠে এবং অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে উহা যথারীতি উদ্‌যাপিত হইবে।

কয়ম্বাটোর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী—মাদ্রাজ রাজ্যের কয়ম্বাটোর শহরের সন্নিকটবর্তী পেরিয়ানায়কনপালয়ম্ গ্রামে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী গত ৭ই নভেম্বর সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব শ্রী টি এস্ অবিনাশীলিঙ্গম্ 'বিদ্যালয়ে'র ২৫ বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। ১৯৩০ সালে একটিমাত্র বালককে লইয়া শিক্ষায়তনটি শুরু করা হয়। ৪ বৎসর কর্মিগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিদ্যালয়ের কাজ বেশ প্রসার এবং স্থায়িত্বলাভ করে। ১৯৩৪ সালে ইহার বর্তমান স্থায়ী আবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন মহাত্মা গান্ধী। ঐ বৎসরই প্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিত যুক্ত হয় এবং আরও তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ১৯৪২ সালে একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়ও খোলা হয়। কয়েক বৎসর পরে জন্মলাভ করে প্রতিষ্ঠানের গ্রাম-চিকিৎসালয়। শিক্ষকগণের কলেজটি স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলটি ১৯৫১ সালে। এই প্রতিষ্ঠানে একটি গ্রামসেবাকেন্দ্রও আছে। মাদ্রাজ রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দকে উচ্চতর অভিজ্ঞতালাভের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হইয়া থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগ লইয়া বিদ্যালয়টি একশত একর জমির উপর স্থাপিত। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থিগণের জন্য চারটি পৃথক ছাত্রাবাস আছে। ১৯৫২ সালে একটি সুন্দর মন্দির ও উপাসনা-হল নির্মিত হইয়াছে। সমস্ত বিভাগসহ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব কমিটির অধ্যক্ষ শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম্ তঁাহার বিবরণীতে জানান যে এই উৎসবের কর্মসূচীর মধ্যে কয়েকটি স্থায়ী পরিকল্পনা ছিল, যথা—(১) একটি রজত-জয়ন্তী-স্মারক গৃহ নির্মাণ, (২) একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী গঠন, (৩) আশে-পাশের গ্রামে ছোট ছোট পুস্তকাগার স্থাপন, (৪) 'থিরুক্কুরাল' সম্বন্ধে একটি গবেষণাগ্রন্থ এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের জন্য কতকগুলি নির্দেশ-পুস্তিকা প্রকাশ। ভগবৎকৃপায় সব পরিকল্পনাগুলিই সন্তোষজনকভাবে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। ৭০,০০০্ টাকা ব্যয়ে রজত-জয়ন্তী-স্মৃতি-গৃহের নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে। এই গৃহটি বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে। পরিকল্পিত লাইব্রেরীটির কাজও অগ্রসর হইতেছে (আনুমানিক ব্যয় হইবে ১ লক্ষ টাকা)। একশত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট ২৫,০০০্ টাকার পুস্তক কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত গবেষণাগ্রন্থটিও সমাপ্তপ্রায়। চতুর্থ মানের বুনিয়াদী শিক্ষকগণের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে—অপরগুলিও শীঘ্র বাহির হইবে। * * *

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার লিখিত ভাষণে (অসুস্থতার জন্য নিজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; ভাষণটি পড়েন মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ) বিদ্যালয়ের কাজের প্রশংসা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির কামনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আমার এবারকার দক্ষিণভারত সফরের শেষ অধ্যায়ে যে পেরিয়ানায়কন্-পালয়ম শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করিতে হইল—ইহা অপেক্ষা বেশী আনন্দদায়ক কাজ আমার পক্ষে আর কিছু নাই। এক মহান্ ধর্মনেতার নামের সহিত জড়িত বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা তো রহিয়াছেই, তদুপরি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একজন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট ইহার গৌরব আরও বেশী। * * *

অতি সামান্য অবস্থা হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরে একটি বিপুল জনপ্রিয় লোকহিতকর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হওয়া—'বিদ্যালয়ে'র এই ইতিহাস, যে সকল সমাজসেবক ব্যক্তিগত সাহস, আত্মত্যাগ এবং আগ্রহ লইয়া জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িতে চান তাঁহাদের নিকট একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে। * * * এই প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি, কাজ এবং সব দিক দিয়া ইহা যে উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয়ের আলোক বিকীর্ণ করিতেছে তাহা বিচার করিলে ইহার প্রভাব শুধু স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ বলা চলে না—উহা দূরদূরান্তরে বহু মানুষের কাছে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। * * * প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কর্মধারা ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এবং সমধিক প্রশংসার যোগ্য। মুখ্যত একটি শিক্ষায়তন হইলেও এই বিদ্যালয় গ্রামোন্নয়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য জনসেবারও একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিষ্ঠানটি চালাইতেছেন তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য শুধু শিক্ষাবিষয়ক নয়, বরং বেশী 'মানবীয়', এমন কি 'জাতীয়' বলিলেও বোধ হয় ভুল হয় না। কেবল ইট সুরকি দিয়া তো কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে না, উহা গড়িয়া উঠে মানুষের ভালবাসা দিয়া। ঐ ভালবাসা আবার পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠান-চালকদের সেবা এবং সদ্ব্যবহার হইতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় এই নীতিই অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখিয়া আমি খুব আনন্দিত। যাহাদের সেবা করিতে ইহা ব্রতী তাঁহাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ইহা পাইতেছে।"

চেরাপুঞ্জি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—খাসিয়া পাহাড়ে উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার এবং অন্যান্য সেবা-মূলক কাজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। ১৯৫৪ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫১৭ (বালিকা—২১০ জন)। খাসিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড় প্রভৃতি হইতেও শিক্ষার্থিগণ এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে। ১৪৭ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি বা অন্যপ্রকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যালয়টিতে বয়ন, সেলাই এবং টাইপ রাইটিং—এই কারিগরী শিক্ষাগুলিরও ব্যবস্থা আছে। উপজাতীয়েরা

সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া সঙ্গীত শিক্ষারও সকল সুযোগ দেওয়া হয়। খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা এবং বিতর্ক-সভাতেও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া থাকে। বৎসরে একবার করিয়া বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। ক্লাস আরম্ভ হইবার আগে এক মিনিট 'নীরব প্রার্থনা'র প্রচলন রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে একটি ভাল লাইব্রেরী ও পাঠাগারও আছে। একটি 'প্রাচীর-সংবাদপত্র'ও প্রকাশিত হয়।

আশ্রমের একটি পৃথক শিল্প-বিদ্যালয় আছে। ২৫ জন শিক্ষার্থীর এখানে নানাপ্রকার হাতের কাজ শিখিয়া জীবিকোপার্জনের যোগ্যতা লাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণকে ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে শিল্প-বিদ্যালয়ের বর্তমান গৃহটির ভিত্তি-স্থাপন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী কর্তৃক গৃহের উদ্বোধন হয়। উহা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে নির্মিত হইয়াছে।

আশ্রমের পরিচালিত ছাত্রাবাসে আলোচ্যবর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৬; তন্মধ্যে ১৭ জনের আংশিক খরচ আশ্রমই বহন করিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনে স্বাবলম্বন, পরিচ্ছন্নতা, সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাদর এবং নিয়মানুবর্তিতা—ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিগণকে এইগুলির দিকে অবহিত হইতে শিখানো হয়।

আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের ধ্যানধারণাদির জন্য একটি ঠাকুরঘর ও প্রার্থনাগৃহ আছে। প্রতি সপ্তাহে একদিন সর্বজনীন 'ভজনে'র ব্যবস্থা হয়। ইহাতে চেরাপুঞ্জির খাসি নরনারী ও বালক বালিকাদের অনেকে যোগদান করে। ভজনের পর একটি ধর্মালোচনা আশ্রমের জনৈক সাধু কর্তৃক খাসি ভাষায় পরিচালিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ধর্মনেতা-গণের জন্মবার্ষিকীও সোৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়।

চেরাপুঞ্জিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্রম তিনটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য একটি অবৈতনিক চিকিৎসালয়ও পরিচালনা করিতেছেন। একটি নৈশ বিদ্যালয়ও শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে।

চেরাপুঞ্জির বাহিরে আশ্রমের কাজ দুইটি জায়গায় প্রসারিত। (১ম) চেরাপুঞ্জি হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী নংগোয়ার গ্রামে। এখানে আশ্রম একটি নিম্ন প্রাথমিক এবং একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় চালাইতেছেন।

(২য়) চেরাপুঞ্জির ১৩ মাইল দূরে শেলা গ্রামে একটি মঠ এবং একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেক খাসি ভক্ত নরনারী আছেন। ধর্মালোচনা, ভজন প্রভৃতি প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ভক্তেরা প্রতিমায় দুর্গাপূজারও আয়োজন করিয়া থাকেন। আলোচ্য বৎসরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী তিন দিন ব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। মঠের সংলগ্ন একটি অবৈতনিক লাইব্রেরী ও পাঠাগারও আছে।

ত্রিচুড় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য)—প্রধানতঃ হরিজন বালক বালিকা-দিগকে বিদ্যার্জন ও চরিত্রগঠনের সুযোগ দিবার জন্য ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে ইহা বর্তমানে একটি বৃহৎ শিক্ষা-ও সেবা কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের কার্যাবলী: (১) গুরুকুল বালিকা অনাথাশ্রমের ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ১৮ (২) বালকদিগের গুরুকুল অনাথ আশ্রমে বিদ্যার্থী ছিল ২৬ ও ৩১টি (৩) প্রাথমিক, নিম্ন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ-সংযুক্ত 'বিদ্যা-মন্দিরে' অধ্যয়ন করিয়াছে ৮৭৭ (সম্পূর্ণ অবৈতনিক —৪৬১, আংশিক খরচে—২১৮) ও ৮৯০ (সম্পূর্ণ অবৈতনিক—৬৩০, আংশিক খরচে—১২৫) জন ছাত্রছাত্রী। বিদ্যামন্দিরের লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ছিল ৫১৬৬ (৪) কারীগরী বিদ্যালয়ে বয়নশিল্প শিক্ষা করে ৩৯ জন শিক্ষার্থী (৫) আদাত এবং পরিকট নামক নিকটস্থ হরিজন বস্তিদ্বয়ে সমাজশিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে (৬) ত্রিচুড় এবং পার্শ্ববর্তী ১২টি গ্রামের জনগণের জন্য স্থাপিত আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে রোগিসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬ ও ৩৯। বহির্বিভাগের রোগিসংখ্যা—১৫৩২৫ (নূতন ৭১৫৪) ও ১৪৮৯৮ (নূতন ৬৬৫০)। ছোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ৫৮ ও ৪২২।

(৭) দরিদ্র ও সর্বহারাগণকে খাদ্য, বস্ত্র এবং গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বাবদ আশ্রম আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ৪৮২০৵০ আনা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৬টি গ্রামে বিতরণকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া দরিদ্র শিশু ও প্রসূতিগণের মধ্যে নূতন দিল্লীর জনস্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রাপ্ত (ইউ এন আই সি ই এফ-এর দান) ১০৮০০ পাউণ্ড চাউল ও ৩৪৫৫ পাউণ্ড দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল।

(৮) চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসিগণের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বীজপ্রজনন, আনারসের চাষ, গিনি ঘাসের চাষ, মধুমক্ষিকা রক্ষণ, সাবান তৈয়ারি, সুতাকাটা, তাঁত বোনা, এবং ছুতারের ও কামারের কাজে উন্নত শিক্ষা ও সহায়তা দেওয়া হইয়াছিল।

(৯) হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য আশ্রম বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার পটভূমিতে শাস্ত্র-প্রচার, হিন্দুধর্মের পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান, এবং ভজন ও ধর্মালোচনাসভার নির্বাহ নিয়মিতভ করা হইয়াছিল।

(১০) শ্রমিক রমণীগণের শিশুদের দেখাশুনা জন্য আশ্রমের একটি পৃথক সেবাবিভাগ আছে। মায়েরা শিশুদের সকাল বেলায় আশ্রমে রাখিয়া যায়। এই বিভাগের দু'জন সেবিকা শিশুদিগের স্নান, পোষাক পরিধান, আহার এবং ক্রীড়া প্রভৃতির ভার নেন। জননীগণ তাহাদের কাজ হইতে আসিয়া শিশুদিগকে পুনরায় ঘরে লইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা গান গায়, গুণিতে শিখে, কিছু কিছু লেখাপড়ার দিকেও তাহাদিগকে টানিবার চেষ্টা করা হয়।

নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদামন্দির—কলিকাতা, বাগবাজার পল্লীতে (৫, নিবেদিত লেন) অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভগিনী নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণ আমাদিগের নিকট আসিয়াছে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসের নাম সারদামন্দির। ত্যাগ-ব্রতধারিণী কর্মিগণের সাহচর্যে পবিত্র আশ্রমপরিবেশে বিদ্যার্থিনীরা এখানে আদর্শ ভারতীয় নারীরূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখাটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক, ইহা সকালে বসে। মাধ্যমিক শাখা (পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী) বসে বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা স্কুলের বেতন এই বিদ্যালয়ে কম লওয়া হয়। দরিদ্র ছাত্রীগণকে অনেক আর্থিক সহায়তা দিবার ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত একটি আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য সংস্কৃত প্রার্থনা প্রভৃতির সমবে আবৃত্তি পুরঃসর স্কুলের (উভয় শাখারই) ২, আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ সালে উভয় শাখার মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬১৩, ১৯৫৪ সালে—৬২১। সারদা মন্দিরে ৫৪ জন আশ্রমিকা ছিলেন (৩০ জ

সঙ্গী, প্রার্থিনী ; ত্যাগীকর্মিনী—২৪)। অসহায়া দরিদ্র মেয়েছেলেগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারেন এজন্য বিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগে বিনা বেতনে দর্জির কাজ, সেলাই, সূচিশিল্প এবং অন্যান্য কয়েকটি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মহীশূরের মহারাণী সারদামন্দির পরিদর্শনে এবং ব্রতধারিণীগণের জীবন-ধারা ও কর্মপ্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তি বোধ করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ভগিনী নিবেদিতা স্মৃতিসভার সভানেতৃত্ব করেন আচার্য যদুনাথ সরকার। আচার্যের পরলোকগতা বিদুষী কন্যা কুমারী রমা সরকারের স্মৃতার্থে তাঁহার প্রদত্ত টাকায় সারদামন্দিরে কয়েকখানি নূতন ঘর সংযোজিত হইয়াছে। আচার্যের মহীয়সী পত্নী শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী সরকার ঐ লোকান্তরিতা দুহিতার নামে মেধাবিনী দরিদ্রা ছাত্রীদের শিক্ষাসৌকর্যার্থে ১০,০০০৲ টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ড্ বিদ্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীকে এম্ মুন্সী, সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী সহ সারদামন্দির পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সালে বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা পরিচালনা করেন ডক্টর কালিদাস নাগ; প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু; পারিতোষিক হাতে করিয়া দেন পুনর্বাসনসচিব শ্রীমতী রেণুকা রায়।

প্রতিষ্ঠানসম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী আলোচ্য মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে নিয়োক্ত আশু-নিবারণীয় অভাবগুলির সুনিষ্পত্তির জন্য স্ত্রী-শিক্ষায় সংবেদনশীল বদান্যগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

(১) অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী-গণকে (অধিকাংশই অতি দরিদ্র পরিবারের) বিনা মূল্যে জলখাবারের ব্যবস্থার জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা।

(২) শিল্পবিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র গৃহের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা।

(৩) বিদ্যালয়ের বিস্তারের উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি কেনা হইয়াছে। উহাতে প্রয়োজনীয় বাড়ী নির্মাণের জন্য আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ হোম—গত ১১।৩।৫৪ তারিখে স্থায়িভাবে বেলঘরিয়ায় (২৪ পরগণা) স্থানান্তরিত হইবার পর ১৯৫৪ সালের (৩৬তম বার্ষিকী) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রাবাসটি প্রচুর আলো বাতাসযুক্ত উন্মুক্ত ৩৬ একর জমির উপর। ছাত্রা-বাসের গৃহগুলি, উপাসনা-মন্দির, গ্রন্থাগার, আরোগ্য-ভবন, ব্যায়ামাগার, পাকঘর ও ভোজনালয়, দুইটি খেলার মাঠ, ঝিল এবং পুষ্করিণী সুপরি-কল্পিতভাবে সাজানো। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মোট ৫০টি ছাত্র ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ২৬ জন বিনা খরচায়, ৯টি আংশিক খরচে ও ১৫ জন খরচ দিয়া ছিল। বর্ষ-অন্তে ছাত্র-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০, (তন্মধ্যে ৩২টি ফ্রি, ৪টি কনসেসনে)। ভানু দাশগুপ্ত স্মৃতি-তহবিল হইতে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন কলেজের ৫৫টি ছাত্রকে পরীক্ষা-ফির সাহায্য-বাবদ ৬৫৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মেমোরিয়েল ফাণ্ড হইতে ৬০৲ টাকা দুইজন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর ফি দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্বাচিত ১৮০০ খানি গ্রন্থ আছে। ১২টি সাময়িকী ও ৫ খানি দৈনিক পত্রিকা বিদ্যার্থীদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্-গণের দ্বারা মাসিক বক্তৃতারও আয়োজন করা হইয়াছিল।

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ৫৪তম (১৯৫৪ সালের) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী: (১) হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে

শয্যাসংখ্যা—১১৫ (পুরুষদের জন্য—৭৫ ; স্ত্রীলোকদের—৪০)। আলোচ্য বৎসরে রোগী সংখ্যা ছিল ২৯৩০ (পুরুষ—১৮৯২ ; স্ত্রী—৬৪১ ; শিশু—৩৯৭) অন্তর্বিভাগে অস্ত্রোপচার হয়—৬২০টি। (২) 'আতুর গৃহ' (Invalids' Home)—শয্যা সংখ্যা —৭৫ (পুরুষ—২৫, স্ত্রীলোক—৫০) ; আশ্রিতের সংখ্যা—২৬ (পুরুষ—৪, স্ত্রীলোক—২২) (৩) হাসপাতালের বহির্বিভাগে—রোগীর সংখ্যা ছিল ২,৩৩,২৬৬ (নূতন ৫০,১২৮) (৪) রঞ্জনরশ্মি-বিভাগে ও মলমূত্রাদির পরীক্ষাগারে পরীক্ষা হয় যথাক্রমে ৫১০ ও ৯২৮৪টি (৫) দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অক্ষম ১২২ জনকে সাহায্য-বাবদ ৩৩২২৷৷৶৮ পাই ও কম্বল, ধুতি, জামা ইত্যাদি দান করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ও সাময়িকভাবে সাহায্যলাভ করেন ১৯০ জন; সাহায্য—২০৮৷৷৵৬ পাই।

বহির্বিভাগের গৃহটিতে আলোচ্য বৎসরে কিছু নূতন সংযোজন হইয়াছে। এই বাবদ উত্তর প্রদেশ সরকার ২২,০০০৲ টাকা এবং অপর একজন বন্ধু পান্নালাল নান ও নারায়ণকৃষ্ণ নানের স্মৃত্যর্থে ২০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

সেবাশ্রম আজমগড় ও জৌনপুর জেলায় যে বন্যা-সেবাকার্য চালাইতেছিলেন উহা ১৫ই অক্টোবর বন্ধ করা হইয়াছে। সমগ্র কাজটির নিম্নলিখিত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল—৫৬টি গ্রামের ১৪০৮টি পরিবারের মধ্যে ৯৯৭৷৷৪ সের খাদ্যশস্য, ১২ মণ লবণ এবং ৫৷ মণ চিনি বিতরণ করা হয়। শিশুদিগকে ২০ টিন বিস্কুট, ফলের জ্যাম, টিনে রক্ষিত সব্জী প্রভৃতি, দুধ এবং ভাইটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হইয়াছিল। চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি হইতে ৫,০৩৪ জন রোগীকে ঔষধাদি দান করা হয়। উপরোক্ত অঞ্চলের কুয়া এবং পয়ঃপ্রণালীর শোধন এই সেবাকার্যের আর একটি অংশ ছিল। আমেরিকার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় ৫২০০টি খাদ্য-প্যাকেট (প্রত্যেকটি প্যাকেটে ৯ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং ৫৷৷ পাউণ্ড আমেরিকান 'ভ ছিল) বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। বিতরিত বস্ত্রাদির সংখ্যা : কম্বল—৬০০ ; ধুতি—২০২৯ ; শাড়ী—১৮৭১ গজ ; শিশুদের পোষাক—১৩২৮। গৃহনির্মাণের জন্য ব্যয়—১০৮৫৲ টাকা।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের (৩৩তম বার্ষিকী) কার্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। ১৯২২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যায়তন অক্লান্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার ঈপ্সিত আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এখানে চতুর্থ হইতে দশম শ্রেণীতে মোট ছাত্র ছিল ২২৮টি, তন্মধ্যে ২২টি (অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বালক) বাহির হইতে আসিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ হইতে প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী যে অনাবিল একটানা আনন্দস্রোত বহিয়া গিয়াছিল তাহা বিদ্যাপীঠের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বৎসরে Physical Training Camp-এ ৮৬টি বালক যোগদান করে ; শিমুলতলার চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই শিবির হয়। ২০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে আংশিক ও বিনা খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়াতে ৫৭৫৫৲ টাকা খরচ হইয়াছে। এখানে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এককালীন দান সাদরে গৃহীত হইবে। জলের সুব্যবস্থা এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরী নির্মাণও এবৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রগণ-পরিচালিত সমবায় ভাণ্ডারের লভ্যাংশ হইতে একটি স্থানীয় ছাত্রকে মাসিক ৫৲ টাকা এবং ১৯৫৪-তে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ষোড়শ স্থানাধিকারী বালককে মাসিক ১৬৲ টাকা বৃত্তি

সঙ্গীত হইয়াছে। সংযোজিত ২৬০ খানি নূতন পুস্তক সমেত গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৬৫২৫; পাঠাগারে ৩৮টি মাসিক, ৯টি সাপ্তাহিক ও ৪টি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। ৮৫টি গরু লইয়া বিত্তাপীঠের গোধন, দৈনিক প্রাপ্ত দুধের পরিমাণ ৩।২ সের। সঙ্গীত ও শিল্পবিভাগে এবং সবজি ও ফুলের বাগানের কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

বোস্টন কেন্দ্রের কার্য—বোস্টন (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ১৯৫৪—৫৫ সালের বার্ষিক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:—

বৃহস্পতি ও রবিবারে সাপ্তাহিক উপাসনা ও ধর্মালোচনার ক্লাসগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী নিয়মিতভাবে বহু জিজ্ঞাসুকে ব্যক্তিগত ধর্মোপদেশ দান করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের ধর্মাচার্যগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী অখিলানন্দজী 'ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নলজি' কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথাকার অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দের সহিত মাঝে মাঝে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রগণের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশেষ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে হার্ভার্ড, বোস্টন, রচেস্টার, টোরণ্টো (কানাডা) —এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য কতকগুলি কলেজ, গির্জা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও তাঁহাকে ভাষণ দিতে হইয়াছিল। তিনি টেলিভিসনেও দুইবার বক্তৃতা দেন। স্বামী অখিলানন্দজী আমেরিকায় সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় ১২টি বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রভিডেন্স্ বেদান্ত সমিতি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভিডেন্স্ (Rhode Island) শহরে স্বামী অখিলানন্দজী কর্তৃক বেদান্ত সোসাইটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে রবিবাসরীয় উপাসনা-সম্মেলন এবং মঙ্গল ও শুক্রবারের সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভাগুলি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। রোড্ আইল্যাণ্ডের ধর্ম, দর্শন এবং জনকল্যাণমূলক অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া থাকেন। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত হইতে স্বামী সর্বগতানন্দ স্বামী অখিলানন্দজীর সহকর্মীরূপে এখানে আসেন। তিনিও বক্তৃতাদি এবং ক্লাস পরিচালনায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করিতেছেন এবং বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

রেঙ্গুনে সাংস্কৃতিক কার্য-রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি দ্রুত অগ্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। ইহার আধুনিক যুগোপযোগী বৃহৎ অবৈতনিক গ্রন্থশালা ও পাঠাগার রেঙ্গুনের গর্বের বস্তু। সোসাইটির কর্মপ্রণালী প্রধানতঃ ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজেই সীমাবদ্ধ। ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে বর্তমানে সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা, বর্মা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার পুস্তকসংখ্যা বার হাজারেরও বেশী। ইহাদের মধ্যে পঠনার্থে দেওয়া হইয়াছিল ৬১১৭ খানি (গত বৎসরের সংখ্যা—৩৮৮০)। সোসাইটির পাঠাগারে একসঙ্গে ৭০ জন পাঠক অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নরত থাকিতে পারেন।

গড়ে দৈনিক পাঠার্থী ১০০ জন। সাতটি বিভিন্ন ভাষার ১৮টি দৈনিক ও ৯৩ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪৪টি ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত এবং ৮টি জনশিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এতদ্ব্যতীত একটি পাঠচক্রও যথারীতি চলে। বিভিন্নধর্মের মহাপুরুষদের স্মারক উৎসবাদিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

হজরত মহম্মদ জয়ন্তী—ইসলামধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্মদিবস বিগত ১২ই কার্তিক, (২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫) কলিকাতার নানা স্থানে পালন করা হইয়াছে। 'ফোতান-নবী দিবস' পালনের জন্য পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মহম্মদ জুবের সিদ্দিকী তাঁহার ভাষণে বলেন, নবী মহম্মদের মতে মানুষ হইল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠবস্তু। (কি মুসলমান, কি অমুসলমান) প্রত্যেক মানুষের জীবনই পবিত্র, তাই নরহত্যা অতি বড় পাপ। মানুষের কর্তব্য হইল ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট প্রাণিগণের সেবা করা। উক্ত ময়দানের পশ্চিমাংশে অপর একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মহীউদ্দীন আহম্মদ।

বর্ষব্রত উদ্‌যাপন—গত ১৩ই কার্তিক (৩০শে অক্টোবর, '৫৫) বুদ্ধিস্ট টেম্পল্ স্ট্রীটস্থ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার সভায় এবং কলেজ স্কোয়ারস্থ ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে 'বর্ষব্রত' উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিন মাস ব্যাপী পালনায় 'বর্ষব্রতের' পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এই আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মিলিত হন ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনওপ্রকার পাপ ও মালিন্য যাহাতে স্পর্শ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে পরস্পর উপদেশ গ্রহণ ও আলোচনাদি করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এই মিলনোৎসব 'প্রবরণ' বা 'পাপনিরোধ' নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। 'বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতি' কর্তৃক রাজপুত্র শ্রীগৌতমের নগর-পরিভ্রমণ অবলম্বনে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। (কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট)।

বাল্মীকির আবির্ভাব-জয়ন্তী—মহাকাব্য রামায়ণ-রচয়িতা আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতার ময়দানে ১৩ই কার্তিক, '৬২ (৩০।১০।৫৫) একটি জনসভার উদ্বোধন করেন শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। তিনি বলেন, মহাকবি বাল্মীকির বিস্ময়কর জীবন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-উদ্বোধনের এক অদ্ভুত প্রেরণা যোগায়। যুগ যুগ ধরিয়া যাহারা উপেক্ষিত, সমাজে অবহেলিত তাঁহারাও ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও চেষ্টায় গৌরবের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে পারে—ইহাই বাল্মীকি-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সভার সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নাই, জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকেই এখন পূর্ণতম আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বৃটেনের সমাজকল্যাণ শিক্ষা—সোয়ানসীর ওয়েলস ইউনিভার্সিটি কলেজে সমাজকল্যাণ কার্য শিক্ষাদানের জন্য ২৯শে আগষ্ট হইতে এক বৎসর ব্যাপী যে একটি কোর্সের প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে যোগদানের জন্য ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিশ্বের ১২টি দেশের ১৬ জন সমাজ-কল্যাণকর্মী রাষ্ট্রসংঘের বৃত্তি লাভ করিয়া বৃটেনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রটির নাম মিঃ ও পি মিশ্র; ইনি নিউদিল্লীর কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ বোর্ডে গবেষণার কাজ করেন।

যে সকল দেশে সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে সেই সকল দেশের সমাজকর্মীদের সমাজকল্যাণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিবার জন্যই সোয়ানসীর কলেজে গত তিন বৎসর ধরিয়া উক্ত শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা হইতেছে। আলোচ্য শিক্ষাকোর্সে অস্থায়ী ছুটির সময় ব্যবহারিক শিক্ষাদানের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ব্রিটিশ ইনফর্মেশন সার্ভিস) ৫